শীত ২০১৭
৬৩ নং ইস্যু
(৪০ নং ইন্টারনেট
ইস্যু)

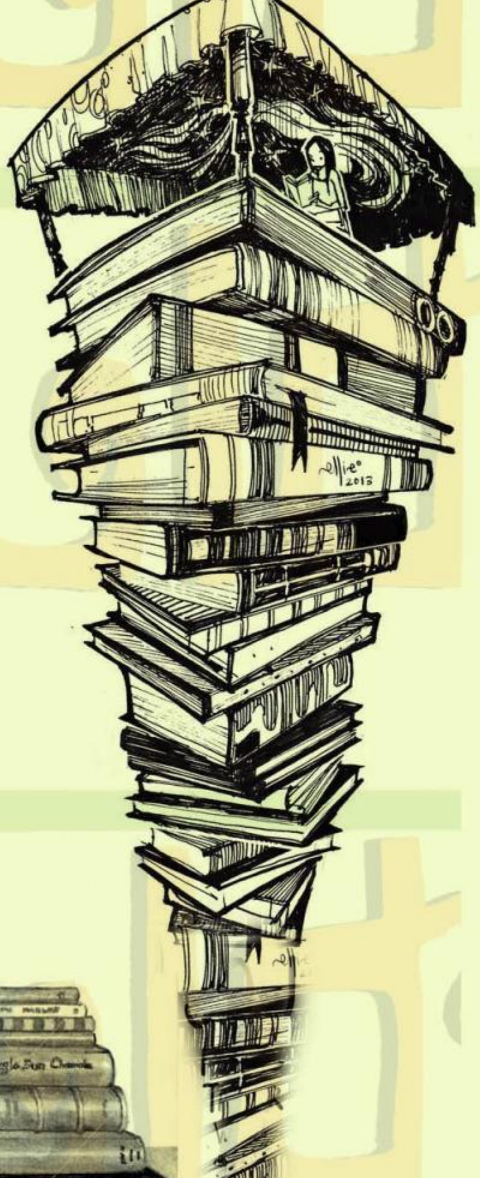

শীত ২০১৭
৬৩ নং ইস্যু
(৪০ নং ইন্টারনেট ইস্যু)

জয়ঢাক

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

এ সংখ্যার আঁকিয়েরা

শিবশংকর ভট্টাচার্য

জয়ন্ত

রাহুল মজুমদার

স্যমন্তক

অংশুমান

শ্রীময়

শ্রীময়ী

সন্দীপন

তন্ময়

অর্ণব

সন্দীপ

ক্যামেরায়

ANNE MARIE NZIOKI ঋতুপর্ণ

অংশুমান

শম্পা

অভীক

উমাদিদি

নির্মাণ সহায়তা

অরিন্দম
সহ-সম্পাদনা

রাজীব
প্রুফিং

তাপস
অডিও

দেবপ্রিয়া

মহুল

ইউনিকোড কম্পোজিটর

এল যে শীতের বেলা। এখন উষ্ণতা খোঁজবার সময়। বন্ধুদের নিয়ে পিকনিক, বাড়ির সঙ্গে চিড়িয়াখানায়, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব আর আনন্দের উষ্ণতা। কিন্তু তা যারা না পায়? তারাও উষ্ণতা খোঁজে। পথের ধারে আগুণ জ্বেলে, কান্না ভুলে, বন্ধু খুঁজে অথবা উজ্জ্বল কোন জীবনের স্বপ্ন দেখে তার থেকে উষ্ণতা কুড়িয়ে নেয় তারা। তেমন ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবারের জয়ঢাকি বোল। লিখে দিয়েছেন তোমাদের দেবাশিসদাদা (দেবাশিস বসু)

আনন্দে থেকো এই শীতে।
–তোমাদের জয়ঢাকি দাদারা

শীত মানে কী শীত?
আদুল গায়ে সে এক ছেলে
পথের ধারে আগুন জ্বেলে
গড়ল মনের ভিত!

শীত মানে কী শীত?
সেই ছেলেটা দুচোখ মেলে
একটা কোনো বন্ধু পেলে
পাতায় মনের মিত!

শীত মানে কী শীত?
একলা খোকা কান্না ফেলে
দুঃখ জয়ের দুয়ার এলে
জীবনটা নিশ্চিত!

শীত মানে কী শীত?
আঁধার বাধার প্রাচীর ঠেলে
স্বপ্ন দেখে এলেবেলে
সেই যে পরম জিৎ!

সূচিপত্র জয়ঢাক শীত ২০১৭

শীত স্পেশাল

কমিকস

গল্প ও উপন্যাস

ছড়া

বিজ্ঞান

নানারঙের লেখা

শীত স্পেশাল

আমার বাবা-আরো কিছু মুহূর্ত	চুমকি চট্টোপাধ্যায়
পারাচিনারের স্মৃতি	দীপালি দেবনাথ
প্রাচীন অ্যাজটেক সভ্যতার কিছু কথা	প্রতিম দাস
ঘোড়ার পিঠে লাইব্রেরি	দীপক গোস্বামী

[এই লেখাটির আগের পর্ব এই লিংকে]

গত মার্চ ২০১৭র বসন্তের জয়ঢাকে বাবার (স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) সম্পর্কে মনের গভীরে গেঁথে যাওয়া কিছু কথা তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলাম। আমার স্মৃতি তেমন একটা ভালো নয়। তবুও দাগ কেটে যাওয়া মুহূর্তগুলোর আরও কিছু কথা শোনাই তোমাদের।

বাবা আদ্যান্ত নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও বাড়িতে কালীপুজো করাতে না কেন বলতেন না, তা আগেই বলেছি। যারা পড়নি তারা টুক করে সংখ্যাটি পড়ে নাও। এই কালীপুজো কেন শুরু হয়েছিল জানো? আমিই বা কেমনধারা প্রশ্ন করছি দেখ! তোমরা কী করে জানবে? আমি বলছি শোনো। আমারও শোনা এই ঘটনা।

বাবাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ। চালের ফুটো দিয়ে বাবা ঘরে শুয়ে চাঁদ দেখতেন। বর্ষার সময় ঘরের চতুর্দিক দিয়ে টুপটাপ জল পড়ত। সেসময় কোন এক রাতে বাবার মা, (দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মা স্বর্গীয় হেমপ্রভা চট্টোপাধ্যায়) স্বপ্ন দেখলেন, পটুয়াতলায় একটিমাত্র শ্যামাকালী মূর্তি অবিক্রিত রয়েছে কারণ সেই মূর্তির একটি হাত চিড় খাওয়া। মাতৃমূর্তি যেন বলছেন, ' আমাকে নিয়ে গিয়ে পুজো কর।'

পরদিন ভোর হতেই হেমপ্রভাদেবী লোক পাঠালেন পটুয়াতলায়। সে গিয়ে দেখে, সত্যিই একটিমাত্র কালীমূর্তি হাতে চিড় খাওয়া বলে অবিক্রিত রয়ে গেছে। সেই মূর্তি এনে পুজো করা হয় চট্টোপাধ্যায় বাড়িতে। সেটা ছিল ১৯৩৯ সাল। তারপর থেকে সেই পুজো চলছে।

আগেই বলেছি, বাবা ছিলেন ঘোরতর নাস্তিক। একেবারে ছেলেবেলা থেকে এমন কিন্তু ছিলেন না। ভালোরকম ঈশ্বর বিশ্বাস ছিল ওঁর। বড় হয়ে মার্ক্সবাদে যখন আকৃষ্ট হলেন, তখন থেকেই সমস্ত কিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করার মনোভাব জন্মাল। আর যেহেতু উনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে কোন যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য পাননি, তাই বিশ্বাস থেকে সরে হয়ে গেলেন নাস্তিক।

বাবার সঙ্গে আমার নানারকম কথা হত। অমন রাশভারি মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে ভয় লাগত না একটুও। তা এই ভগবান আছেন কি নেই সে প্রসঙ্গে কথা হতে হতে আমি জিগ্যেস করলাম, ' আচ্ছা বাবা, রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? উনি তো ভবতারিণী মায়ের সঙ্গে রীতিমত কথা বলতেন, খাওয়াতেন!'

খুব সুন্দর করে স্মিত হাসি হাসলেন বাবা। কোন শব্দ নেই সে হাসির, শুধু ঠোঁট দুটো এক কলা চাঁদের মতো হল। বললেন, ' দেখো মা, যে মানুষ একাধিক মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেন, তার কিছু ক্ষমতা যে আছে, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। ওঁর সারল্য, জীবনবোধ, মানুষের মন বুঝতে পারার ক্ষমতা ইত্যাদি বহু মানুষকে

আকর্ষণ করত। তুমি এখুনি আমাকে জিগ্যেস করবে বিবেকানন্দর বিষয়ে, তাই তো? এ এক দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। নিশ্চয়ই বলব তোমাকে।'

'আর ওই যে মাকালীর সঙ্গে কথা বলা আর খাওয়ানোর কথা বলছিলে, তার উত্তরে বলি, অনেকদিন ধরে যদি তুমি একই অসত্য কথা বার বার বলে যাও, এক সময় তোমার মনে হবে সেই অসত্যটাই সত্যি। ধরো তোমার কুড়ি বছর বয়েস। কিন্তু বার বার যদি তুমি বলো যে তোমার বয়েস পনেরো, একদিন দেখবে তুমি বিশ্বাস করছ যে তোমার বয়েস পনেরো। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হ্যালুসিনেশন! দৃষ্টিভ্রম! বলেই হেসে উঠলেন হাহা করে। সে হাসি এক কলা চাঁদের মতো নয়, পুরোপুরি পূর্ণিমার চাঁদ। উদাত্ত, প্রাণখোলা।

বাবা ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, আমি তেমনটিই বললাম। কিন্তু নিজে না মানলেও, অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দিতেন না কখনো। তোমরা কিন্তু নিজেদের বোধবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে তবেই কোন কিছু বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করবে।

বদলের স্বপ্ন দেখতেন বাবাও। বলতেন, ' শিক্ষাই একমাত্র পারে ভালোর দিকে বদল আনতে। ভারতবর্ষের প্রতিটা মানুষকে ন্যূনতম শিক্ষা না দিলে এ দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। শুধু সরকার নয়, প্রতিটি শিক্ষিত নাগরিকের উচিৎ গরিব, অশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব নেওয়া। তোমার মাকে আমি এব্যাপারে স্যালুট জানাই।'

একটু পরিষ্কার করে বলি। সাধনা চট্টোপাধ্যায় মানে, আমার শাশুড়িমায়ের (এইভাবে মা বলতে খুব খারাপ লাগে। তোমাদের বোঝাতে বললাম। এবার থেকে মনে রেখ নামটা।) এতটাই লেখাপড়া করার ইচ্ছে ছিল যে বড় ছেলের (দিলীপ চট্টোপাধ্যায়)সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে উনি গ্র্যাজুয়েশন করেছিলেন। ক্লাস এইটে পড়ার সময় বিয়ে হওয়াতে লেখাপড়ায় সাময়িক বাধা পড়েছিল।

যৌথ পরিবারের বড় বউ হয়ে আসাতে কিছু দায়িত্ব পড়েছিল কাঁধে। যৌথ পরিবার মানে বোঝ তো? জয়েন্ট ফ্যামিলি যাকে বলে। সে জয়েন্ট যে সে জয়েন্ট নয়! দু বেলা প্রায় ৫০ টা পাত পড়ত। শুধু কি নিজেদের লোক! তুতোর তুতো, ওপার বাংলার যশোরের পাইকড়া গ্রামের লোক, সকলেই থাকত। যশোরের পাইকড়াতেই বাবাদের আদি বাসস্থান ছিল কিনা, তাই সেখানকার মানুষজনকে আত্মীয় বলেই ধরে নেওয়া হত। সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। প্রতিদিন উৎসব!

যাঁর লেখাপড়ার খিদে আছে, সে খিদে আজ হোক, কাল হোক মাথা চাড়া দেবেই। একটু একটু করে এগিয়ে মা শেষ অবধি স্নাতক হলেন। বাড়িতে মাকে কাজে সাহায্য করতেন ননীবালা দাস নামে এক মাঝবয়েসী মহিলা। আমরা ডাকতাম ননীদি। প্রতিদিন সন্ধেবেলা মা ননীদিকে নিয়ে বসতেন পড়াতে। একটা স্লেট আর চক কিনে দেওয়া হয়েছিল। খুব ধৈর্য ধরে পড়িয়ে বছর খানেকের মধ্যে মা ননীদিকে স্বাক্ষর করে তুললেন। যেদিন ননীদি সই করে টাকা তুলেছিল, কেঁদে ফেলেছিল। কারণ তার আগে তো আঙুলের টিপছাপ দিয়ে সব কাজ চলত। ননীদির আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছিল অনেকটাই।

বাবার কী আনন্দ! বলেছিলেন, ' ননী, আর কেউ তোমাকে ঠকাতে পারবে না। তোমার মা (ননীদি মাকে মা বলেই ডাকত) স্যালুট জানাবার মতো কাজ করেছেন।'

পড়াশোনার কথা যখন চলছে তখন আমার নিজের পড়ার প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি। খুবই ছোট্ট একটা মুহূর্ত, কিন্তু আমাকে ছুঁয়ে গেছিল বলেই সযত্নে ধরে রেখেছি মনের জাদুঘরে। আমার বিয়ের চার-পাঁচ মাস বাদেই ছিল প্রথম সেমিস্টার। এমএসসি পড়ছি তখন। পরীক্ষার আর বারো চোদ্দ দিন বাকি। আমার তো কিছুই পড়া হয়নি। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেই কোনরকমে নাকে মুখে গুঁজে বসে যেতাম পড়তে। আর ছুটির দিনে তো ভোর থেকে টানা পড়তাম। শুধু স্নান খাওয়ার সময়টুকু উঠতাম। যদি টপকে যাই তাহলে শ্বশুরবাড়িতে মান সম্মান সব যাবে। অতএব প্রাণপন লড়াই করছি।

একদিন মন দিয়ে পড়ছি। তখন বিকেল। বাবা কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন, বুঝতে পারিনি। মাথায় আলতো হাতের ছোঁয়াতে চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখি, বাবা! আমাকে বললেন, ' যাও মা, ছাদে একটা চক্কর দিয়ে এসো। একভাবে পড়ছ দেখছি। ফ্রেশ এয়ারে ঘুরে আসলে নতুন এনার্জি পাবে, আরও ভালো মন বসবে। হাত-পা গুলোও ছাড়বে। পরিশ্রম করছ, ভালো ফল পাবে। চিন্তা নেই।' সেদিনও চোখে জল এসেছিল, এখনও এল।

কত ছোট ছোট মুহূর্ত মনে পড়ছে, গুছিয়ে বলতে পারছিনা ঠিক। যেমন এখুনি মনে পড়ল দু চারটে সোজাসাপ্টা কথা যা আমার কাছে অমূল্য। নতুন বউ হয়ে এসেছি। মা বললেন, ‘বাড়ির যারা বড় পুরুষমানুষ, তাদের সামনে একটু ঘোমটা দিও। নতুন বউ তো! পরে আর দিতে হবে না।’

মায়ের কথামতো ঘোমটা দিয়ে বাবার সামনে গেছি। বাবা তাকিয়ে বললেন, ' এ কী! ঘোমটা দিয়েছ কেন?' পেছনে মা ছিলেন। বললেন, ' নতুন বউ, ঘোমটা...'

কথা শেষ করতে দিলেন না বাবা। জোরে বলে উঠলেন, 'ধুত্তোর নিকুচি করেছে নতুন বউ! ও আমাদের মেয়ে। খোল ঘোমটা। আর কখনো দেবে না ওসব।'

পড়া প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল আর এক পড়ার কথা। সেই পড়া হল খবরেরে কাগজ পড়া। বাড়িতে অন্যান্য কাগজের সঙ্গে গণশক্তি আসত। এখনও আসে। বাবার সব থেকে প্রিয় কাগজ ছিল গণশক্তি। খুঁটিয়ে পড়তেন। আমি সে সময় পড়াশোনা করার ফলে কাগজ পড়ার তেমন ফুরসত পেতাম না। যেটুকু পড়তাম, সেটা গণশক্তি নয়। বাবা লক্ষ করেছিলেন।

একদিন বললেন, ' আচ্ছা মা, তুমি গণশক্তি পড় না কেন? ওতে সব সঠিক খবর থাকে।'

অসীম সাহস ভর করল আমাকে। বলে দিলাম, 'যে কাগজ শুধু একটা রাজনৈতিক দলের সব কাজ ভালো বলে প্রচার করে, আর অন্যদের সবই খারাপ, সে কাগজ আমি পড়ি না।'

এ কথা বলার পরই মনে হয়, সব্বোনাশ! কী বললাম! ভাবতে ভাবতেই হো হো হাসিতে ভরে যায় ঘর। বাবা হাসছেন।

একটা মজার ঘটনা বলে আপাতত শেষ করছি। একদিন একজন ভদ্রলোক বাড়িতে এসেছেন। বাবা কথা বলছেন তাঁর সঙ্গে। আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'ও হচ্ছে আমার সম্পর্কিত ভাই। ওকে আমরা ঘ্যাদন বলে ডাকি। ও কিছু কবিতা লিখেছে, তুমি সময় করে একটু পড়ে দেখো।'

ঘ্যাদনকাকা বললেন, ' বড়দা, আমি দু একটু শোনাই আপনাকে? '

বাবা সম্মতি দিলেন।

পাঁচালির সুরে ঘ্যাদনকাকা পাঠ করতে শুরু করলেন ওঁর লেখা কবিতা। মিনিট দুয়েক পাঠের পর বাবা বললেন, ' হয়েছে, বুঝেছি। তুই দিয়ে যা। চুমকি দেখে নেবে'খন।'

আমি লক্ষ করলাম বাবার কান লাল হয়ে উঠেছে। বুঝলাম বাবা খুব কষ্ট করে হাসি চেপেছেন। আমার অবস্থা তো বাদই দাও। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

ঘ্যাদনকাকা চলে গেলে পরে বাবা বললেন, 'শোন মা, ফেলে দাও এই সব জঞ্জাল। নিজেও সময় নষ্ট করে, অন্যেরও সময় নষ্ট করে এরা। আক্কেল আর হল না জীবনে।'

আমি তো হো হো করে হেসে উঠেছি। বাবাও যোগ দিলেন তাতে।

হাসি দিয়ে শেষ করি, কী বলো? আবার শোনাব বাবার কথা কোন এক সময়। সবাই ভালো থাকো।

টাইটেল গ্রাফিক্‌স্ঃ ইন্দ্রশেখর
চিত্রসৌজন্যঃ লেখক

পারাচিনারের স্মৃতি

শৈশবে আফগানিস্তানের রোমাঞ্চকর দিনগুলির স্মৃতিচারণ করলেন মুম্বইপ্রবাসী শ্রীমতী দীপালি দেবনাথ

পারাচিনারের বাড়িতে প্রথম প্রবেশের মুহূর্তটা বেশ মনে পড়ে। দুর্গের দরজা দিয়ে ভেতরে গিয়েই বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের তিন ভাইবোনের একটা কমপিটিশান হয়ে গেল। অবশ্য আমি ছোট বলে ছুট পেয়ে যেতাম। দুর্গের সদর দরজাটা পেল্লাই। লোহার দরজা, তার মধ্যে একটা ছোট দরজা। সেখানে একজন খাসাদার দাঁড়িয়ে, পরণে ছাইরঙা Mazri cloth এর সালোয়ার কুর্তা,কাঁধে রাইফেল আর কোমরে টোটার বেল্ট। দরজায় গোল গোল গর্ত। তার মধ্যে দিয়ে রাইফেলের নল বেরিয়ে আছে। দরজার অন্য দিকে আর একজন খাসাদার দাঁড়িয়ে । দুর্গের ভেতরে বাড়ির দরজাটা তুলনায় ছোট, সেই দরজাতেও একটা ছোট দরজা ছিল।

দরজা খোলা। আমরা ছুটে গেলাম। আধখোলা দরজার ওপাশে একটা মোটাসোটা বেড়াল ঘুমোচ্ছিল। আমাদের দেখে বাঁ হাত কানের কাছে তুলে একটা বিরাট হাই তুলে লাফ দিয়ে দরজার ওপরে উঠে চলে গেল।

বিকেল বেলায় আমাদের বেড়াতে পাঠানো হত। একদিন বিকেলে আমরা দুর্গের বাইরে খেলা করছি, দুই দাদা আখরোট গাছে দোল খাচ্ছে আর আমি গাছের নিচে ঘুরে ঘুরে কাঁচা সবুজ আর কষাটে আখরোট চিবিয়ে চিবিয়ে ফেলছি, এমন সময় একটা গাড়ি(সে যুগে মোটর বলা হত) হর্ণ বাজাতে বাজাতে এসে থামল। গাড়ি থেকে খাসাদারকে সঙ্গে করে আমার বাবা নেমেই আমাদের সঙ্গে খেলতে শুরু করে দিলেন। বাপি শনিবারে এসে সোমবারে চলে যেতেন যেটা কিনা আমাদের একেবারে পছন্দ ছিল না। বাপির কাজের জায়গা ছিল থাল দুর্গ।

মাকেও ড্রাইভিং শিখতে হয়েছিল দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে একটু আধটু বাজারহাট করার জন্য। তার আগে মাকে বন্দুক চালানোও শিখতে হয়েছিল। আমাদের নিয়ে বেরোতেন পৈতের মত করে টোটার মালা ঝুলিয়ে কাঁধে বন্দুক নিয়ে। মাথায় কিন্তু সামান্য ঘোমটা থাকত।

মা যখন মোটামুটি ড্রাইভিং করছেন তখন একদিন পরীক্ষা নিতে বাপি সবাইকে নিয়ে বেরোলেন। চারিদিকে বরফ। তখন পড়ছিল না অবশ্য। রাস্তার পাশে চওড়া নালার মত।

খানিক বাদেই মা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে পাশে সেই নালায় ল্যান্ড করলেন। বোধহয় বরফে গাড়ির চাকা পিছলেছিল। গাড়ি স্লো মোশনে নালায় গিয়ে পড়ল। বাঁ দিকটা আটকে গেছে। আমরা সবাই ডান দিক দিয়ে একে একে বেরিয়ে এলাম। তারপরে সেইখানে আমাদের কী হাসি আর লাফাতে গিয়ে আছাড় খাওয়া!

আমাদের ছোট ছোট বেলচা ছিল। সকাল বেলায় বেলচা নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তার বরফ পরিষ্কার করতে হত। না হলে খেলতে যেতে পারব না। বাড়ি ফিরে আগে গরম জলে হাত চুবিয়ে খানিকক্ষণ পরে আগুনের সামনে যেতে পেতাম। একদিন খেলার পর খালি পায়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরলাম। লাফাবার কারণ বরফ। আমাদের জুতোগুলোকে দাদার বুদ্ধিতে বরফে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। ফলভোগ কী হয়েছিল সেটা মনে নেই। বাপি এসব বেশ উপভোগ করতেন। ঝামেলা ভোগের বেলায় মা।

আমাদের বাড়ির সামনে চৌকিদারের ঘর ছিল। তার সঙ্গে আমাদের বড় ভাব ছিল। তার ঘরে আর কে ছিল তা মনে নেই কিন্তু প্রায়ই দুপুরবেলায় দেখতাম তার বৃদ্ধ বাবা একটা লঙ্গোটি পরে গায়ে মাথায় বরফ ঘষে ঘষে স্নান করত। রোগা গায়ে বরফ ঘষে ঘষে গায়ের রং কালো যা ওখানে দেখা যায় না। তার নাকি বয়স ৮০।

গরমের সময়ে দুপুরবেলায় বাইরে যাওয়া আটকানোর জন্যে আমাদের নিয়ে বসতেন দরজার ভেতরে, যেখানে একটু ছায়া আছে। মাটি দিয়ে ছোট ছোট পাহাড় ,নদী ,নদীর সেতু এবং ছোট ছোট পুতুল করতেন ও করাতেন। আমার বড় ভাই খুব সুন্দর মডেল বানাত। দাদা শুধু দুষ্টুমি করত। পরে অবশ্য সেও বানাত।

যে মেয়েরা ঘরের কাজ করতে আসত তারা ঢোলা জামা কাপড় পরত। আমার যতদূর মনে আছে বেশির ভাগ সময়ে পরনে কালো রঙের ঢোলা সালোয়ার কামিজ, গলায় মাথায় পুঁতির গহনা, মাথায় চুলের অনেকগুলো বিনুনি। কোমরে একটা ড্যাগার। পায়ে ঘাসের জুতো।

এত সবের মধ্যে পড়তে বসতে হত মায়ের কাছে । বর্ণপরিচয় ফার্স্ট বুক, অঙ্ক ।

একদিন বেলাতে আমরা খেলা করছি এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ। আমি একটা প্রজাপতির পেছনে ছুটছি আর দাদা (তখন দাদার বদলে নাম ধরেই ডাকতাম) গাড়িটা খুঁটিয়ে দেখছে। ঠিক সেইসময়ে কেউ গাড়ির হর্ন বাজিয়ে দিল। শাঁখের বদলে গাড়ির হর্ন। আগমন হোল আমাদের বোন স্বপ্না লাহিড়ী বা চিনার লাহিড়ীর।

কিছুকাল বাদে একসময় অবশেষে সময় এল পারাচিনার ছেড়ে যাবার। একদিকে রুক্ষ পাহাড় আর একদিকে গভীর খাদ, মাঝখান দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল থাল

দুর্গের দিকে।

এবারে থালের এক অভিজ্ঞতা বলি।এক রাতে ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ বাপি আমাদের টেনে তুলে গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে চললেন। পৌঁছলাম এক খোলা মাঠে। সেখানে এক সমাবেশ। আমরা নেমে দাঁড়ালাম। লোকেরা গোল হয়ে দাঁড়াল। তারপরে নাচ শুরু হল। যার নাম খডক নাচ।. দুজন করে নাচছে, বারে বারে একজন করে চলে যাচ্ছে আর একজন যোগ দিচ্ছে। এক পায়ে পাক দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে দু'হাতের আঙুলে তুড়ি দিয়ে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে। বাপিকেও ওরা টেনে নিয়ে গেল। বাপিও নেমে পড়লেন, সমান তালে নাচতে থাকলেন। বাপি ছাড়া সবাইকার বাবরি চুল। দেখার মত দৃশ্য । তখন অবাক হয়ে দেখেছি আর আজ সে দৃশ্য যখন মনের পর্দায় দেখি অভিভুত হই।

ফটোগ্রাফ সৌজন্যঃ শ্রীমতী দীপালি দেবনাথ ও শ্রীমতি স্বপ্না লাহিড়ী।

প্রাচীন অ্যাজটেক সভ্যতার কিছু কথা

প্রতিম দাস

প্রাচীন অ্যাজটেক সভ্যতার মানুষদের কোনও স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। যাযাবরদের মতো একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হত তাদের। এই প্রাচীন অ্যাজটেকরা অনেক ধরনের ভগবানে বিশ্বাস করতেন। যেমন সূর্যের দেবতা, যিনি প্রত্যেকদিন সূর্যটাকে সাথে নিয়ে আসেন। কোনও কারণে তার মনখারাপ হলে তিনি এই কাজ করতে চান না আর এর ফলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। অ্যাজটেকরা জীবনের অনেকটা সময় এইসব দেবতাদের সন্তুষ্ট রাখার পেছনেই ব্যয় করতেন। খাদ্য যাতে ঠিকঠাক যোগাড় হয় তার জন্য দরকারমতো ভগবান সৃষ্টি করে নিতেন।

আর এইসব ভগবানদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য দরকার পড়ত পুরোহিতের। সাধারণ মানুষ প্রার্থনা করতেন। কিন্তু একমাত্র পুরোহিতদেরই নাকি ক্ষমতা ছিল ভগবানদের সন্তুষ্ট করার। এইসব পুরোহিতরা বলতেন, ভগবানদের সন্তুষ্ট রাখার একটাই উপায়, তা হল মানুষের বলিদান। তাদের গোষ্ঠীর কিছু অংশ খাবার সংগ্রহ করত। কিছু অংশ বানাত নানা জিনিসপত্র। আর শক্তিশালীদের নিয়ে বানানো হত হানাদারবাহিনী। যাদের প্রধান কাজ ছিল অন্য উপজাতি থেকে মানুষ ধরে আনা, যাদের পুরোহিতরা দেবতার জন্য বলি দিতে পারে। না হলে তো নিজের গোষ্ঠীর মানুষকেই বলি দিতে হবে।

ফলে বোঝাই যাচ্ছে, এই বিশেষ কারণে অ্যাজটেকরা অন্যান্য গোষ্ঠীদের কাছে জনপ্রিয় ছিল না মোটেই। এমনও দেখা যেত, এই অ্যাজটেক হানাদারদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অন্য গোষ্ঠীর লোকেরা একত্র হয়েছে নিজেদের মধ্যের শত্রুতা ভুলে গিয়ে। দল বানিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করেছে।

আর ঠিক এই কারণেই প্রায় ২০০ বছর ধরে প্রাচীন অ্যাজটেক উপজাতির মানুষদের কোনও স্থায়ী বাসস্থান গড়ে ওঠেনি। কেউ ওদের পছন্দ না করার কারণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

প্রাচীন অ্যাজটেকদের একটা অতি প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যা ওদের প্রধান উপকথার অংশ। যেখানে বলা হয়েছে অনেক অনেকদিন আগে সূর্যের আর যুদ্ধের দেবতা ওদের পুরোহিতদের সাথে দেখা করেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে একদিন একজন পুরোহিত একটি ঈগল দেখতে পাবেন যে বসে থাকবে একটি ক্যাকটাসগাছের ওপর। ধরে থাকবে একটি সাপকে। আর সেটাই হবে সংকেত, সময় হয়ে গেছে এবার অ্যাজটেকরা তাদের বাসভূমির সন্ধান পাবে। আর সেখানেই ওরা নিজেদের নগরী গড়ে তুলবে। তার মধ্যে এটাও বলে ছিল যে অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও ওদের জীবন উদ্বেগহীনভাবে কাটবে এই নগরীতে। আর ওরা নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে নেওয়ার অনেকটা সময় পাবে।

বিশ্বাস হোক বা না হোক একদিন সত্যি সত্যি এক পুরোহিত দেখতে পেল একটা ঈগল একটা ক্যাকটাসগাছের ওপর মুখে একটা সাপ ধরে বসে আছে। পুরোহিতের নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছিল না। একছুটে সে ফিরে এল দলের কাছে ভ্রাম্যমান আস্তানায়। জানাল কী দেখেছে। এ ঘটনা ঘটেছিল মেক্সিকোর উপত্যকা অঞ্চলে। টেক্সকোকো লেকের জলাভূমি এলাকায়।

উপকথা অনুসারে অ্যাজটেকেরা সবাই ছুটে গিয়েছিল ব্যাপারটা দেখার জন্য। এরকম আশ্চর্য ঘটনা নিজের চোখে দেখার লোভকেই বা সামলাতে পারে। সবাই ওখানে পৌঁছতেই ক্যাকটাসটা বদলে গেল একটা দ্বীপে। আর সেই দ্বীপেই বসবাস শুরু করল ভ্রাম্যমান প্রাচীন অ্যাজটেক উপজাতির দল। দ্বীপটার নাম দিল টেনছটিটলান বা "দ্য প্লেস অফ প্রিকলি পিয়ার ক্যাকটাস"।

উপকথার জাদুর এই টেনছটিটলান দ্বীপে বসবাস শুরু করার পর ওরা ওদের চিরন্তন হানাদারি করা বন্ধ করল। কিন্তু ভগবানকে তো প্রাপ্য বলি দিতে হবেই। সেটা বন্ধ হল না। ধরে আনা মানুষের বদলে ওরা নিজেদের গোষ্ঠীর লোকজনকেই বলি দেওয়া শুরু করল। আর এটাই নাকি করতে বলেছিল ওদের দেবতারা। (যদিও উপকথা অনুসারে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করার জন্য যুদ্ধে গিয়ে লোকক্ষয় করা আটকানোর কথাই আসলে বলতে চেয়েছিলেন দেবতারা।)

এরপর কেটে গেল বেশ কিছু সময়। বলি দিতে দিতে কমে যাচ্ছে উপজাতির জনসংখ্যা। এটা উপলব্ধি করে অ্যাজটেকদের রাজা তার একজন দূতকে পাঠালেন কাছের এক উপজাতির কাছে। আমন্ত্রণ জানালেন তাদের প্রধানের মেয়েকে টেনছটিটলান দ্বীপের রাজধানীতে আসার জন্য। দেখা করার জন্য ওর ছেলের সাথে। আমন্ত্রণ মেনে নিয়ে সেই উপজাতির রাজকন্যা এলেন অ্যাজটেক রাজধানীতে। দেখা করলেন অ্যাজটেক রাজপুত্রের সাথে।

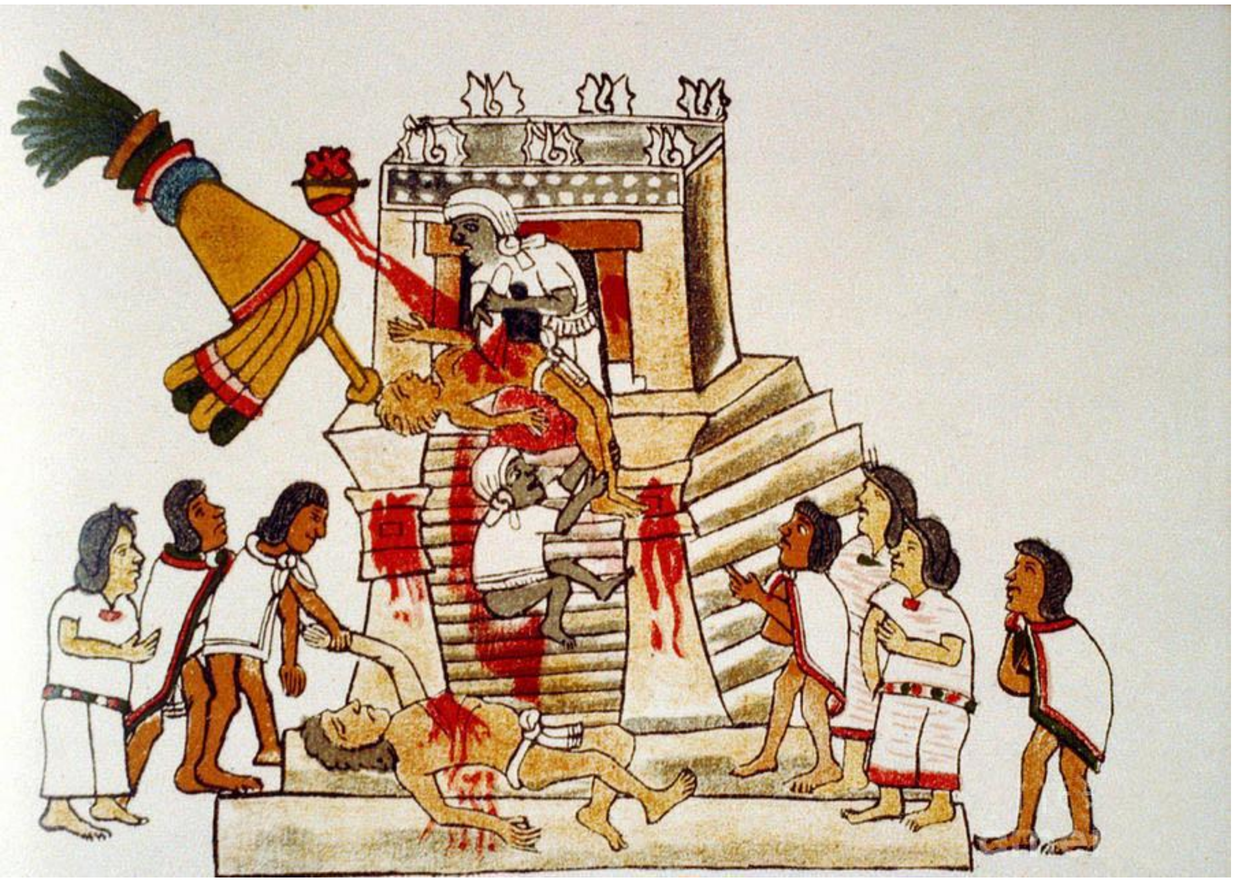

একটা দারুণ ভোজসভা হল। আর সেই অনুষ্ঠানের শেষে রাজকন্যা নিজেই বিয়ের প্রস্তাব দিলেন রাজপুত্রকে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল তারপর। খবর পাঠানো হল রাজকন্যার বাবার কাছে যে সে অ্যাজটেক রাজপুত্রকে বিয়ে করতে চায়। এটা জানতে পেরে মেয়েটির পিতা এলেন টেনছটিটলান দ্বীপে আজটেক রাজধানীতে। উদ্দেশ্য বিবাহ উপলক্ষে মেয়েকে কী কী দেবেন সেসব নিয়ে একটা আলোচনা করা। আর সেখানেই জানতে পারলেন তার মেয়ের সাথে যেসব দাসদাসীরা এসেছিল তাদের বলি দিয়ে দেওয়া হয়েছে অ্যাজটেক দেবতাদের উদ্দেশে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে আর একটু হলে মেয়েটির বাবাকেও বলি দিয়ে দিত অ্যাজটেকদের রাজা। কিন্তু সাথে একদল সশস্ত্র দেহরক্ষী থাকায় ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে সমর্থ হলেন কন্যাটির পিতা। পরের দিনই অ্যাজটেকদের একেবারে শেষ করে দেওয়ার জন্য আশপাশ থেকে সেনা সংগ্রহ করে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করলেন।

এখানে কাজে লাগল অ্যাজটেকদের দেবতাদের দেওয়া পরামর্শ। বলাই ছিল যুদ্ধ না করে, লোকক্ষয় না করে শক্তি সঞ্চয় করার জন্য। সময়ের সাথে সাথে এখন দলের তরুণরাও পরিণত হয়েছে সমর্থ যোদ্ধায়। বানিয়ে রেখেছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র। যে কারণে এই যুদ্ধে জিতে গেল অ্যাজটেকরাই। এর ফলে ওদের সংগ্রহে এল অনেক অনেক ধনসম্পদ, খাবার এবং পোশাক। আর সাথে আথেই দেবতাদের উদ্দেশে বলি দেওয়ার জন্য অনেক মানুষ।

এতে দেবতাদের ওপর ওদের বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। এরপর থেকে ওরা আবার শুরু করল যুদ্ধ অভিযান। আর লুটে আনা সম্পদ দিয়ে আরও ভালো করে গড়ে তুলতে থাকল নিজেদের স্থায়ী বাসস্থান টেনছটিটলান দ্বীপটাকে।

আজ যেখানে মেক্সিকো শহর সেখানেই ১৫০০ সালের প্রথমদিকে ছিল টেনছটিটলান নগরী, অ্যাজটেক সভ্যতার রাজধানী। বাস করত প্রায় তিন লক্ষ মানুষ। প্রাচীন বর্ণনা অনুসারে টেনছটিটলান ছিল এক অদ্ভুত সুন্দর নগর। ঝকমকে মন্দির, খোলামেলা বাজার এবং অসংখ্য বিপণীর সমাহার। আর সেইসব বিপণীতে পাওয়া যেত নানারকম জিনিসপত্র। সেখানে নাকি ছিল আজকের মতো রেস্টুরেন্ট। অর্থের বিনিময়ে সেখানে পাওয়া যেত সাজানো আসনে বসে সুস্বাদু খাবার আস্বাদনের সুযোগ। টাটকা খাদ্য, পানীয় বিক্রির দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হত। চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থার সাথে সাথেই ছিল কেশবিন্যাস করার অতি বিশেষ আয়োজন। পাওয়া যেত প্রসাধনের নানান সামগ্রী এবং এমব্রয়ডারি করা পোশাক। শিল্পীদের বিশেষ সম্মান ছিল অ্যাজটেক সভ্যতায়। দেবতার প্রতি বিশ্বাসের থেকে হওয়া নৃশংসতার দিকটা বাদ দিলে অ্যাজটেক সভ্যতা ছিল এক বর্ণময় শিল্পসংস্কৃতির পীঠস্থান বিশেষ।

উপকথা অনুসারে, এই অ্যাজটেক নগরী গড়ে উঠেছিল জলাভূমির ওপর। যে কারণে সেই সময়ে ওখানকার বাড়িঘরের স্থায়িত্ব খুব বেশি হত না বলেই জানা গেছে। আজও সেই ঐতিহ্য নাকি বর্তমান। এখনও মেক্সিকোর জমি সেই অর্থে শক্ত নয়। অবশ্য প্রযুক্তির সহায়তায় এ সমস্যার সমাধান বর্তমানের অধিবাসীরা করে ফেলছেন অনেক পরিমাণে।

[তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট]

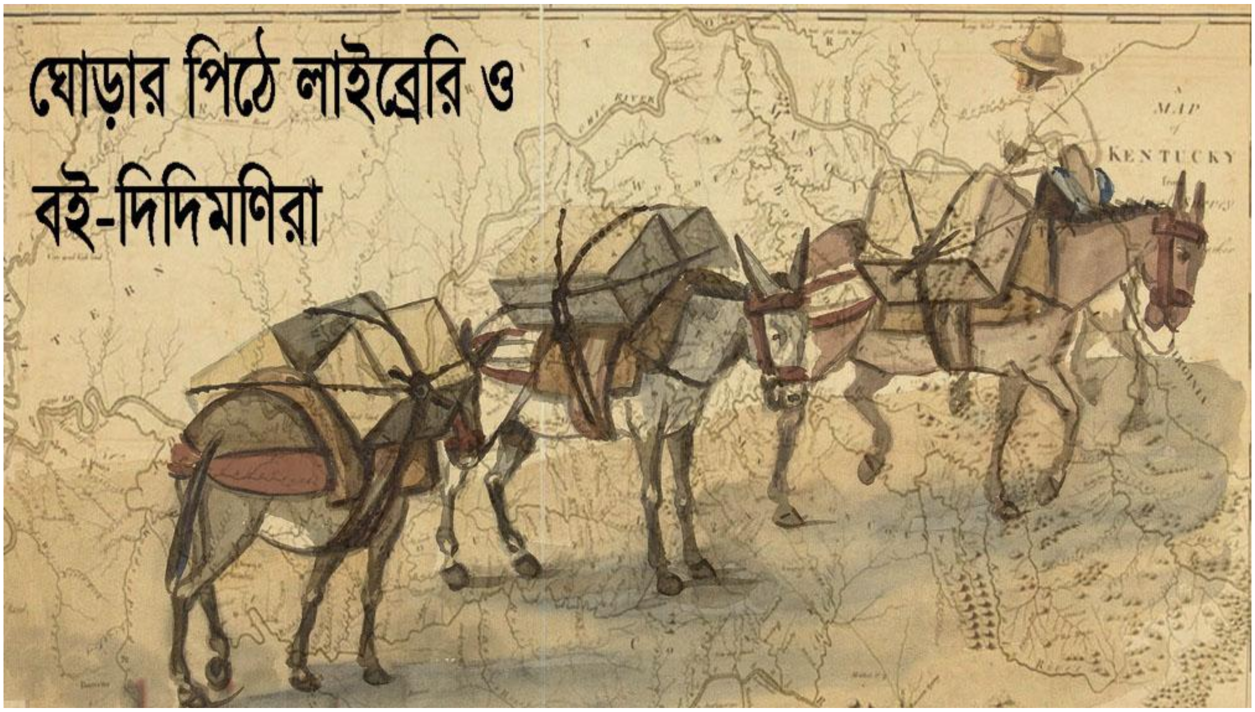

আমেরিকার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল। খাড়াই পাহাড়ের গায়ে বিপজ্জনক পথে পা পা করে এগিয়ে চলেছে একটা ঘোড়া। তার পিঠে বসা তরুণীটির সতর্ক নজর পাশের খাদের দিকে। এক জায়গায় এসে বোঝা গেল ঘোড়ারপিঠে যাওয়া সম্ভব নয়। নেমে এলেন তরুণী। ঘোড়ার শরীরের দুপাশে ঝোলানো রয়েছে তাঁর অমূল্য সম্পদ। দুটো বড়োবড়ো বইয়ের থলি। তাদের না ক্ষতি হয়। সাবধানে ঘোড়ার রাশ ধরে পা পা করে পেরিয়ে এলেন বিপজ্জনক জায়গাটা। দূরে দেখা দিয়েছে একটা ছোট্টো পাহাড়ি গ্রাম। সেইদিকে এগিইয়ে চলতে চলতে আপনমনেই একটা সুর ভাঁজছিলেন তিনি। আপালাচিয়ানের দুর্গম পথে চলেছেন বই-দিদিমণি, তাঁর চলমান লাইব্রেরি নিয়ে, জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে। খবর দিচ্ছেন --

দীপক গোস্বামী

সময়টা ১৯৩৩। মন্দার জ্বরে কাঁপছে সারা পৃথিবী। নামই হয়ে গেছে ‘বিশ্ব-মন্দা’ (Great Depression)। আর এই অর্থনৈতিক অসুখে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে আমেরিকা। সেই সময়ের একটা ঘটনা।

কিন্তু ঘটনাটা বলার আগে মন্দার ব্যাপারটা দু’এক কথায় জেনে নেওয়া দরকার। মন্দ মানে যে খারাপ সেটা আমরা সবাই জানি। মন্দাও খারাপ, তবে সেই খারাপ হচ্ছে অর্থনীতির খারাপ অবস্থা। যে দেশে মন্দা আসে, সেখানে একই সঙ্গে অনেক রকম দুর্বিপাক এসে হাজির হয়— ব্যাবসায় শেয়ারের দাম পড়ে যায়, সকলেই শেয়ার বিক্রি করে দিতে চায়। জিনিষের দাম একই থাকলেও লোকের আর কেনার ক্ষমতা থাকে না। কিনতে না পারার জন্য সেগুলো বিক্রি হয় না, আর বিক্রি হয় না বলেই সে’সব তৈরিও হয় না। তৈরি না হলে কল-কারখানায় শ্রমিকের দরকার কী? সেখানে এবং অফিসে কর্মচারী ছাঁটাই হতে থাকে। বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলে, যাদের কোনও রোজগার নেই। রোজগার না থাকায় সবাই একই সঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিতে চায়।

ব্যাঙ্কগুলো সেই চাপ সহ্য করতে পারে না। ব্যাঙ্ক ফেল হতে থাকে। চারিদিকে হাহাকার পড়ে যায়। এই রকম একটা ভয়ানক অবস্থা চলেছিল সারা বিশ্বজুড়ে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

শুরু হয়েছিল আমেরিকায় ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার, যে দিনটাকে আজও 'কালো বৃহস্পতিবার' (Black Thursday) বলে সবাই জানে। ঐ এক দিনেই ১ কোটি ২৯ লক্ষ শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। পরের চার দিনে শেয়ারের দাম পড়ে গেছে ২৩%, যা অকল্পনীয়। আর এটাই অর্থনীতির ভাষায়— স্টক মার্কেট ক্র্যাশ। বাজারের অবস্থা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে প্রতি বছর জিনিসের দাম ১০% হারে পড়ে যেতে লাগল, অল্প সময়ের মধ্যেই বেকারির হার দাঁড়াল ২৫%। যারা তখনও চাকরি করছিল, তাদের আয় কমে গেল ৪২%। বহু কৃষকের জমিজমা বিক্রি হয় গেল, বাড়িঘর হারিয়ে অনেকেই আরও দূরের রাজ্যে চলে গেল কাজের খোঁজে।

সে সময় আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন হার্বার্ট হুভার। তাঁর এবং সরকারি সংস্থা, ফেডারেল রিজার্ভ-এর ভুল নীতির ফলেই এই মন্দার সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সরকারি নীতির পরিবর্তনে এই ভয়াবহ দিনগুলোও একটু একটু করে বদলাতে থাকল। ১৯৩২-এ রাষ্ট্রপতি হিসাবে এলেন ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট। এই অবস্থার পরিবর্তন করার ব্যাপারে তাঁর মাথায় রকমারি নতুন চিন্তা ছিল। সেগুলোকে প্রয়োগ করার জন্য 'নিউ ডিল' নামে একটা কার্যক্রমের ভেতরে নানা কর্মসূচিরও সৃষ্টি হল। সেগুলোর মধ্যেই একটার নাম 'ওয়ার্কস প্রোগ্রেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (Works Progress Administration, সংক্ষেপে ডবলু. পি. এ)। শুরু হয়েছিল ১৯৩৩-এ এবং এই কর্মসূচিতে আমেরিকার লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষকে যুক্ত করা হয়েছিল, যাতে এই মন্দার সময় তাদের একটা নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। সাধারণত সরকারি কাজ বলতে নির্মাণ কাজের মত ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরিই বোঝায়। কিন্তু ডবলু. পি. এ-এর নানা কর্মসূচির মধ্যে শুধু সেটুকুই নয়, দেশে এই দুঃসময়ে কলা সাহিত্য নাটক ইত্যাদির উন্নতির জন্যেও শিল্পী লেখক গায়ক অভিনেতাদের মত অনেককেই নিযুক্ত করা হয়েছিল।

ডবলু. পি. এ-এর বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটি ছিল সাক্ষরতা, অর্থাৎ যারা পড়তেই পারে না তাদেরকে কাজ চালাবার মত পড়াশোনা শেখানো। তারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে কেনটাকি রাজ্যে সৃষ্টি হল প্যাক হর্স লাইব্রেরি (The Pack House Library) প্রকল্প। উদ্দেশ্য খুবই সরল— কেনটাকির বিচ্ছিন্ন ও দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে বই, পত্র-পত্রিকার মত পাঠ্য উপাদান পৌঁছে দেওয়া। কী উপাদান, কীভাবে এবং কাদের দিয়ে দশ বছরের মত দীর্ঘ সময় প্রকল্পটা চালু রাখা হয়েছিল সেই নিয়েই এই আলোচনা।

কেনটাকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের মাঝামাঝি একটি রাজ্য— আয়তন ৪০,৪০৯ বর্গমাইল। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত যে চারটি রাজ্য মিলে একটি কমনওয়েলথ তৈরি হয়েছিল, কেনটাকি তাদের অন্যতম। এখানকার উর্বরা জমিতে অনেক নীলঘাসের উৎপাদন হওয়ার কারণে কেনটাকিকে 'ব্লুগ্রাস স্টেট'-ও বলে।

আমরা আগেই বলেছি মন্দার দুঃসময়ে কিছু লোকের জন্য চাকরির বন্দোবস্ত করা প্যাক হর্স লাইব্রেরি উদ্যাগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল পূর্ব কেনটাকির প্রায় দশ হাজার বর্গমাইলব্যাপী আপ্পালাচিয়ার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের লোকেদের কাছে বইপত্র ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া। কারণ ১৯৩০-এ ঐ অঞ্চলের শতকরা ৩১ জন অধিবাসী পড়তে জানত না। তারা বুঝতে পারছিল এই ভয়াবহ মন্দা তাদের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে যে আশঙ্কা তৈরি করেছে, তার থেকে রেহাই পেতে গেলে পড়াশোনা করার একান্ত প্রয়োজন। বিচ্ছিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলে চলমান গ্রন্থাগার বা মোবাইল লাইব্রেরি (Mobile library)-এর মাধ্যমে বই পাঠানোর চেষ্টা যে

এর আগে হয়নি তা নয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক মে স্টাফোর্ড গ্রামীণ এলাকায় ঘোড়ার পিঠে বই পাঠাবার জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু সে উদ্যোগ এক বছরের বেশি চলেনি। ১৯২০-র প্রথম দিকে ওখানকার বেরিয়া

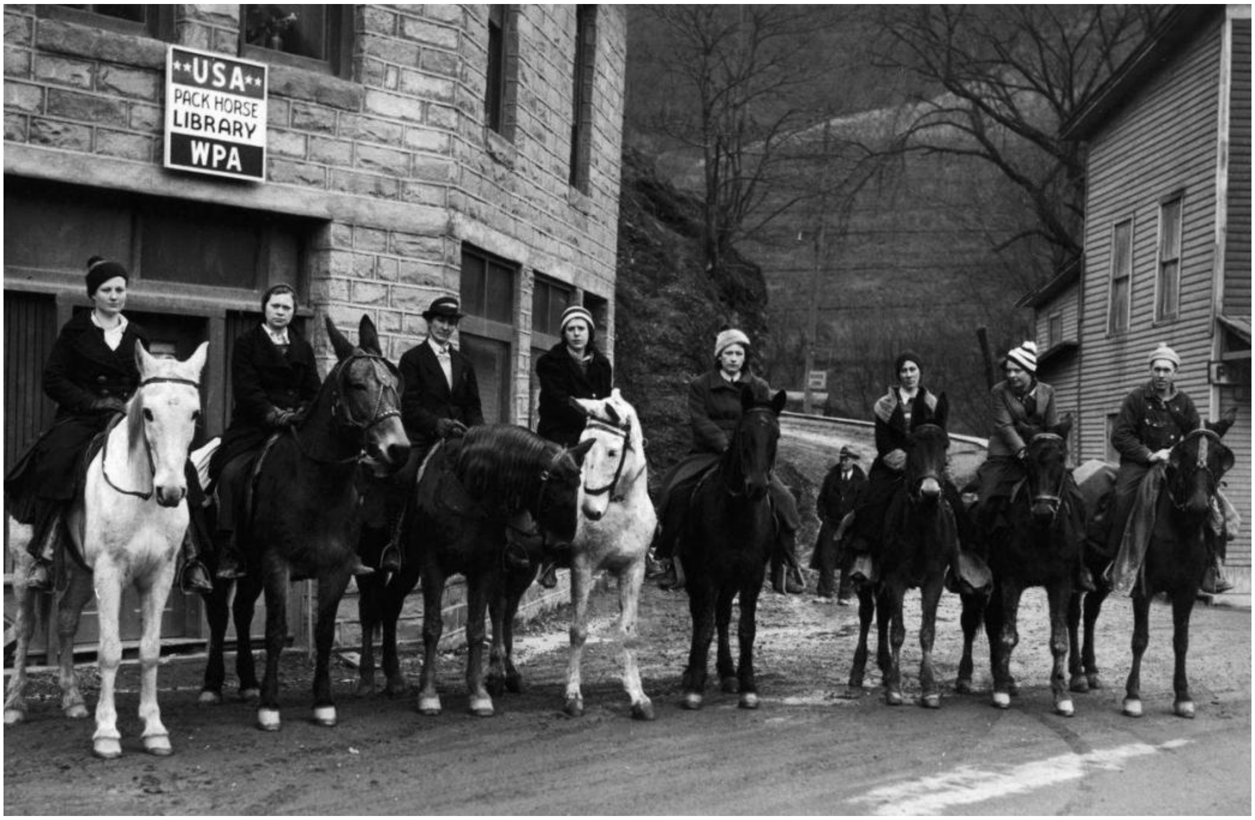

কলেজও ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে পাহাড়ে বই পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। সে সবও কয়েক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু প্যাক হর্স লাইব্রেরি পরিকল্পনার মধ্যে অন্য অভিনবত্ব ছিল। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বই নিয়ে যাবার পদ্ধতি ছিল একই। ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠের জিনের দু'ধারে থলি ঝুলিয়ে তার মধ্যে বই পুরে দেওয়া। যারা বই নিয়ে যেতেন, তাঁদেরকে চলমান গ্রন্থাগারিক বা মোবাইল লাইব্রেরিয়ান (Mobile Librarian) বলা হোত। কিন্তু নতুনত্ব ছিল এই যে, এবারের উদ্যোগের প্রায় সব লাইব্রেরিয়ানই ছিলেন মহিলা। আর মহিলা বলেই তাঁদের 'বই-দিদিমণি' বা 'বুক উইমেন' (Book women) বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের নিজস্ব ঘোড়া বা খচ্চরেই বই বোঝাই করা হলে তাঁরাই পুরুষদের মত (হয়ত আরও বেশি) দায়িত্ব নিয়ে শীতের সময়ও ঠাণ্ডায় রেকাবে জমে যাওয়া পা নিয়ে কাজ করে গেছেন। এইসব বই-দিদিমণিকে সব ঋতুতেই প্রতি সপ্তাহে ১০০ থেকে ১২০ মাইল পথ ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে ঘুরতে হয়েছে। খুব দুর্গম জায়গায় যেখানে ঘোড়ায় ওঠা সম্ভব নয়, সেখানে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটেও গেছেন তাঁরা। একমাত্র উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীদের পড়বার মত উপাদান সরবরাহ করা।

উপাদান বলতে মূলত পুরোনো বই, পত্র-পত্রিকা, পাঠ্যপুস্তক, সানডে স্কুলের ম্যাগাজিন সবকিছুই, যা পাওয়া যেত বিভিন্নজনের কাছ থেকে দান হিসাবে। কেনটাকি লাইব্রেরি কমিশনের প্রতিনিধি হিসাবে লীনা নফসিয়ার এজন্য সারা রাজ্য ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং অবস্থাপন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে আপ্পালাচিয়ার সাধারণ

মানুষদের পাঠ্য উপাদান দেবার জন্য ক্রমাগত আবেদন করেছেন। বিভিন্ন কেন্দ্রের কোনও একটা লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে এই উদ্যোগ চালু হোত। প্রথমে পাঠ্য উপাদানগুলো সংগ্রহ করে সেখানে জমা করার পর বই-দিদিমণিরা সেগুলোর ছেঁড়াখোঁড়া মেরামত করতেন। তাঁরা পুরোনো ক্রিসমাস-কার্ডও সংগ্রহ করতেন এবং সেগুলো কেটে পাতায় চিহ্ন দেবার জন্য বুক-মার্ক তৈরি করে দিতেন। না হলে তো নতুন পাঠকরা পড়ার সময় কুকুরের কানের মত পাতার কোনা মুড়ে বইগুলো নষ্ট করে দেবে।

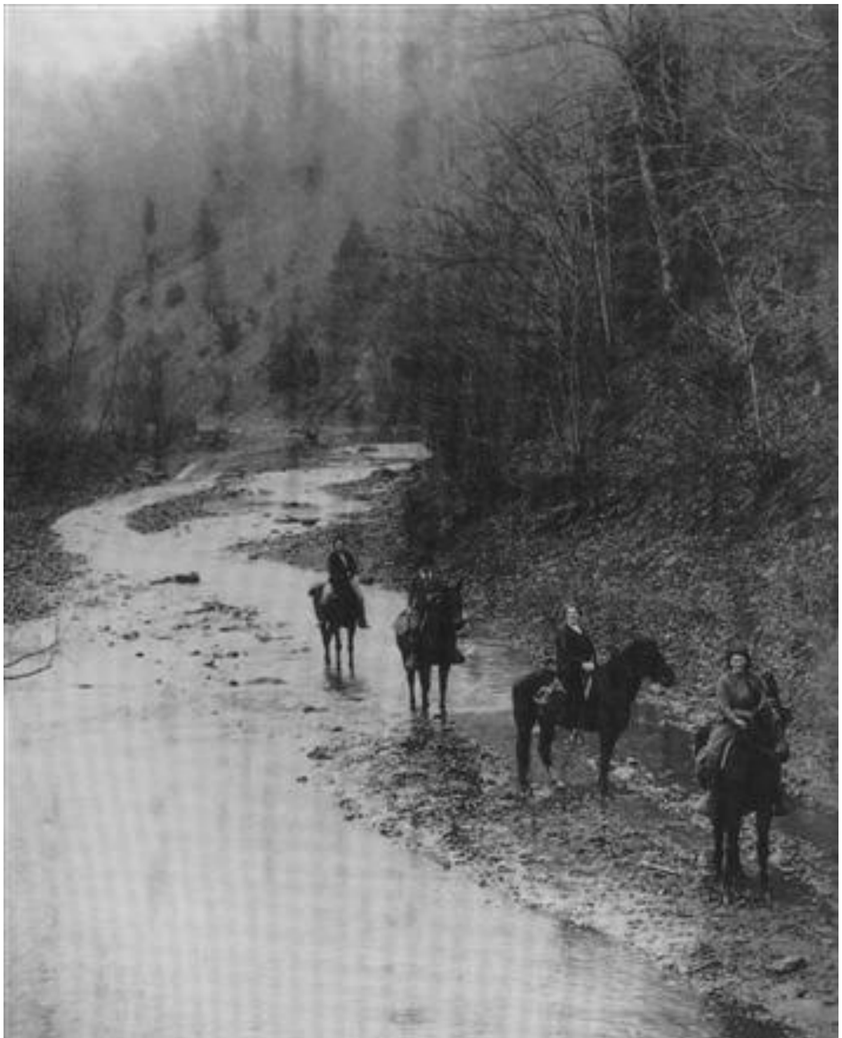

এইসব প্রচারের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্দ্ধেক রাজ্য থেকে বই আসতে লাগল। জনৈক কেনটাকিবাসী ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাবার পরও তাঁর মায়ের স্মৃতিতে ৫০০ বই পাঠালেন। সারা দেশের অনেকেই অল্প অল্প করে পেনি জমিয়ে এই উদ্যোগকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ১৯৩৬ নাগাদ এইসব লাইব্রেরিয়ান প্রায় ৫০,০০০ পরিবারকে পড়ার উপাদান সরবরাহ করতেন। আরও এক বছরের মধ্যে প্রায় ১৫৫-টি সরকারি স্কুলও এই পরিসেবার মধ্যে চলে এল। কারণ বিচ্ছিন্ন পার্বত্য অঞ্চলের সরকারি বিদ্যালয়ে কোনও লাইব্রেরিই ছিল না।

এইসব পাহাড়ি লোকেরা মার্ক টোয়েনের বই খুব ভালবাসত। তাদের কাছে ডানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুশো'-ও খুব জনপ্রিয় ছিল। বড়োরা অনেকেই পড়তে পারত না বলে তাদের ছবির বই বেশি পছন্দ ছিল। বইগুলো পড়ে দেওয়ার ব্যাপারে তারা বাড়ির

পড়তে জানা ছোট ছেলেদের ওপরই নির্ভর করত। ছোটছোট ছেলেরা এইসব বই-দিদিমণিদের কাছে কাতর আবেদন করে গেছে যে সারাদিনের জমি নিড়ানির কাজ শেষ করার পর কিংবা রবিবারে পড়ার জন্য তিনি যেন কিছু বই তাদের কাছে রেখে যান। কোনও বিশেষ বই নয়— যে কোনও বই, যে কোনও ধরনের, যে কোনও বিষয়ের, কারণ তারা তো পড়ার বই-এর বাইরে কোনও বইই পড়তে পায় না।

আর এইসব সহানুভূতিশীল বই-দিদিমণিরা তাদের আবদার তো রাখতেনই, তার পরেও তাঁদের কাজ শেষ হতো না। যেসব পুরোনো বই তাঁরা পেতেন, মেরামত করে বেশ কয়েকবার ব্যবহারের পরে যখন আর সেগুলো পড়ার মতো অবস্থায় থাকত না তখন তাঁরা সেগুলোর লেখা এবং ছবি আলাদা আলাদা করে কেটে এবং সাদা কাগজে সেঁটে বাঁধাই করে নতুন বই তৈরি করতেন। ছেঁড়াখোড়া রান্নার বই থেকেও রান্নার পদ্ধতিগুলো আলাদা করে কেটে বাঁধিয়ে ছাঁট বই বা স্ক্র্যাপ বুক (Scrap book) তৈরি করতেন তাঁরা। এইভাবেই অনেক স্ক্র্যাপ বুক তৈরি হয়ে গেল।

উৎসাহী পাঠকদের কাছে বই পৌঁছবার জন্য এইসব দিদিমণিদের যে কী অপরিসীম কষ্ট করতে হয়েছে তা কল্পনাও করা যায় না। অনেক পাঠকই পাহাড়ের পেছনে থাকতেন, যেখানে যাবার কোনও রাস্তাও ছিল না। দিদিমণিরা শুকনো নদীর খাঁড়িপথ ধরে গিয়ে সেখানে বই সরবরাহ করেছেন। যখন যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে তখনও তাঁরা হার মানেন নি। জনৈক বই-দিদিমণির খচ্চর পথের মধ্যে মারা গেলে তিনি বাকি ১৮ মাইল পথ বইয়ের ব্যাগ নিয়ে পায়ে হেঁটেই পাহাড়ে উঠেছেন। এই রকম এক দিদিমণি ন্যান মিলান, যিনি পাইন মাউন্টেন সেট্‌লমেন্ট স্কুল থেকে আট মাইল ব্যাসার্ধের বিভিন্ন অঞ্চলে বাচ্ছাদের বই সরবরাহ করতেন, ঠাট্টা করে বলতেন যে তাঁর ঘোঁড়ার এক দিকের পা-দুটো নিশ্চয়ই অন্যদিকের চেয়ে ছোট, না হলে তো খাড়াই পাহাড়ি রাস্তায় খাদের ঢালুতে পা পিছলেই পড়ে যেত।

বেশিরভাগ সময় এই সব মহিলাদের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকেই পছন্দ করা হত। কারণ নতুন মুখ দেখলে পাহাড়ের লোকরা সব সময় বিশ্বাস করত না। পাহাড়ি মানুষদের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য এইসব দিদিমণিরা বাইবেলের অংশ আবৃত্তিও করে শোনাতেন। পড়তে না জানার কারণে পাহাড়ের অনেকেই হয়ত বাইবেলের গল্প তাদের গুরুজনদের মুখে শুনে থাকবে। দিদিমণিদের মুখে পবিত্র বাইবেলের কথা শুনে তারা তাদের কাজকর্মের প্রতিও আগ্রহী হয়ে উঠত।

এই ভাবেই নানা কষ্ট সহ্য করে এবং বহু মানুষের কৃতজ্ঞতা অর্জন করে প্যাক হর্স লাইব্রেরি ভালোভাবেই চলছিল। কিন্তু ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে রুজভেল্টের আদেশে 'ওয়ার্কস প্রোগ্রেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' প্রকল্প বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্যাক হর্স লাইব্রেরিও বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তখন বেকারি অনেক কমে গেছে। অনেকেই পুরোনো চাকরিতে ফিরেও গেছে। কিন্তু বই পড়ার প্রয়োজন তো ফুরোতে পারে না। তাই আমরা দেখতে পাবো কয়েক বছরের মধ্যেই মোটর ভ্যানে করে বই নিয়ে গিয়ে আবার চলমান গ্রন্থাগার (bookmobiles) শুরু হবে। পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বই পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে আমাদের এটা জানা নেই সেই নতুনভাবে বই পরিবেশনের সঙ্গে বই-দিদিমণিরা জড়িয়ে ছিলেন কি না— বা থাকলেও কতজন ছিলেন!

	কমিক্স্		শীত ২০১৭
কমিক্স্	শার্লক হোম্স্ হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিল্স্	অনুবাদঃ দেবজ্যোতি	শীত ২০১৭
কমিক্স্	মোবাইল	সন্দীপন কর্মকার	শীত ২০১৮
কমিক্স্	রাশিয়ান কমিকস-দাঁড়া দেখাচ্ছি-সার্কাসে গোলমাল	কুর্লিয়ানস্কি ও হাইত	শীত ২০১৭
কমিক্স্	টোটা আর টিটো-ক্যাপ্টেনের শরীরচর্চা	রুডলফ ডার্ক্স্। অনুঃ তাপস	শীত ২০১৭
কমিক্স্	তারানাথ তান্ত্রিক	দেবসেনা নন্দী শ্রীময় দাশ	শীত ২০১৭

আগের পর্ব এই লিংকে

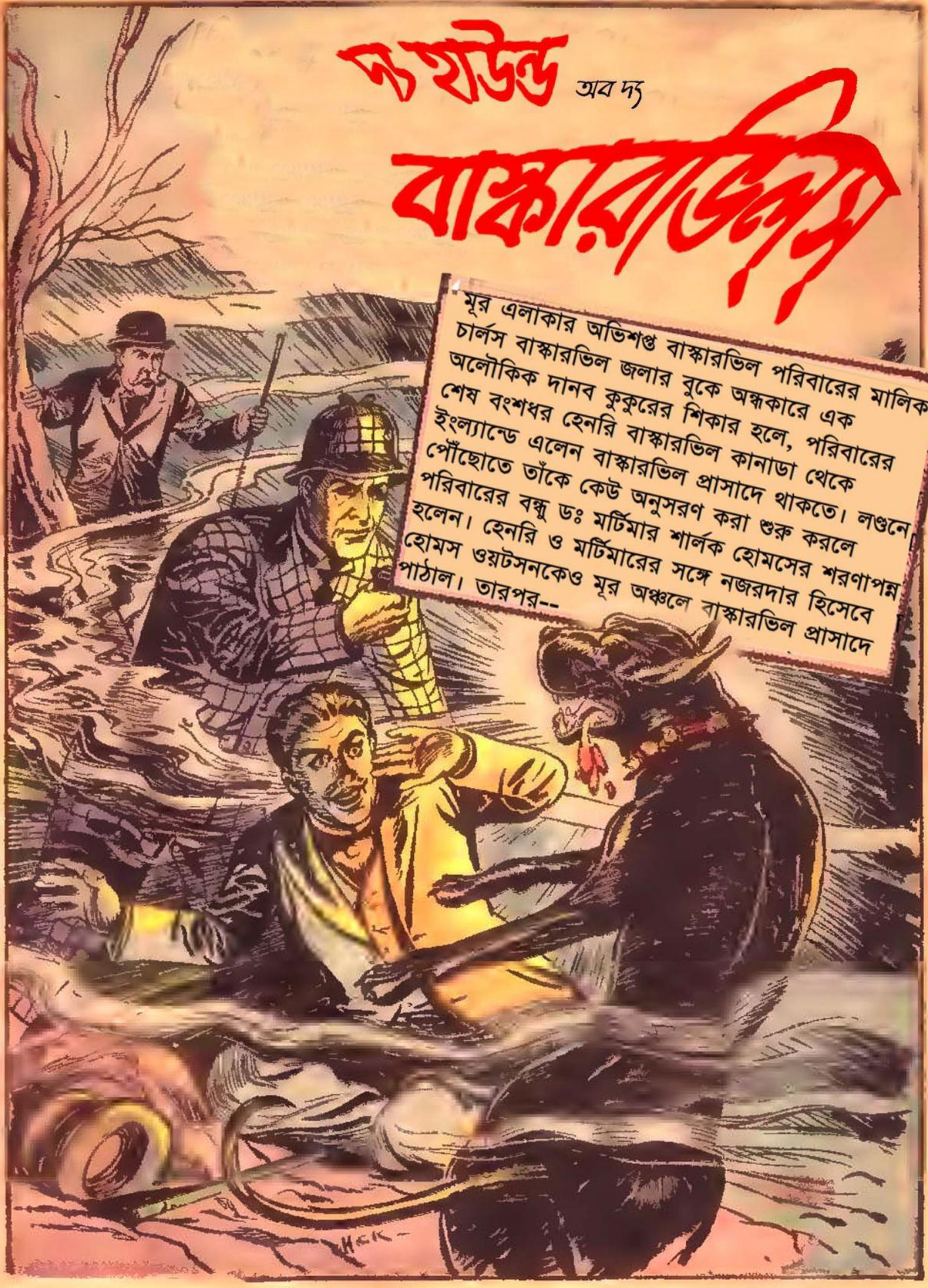
হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিল্স
মূর এলাকার অভিশপ্ত বাস্কারভিল পরিবারের মালিক চার্লস বাস্কারভিল জলার বুকে অন্ধকারে এক অলৌকিক দানব কুকুরের শিকার হলে, পরিবারের শেষ বংশধর হেনরি বাস্কারভিল কানাডা থেকে ইংল্যান্ডে এলেন বাস্কারভিল প্রাসাদে থাকতে। লণ্ডনে পৌঁছোতে তাঁকে কেউ অনুসরণ করা শুরু করলে পরিবারের বন্ধু ডঃ মর্টিমার শার্লক হোমসের শরণাপন্ন হলেন। হেনরি ও মর্টিমারের সঙ্গে নজরদার হিসেবে হোমস ওয়টসনকেও মূর অঞ্চলে বাস্কারভিল প্রাসাদে পাঠাল। তারপর--

বাস্কারভিলে স্বাগত স্যার হেনরি
এবারে তবে আমি চলি। বাড়িতে অনেক কাজ পড়ে আছে। ব্যারিমোররা আপনাকে সবকিছু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।
বাইরে গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে গেল। স্যার হেনরি আর ওয়াটসনের পেছনে গম্ভীর শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল প্রাসাদের দরজা

আপনাদের জিনিসপত্র ঘরে রেখে দিয়েছি স্যার। খানিক পরেই ডিনার দেয়া হবে। আশা করি আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না সার। নতুন কাজের লোক যোগ দেয়া পর্যন্ত আমি আর আমার স্ত্রী আপনাদের সঙ্গেই থাকব।
নতুন কাজের লোক! তুমি চলে যাচ্ছ?
সার চার্লসের মৃত্যু আমাদের বড়ো আঘাত দিয়েছে সার। এখানে আর আমাদের থাকা হবে না।
না—না
সার হেনরি কয়েকদিনের মধ্যে একটু বাইরে যাবেন। এ অবস্থায় অচেনা মানুষজনের চাইতে তুমিই যদি তাঁর ফেরা অবধি থেকে যাও তাহলে বোধ হয় ভালো হয়।
ঠিক আছে সার।
এদের ধরে রাখবার জন্য গল্পটা বানাতে হল। এরা চলে যেতে চাইছে! আশ্চর্য!
সবকিছুই কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে। এ ঘরটা—একটু ভয়ধরানো!!
দেখা যাক, সকাল হলে হয়ত পরিস্থিতি পাল্টাবে!
দেখা যাক। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়াই ভালো।
নির্জন মূর এলাকায় বাতাসের গর্জন আর গোঙানি শুনতে শুনতে ওয়াটসন তার বিছানায় ছটফট করে। নিচের হলঘর থেকে রাত বারটার ঘন্টার শব্দ ভেসে এল—হঠাৎ একটা চাপা ফোঁপানোর শব্দ ভেসে এল! কোন মহিলার কান্নার শব্দ--

সেই ফোঁপানির শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল এক অশরীরি পশুর গর্জন
শিকারী কুকুর!! সেই শিকারী কুকুরের ডাক!!
তারপর মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা—
কান্নার শব্দটাও বন্ধ!!
পরদিন সকালে
কাল রাতে কোন মহিলাকে কাঁদতে শুনেছিলেন?
আজ্ঞে হ্যাঁ। কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করতে হবে।
এ বাড়িতে কেবল দুজন মহিলা আছেন। একজন বাসনকোসন ধোয়। সে বাড়ির অন্যদিকে থাকে। অন্যজন আমার স্ত্রী। সে যে কাঁদছিল না এটুকু আমি বলতে পারি।
কিন্তু ওয়াটসন যখন মিসেস ব্যারিমোরকে দেখতে পেল—
এ নিঃসন্দেহে কাঁদছিল। কিন্তু কেন? তাছাড়া ব্যারিমোর, ধরা পড়ে যাবে জেনেও মিথ্যেটা বলল কেন?
প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করতে করতেই ওয়াটসন মূরের ভেতর ঘুরছিল। এই প্রথম মূরের ধূসর, বিমর্ষ মাটিতে পা ছোঁয়াল সে। হঠাৎ পেছন থেকে একটা হাসিমাখা গলার শব্দ তার চিন্তার সুতোটাকে ছিঁড়ে দিল। ঘুরে তাকাল ওয়াটসন।

আমি মেরিপিট হাউসের স্টেপলটন। আপনি তো ডঃ ওয়াটসন তাই না? আলাপ হয়ে ভালো লাগল।
আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?
ডঃ মর্টিমার বললেন। তার মানে এবার আমরা এ এলাকায় বিখ্যাত মিঃ শার্লক হোমসেরও দেখা পেতে চলেছি!!
উঁহু। সে এখন লণ্ডন ছেড়ে আসতে পারছে না। একটা গুরুত্বপূর্ণ কেস নিয়ে ব্যস্ত আছে।
একদিন বাড়িতে আসুন না! আমার বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আরে- এই প্রজাতির প্রজাপতিই তো খুঁজছিলাম–আমি আসি–
স্টেপলটন প্রজাপতির পেছনে ছুট লাগাতে এক তরুণী হঠাৎ পা টিপে টিপে ওয়াটসনের কাছে এগিয়ে এল।
ফিরে যান। এক্ষুণি সোজা লণ্ডন ফিরে যান আপনি। মূর এলাকায় আর কখনও পা দেবেন না।
কেন? আপনি কে?
আমি বেরিল স্টেপলটন। মেরিপিট হাউসে দাদার সঙ্গে থাকি। আপনি প্লিজ লণ্ডনে ফিরে যান।
ধর ওদের –
বেরোও এখান থেকে। নইলে পুলিশে খবর দেব। আমার সম্পত্তিতে বিনা অনুমতিতে ঢুকে এসেছ কেন?
আপনার কুকুরকে সরান মিস্টার ফ্র্যাংকল্যান্ড।
এই যাঃ যাঃ ভাগ–

এই থাম। আপনি কে বলুন তো? আগে কখনো দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।
আমি ডঃ ওয়াটসন। সার হেনরির অতিথি।
ওহো আমি ভেবেছি আপনিই সার হেনরি।
শুনে রাখ ওয়াটসন, এই এলাকায় থাকতে হলে আমার সম্পত্তিতে পা দেবে না। কথাটা যেন মনে থাকে।
ওর জমিতে ঢোকা নিয়ে লোকটা এমন ক্ষেপে উঠল কেন?
মিস্টার ফ্রাংকলিন একটু ক্ষ্যাপাটে আছেন। বিনাকারণে ঝগড়া করে আনন্দ পান।
ওই যে ওঁর বাড়ি। এ এলাকায় একটা কয়েদি জেল পালাবার পর থেকেই ছাদের ওপর থেকে একটা টেলিস্কোপ নিয়ে চারদিকে নজর রাখেন। যদি চোখে পড়ে যায়।
কিছু মনে করবেন না সার। আমি আসলে সার হেনরিকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। সার চার্লস আমাদের ভালো বন্ধু ছিলেন। সার হেনরিরও ওঁর মত পরিণতি হোক তা আমি চাই না।
ওই যে দাদা আসছে।ওঁকে এসব কথা বলবেন না প্লিজ। ভূতুরে হাউন্ডে আমি বিশ্বাস করলেও দাদা একেবারেই বিশ্বাস করে না।
উফফ্ যা দৌড় করাল এই প্রজাপতিটা! তবে হ্যাঁ। ধরেছি ব্যাটাকে শেষমেষ। আরে, তোমাদের আলাপ হয়ে গেল বুঝি? তা আমার বোনের সঙ্গে কী গল্প হচ্ছিল ডঃ ওয়াটসন?
বিশেষ কিছু নয়।

কী রে টুবু , সেই কখন থেকে তোকে ডাকছি। স্নানে যা। কত বেলা হয়ে গেছে তা দেখেছিস। ফোন ঘেঁটে ঘেঁটে আর চোখের মাথাটা খাস না!
এইতো মা যাচ্ছি। আরেকটা লাস্ট অ্যাটাক করে নি।
কিছুক্ষণ পরে......
আরে.....!আরে.......!আরেকটু ভিতরে যা! যা যা যা...............!অনেক লুট পাবো!
তারপরেই রাগের মাথায়..........
ধুর! এইগুলো কোন কম্মের নয়! তোদের তো আমি.......
ধড়াম!!
ওরে বাবারে! গেছিরে!
বিকেলে........
আরে টুবুদা, তোমার পায়ে কী হল? এ বাবা, তাহলে তো তুমি আর আজ আমাদের বাড়িতে রাতে খেতে আসতে পারবে না। যাই হোক, তাহলে কাকু আর কাকিমাই আসবে না হয়।

আগের পর্ব এই লিংকে

'দাঁড়া দেখাচ্ছি' সিরিজের কার্টুন ফিল্মের স্রষ্টা চিত্র-নাট্যকার আ. কুর্লিয়ান্‌স্কি, আ. হাইত, পরিচালক ভ. কতেনোচকিন এবং শিল্পী-প্রযোজক এবার তাঁদের নায়কদের পাঠালেন সার্কাসে।

তবে সে তো তোমরা জানোই, মল্লভূমিতে খরগোশকে ধরার প্রথম চেষ্টাটায় নেকড়ে হেরে যায়। তাই বলে হাত (মানে থাবা) গুটিয়ে সে বসে থাকে নি।

দাঁড়া, দেখাচ্ছি!

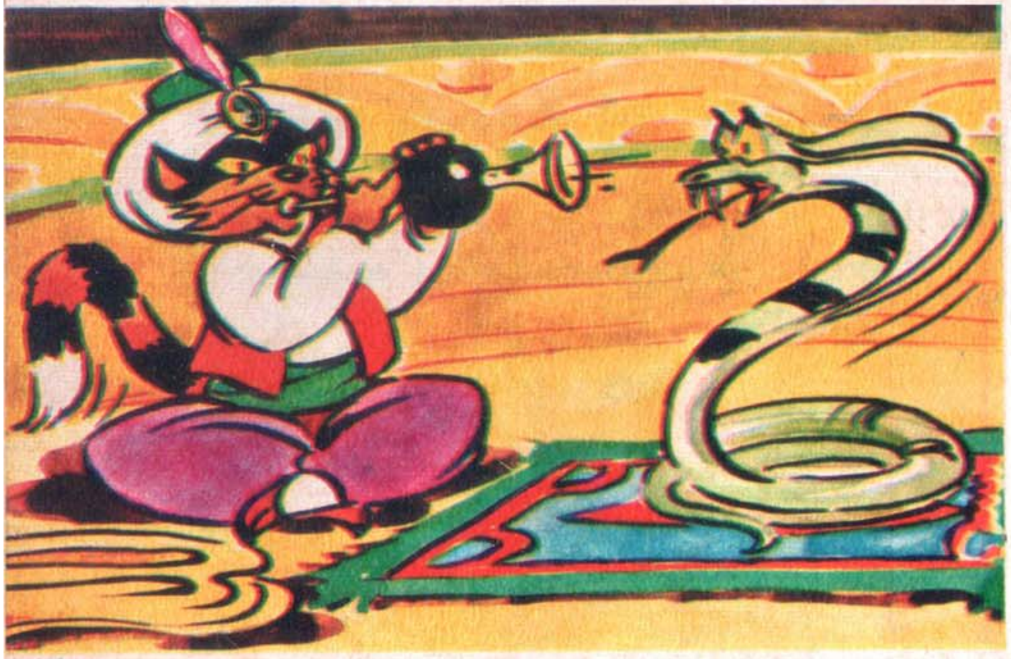

পরের খেলাটা যাদুকর বেড়ালের। সে বাজাচ্ছিল ভেঁপু আর তালে তালে দুলছিল ভয়াবহ এক কেউটে সাপ।

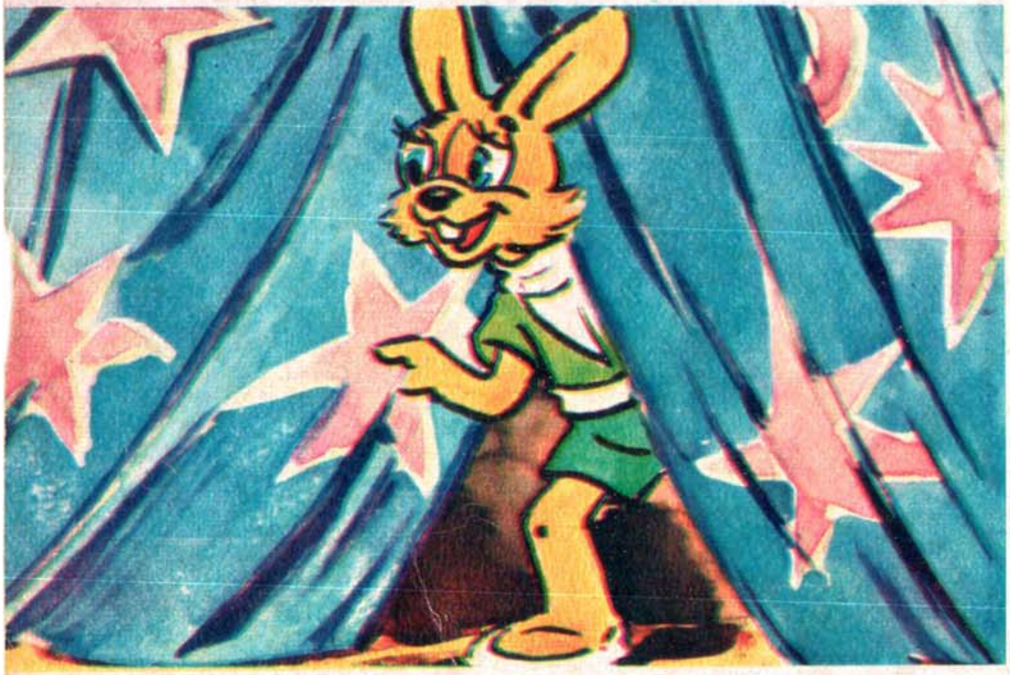

খরগোশ সেটা দেখছিল উইঙ্গ্সের আড়াল থেকে। এতই মুগ্ধ হয়ে সে সাপটাকে দেখছিল যে...

খেয়ালই করে নি যে ও গুঁড়ি মেরে আসছে। বস্তাটা সে তৈরি করেই রেখেছিল।

ফুরসতই পেল না খরগোশ, ঝুপ করে নেকড়ে বস্তা-বন্দি করলে তাকে।

বস্তার মুখ বন্ধ করতে না করতেই দ্যাখে আসছে বেড়াল, সেও বস্তা নিয়ে। বোঝা যায় ওর খেলা শেষ হয়ে গেছে। বললে, 'একটা সিগারেট হবে?'

তারপর দুজনেই নিজের নিজের বস্তা নিয়ে চলে গেল। বুঝতেই পারছ, বদলা-বদলি হয়ে গিয়েছিল।

নেকড়ে সরে গেলে এক কোণে, কেউ নেই। ভাবলে, 'এবার কেউ আমার ব্যাঘাত করবে না।'

বস্তার বাঁধন খুললে, বেরিয়ে এল — একটা ভেঁপু। এ কী ব্যাপার? বস্তায় ভেঁপু এল কোত্থেকে?

বস্তায় থাবা ঢুকাল, কী যেন নড়ে চড়ে উঠছে সেখানে।

'এইবার ধরেছি তোকে লম্বকর্ণ!'

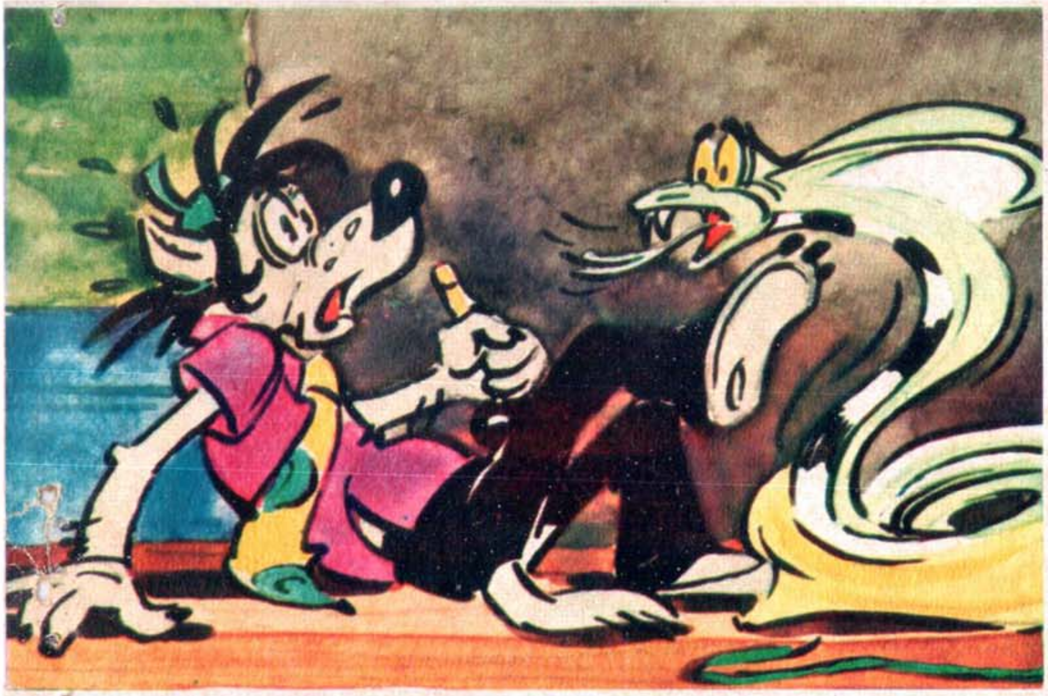

আর বস্তা থেকে লাফিয়ে বেরুল কেউটে। নেকড়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল ভয়ে।

অবিশ্যি তক্ষুণি তার মনে পড়ল কিভাবে বেড়াল সাপ খেলাচ্ছিল, সেও বাজাতে লাগল ভেঁপু।

সাপও নেচে নেচে পাকে পাকে জড়াতে লাগল নেকড়েকে।

জীবন্মৃত হয়ে নেকড়ে চলল। ভেঁপুটা ফেলতে পারছে না, বুঝছে যে ভেঁপুর শব্দে সাপ যেন একটু ঝিমিয়ে পড়ে।

দেখল মোটর সাইকেল-আরোহী ভালুকের খেলা শুরু হচ্ছে। সাপের লেজের ডগাটুকু সে বেঁধে দিল মোটর সাইকেলের সঙ্গে।

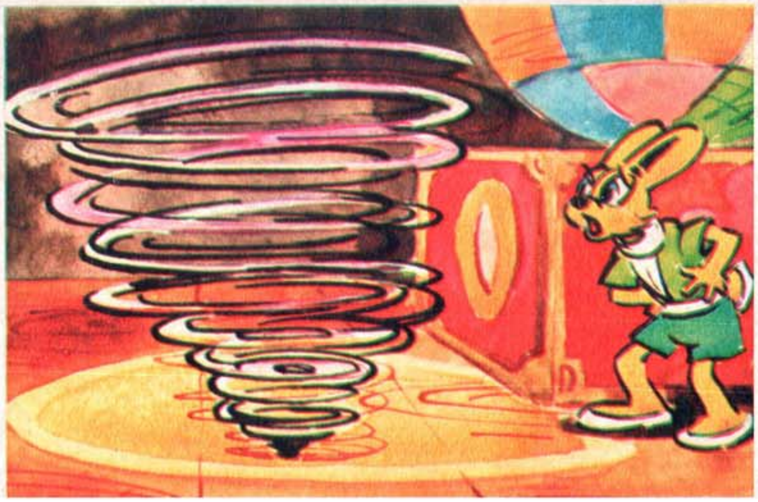

গোঁ গোঁ করে উঠল ইঞ্জিন, ছুটল মোটর সাইকেল, নেকড়েকে পাক খাওয়াতে লাগল লাট্টুর মতো। স্থির হতে সে পারে নি অনেকখন।

যখন জ্ঞান ফিরল, খরগোশ তখন আর সেখানে নেই। কী আর করবে নেকড়ে? শুধু ঘুষি পাকিয়ে চেঁচাল, 'দাঁড়া খরগোশ, দেখাচ্ছি তোকে!'

টোটা আর টিটো

আগের পর্ব এই লিংকে

তীর্থে চলেন ক্যাপটেন

মূল কমিকসঃ রুডলফ ডার্কস

অনুবাদঃ তাপস মৌলিক

স্কুলে ছুটি পড়ে গেছে। এই একমাস ধরে দিনরাত ওই বিচ্ছুদুটোর বাঁদরামি আমি সহ্য করতে পারব না। চললাম আমি হিমালয়ে, তীর্থভ্রমণে।
অ্যাঁ!! সে কী!!! তুমি না থাকলে আমার সোনামণিদের দিন কাটবে কী করে??
1

সোনামণি না কচু! ধানি লঙ্কা দুটো!! তবে ওদের ছাড়া আমারও খালি খালি লাগবে।
ওরা তোমার কোনও ক্ষতি করেছে কখনও? ফুলের মতো নিষ্পাপ দু'টি শিশু, আহা রে!
শুনে দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

দিব্যি করে বল দেখি গুন্ডাদুটো, এই বুড়োটাকে কি তোরা সত্যিই ভালোবাসিস? আহা-হা, এই দেখ, কাঁদে কেন আবার!!
বেচারা টোটা-টিটো!
প্লিজ, যেও না ক্যাপ্টেন!
যদি কোনও দোষ করে থাকি ক্ষমা কর আমাদের! ফোঁৎ ফোঁৎ

বেশ বেশ, ঠিক আছে। আয় আমার বুকে আয়। তোদের ছেড়ে কোথাও যেতে পারি আমি?
আহা, কত ভালো মনটা ওদের!!
ভ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ
4

উফফ!!
বুম

চললাম! ব্যোম ভোলে!!
পাজি হতচ্ছাড়া দুটো!! এইমাত্র ঘরটা কিনা আমি ঝাড়পোঁছ করলাম!

আগের পর্ব এই লিংকে

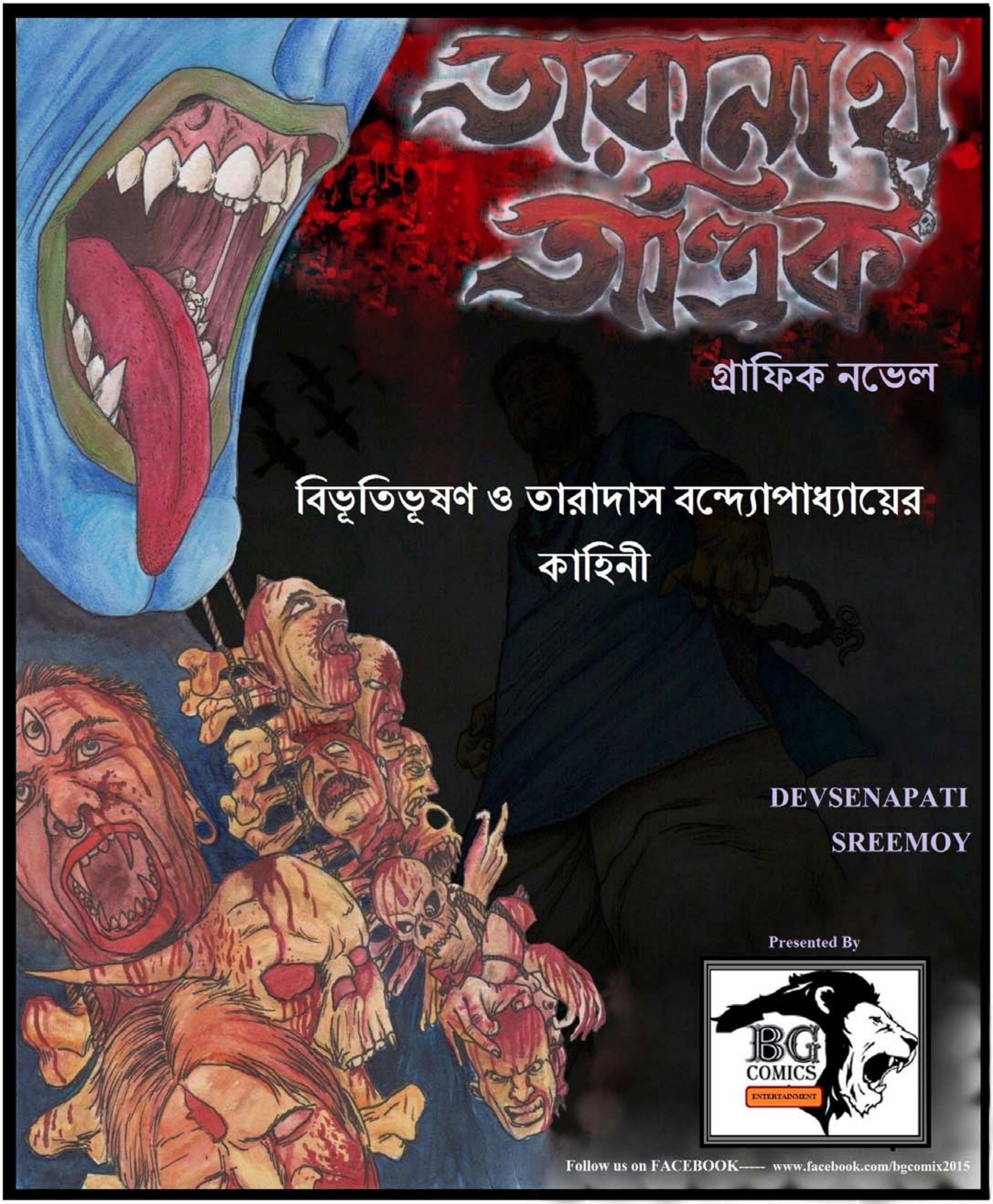
তারানাথ তান্ত্রিক
গ্রাফিক নভেল
বিভূতিভূষণ ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কাহিনী
DEVSENAPATI
SREEMOY
Presented By
BG COMICS
ENTERTAINMENT
Follow us on FACEBOOK----- www.facebook.com/bgcomix2015

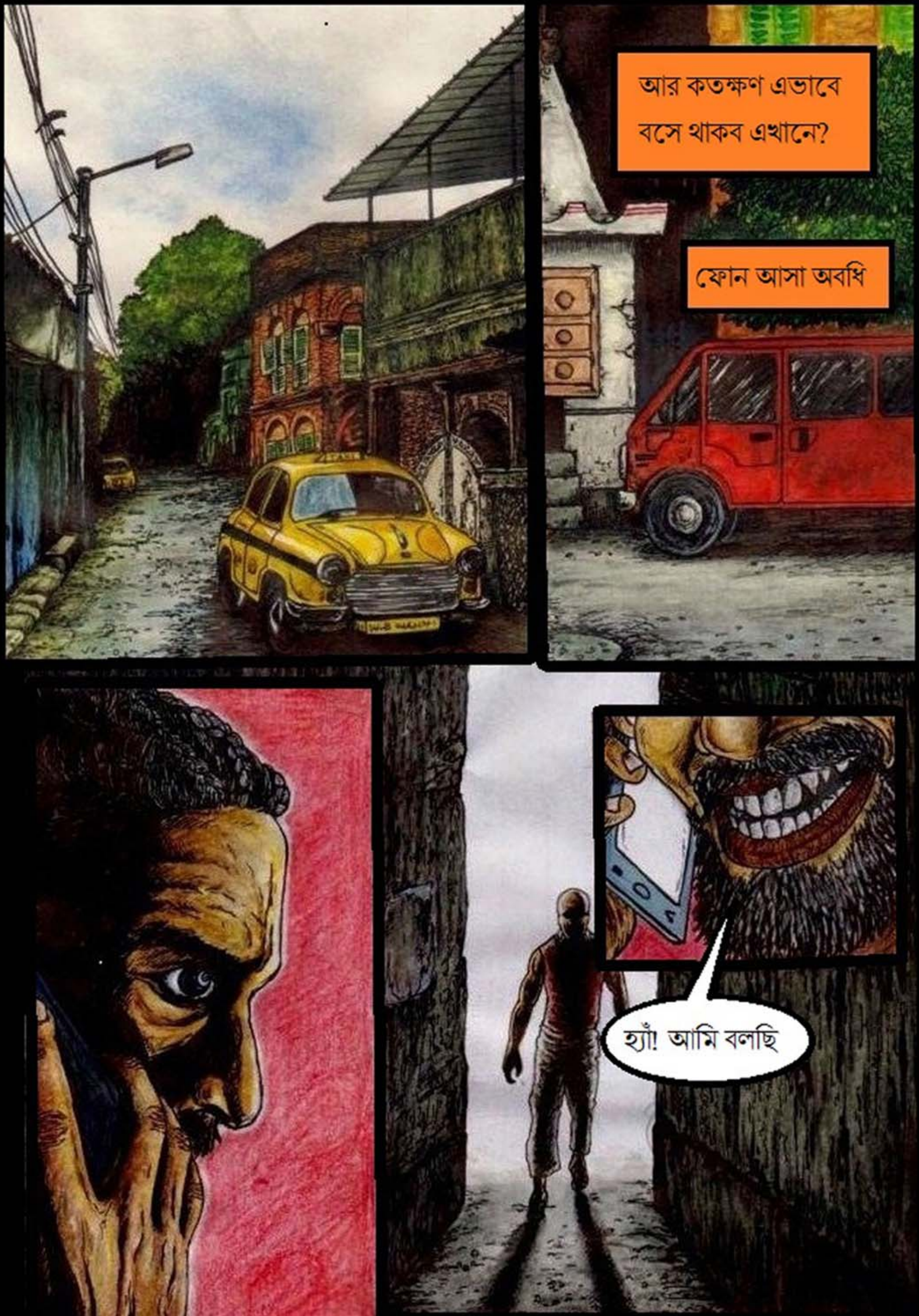
আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকব এখানে?
ফোন আসা অবধি
হ্যাঁ! আমি বলছি

আসব?
আরে......
এসো এসো !
এ কে ? বন্ধু নিশ্চয়ই ?
হ্যাঁ ও হল বিভূতি।
আমার কলেজের বন্ধু।
তখন...... অন্য কোথাও
Payment Done..

আরে থাক থাক থাক ! পায়ে হাত না একদম!
Bibhuti Banerjee
Writer at
Bengali story Writer
Calcutta, India
About Bibhuti
চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির ....
আর এই যে ছোকরা ! তোমার কি এতদিন পর এই বুড়োটার কথা মনে পড়ল? অ্যাঁ ?
না মানে আসলে একটু কাজের চাপ ছিল তো এই ক'দিন
Kishori Sen
Works at
Self employed
About Kishori
Life is nthng bt a walking shadow

আচ্ছা ওসব ছাড়ুন না। বিভূতি সেই কবে থেকে আলাপ করতে চাইছিল আপনার সাথে। তাই আজ নিয়ে এলাম। আপনার অনেক গল্প করেছি অর কাছে
তা বিভূতি! তুমি কি করো?
আমি একটু আধটু লেখালিখি করি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়.........
বাঃ! তা বেশ তো। এবার থেকে তো পড়তে হবে তাহলে তোমার লেখা......। বোলো কোন পত্রিকায় পাব।
আসলে বেশিরভাগই ওয়েব ম্যাগ ......
আরে ওসব ছাড় না! তুই আসলে যে কারণে এসেছিস সেটা বল না।

	প্রতিযোগিতার গল্প		শীত ২০১৭
প্রতিযোগিতার গল	অষ্টম স্থান তাতিয়ানার ছোট্টো গল্প	পারিজাত ব্যানার্জি	শীত ২০১৭
প্রতিযোগিতার গল	নবম স্থান-ক্যারন	তন্ময় বিশ্বাস	শীত ২০১৭
প্রতিযোগিতার গল	দশম স্থান-সত্যি মিথ্যা	শঙ্কর সেন	শীত ২০১৭
	গল্প		শীত ২০১৭
গল্প	দুলদুলি	শিবশংকর ভট্টাচার্য	শীত ২০১৭
গল্প	চোরপাখি	শিশির বিশ্বাস	শীত ২০১৭
গল্প	মন কেমন	দীপান্বিতা রায়	শীত ২০১৭
গল্প	উত্থান	শাশ্বতী চন্দ	শীত ২০১৭
গল্প	খোক্কস	শিবানী রায়চৌধুরী	শীত ২০১৭
গল্প	শিবু স্যার আর কিলু ডাইরেক্টর	বাবিন	শীত ২০১৭
গল্প	টুইটি	কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	শীত ২০১৭
গল্প	ক্যোচনের বিয়েবাড়ি	পিয়ালী গঙ্গোপাধ্যায়	শীত ২০১৭
গল্প	প্রেত ছায়া	সৌরভ রায়	শীত ২০১৭
গল্প	প্রফেসর বৈদ্যনাথ ও প্রফেসর বৈদ্যনাথ	চন্দন কুমার দেব	শীত ২০১৭
গল্প	একটি মিথ্যে গল্প	শুভ্রা ভট্টাচার্য	শীত ২০১৭
গল্প	গঙ্গাফড়িঙের রং	সোমনাথ মুখোপাধ্যায়	শীত ২০১৭
গল্প	মুক্তো মেঘ	সুস্মিতা কুণ্ডু	শীত ২০১৭
গল্প	বিটকেল	কিগান (সাকিন আলি)	শীত ২০১৭
গল্প	জীবন	সৌম্য ব্যানার্জি	শীত ২০১৭
গল্প	কোণার্কের দেবতা	মনোজিত গাইন	শীত ২০১৭
গল্প	ঝিনুকনদীর চর	মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ	শীত ২০১৭
গল্প	হরেনদাদুর অঙ্ক	শুভময় মিশ্র	শীত ২০১৭
গল্প	রাক্ষসের বন্ধুরা	অপর্ণা গাঙ্গুলী	শীত ২০১৭

বিদেশী গল্প

ইংরিজি গল্প-আর কিছুক্ষণ	ডব্লিউ এফ হার্ভে-আগস্ট
জাপানী গল্প-নিখুঁত অন্তর্দৃষ্টি	সোনালী ঘোষাল

জাতক কথা

বন্ধু জাতক	নন্দিনী দাসচট্টোপাধ্যায়

জয়ঢাক গল্প প্রতিযোগিতাঃ অষ্টম স্থান

পারিজাত ব্যানার্জি

নাঃ, আজকে আর খায়নি তাতিয়ানা। "মা, ইচ্ছে করছে না।" - এমন বলার আর ক্ষমতাও নেই ওর। এখনও মনে পড়ে মা খালি বাংলার বস্তাপচা টেলিসোপগুলো দেখত বলে কত হাসাহাসিই না করত তাতিয়ানা, ওর বাবা অনিমেষও মেয়েকেই প্রশ্রয় দিতেন। তন্ময় (তাতিয়ানার দাদা) অবশ্য মায়ের হয়েই ঝগড়া করত বোনের সাথে। অবশ্য ঝগড়া না বলে খুনসুটি বলাই ভালো। মা শেষমেশ বিরক্ত হয়ে রিমোট ওদের হাতে দিয়েই চলে যেতেন। "খেলা দেখবার কত বাহানা! শুধু শুধু আমার সিরিয়ালদের দোষ ধরা না! পড়াশোনা নেই তোদের?"

আজ আর সত্যিই লেখাপড়া করতে হয় না তাতিয়ানাকে। সে প্রায় একবছর আগেই ওসব পাঠ চুকেবুকে গেছে তার। কলেজের ভারী ভারী বইগুলো দেখলেও এখন ভয় হয় তার, গায়ে পড়ে যাবে না তো! মাঝে মাঝে হেঁটে বাবার দেওয়া সেই মোবাইল ফোনটা অবধি অবশ্য যায় ও। উঁকি দিয়ে দেখে কোনও নতুন মেসেজ এলো কিনা। বিশেষ কারও আসেনা। বেশির ভাগই নেটওয়ার্ক প্রোভাইডারের নয়ত চৈতালীর। সেই ছোট্টবেলার বন্ধু ও। এখনও শুধু মাঝে মাঝে ওই মেসেজ পাঠায়। ও জানে ফোন করলে তাতিয়ানা আর ধরবে না। অন্তত মেসেজটাতো পড়বে!

"আমি চাইলেই তোকে দেখতে যেতে পারি, কিন্তু তোর দাদা মানা করেছে- বলেছে আমি সহ্য করতে পারব না। তুইও কষ্ট পাবি। কেন তুইই শুধু ওই মেসেজ গুলো পেলি বলত!"

জানে না তাতিয়ানা। শুধু জানে নতুন যেই কোম্পানির মোবাইল ফোন তার বাবা তাকে কিনে দিয়েছিল, সেই 'sara Beral' ব্র্যাণ্ডের ফোন আর এক দুটোই বিক্রি হয়েছিল সারা বিশ্বে। প্রথম প্রথম যখন ফিনিশিয়ান আর ইরানিয়ান ভাষায় মিশেলে মেসেজ আসত, বা পরের ওই গ্রিক ভাষাটা তখনও ওবধি সবার এক সাথেই মেসেজ আসত। হঠাৎই একদিন, বাকি দু তিনজনের ফোন একসঙ্গে খারাপ হয়ে যায়। শুধু ঠিক থাকে তাতিয়ানার ফোন। আর তার পরেই শুরু হয় বিপত্তি।

ততদিনে ভারত সরকারের থেকে বৃত্তি পেয়ে ফিজিক্স নিয়ে দাদার কলেজেই ভর্তি হয়ে গেছিল তাতিয়ানা। মেসেজ আসাও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন। তন্ময় আর তার প্রফেসর নাসার সঙ্গে যুগ্ম প্রয়াসে রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু কোনও কুলকিনারা পাচ্ছিল না।

হায়দ্রাবাদ থেকে ডঃ এস রাধাকৃষ্ণনও প্রায়ই ফোনে খোঁজখবর নিতেন প্রফেসর খাসনবিশের থেকে। তাতিয়ানার সঙ্গেও ভালই বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল ওঁর। ভীষন স্নেহ করতেন ওকে। এখনও বলেন, “poor child we could not even try to help her. Her case is beyond our imagination.”

টিভিতে এক সাক্ষাৎকারে একথা বলতে গিয়ে চোখে জল এসে গিয়েছিল তাঁর। তাতিয়ানা অবশ্য এখন আর কাঁদতে পারে না। অনুভূতিগুলো ভাগ্যিস চলে যাচ্ছে। নাহলে চোখের এক ফোঁটা জলেরও ভার কী করে নিত সে?

এখনও মনে আছে সব। ঠিক যেন কোনও সাইফাই মুভি। ল্যাবে কাজ করছিল তাতিয়ানা। একটু বেশি রাত হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। হঠাৎ পকেটের মধ্যে নড়েচড়ে উঠল তার ফোন কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে। বাকিরা আগেই বেড়িয়ে গেছে সবাই যে যার মতো। তন্ময় তার প্রফেসরের ঘরে ব্যস্ত। তাতিয়ানার তাই বিশেষ তাড়া নেই। ফোন বাজলেও ভ্রূক্ষেপ করল না সে। এস এম এস তো! পরে দেখা যাবে- এই ভেবে হাতের কাজটাই মন দিয়ে করতে থাকে সে।

কিছুক্ষণ বাদে আবার মেসেজ্। দাদা নয় তো! ফোনটা বার করে হাতে নেয় তাতিয়ানা। সেই একই ব্যাপার! হিজিবিজি সাংকেতিক কিছু ফোঁটা দিয়ে সৃষ্ট এক ব্রহ্মাণ্ড! কি সুক্ষ্ম কাজ। তাতিয়ানাত আঁকা ঝোঁকার দিকে শখ চিরকালই তীব্র। মেসেজের ভাষা বোঝা না গেলেও এই নিপুণ সৃষ্টি দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে পারে না সে। কিন্তু হঠাৎই তার খুব চোখ জ্বলতে শুরু করে। ফোনটাও ভীষণ গরম হয়ে যায়। এতটাই যে আর তা হাতে ধরে রাখতে পারে না তাতিয়ানা। ফোনটা মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তা কুড়িয়ে নেবে বলে মাটিতে বসে সে। গায়ে হাত পায় তীব্র ব্যথা অনুভব করে সে। মনে হয়, আর যেন বসেও থাকা যাবে না। এখনও স্পষ্ট মনে আছে তাতিয়ানার- হাতের পাতায় টান পড়ছিল তার।

চোখের সামনে হাতটা তুলে নিতেই মনে হল হাতটা যেন হঠাৎই কয়েক ইঞ্চি ছোট হয়ে গেল! আর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে ব্যথাও উধাও!

খুব হেসেছিল তন্ময় ফেরবার পথে, “ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলি নাকি! কই তোর ফোনে তো কোনও মেসেজ নেই? আর তাছাড়া, তুই ছোট হবি কী করে? তুই তো ছোটই!” মাথায় হাল্কা গাঁট্টা মারে তন্ময়। তাতিয়ানা হাসতে পারেনি। আতঙ্ক তখনও তার চোখমুখে।

এরপর প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। কখনও বাসে, কখনও বাড়িতে, কখনও আড্ডা মারার সময়- আবার কখনও মাঝরাতে পড়াশোনা করার সময়। বিপ বিপ করে মেসেজ আসে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে তারামণ্ডল, গরম হয়ে হাত থেকে ছিটকে পড়ে ফোন ব্যথা আর সবশেষে কয়েক ইঞ্চি ছোট হয়ে যাওয়া। তারপরে ফোন অন করলেই মেসেজ ভ্যানিশ!

অনিমেষ খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। স্ত্রীকে বলেন তাতিয়ানার ফোন নিয়ে নিতে। তাতিয়ানা নিজেও সবসময় ফোন থেকে পালাতে চায়। কিন্তু তখনই বেজে ওঠে, ‘বিপ্ বিপ্!’ সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার- ফোন অন্য কারও কানে বা হাতে থাকলে মেসেজও আসে না।

প্রথমে তন্ময় বিশ্বাস না করলেও অচিরেই বোঝা যায় এক বর্ণও কল্পনা করছে না তাতিয়ানা। সত্যিই ‘ছোট’ হয়ে যাচ্ছে সে!

এমনই চারবছর আগের ঘটনা। জল অনেকদূর অবধি গড়িয়েছিল। প্রফেসর খাসনবিশ ঘটনাটা জানতে পেরেই নাসাকে জানান। কিন্তু প্রথমে নাসা মানতেই চায়নি এমন হাস্যকর ঘটনা! তাদের ধারনা হয়, সবটাই সাজানো! তাদের যুক্তিও অকাট্য। পৃথিবীতে এত মানুষ থাকতে কেন তাতিয়ানাই পাবে ভিনগ্রহের সিগন্যাল? বাকি যারা ওই মেসেজ পের হঠাৎ তাদের সবার ফোন খারাপ হয়ে গেল- তাতিয়ানার ফোন এখনও চলছে কী করে? খবর নিয়ে তারা আরও জানতে পারে, ‘Sara Beral’ বলে কোনও নতুন আমেরিকান ব্র্যাণ্ডের ফোন মার্কেটেই আসেনি। যাদের ফোন নষ্ট হয়ে গেছে সেই ফোনের স্যাম্পলও আশ্চর্যভাবে উধাও। তবে কি তাতিয়ানার ফোন কোনও বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো হয়েছে? কে বানিয়েছে? উঠে আসে তন্ময় আর মিঃ খাসনবিশের নাম।

নাসা কম অপমান করেনি তাঁদের। কিন্তু যখন তাতিয়ানা (তখন সাড়ে তিনফুটের একটু কম হাইট)গিয়ে সামনে দাঁড়াল তাদের চমকে উঠল বিজ্ঞানীমহল। নাসার উদ্যোগেই বসল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের বোর্ড। সকলেই একটা ব্যপারে একমত হলেন মোবাইল ফোনের মেসেজ থেকেই নিঃসরণ হয়েছে কোনও তেজস্ক্রিয় রশ্মি- যার থেকেই তাতিয়ানার এই বিকৃতি। নিঃসরণের পর উধাও হয়ে যাচ্ছে তাই ওই কোড। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় আরও বোঝা গেল, যে বা যারা সাংকেতিক ভাষায় দু এক জনের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছিল- কোনওভাবে তাদের মধ্যে তাতিয়ানাকেই তারা চিহ্নিত করেছে। তাই 'Sara Breral' ব্র্যণ্ডের নামও বাকি সব স্থান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অবশ্য এই রশ্মি তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে পাঠিয়েছে কিনা- তা বলা কঠিন।

আর আজ তো সব্বাই চুপ, যেন নিঃসারে এ ওকে বলছে- 'বলা বারণ'! সত্যিই, কী হবে আর বলাকওয়ায় গিয়ে? এই কয়েক বছরে তাতিয়ানার উচ্চতা কয়েক ইঞ্চিতে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু দাঁড়ায়নি, প্রচণ্ড তীব্রতায় নিম্নমুখে ধাবিত তার উচ্চতা। এদিক ওদিক থাকলে পাছে ভুল করে পা পড়ে যায়- তাই তাতিয়ানার ঘর এখন এক ছোট্ট পাখির খাঁচা। তন্ময় নিজে গিয়ে কিনে নিয়ে এসেছে একমাস হল। মাকে আর দেখতে পায় না তাতিয়ানা। তিনি কবেই বিছানা নিয়েছেন। বাবা কিছুদিন আগে অবধিও ভারত সরকারের সাথে নিয়মিত সংযোগস্থাপন করতেন। কিন্তু এই খাঁচায় যখন থেকে বাসা বেঁধেছে তাতিয়ানা- তিনি বুঝেছেন সব্বাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে তিনি প্রলাপ বকেন এখন, "কেন যে মোবাইল কিনে দিলাম মেয়েটাকে? আমি দায়ী!! ওর এই অবস্থার জন্য আমি দায়ী।"

তন্ময়ই একমাত্র শান্ত এখনও। বোনকে খাওয়ানো (দু দানা চাল- দুবেলা), শোওয়ানো, স্কেল দিয়ে মাপ নেওয়া- সবই ওই করে এখন। গত সপ্তাহেই মেপেছে। দেড় ইঞ্চির থেকে কিছু কম এখন তাতিয়ানা।

"কাল আবার মেসেজ এসছিল। মোবাইলটা থেকে না। ওটা আর কাজ করছে না। শুধু বিপবিপ শব্দটা শুনেছিলাম। আর তারপর--কোথাও নেই! তাতিয়ানা হারিয়ে গেছে! ওকে আর পাচ্ছি না। আর পাব না গো।" তন্ময় এই প্রথম চিৎকার করে ওঠে। ভেঙে পড়ে কান্নায়। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ আর প্রফেসর খাসনবিশ মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বেড়িয়ে যান ঘর থেকে।

****

ঘুম থেকে উঠে পড়ে তাতিয়ানা। মেসেজ পেয়েছিল সে। বিপ বিপ শব্দ, ব্যথা- সব মনে আছে তার। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে চেনা জগৎটা আর দেখতে পায় না ও। কিন্তু দেখে তারই উচ্চতার সারি সারি মানুষ, যাদের মধ্যে আর বেমানান লাগে না ওকে। আমাদেরই পৃথিবীর অন্য কোনও স্তরে বাস করে এই জাতি- যাদের সাংকেতিক ভাষাই ধরা পড়েছিল তাতিয়ানার মোবাইলে। কেউ একজন ফিস্‌ফিস্‌ করে কানের কাছে বলল- "welcome-greetings from Sara Beral Indicate your Posiho"। পাঁচটা আঙুল তুলে ধরে তাতিয়ানা। এই পৃথিবীর বুকে মিলিয়ে যায় সে- চিরদিনের জন্য। নিজের অজান্তেই সাংকেতিক ভাষাটা কখন রপ্ত করে ফেলেছে সে।

প্রসঙ্গত, তাতিয়ানার উচ্চতা এখন ২৪ ন্যানোমিটার। ২৪ যে শুভসংখ্যা এই অজানা পৃথিবীবাসীদের কাছে!

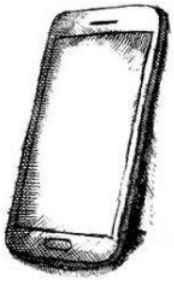

ক্যারণ

তন্ময় বিশ্বাস

'Greeting from sara breral. Indicate your posiho...'

(সব শুরুর আগে)

যেভাবে স্রোত এসে আগে আগে বন্যার খবর আনে,যেভাবে মৌমাছির ডানা ফুলের খবর পায়, ঠিক সেভাবেই গাংলু বুঝে গেল ও আর একা নেই। এই গাছপালা,পাতার ফাঁক গলে আসা সূর্য আর পায়ের নিচে নোনাধরা কাদার ওপর ছুটে পালানো বনমুরগির ছোটোখাটো দলটার বাইরেও এখানে কিছু আছে। সে আর এখানে একমাত্র নয়।

সামনের মাঝারি জঙ্গলটার দিকে একবার তাকাল গাংলু। খাপছাড়া সবুজের ঢল চলে গেছে অনেকদূর অবধি। গাংলু আস্তে আস্তে এগোল। এই মাটি ফুঁড়ে শেকড় উঠে আসা জল-কাদার জঙ্গলের একটা খুব সহজ নামতা আছে। *হয় শিকার করো, নয় শিকার হও।*

এখানে ভয়টাকে রাখতে হয় পায়ের তলায়। দু'পায়ের মধ্যেকার সাবধানতায়।

গাংলুর অভ্যস্ত চোখ মেপে চলেছে প্রতি ইঞ্চি অন্ধকার, আলো-ছায়া। *বিপদ তোমার সামনেই থাকে, শুধু তাকে চিনে নিতে হয়।*

টি টি টি.... করে একটা পাখি খুব নিচু থেকে ডেকে উঠল। কয়েকটা ঝিঁঝিঁ এখনও থামেনি। ওদের রাত বোধহয় শেষ হয় না।

গাংলুর আঙুলগুলো কুড়ুলের কাঠের হাতলে আরও একটু চেপে বসল। কানের কাছ দিয়ে কয়েক ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে গেল পিঠের দিকে। ও আলোগুলো দেখতে পেয়েছে! একটা নয়, তিনটে। মাটি থেকে চার হাত ওপরে ভাসছে। হাতের মুঠোর চেয়ে আকারে একটুখানি বড়ো। স্নিগ্ধ, হলদেটে!

আলোগুলো এগিয়ে আসছে। তিন দিক থেকে। গাংলুর মনে হল নিচের কাদামাটি যেন গেঁথে ফেলেছে ওর পা দুটোকে। আর নড়ার ক্ষমতা নেই। ওগুলো এখন খুব কাছে। পাখির ডাক, ঝিঁঝিঁর চিৎকার ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ওগুলোর মৃদু গুঞ্জনে। হলুদ আলোয় চাপা পড়ে যাচ্ছে জঙ্গলের সমস্ত সবুজ।

গাংলু শেষবারের মতো চেষ্টা করল। কোনওরকমে পিছনে খাঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল পা দুটোকে। আর তখনই ও ব্যাপারটা লক্ষ করল। ওর রোদে পোড়া চামড়ার ওপর রক্তের মতো গড়িয়ে পড়ছে সবুজ রঙের দাগ! কেউ

যেন খুব যত্ন করে ওর সারা শরীরে দাগ কেটে চলেছে। লম্বালম্বি, আড়াআড়ি। আর দাগ বরাবর একটা পাগল করা যন্ত্রণা যেন ছড়িয়ে পড়ছে সব দিকে। চামড়া পুড়ে যাচ্ছে সবুজ আগুনে!

খাঁড়ির কাছে এসে শরীরটাকে ছেড়ে দিল গাংলু। সাঁতার জানা মানুষ সহজে ডোবে না। কিন্তু ও ডুবছে। চিৎ হওয়া শরীরটা তলিয়ে যাচ্ছে গভীরে। কিছুই যেন করার নেই। মুখের ভেতর আটকে থাকা শেষ বাতাসটুকুও বুদবুদ হয়ে বেরিয়ে এল একসময়। তারপর কাঁপতে কাঁপতে ওপরের দিকে উঠে গেল। আর কিছু দেখতে পেল না গাংলু। চোখের পাতায় নেমে এল নোনা লাগা অন্ধকার।

(১)

(২৪ ফেব্রুয়ারি, সন্ধে ৭:৫৯, নিউইয়র্ক, আমেরিকা)

ক্লাইভের যে এখানে খুব বেশি কাজের চাপ তা কিন্তু নয়। বলতে গেলে সারাদিন বসেই থাকতে হয়। বসে থাকাটাই কাজ। আর শুধু চোখ-কান সমেত বাকি তিনটে ইন্দ্রিয় খোলা রাখা। বলা তো যায় না। অঘটন তো সেই না বলেই হয়...

এই ঘরটা আগে সেটি'র স্টোররুম হিসেবে ইউজ হত। কেবল, ওয়্যার, লেন্স সব ম্যানুয়ালি সাজানো থাকত। তা জায়গা কম পড়ল, না নাপিত দেখে নখ বাড়ল সেটা ক্লাইভ জানে না। কিন্তু স্টোরটা শিফট হয়ে গেল সেকেন্ড ফ্লোরে। আর এটা হয়ে গেল প্রোজেক্ট TATS -এর অবজারভেটরি সেন্টার।

একটা মোবাইল সেট রাখার জন্য আস্ত একটা ঘর! নাসা বলেই পারে হয়তো। তবে ক'দিন পারবে সেটা হচ্ছে গিয়ে কথা। দু'মাস আগের হুজুগে যে জল ঢুকেছে, সে তো ক্লাইভের একা থাকা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ।

ফিসফাস অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। যে কোনও দিন ক্লাইভের সুখের চাকরিটি যাবে! আবার মিশন কন্ট্রোলের সেই প্রচণ্ড টেনশনের কাজগুলো। সবদিক নজর রাখো, লঞ্চ প্যাড ঠিকঠাক আছে কিনা, ফুয়েল ট্যাঙ্ক ওপেন হয়েছে তো? আরে আয়নোস্ফিয়ার পার হয়ে গেল এখনও থার্ড সিকুয়েন্স-টা শুরু হচ্ছে না কেন? পোগ্রামিং গলদ? খোঁজ খোঁজ। একটা ভুল মানে বিলিয়ন ডলার জলে। তারপর দোষারোপ, পালটা দোষারোপ তো ফ্রি-তেই আসবে। তবু কাজটাকে ভালোবাসে ক্লাইভ। এই বসে থাকার থেকে বোধহয় ভালোই। একেকটা স্পেসক্রাফট যখন সমস্ত সিকুয়েন্স পার করে উতরে যায়, তখন সবার পিঠচাপড়ানি খেতে খেতে মনের মধ্যে পৃথিবী ছাড়ার মতো একটা আরাম টের পায় ও। সেটার তুলনা বোধহয় কিছুর সাথে হয় না। এই বোবা মোবাইলের সামনে বসে থাকার সাথে তো নয়ই।

উদাসভাবে স্ট্যান্ডে খাড়া করা মোবাইলটার দিকে তাকাল ক্লাইভ। আর তাকাবার সাথে সাথে লাফিয়ে উঠল। পাঁচ ইঞ্চির স্ক্রিনটা জ্বলে উঠেছে!

তবে কি পাওয়ার বটনে চাপ পড়েছে..

না তো! ওই তো স্লাইড লক অপশন দিচ্ছে। আর তার ওপরে একটা খামের ছবি নাচানাচি করছে।

মেসেজ এসেছে! আবার!

মোবাইলটা না ধরে পাশের মনিটরের দিকে ঝুঁকে পড়ল ক্লাইভ। মোবাইল সেটটাতে বেশ কিছু পোর্টার ইনস্টল করা হয়েছে। তার থেকে বেরিয়ে আসা জ্যাকগুলো কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করা। মোবাইলের সমস্ত কিছু এখান থেকে অপারেট করা যায় সহজেই।

কি বোর্ড-টায় তাড়াতাড়ি কমান্ড টাইপ করল ও। ফ্রিকোয়েন্সিটা এখনই দেখা দরকার। ওটাই আসল। ওটা পেয়ে গেলেই কেল্লা হাতের মুঠোয়। তারপর সেটা নিয়ে কী করবে, সেটা তোমার ব্যাপার।

ঠিক পাঁচ সেকেন্ডেই মনিটার আউটপুট দিয়ে দিল। স্ক্রিন জুড়ে বড়ো বড়ো করে ভেসে উঠল লেখাটা।

ফ্রিকোয়েন্সি আননোন!

ড্যাম ইট! প্রচণ্ড জোরে নিজের পায়ে একটা চাপড় মারল ক্লাইভ। এতটা সেনসিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি! *যেটা কিনা, নাসাও ধরতে পারছে না!*

ও দায়সারা ভাবে এবার মেসেজটা ওপেন করল। কালো স্ক্রিনে সাদা দিয়ে ফুটে উঠল আলফা বিটার হিজিবিজি দাগগুলো। গ্রিক অ্যালফাবেট। অবশ্য এটা কোনও সমস্যাই নয়। ক্লাইভ ভালোই গ্রিক জানে। বলা যায় ওই জন্যই এখানে রাখা হয়েছে ওকে।

ক্লাইভ পাশে আরেকটা উইন্ডো খুলল। এটা এখুনি অনুবাদ করে মেল করতে হবে। অরিজিনাল সমেত।

'Greeting from sara beral. Indicate your posiho...'

এরা বোধহয় এর বাইরে কিছু জানে না!

এতটা টাইপ করে থামল ও। এরপর কয়েকটা নানান সাইজের ডট এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে। যেন স্ক্রিনের ওপর কেউ সাদা সাদা পিঁপড়ে ছেড়ে দিয়েছে।

ক্লাইভ থামল। অবিশ্বাস নিয়ে ডটগুলোর দিকে তাকাল কিছুক্ষণ। *হ্যাঁ স্পেস থেকে ইমেজ ফাইল এলে বোধহয় এরকমই হওয়া উচিৎ।*

ক্লাইভ পকেট থেকে রেডমি-র সেটটা বার করল। তারপর কিউ আর স্ক্যানার অ্যাপটায় আঙুল দিয়ে চাপ দিল।

কুইক রেসপন্স কোড বা শর্টে কিউ আর কোড। নব্বই-এর দশকে সেরা আবিষ্কারগুলোর মধ্যে একটা। ১৯৯৪-তে জাপানের একটা অটোমোটিভ সংস্থা প্রথম এটা বার করে। তারপর এটা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

দোকানে জিনিস কেনার সময় প্যাকেটের পিছনে যে সাদা কালো বার কোডগুলো স্ক্যান করে বিল করা হয়, কিউ আর তারই আপডেটেড ভার্সন। এই ডটগুলোর প্যাটার্ন পালটে পালটে এর মধ্যে বিভিন্নরকম ইমেজ, ডাটা, এমনকি ভিডিও অবধি স্টোর করে রাখা যায়। শুধু মোবাইলে কিউ আর রিডার অ্যাপটা থাকলেই হবে। এরর কারেকশন পদ্ধতিতে ডটগুলো চটপট ছবি বা ডাটায় বদলে যাবে।

পাক্কা দু'সেকেন্ড। মোবাইলে ছবিটা ফুটে উঠতেই সেটাকে হাত থেকে নামিয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেল ক্লাইভ! ও হঠাৎই একটা ধাক্কা খেয়েছে! বুকের ধুকপুকানি কি বাড়ল? ছবিটায় কিন্তু খুবই সাদামাটা, ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। তার ওপর আলফা বিটা দিয়ে লেখাগুলো তো আরও বেশি সাধারণ! শুধু লেখাগুলো এইভাবে, এখানে......। *আসলে খুব সাধারণই কখন যে অসাধারণ হয়ে যায়!*

ক্লাইভ রিসিভারটা হাতে তুলে নিল। ওপরের মহলে জানাতে হবে এখুনি। তবে তারা কতটা পাত্তা দেবে সেটাও একটা প্রশ্ন। নইলে TATS-এই যা করার করতে হবে।

ওরা আগুনে হাত দিয়েছে। আঁচ তো লাগবেই।

ওপারের কলার টিউনটা শুনতে শুনতে লেখাটার দিকে আরেকবার তাকাল ক্লাইভ। লাল দিয়ে লিখলেই যেন বেশি মানাত ওগুলো।

TO TATS, if you want your world for future.

ওরা আমাদের নামও জানে!

(২)

(২৪ ফেব্রুয়ারি, রাত ৯:৩৬, উইলিয়াম টাউন, আমেরিকা)

দেশ জুড়ে নাসার বারোটা সেন্টারের মধ্যে কিন্তু উইলিয়াম টাউন পড়ে না। এটাকে একটা আধা অফিসিয়াল রিল্যাক্স সেন্টার বলা চলে। মানে হালকা চালে কথাবার্তা, মিটিং, একটু মাইন্ড ফ্রেশ এইসব। আবার বাকি বারোটায় জায়গার অভাব হলেও এর ব্যবহার হয়।

লনের আশেপাশের ছাড়া ছাড়া ভিড়গুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চললেন খাসনবীশ। এখানে একটা ঢিল ছুড়লে ৯০% চান্স থাকে যে সেটা বিশ্ববিখ্যাত কারও মাথা ফাটাবে!

দেশটা মেধা কেনে। জমিয়ে রাখে...

সামনের 'কনফারেন্স রুম' লেখাটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবলেন প্রফেসার।

'এক্সকিউজ মি স্যার।'

দূর! বিরক্ত হলেও কিছু করার নেই। এখানে সেফটি ফার্স্ট। তাই যেখানে পেরেছে একটা করে চেকপোস্ট বসিয়ে দিয়েছে। কয়েকটা তুলে নিয়ে গেলে হয়। কলেজে যে রেটে বাইরের ছেলে ঢোকে! অবশ্য ওটা হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়া। ফাঁকফোকর খোঁজার একটা দেশ।

সোনালি চুলের তরুণী সিকিউরিটি গার্ডের এগিয়ে দেওয়া কাঠিটা সিগারেটের মতো করে মুখে ধরলেন খাসনবীশ। তুলোর মিষ্টি একটা স্বাদ অল্পক্ষণের জন্য ঠেকে থাকল জিভে। তারপর চেকপোস্টের একটা ফুটো দিয়ে কাঠিটা ঢুকিয়ে দেওয়া হল টেস্টারে। বড়োজোর পাঁচ সেকেন্ড। তারপরই মাথার ওপরে একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠল। উনি ডি এন এ টেস্টে পাশ করে গেছেন।

'ওয়েলকাম স্যার। হ্যাভ আ নাইস ডে।'

মেয়েটা বেশ সুন্দর করে হাসল। খাসনবীশের কেন জানি মনে হল হাসিটা বানানো নয়, নিজস্ব।

আসলে কয়েকটা হাই ডেফিনিশনের হলিউডি সিনেমা দেখে আমেরিকাকে চেনা যায় না। বরং ঠকতে হয়। এখানে রেস্টুরেন্টের সস্তা টেবিলে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, বড়ো রাস্তার ধারে খুচরো শর্টকাটে লেগে থাকে আরেকটা

আমেরিকা, যা অন্ধকার। তারা বিভিন্ন সময়ে এসে আটকে পড়েছে অন্য একটা দেশে। সরকার তাদের স্বীকার করে না। দোকানে, পথেঘাটে তাদের বলে বলে ঠকানো যায় দিব্যি। সাত সাগরের পারে বসে এসব বোঝা দায়। সত্যি সত্যি হেঁটে দেখতে হয়। দেখা শিখতে হয়। সিনেমা, সাহিত্য, গানে ভুখা ভারত বেরিয়ে পড়ে প্রতি মুহূর্তে। ভুখা আমেরিকা শুধুই মিলিয়ে যায়।

সে তার দুর্বলতা ঢাকতে জানে। খুব ভালোভাবেই জানে।

কনফারেন্স রুমের বিশাল কাঠের দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ালেন খাসনবীশ। দরজা জুড়ে একটা রঙিন ‘মিটবল’ খোদাই করা। অবশ্য এটা ডাকনাম। খাতায় কলমে এর নাম ‘ভিক্টর’। নাসার বেশ কয়েকটা লোগোর মধ্যে সবথেকে বেশি প্রচলিত। আর পুরোনো তো বটেই।

১৯৫৯-তে নাসার দ্বিতীয় বর্ষ উপলক্ষে James Modarelli এটা ডিজাইন করেন। ছোট্ট গোলটুকুর মধ্যে নাসার সমস্ত পরিচয় বেশ সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

এখানে নীল বৃত্ত হচ্ছে গ্রহ বা প্ল্যানেট। তার ভেতরের সাদা সাদা তারাগুলো তুলে ধরে সমগ্র মহাকাশকে। তারপর আসে লাল রঙের স্ট্রিপের মতো একটা ‘V’। এর অবশ্য অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা আছে। সাদা বাংলায় এটা তুলে ধরে Aeronautics, মানে ওই রকেট, বিমান-টিমানের ব্যাপার। আর NASA লেখাটাকে ঘিরে যে সাদা দাগটা হালকা করে চক্কর কাটছে। ওটা মহাকাশ অভিযানকে রিপ্রেজেন্ট করে।

দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে আগের দু’বারের মতোই ধাক্কা খেলেন খাসনবীশ।

তবে কী ভুল করে রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লাম!

কনফারেন্স রুমের ‘ক’-ও এখানে নেই। মানে কনফারেন্স রুম বলতে পাতি মধ্যবিত্ত কেরানিদের যেটা মনে পড়ে। লম্বা মতো ঘর, চৌকো মতো টেবিল। বড়ো একটা প্রোজেকটর স্ক্রিন আর সাজানো চেয়ারগুলোতে গোমড়া গোমড়া সব মুখ।

এটা কনফারেন্স রুমের থেকেও অনেক বেশি কিছু। সফট ড্রিংকসের গ্লাস নিয়ে ঘুরে বেড়ান ওয়েটার, হালকা চিজের গন্ধ, একপাশে থরে থরে সাজানো লাল নীল বোতল আর ভেলভেটের ক্লথ পাতা টেবিল চেয়ার।

‘ওয়েলকাম প্রফেসার।’

TATS -এর হেড কন্ট্রোলার রিচার্ড পার্কারের শরীরটা তার পদের সাথে বেশ মাননসই। সাড়ে ছ’ফুটের হাইট, শিশুসুলভ মুখ আর একদম সাদা কদমছাঁট চুলগুলো তাকে কমিউনিকেশন এক্সপার্টের থেকেও অনেক বেশি একজন রিটায়ার্ড ওয়েটলিফটার হিসেবে তুলে ধরে। তাঁর ক্রিয়েটিভিটি, পর পর দুটো মিশনে সাফল্য, স্পেস ওয়াকের রেকর্ড তাঁকে প্রায় কিংবদন্তি করে রেখেছে।

‘হ্যালো পার্কার,’ ঘাড়টা যতটা সম্ভব ওপরে তুললেন খাসনবীশ।

‘আজ তোমার জন্য, ইভেন সবার জন্য অনেক ক’টা ভালো খবর আছে। চলো, এবার বসা যাক।’

‘ড্রিংকস?’

‘নো থ্যাংকস।’

‘ওকে গায়েজ। এবার একটু কাজ করা যাক।’

TATS -এর বয়স সবে মাত্র দু’মাস। যার মোবাইলের sms থেকে সব কিছু শুরু, সেই তাতিয়ানার নাম থেকেই গ্রুপের নাম রাখা হয়েছে TATS। যদিও মনে হয় না তাতিয়ানা এতে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে। আসলে তাতিয়ানা নামটা বড়ো বলেই হোক, বা যে কোনও কারণেই হোক, স্কুলের খাতার বাইরে বেশিদূর ছড়ায়নি। পাড়ার চপের দোকান থেকে শুরু করে ক্লাসের স্যার ম্যাডামরা সবাই ওই ‘তানি’। তাতিয়ানা থুড়ি তানিরও বড়ো নামটা পছন্দ নয় তেমন। তাই ওর রাজু জ্যাঠা যখন সেই মিশাইল মার্কা নামটা দিয়েই গল্প লিখল, তখন তানি নাকি ভয়ানক ক্ষেপে গিয়েছিল!

‘লেটস স্টার্ট!’ সবাইকে একটা ওভাল শেপের টেবিলে জড়ো করে শুরু করেন রিচার্ড। TATS -এর কোর কমিটির সদস্য সাকুল্যে পাঁচ। এখানে সবাই সেরা। জার্নালিস্ট, হার্ডওয়্যার অ্যানালাইজার, প্রফেসর, CSNSWA (কসমিক অর সুপার ন্যাচারাল সিগন্যাল অ্যান্ড ওয়েভস অ্যানালাইজার), আর কমিউনিকেশন এক্সপার্ট।

‘প্রথমেই আসা যাক ত্যাতিয়ানের... সরি, তাতিয়ানের, কি ঠিক উচ্চারণ করছি তো?’

খাসনবীশ উত্তরে হালকা করে হাসলেন।

‘ওর রিসিভ করা sms-টা সত্যিই আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। প্রশ্ন একটাই, মহাকাশ তরঙ্গ ধরার জন্য আমাদের কাছে এত কিছু থাকা সত্ত্বেও, সব ফেলে রেখে একটা আনকোরা নতুন কোম্পানির মোবাইল কেন?’

পাশে রাখা তরলটা একচুমুক গলায় ঢেলে আবার শুরু করলেন, 'ওয়েল আমি কিন্তু মোবাইল কোম্পানিটার চার্ট এনে দেখেছি। ওদের পোগ্রামিং, কোডিং একদম ওকে। আর পাঁচটা কোম্পানির মতোই। বাট শুনলে সবাই অবাক হবেন। তাতিয়ানার সেটটা তা নয়! ওর পুরো পোগ্রামিং প্রসেসটা একটা ক্রিটিক্যাল পর্যায়ে এসে আটকে আছে।'

'কিন্তু, এটা কী করে সম্ভব!' বাদামি চুলের হার্ডওয়্যার অ্যানালাইজার হ্যানা হাংকের গলায় স্পষ্ট উত্তেজনা।

'আই'ম নট শিওর। বাট আই হ্যাভ আ ওয়াইল্ড গেজ। আচ্ছা থান্ডার, মানে বজ্রবিদ্যুৎ সম্পর্কে আপনাদের কী আইডিয়া আছে? আই মিন, বেসিক তো মেঘে মেঘে ঘষা লাগা আর নেগেটিভ পজিটিভের ব্যাপার। আমি ডিটেলে যাচ্ছি না। কিন্তু তারপর?'

'বাই দ্য ওয়ে, খাসনবীশ আপনার মনে আছে? আমাকে একবার বলেছিলেন একটা ঝড়জলের রাতে তানির বাড়ির পিছনের একটা শিরিষ গাছ পুরো উড়ে গিয়েছিল?'

খাসনবীশ মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ বাজ পড়ে।'

'আর তানির কল লিস্টে পাওয়া গেছে, প্রায় ওই সময়েই ওর বন্ধু চৈতালীর সাথে ও কথা বলেছিল। কলটা কন্টিনিউ হয়েছিল বাইশ মিনিট। অথচ, তানি জানিয়েছে সেদিন ওদের ঝগড়া হয়েছিল বলে কথা হয় মাত্র পাঁচ-ছ'মিনিট! চৈতালীও ব্যাপারটা কনফার্ম করে। অবশ্য, ঝগড়া হলেও দুটো মেয়ে মাত্র পাঁচ মিনিট কথা বলবে! এটা নেওয়া যায় না। আমার মেয়ে তো আমাকে মোবাইল রিচার্জেই ফতুর করছে।'

সবাই একসাথে হেসে উঠল।

'কিন্তু কানেকশানটা কী?' মিস হ্যাংক হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করে।

'আসছি। জিম তোমার ভিডিওটা এডিট করা হয়েছে? তাহলে আমার খাটুনি একটু বাঁচে আর কি!'

'একদম রেডি।'

'ওকে প্লে ইট।'

প্রথম দিন জিম হেক্টরের পরিচয় পেয়ে বেশ অবাক হয়েছিলেন খাসনবীশ। নাসার সিক্রেট মিশনে 'ডিসকভারি'-র একজন জার্নালিস্টের কী কাজ!

হ্যানা হয়তো তাঁর বিস্ময়টা আন্দাজ করতে পেরেছিল।

'আপনার বোধহয় এটা মানতে অসুবিধা হচ্ছে প্রফেসার? কিন্তু কিছু করার নেই। আমাদের সিক্রেট একটু হলেও ভাঙতে হয়। স্পনসরের জন্য নাসা এখন নরকেও যেতে পারে, একজন রিপোর্টার পোষা তো খুব ছোটো ব্যাপার। দিন দিন সরকার বাজেটের ব্যাপারে শক্ত হচ্ছে। এতদিনে নিশ্চয় বুঝেছেন কিছুটা।'

হ্যানা তার প্রায় হোয়াইট ওয়াশ করা মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি দিয়েছিল।

হ্যাঁ, খাসনবীশ এই ক'টা দিনে ভালোই বুঝেছেন। ভারতে বসে নাসাকে যতটা মহান, অপরাজেয় ইত্যাদি প্রভৃতি মনে হোক না কেন, আমেরিকার মাটিতে নাসা কিন্তু আদৌ তা নয়। নাসার সাকসেস পয়েন্ট ফেলিওরের চেয়ে ভয়াবহভাবে কম। অনেক ক্ষেত্রেই দশটার মধ্যে ছটা প্রোজেক্টেই ব্যর্থতার নজির রেখেছে নাসা। কম্পেয়ার করতে গেলে আমাদের ISRO অনেক বেশি সফল।

আর এজন্য ট্যাক্সিওয়ালা থেকে শুরু করে ট্যাক্সের জ্বালায় হাফপাগল কেরানি অবধি সবার চোখা চোখা আমেরিকান গালিগালাজ নাসাকে কুড়োতে হয় বছরভর।

এক ভিখারি তো সুইসাইড নোটে নাসার নাম লিখে গিয়েছিল!

ঘরের আলোগুলো একটু কমে এল। জিম ওর ল্যাপটপে ভিডিওটা প্লে করে স্ক্রিনটা ঘুরিয়ে দিল বাকিদের দিকে।

ডিসকভারির লোগোটা কয়েক সেকেন্ড ভেসে থেকে মিলিয়ে গেল। স্পিকার থেকে ভেসে এল বৃষ্টির ছম ছম শব্দ। তারপর কালো স্ক্রিনে ধীরে ধীরে একটা রাতের ছবি ফুটে উঠল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বিদ্যুতের নীলচে আলোতে ঝলসে উঠছে আকাশের মেঘ। একটা দোতলা বাড়িতে আলো দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি ভেজা বাড়িটা চক চক করছে স্ট্রিট লাইটের আলোতে।

এটা কোথাকার?

ক্যামেরা এবার জুম হতে হতে জানালা ভেদ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। বৃষ্টির শব্দ কমে এল কিছুটা। তার জায়গায় একটা মেয়ের গলা........

খাসনবীশের চোয়ালটা আপনা থেকেই ঝুলে পড়ল। *ঈশ্বর তুমি কোথায়!*

স্ক্রিনে একটা মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। রাগী রাগী গলায় ফোনে কথা বলছে।

তানি! এরা এটারও ডকুমেন্টারি বানিয়ে বসে আছে!

মাথার পেছনে লম্বা করে বাঁধা পনিটেল, হালকা ঝুঁকে দাঁড়ানোর ভঙ্গি, এমনকি ঠোঁটের ওপরের তিলটা অবধি নিখুঁত! তবে এটা তাতিয়ানা নয়। তানির সাথে এর ফারাকটা ঠিক ধরতে পারলেন না প্রফেসর। মানুষ যে কোথায় গিয়ে আলাদা হয়!

ছবি পালটে গেল। চারদিকে ময়লা তুলোর মতো থোকা থোকা মেঘ। বিদ্যুতের হালকা হালকা ঝিলিক খেলা করছে এদিক ওদিক।

হঠাৎই, একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট বিদ্যুতের রেখা এঁকেবেঁকে নিচের দিকে নেমে গেল। বাড়ির পিছনে একটা গাছের ওপরে এসে পজ হল কিছুক্ষণ। আর যাই হোক এটা শিরিষ গাছ নয়।

স্লো মোশনে নীলচে রেখাটা অজগরের মতো একটা ছোবল মারল গাছটাকে। গাছটার ওপরের অংশটা একটু ফাঁক হল। তারপর পুরো গাছটা ঝলসে উঠল তীব্র নীল আলোয়। এই অবস্থায় পুরো ঘটনাটা পজ হল। রিওয়াইন্ড হয়ে গাছের ওপরে পড়ার মুহূর্তে চলে এল আবার। নীলচে জিভটা ফের স্লো মোশনে গাছটাকে ছুঁল। আর সাথে সাথেই ধোঁয়ার রিঙের মতো একটা ওয়েভ তৈরি হল (অ্যানিমেশন)। তারপর সেটা বড়ো হয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

স্পিকারে একটা গলা ভেসে এল, ‘বাজ মাটির কিছু স্পর্শ করার সাথে সাথেই গোটা একটা সার্কিট কমপ্লিট করে ফেলে। এটা পৃথিবীতে প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি বৃহত্তম সার্কিটগুলোর মধ্যে একটা।
এখন সার্কিট তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই জায়গাটাকে ঘিরে একটা তড়িৎ চুম্বকীয় বলয় বা ম্যাগনেটিক ওয়েভের সৃষ্টি হয়। আর এটুকু গ্যারান্টি দিয়েই বলা যায়, যে আপনাদের ঘরে ইলেকট্রনিক্স জিনিস থেকে থাকলে, একবার না একবার বাজের কবলে পড়ে সেগুলো খারাপ হয়েছেই………’

ধারাভাষ্যটা একটু থামল। সদ্য জন্ম নেওয়া ‘ম্যাগনেটিক ওয়েভের’ একটা কোণা দেওয়াল ভেদ করে ঘরে ঢুকে পড়ল।

টেবিলের ওপর রাখা তানির মোবাইলটা তখনও ‘ইন কল’। অদৃশ্য তরঙ্গটা খুব দ্রুত মোবাইলটাকে আঘাত করল। মোবাইলের আলোটা নিভে গিয়ে আবার জ্বলে উঠল। হালকা চিররর শব্দ। চার্জারের গর্তটা দিয়ে ক্যামেরা ঢুকে পড়ল ভেতরে। মোবাইলের ছোটো ছোটো যন্ত্রাংশগুলো দেখা যাচ্ছে। আর অ্যানিমেশনে বানানো নীল নীল কয়েকটা হিজিবিজি নাম্বার ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক।

এগুলো আবার কী!

‘রিসিভিং ফ্রিকোয়েন্সি,’ ধারাভাষ্যটা আবার ভেসে এল। এখন একটু যেন উত্তেজিত, ‘প্রত্যেক মোবাইলেই নির্দিষ্ট করা থাকে। এখন মোবাইলটা অন কল থাকায় সেটাও অ্যাকটিভ ছিল। এবার যদি ধরে নেওয়া যায় থান্ডারের ম্যাগনেটিক ফ্রিকোয়েন্সি বাই এনি চান্স মোবাইলের রিসিভিং ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ম্যাচ করে যায় বা কাছাকাছি হয়ে যায়। তাহলে? তাহলে এটা হয়......’

ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মোবাইলের সাথে ধাক্কা লাগার দৃশ্যটা আবার দেখাল। এবার মনে হচ্ছে যেন মোবাইলটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো ওয়েভটাকে গিলে ফেলল।

‘ইয়েস। মোবাইলটা আকাশের কল রিসিভ করে নেয়, মানে বাজের ম্যাগনেটিক ওয়েভটা। আর যেহেতু এটা রেগুলার কোনও কল নয়, তাই এটা মোবাইলের ওপর অবশ্যই প্রভাব ফেলবে।

‘না। এক্ষেত্রে মোবাইলটার হাল আমাদের টিভি-ফ্রিজের মতো হয়নি। প্রভাবটা পড়েছে পোগ্রামিং কোডে। মোবাইলের প্রত্যেকটা কাজের জন্যই পোগ্রামিং কোড থাকে। তাতিয়ানার মোবাইলের কোডিং-এ এমন একটা ক্রিটিক্যাল পরিবর্তন এসেছে যে.........’

শতাব্দীর সেরা চমকটা ঘোষণা করার আগে কণ্ঠস্বরটা একটু থামল। ঘরে পিন পতনের নীরবতা। পর্দায় ভিডিও-র বিশেষ বিশেষ মুহূর্তগুলো ফিরে ফিরে আসছে। এবার তানির রিসিভ করা মেসেজটা ফুটে উঠল।

‘এটা একটা আলট্রা সেনসিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি রিসিভারে বদলে গেছে। যেটা হেসেখেলে নাসার সব থেকে সেনসিটিভ রিসিভারকেও হার মানায়। আর তার রেজাল্ট তো আপনাদের সামনেই আছে।’

ভিডিওটা এখানেই শেষ। ঘরের আলোগুলো আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেল।

‘ওয়েল ওয়েল ওয়েল!’ হ্যানা নীরবতা ভাঙে, ‘রিচার্ড তোমার কি মনে হয় না, তোমার এই ধারণাটা একটু বেশিই বন্য?’

‘আমি আগেই বলেছি এটা ওয়াইল্ড গেজ,’ পার্কার হাসলেন, ‘তুমি এর চেয়ে ভালো থিওরি দিতে পারলে তোমার নেক্সট বিউটি ট্রিটমেন্ট আমার পকেট থেকে।’

‘আই থিংক তার জন্য তোমার মেয়েই যথেষ্ট। কিন্তু ট্যাটিয়ান... ওকে ফাইন টানি... তানি। ইয়েস, তো ওর মোবাইল না হয় এই জন্য ওরকম বিহেভ করল। কিন্তু বাকিদেরগুলো?’

‘ওহ! কাম অন হ্যানা! তুমি সত্যিই হ্যানা মন টাইনা মার্কা কথা বলেছ। ভুলে গেলে! ওগুলো জাস্ট সস্তায় নাম কেনার জন্য ফ্রড ছিল।’

‘ওকে, আকাশ কুমার তোমার কী মত? সাইলেন্ট মোডে চলে গেছ যে।’

স্যাং কাউচ টিমের মধ্যে কনিষ্ঠতম। CSNSW স্পেশালিষ্ট। বেঁটেখাটো, এলোমেলো চুল আর খুদি খুদি চোখের এক তর্কবাজ টিন এজার।

‘আমার মতটা বোধহয় আমি অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছি,’ স্যাং মাথাটা তুলল, ‘মহাকাশে কোথাও যদি প্রাণ থেকেও থাকে তবে সেটা ব্যাকটেরিয়া বা ওই ধরণের কিছু। এর একপাও বেশি নয়।’

‘তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ শুধু আকাশ গঙ্গাতেই কত গ্রহ আছে তার হিসেব এখনও অ্যাকিউরেট পাওয়া যায়নি। আর তার বাইরে তো ছেড়েই দিলাম,’ খাসনবীশ বলে ওঠেন।

‘আমি কিছুই ভুলছি না প্রফেসার।’

‘তবে তোমার কেন মনে হচ্ছে এই মিলিয়ন সোলার সিস্টেমের মধ্যে একটা গ্রহতেও প্রাণ থাকতে পারে না?’

‘কাকতালীয় ব্যাপারটা এক আধবারই হয়,’ কাউচ গ্লাস থেকে একটু জল খেল, ‘এটা কোরান, বাইবেল বা আপনাদের গীতা নয় যে ভয়েজ কমান্ড দিল তো আলো জ্বলল, কাঠি ঘুরাল তো ডিম ফুটল। এটা বিজ্ঞান। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব আর সেটা টিকে থাকা গোটাটাই কাকতালীয়। সূর্য থেকে তার দূরত্ব, তার আকার, প্রতিবেশীতে বৃহস্পতির মতো একজন বডিগার্ড, যে কিনা আমাদের দিকে ধেয়ে আসা সমস্ত উটকো বিপদের মুখ ঘুরিয়ে দেয়! জেনে রাখুন বৃহস্পতি না থাকলে পৃথিবী অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যেত। তারপর পৃথিবীর গতি, চাঁদের অবস্থান, এমনকি অগ্ন্যুৎপাত, বিদ্যুৎ চমকান এটসেট্রা এটসেট্রা... এর মধ্যে একটাও যদি বাদ পড়ত তাহলে হয়তো পৃথিবীতে জীবন আসতই না।’

'এখানেও কিন্তু হয়তো থেকে যাচ্ছে,' হ্যানা ঘাড়টা একটু হেলিয়ে বলে ওঠে।

'সায়েন্সের অনেকটাই 'হয়তো', 'ধরে নেওয়া'-র ওপর দাঁড়িয়ে আছে মিস। প্রায় সব ফর্মুলা। ধরে নেওয়া হয় ফ্রিকশন নেই, ধরে নেওয়া হয় গ্রাভিটি নেই, বাতাস নেই....'

'ওকে ওকে, এবার আমার টার্ন,' এতক্ষণে জিম মুখ খুলল, 'পার্কার, ধরে নিলাম তুমি ঠিক। কিন্তু ওদের দাবিটা কী? Indicate your poisho? হোয়াট'স দ্যাট? কী ধরব সেটা ইন্ডিকেট করবে! কোনও মানেই দাঁড়ায় না.......'

'গুগলে সার্চ মারো ক্যামেরা খোকা,' হ্যানা ফোড়ন কাটে, 'posiho-র ১০১ টা মানে পাবে। হয়তো ওরা আসছে আমাদের অবস্থান বোঝাতে।'

'বা তোমার চুলের ওপর খরচ কমাতে,' কাউচ মুখ বেঁকায়।

উত্তরে হ্যানা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তখনই পার্কারের ব্লুটুথ হেডফোনটা একবার বিপ করল।

'এক্সকিউজ মি প্লিজ।'

তারপর মিনিট দুই ফোনে কথা বলার পর যখন টেবিলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তখন মুখে খেলা করছে এক রহস্যময় হাসি।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আজকের রাতটা লম্বা হতে চলেছে,' চেয়ারটা নাটকীয়ভাবে একটু ঘোরালেন, 'আমরা রাতটাকে দিন করতে চলেছি।'

(৩)
(২৫ ফেব্রুয়ারী, দুপুর ২:০৩, কলকাতা, ভারত)

এই সময়ের রাস্তাটা কেমন যেন ক্লাস ফোরের রচনা বইয়ের মতো হয়ে থাকে। একঘেয়ে রুগী রুগী। ঘুরে ফিরে সব রচনাই যেন গরুতে এসে থামে। চারটি পা, একটি লেজ, দুটি কান। এখানের রচনাটা গলি নিয়ে। যেরকম গলিতে টাটা সুমো ভুল করে ঢুকে পড়লে খবর হয়ে যায়, সেরকম।

জুসের ক্যানের বাকিটা গলায় ঢেলে, সেটাকে দোতলা ব্যালকনির বাইরে পাঠিয়ে দিল তাতিয়ানা। কিছুক্ষণ কড় কড় করে সেটা গড়াগড়ি খেল। তারপর শান্তভাবে ঢুকে গেল মুখখোলা নালির রোগাটে হাঁয়ে।

ইতিহাসের ফেলে যাওয়া শহরের মতো আবার বাতিল হয়ে যায় গলিটা। এধার ওধার অগোছালোভাবে জমা জল আর মাঝবেলার ছেঁড়া কাঁথার একটা রোদ। কেবলের তারে আটকা পড়া ঘুড়িটা আপনমনে দোল খায়। একটু একটু কাঁপে। তারপর আবার ঝুলে পড়ে।

শনিবারের দুপুরগুলো এমনিই হয়। কাটতে চায় না। বাবার অফিস, মায়ের একবেলার মামাবাড়ি আর দাদার গুলতানি সফর। হাফ ডে স্কুল ছুটির পর পড়ে থাকে শুধু তাতিয়ানা। সাথে বাংলা সিরিয়াল মার্কা একটা দুপুর।

খুব নিচু দিয়ে একটা চিল পাক খাচ্ছে। গলির একদম মাঝখানে ভয়ে ভয়ে এসে পড়া রোদটায় একবার করে ওটার ছায়া পড়ছে, আর পরক্ষণেই সেটা মিলিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা চিল এভাবে পাক খায় কেন? কোথাও যাওয়ার নেই বলে?

নাসা থেকে ফেরার পর ওর রাস্তাটাও কেমন যেন গন্তব্যহীন মনে হয় তানির। রাস্তাটা এগোয়। সোজা, ডানদিক, বাঁদিক। কিন্তু শেষ অবধি কোথাও যায় না...

ক্লাসে ওকে সবাই কেমন একটা নজরে দেখে এখন। যেন ওর গ্রহটা হঠাৎ করে আলাদা হয়ে গেছে। যেন ঠাকুমার দেওয়া তাতিয়ানা নামটাকে মনেপ্রাণে অপছন্দ করা আগের সেই তানি আর ও নেই। দু'দিন আগে স্কুলে, পাড়ায় যে শুধুমাত্র তানি হয়ে ছিল, সে এখন তাতিয়ানা। তাতিয়ানা বোস।

সেদিন স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি। দু'পিরিয়ডে। ও আর চৈতালী গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মোড়ের ফুচকা স্ট্যান্ডে। রাতে বৃষ্টি পড়েছিল। পিচ রাস্তার পাঁজরে পাঁজরে জল জমেছিল বেশ। ওরা তখন সবে শালপাতা হাতে নিয়েছে। তখনি কীভাবে যেন জেব্রা ক্রসিং-এ রাস্তা পেরোনো একটা দল চিনে ফেলেছিল তাতিয়ানাকে। টানাটানা চোখ, টিকোলো নাক আর মায়ের ভাষায় কাঁচা হলুদ গায়ের রঙের সমস্যা হল, একবার দেখলে চট করে ভোলা যায় না। বিশেষ করে ঠোঁটের ওপরে আলতো করে বসে থাকা তিলটা। দেখলেই চেনা যায়। ওরাও চিনেছিল। মিনিট খানেকের একটা হুজুগে ভিড় ঘিরে ধরেছিল ওদের। তানিকে।

উড়ে আসা প্রশ্ন, সেলফি ক্লিক, তারপর একসময় রাস্তা ফাঁকা হয়েছিল। একদম খালি। চৈতালী কখন যেন চলে গেছে। তানির চোখের সামনে নেমে এসেছিল ঘষা কাঁচের পর্দা। পিঠের ব্যাগ ভারী হতে লেগেছিল হঠাৎ করেই।

শহরে বেলা গড়াচ্ছে, বাস চলে যাচ্ছে লোক নামিয়ে, ফুচকাওয়ালা এঁটো হাতে খুচরো বুঝে নিচ্ছে। রাস্তা কেটে যাচ্ছে ব্যস্ত মানুষজন। চৈতালী চলে গেছে! রাশিয়ান রূপকথায় মোড় ঘুরেছে। নতুন দিগন্তওয়ালা এক মোড়। বা দিগন্ত ছাড়া...

'কাম উইথ মি... ড্রিং ট্যা... ড্রিং ট্যা...'

তানি চমকে পায়ের দিকে তাকাল। আর তারপরেই হেসে ফেলল। পায়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে কাঠবিড়ালিটা থেমে আছে।

এটা ব্যাটারিতে চলে। তানির বিশাল কালেকশানের মধ্যে একটা। এখন অবশ্য আর খেলে না। ওর স্টাডি কাম বেডরুমে সাজানো থাকে। সুইচ অন করলে হালকা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। সাথে 'কাম উইথ মি' মিউজিকটা বাজে।

ও পায়ের আঙুল দিয়ে হালকা ঠ্যালা দিল। ক্যাট ক্যাট করতে করতে ওটা দরজার কাছে গেল। তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে আবার চলতে থাকল।

আরে এটা তো শুধু সোজা যেতে পারে! বাঁক নিল কী করে? নিশ্চয় দাদার কীর্তি। তা এটা সাকসেসফুল কীর্তি। বেশিরভাগই বারোটা বাজায়। তবুও আগ্রহ-টাগ্রহের ঘাটতি নেই। সত্যি, দাদাটা কেন যে ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে পড়ল না!

তানি উঠে পড়ল। এটা হচ্ছে ওকে তলব করার জন্য। না গেলে আবার বাবুর গোঁসা হবে। জ্বালা কম নাকি। ঢ্যাং ঢ্যাং করে লম্বাই হয়েছে খালি। বয়স সেই দশ বারোতেই গোঁত্তা খাচ্ছে।

করিডরটা অন্ধকার। গলির বাড়িতে রোদ ঢোকে না তেমন। কালো সিমেন্টের পালিশ করা মেঝে দিয়ে থুপ থুপ করে এগিয়ে যাচ্ছে খেলনাটা।

'ড্রিং ট্যা... ড্রিং ট্যা... কাম উইথ মি... কাম উইথ মি' কানের পাতায় ফিট করা এল ই ডি দুটো হালকা লাল আলো ছড়াচ্ছে।

করিডরের একদম শেষে তানির ঘর। দরজাটা একটু ফাঁক করা। খেলনাটা ডেকে ডেকে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, একটা জলের শব্দ হচ্ছে না? কেমন একটা কল কল করে জল পড়ার শব্দ! ঘরের ভেতর থেকে আসছে। দাদা? দুটো পাখি যেন ঝগড়া করছে তার মধ্যে। ঘুলঘুলি দিয়ে চড়াই ঢুকেছে?

দরজার কাছ অবধি গিয়ে পুতুলটা থামল। পায়ে ভর দিয়ে ঘুরল তানির দিকে। তারপর দম শেষ হয়ে যাওয়া পুতুলের মতো ঝুপ করে পড়ে গেল। *ব্যাটারি শেষ বোধহয়।*

তানি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ফাঁকা ঘর। জানলার ঘষা কাচের ওদিকে তিনটে-চারটের শহরতলি। ভেতরে গিঁট পেকে আছে আলোছায়া। জলের শব্দ থেমে গেছে। পাখির ঝগড়া যেন শেষ হয়ে গেছে মাঝপথেই! ঘর জুড়ে অদ্ভুত একটা কানে ঝিঁঝিঁ ধরানো নীরবতা। কেউ যেন অপেক্ষা করে ছিল এখানে। এখন আর নেই!

জানলার ঠিক সামনেই বিছানা। টান টান করে পাতা সাদা চাদর। তার ওপর একটা মথ... না মথ তো নয়। ডানা মেলে বসেছে। প্রজাপতি তবে কালোও হয়! প্রজাপতিটা নিঃশব্দে উড়ে এল। বসল তানির পায়ের পাতায়। এবার ভালো করে দেখা যাচ্ছে। কালোর ওপর নীল দিয়ে কাজ করা ডানা। নীল রেখাগুলো শিরার মতো ছড়িয়ে আছে ডানা জুড়ে।

কড়ড়ড়ড়... তানি একটু চমকে ঘাড় ঘোরাল। পাশের স্টাডি টেবিলের ওপর পেনসিলটা গড়াচ্ছে। হাওয়া দিল? গড়াতে গড়াতে টেবিলের ধার অবধি এসে যেন থামল অল্প। তারপর টুপ করে মেঝেতে পড়ল। আর ঠিক তক্ষুনি কম ভলিউমের গানটা বেজে উঠল -

'দেড়শ বছর আগেও আমি...'

মুহূর্তের মধ্যে তানির হাতের তালু ঘেমে এল। পায়ের তলাটা কেমন যেন ঝিন ঝিন করছে।

এই একলা বাড়িটা কি তবে জেগে উঠল!

ভয়ে ভয়ে তাকের মিউজিক সিস্টেমের দিকে তাকাল তানি। অনুপম তখনও গেয়ে চলেছে। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এসে গানটা যেন নরক সাজিয়ে বসেছে এই বারো বাই আট ফুটের ঘরে। দেড়'শরও অনেক বেশি সময়ের অপেক্ষা আজ শেষ হয়েছে।

আজ তারা জেগেছে!

'ঘরে কে আছে? ... হ্যাল্লো!' নিজের কাছেই কথাগুলো খুব বেশি ফাঁপা মনে হল তানির।

'খি খিখি খি' সেলফে রাখা স্পিকিং ডলটা মুখ ভেঙিয়ে হেসে উঠল।

ও আর দাঁড়াল না। নিজেকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলার আগে, পিছনের দরজাটা একটানে খুলে ফেলল। আর এক সেকেন্ডও এখানে নয়।

কিন্তু, এ কী! দরজার বাইরেটা আর ফাঁকা নয়। দরজার ঠিক সামনে কাপড়ের ডেক চেয়ারটা পাতা! এটাতেই একটু আগে ব্যালকনিতে বসেছিল তানি। একটাই আছে ওদের বাড়িতে। আর চেয়ারের কোলের ওপর? ওটাও তো একটাই ছিল!

'ড্রিং ট্যাং... ড্রিং ট্যাং... কাম উইথ মি... ড্রিং ট্যাং... ড্রিং ট্যাং...' কানের এল ই ডি-গুলো থেকে যেন রক্ত ঝরছে। টকটকে লাল রক্ত।

ও দরজাটা ধড়াম করে বন্ধ করে পিঠ ঠেকাল। কাঁধদুটো দু'পাশে হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। হাঁপাচ্ছে।

'ম্যানহোল আর কলেজস্ট্রিটের গলি...'

তানি স্বপ্নেও ভাবেনি অনুপমের গলাকে এতটা অসহ্য লাগবে!

মোবাইলটা? মোবাইল কোথায়? ইমিডিয়েটলি ওটা দরকার। তানি চোখ খুলল। খুলেই রাতের রাস্তায় ট্রাকের সামনে পড়া কুকুর ছানার মতো মনে হল নিজেকে। হড় হড় করে একটা ঠাণ্ডা ঢেউ নেমে এল মাথা থেকে। পায়ের দিকে।

ঘষা কাচ দিয়ে চুঁইয়ে আসা আলোতে পিঠ দিয়ে বসে আছে লোকটা। যেন পোড়া কাঠ কুঁদে বানানো। চোখে মণি বলে কিছু নেই। সাদা অংশের গোটাটাই হালকা সবুজ আলো। আর ফ্রিজ খুললে যেমন ধোঁয়া ধোঁয়া মতো একটা কুয়াশা দেখা যায়, তেমনই যেন একটা কুয়াশার মেঘ পাক খাচ্ছে চোখ দুটোর আশেপাশে।

তানি দরজা বেয়ে বসে পড়ল। সাইলেন্সর ছাড়া একটা বাইক ছুটে বেড়াচ্ছে ওর বুক জুড়ে। জলের শব্দটা আবার ফিরে এসেছে। ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে কোথাও একটা। স্পিকিং ডলটার হাসি এখনও থামেনি। *আচ্ছা, হায়েনার হাসি বোধহয় এরকমই হয়!*

'পুকুর ধারে জলের গন্ধে, বাংলা ভাষায়...'

মিউজিক সিস্টেমের ভলিউম বাড়ছে আস্তে আস্তে। নিউমার্কেটের বিকেলের ভিড় যেন উঠে এসেছে ঘরের মধ্যে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আছে, অনেকে আছে।

লোকটা উঠে দাঁড়াল। ক্যাট ক্যাট করে একটা ফাটল এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে পড়ল পিছনের কাচ জুড়ে। কট... কট... কট কট। কিছুক্ষণ থামল। তারপর ঝন ঝন করে ভেঙে পড়ল। স্পিকিং পুতুলটা হেসে উঠল আরও জোরে।

হঠাৎ করে নিজেকে হাইওয়ের ওপর ওড়া প্লাস্টিকের মতো মনে হল তানির। নিচে গাড়ি, বাইকের ফেলে যাওয়া রাস্তা। ওপরে আকাশ। ও আস্তে আস্তে নেমে আসছে। মেঘ জমছে আকাশে। কালো, একদম কালো চারটে দিক। শুধু দু'টুকরো জেগে থাকা সবুজ। হালকা একটা সবুজ ধোঁয়া -

"দেড়'শ বছর আগেও আমি, তোমার খোঁজে পথের ধারে... ক্লান্ত হয়ে শুয়েছিলাম... ... ... এভাবেই ঠিক অন্ধকারে।"

(৪)
(২৫ ফেব্রুয়ারি, রাত ৭:১৬, পাটনা, ভারত)

মাঝে মাঝে নিজেকে বরফের মধ্যে জমে যাওয়া পিঁপড়ে বলে মনে হয় ওমপ্রকাশের। গলে না পচে না, নড়াচড়াও করতে পারে না। শুধু একভাবে শক্ত জলের সাথে চিটে থাকে।

পায়রার বাড়ির মতো একটা ঘর। ড্যাম্প ধরা দেওয়াল আর পচতে থাকা কাগজের বান্ডিলের মধ্যে পায়া নড়বড়ে টেবিলটুকু কোনও রকমে জায়গা করে নিয়েছে। আর পেরেক ওঠা চেয়ারটাতে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে ঠাঁই হয়েছে ওমপ্রকাশের।

ক্ষমতার জন্য আগে কাঠ খড়ই পোড়ে। তারপর পুড়তে হয় নিজেকে।

বিহারের সি এম-এর সাথে যোগাযোগের মাঝের সুতো হিসেবে কাজ করে ওমপ্রকাশ। যেখানে বারুদ ছাড়া তেমন কথা বলা হয় না সেখানে সুতোয় টানও লাগে দু'দিক থেকেই।

এমনিতে তো সি এম-এর দর্শনার্থীরা ওর সাথে কথাই শুরু করে টেবিলের ওপর পাইপগানগুলো নামিয়ে রেখে...

ওর ভাবনায় ছেদ পড়ল -

'স্যার স্যার।'

'কা?' পানে লাল হয়ে থাকা ঠোঁট নিয়ে ওর দিকে তাকালেন সি এম।

'ও দিল্লি সে কল আয়া থা। রাত মে কুছ ফরেনার আ রহে নালন্দা মে। ও কুছ এলিয়েন বাগারা বাগারা...'

'আরে ইয়ার, ইনলোগো কা তো কাম ধান্দা কুছ হ্যায় নেহি, ব্যাস ঝুট মুট কা তকলিফ। এ বিশ্ব ধ্বংস হোগা, আশমান টপককে এসিড গিরেগা। বড়ে আয়ে কল্কি ভগবান...'

'স্যার তো?'

'ও কলকাত্তা হো কর আ রহে না? সো চেকিং ফিকিং হো গিয়া হোগা। যাদা তকলিফ মত লো। নালন্দা কা চিফ কো এক ফোন ডাল দো ব্যাস।'

'স্যার ফোন তো ডেড হ্যায়!'

'আরে বুরবক হ্যায় তু? অনলাইন কল কর দে।'

সি এমের ফোনটা বেজে উঠল তখনি - 'আরে বাপ রে... হ্যালো... হাঁ জি কাবাব চড়া দো। হাম ব্যস দশ মিনিট মে আয়ে।'

(৫)

(২৫ ফেব্রুয়ারি, রাত ৭:২৩, ভারতের কোথাও)

ঘরটায় আলো নেই তেমন। শুধু একটা জিরো পাওয়ারের বালব হাঁপানি রুগীর মতো টিমটিম করে জেগে আছে। ছায়াটার পিঠ আলোর দিকে। স্ক্রিনের হালকা নীলে জ্বল জ্বল করছে দুটো চোখ। একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে তৈরি হল ও। মনে হল জীবনের প্রথম অন্যায়টুকু করতে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে একটা চাপ অনুভূত হল।

আর কোনও উপায় নেই। এটা শুধুমাত্র যোগ্যদের জন্য।

ফোনটা ডেস্কটপের সাথে কানেক্ট করে 'ভয়েজ ম্যাজিক' সফটওয়্যারটা অন করল। রেকর্ড মোডে সেট করতেই স্ক্রিন জুড়ে একটা গ্রাফ শিটের ছবি ভেসে উঠল। বিভিন্ন মাপের ঢেউ স্থির হয়ে আছে পাতা জুড়ে।

কল

ট্রু ট্রু ট্রু...

'হ্যালো নালন্দা কন্ট্রোল রুম।'

স্ক্রিনের গ্রাফগুলোর ওঠানামা শুরু হয়ে গেছে। ওপারের গলাটা নিজের ছাপ ফেলে যাচ্ছে টু ডি গ্রাফ শিটে।

নিচের টাইমারের দিকে তাকাল। আর ১২ সেকেন্ড...

ঠিক আছে

'হ্যালো, is Nalanda open tomorrow, for visitors?'

'Yes, but museum …'

এক সেকেন্ড

আর কিছু না বলে ও ফোনটা কেটে দিল। গ্রাফগুলো এ ওর সাথে গিঁট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রসেসিং বাটনে ক্লিক করল।

লোডিং... ...

রেজাল্ট - ২.৪

এই সফটওয়্যারটা ওর এক জার্মান ফেসবুক ফ্রেন্ড ওকে দিয়েছিল। একটা মিনিমাম অ্যামাউন্টের ভয়েস স্যাম্পেল ইনসার্ট করলে, ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে সেটাকে কপি করে নেয় সফটওয়্যারটা। তারপর, একটা ফিলটারের সাহায্যে অন্য যে কোনও ভয়েস স্যাম্পেলকে ওটার মতো করে বদলে ফেলে। মানে সাদা বাংলায় এটা দিয়ে গলা নকল করা যায়। যার চাওয়া হবে তার।

অপেক্ষা...

এটা করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

আবার নিজেকে বোঝায় সে। নীলচে কালো ছায়াটা একটু যেন কেঁপে ওঠে।

কুল... কুল...

আশা করি ফোনটা মিস হয়ে যায়নি। স্ক্রল করে আগের দু'ঘন্টার কল লিস্টগুলো আরও একবার চেক করে নিল। *নাঃ ঠিক আছে...*

তখনই ল্যাপটপটা বিপ করল। *অ্যাট লাস্ট!*

কিছুটা বেজে যেতে দিয়ে ফিলটারটা অন করল। তারপর অবিকল একভাবে বলে উঠল, 'হ্যালো, নালন্দা কন্ট্রোলরুম?'

'হাঁ ইকবাল সাব। আব ডিউটি মে?'

'ইয়েস, আব সেন্টার মেই কল কিয়া হ্যায়।'

'হাঁ হাঁ। সরি সরি। ও কেয়া হ্যায় না, কুছ ফরেনার লোগ ইউ.এস সে আব কা ওহাঁ আ রহে। তো থোড়া খাতিরদারি... সমঝে না? সি এম কা অর্ডার...'

'ওকে স্যার...'

'আউর হাঁ, তুমহারা বেটা অব ক্যায়সা হ্যায়?'

'ও... ইয়ে... হাঁ ঠিকই হ্যায়। ওকে প্রকাশজি বাদ মে বাত হোগা...'

ও কলটা শেষ করল। কপালের ঘামটুকু মুছে নিল হাতের উলটো পিঠে।

এখনই করতে হবে।

সি এমের অফিসের নাম্বারটা সেট করল। এবার এই নাম্বারটা দিয়ে যেখানে খুশি কল করা যাবে।

কলিং... ...

'হ্যালো, নালন্দা কন্ট্রোলরুম?'

ছায়াটা একটু থামল। চোখ বন্ধ করে গুছিয়ে নিল নিজেকে।

নাউ অর নেভার!

'ইকবাল সাব, ম্যায় প্রকাশজি। আবকা লড়কা ঠিক হ্যায় না?'

(৬)

(২৫ ফেব্রুয়ারি, রাত ১০:১৯, 25°08'12"N, 85°26'38"E)

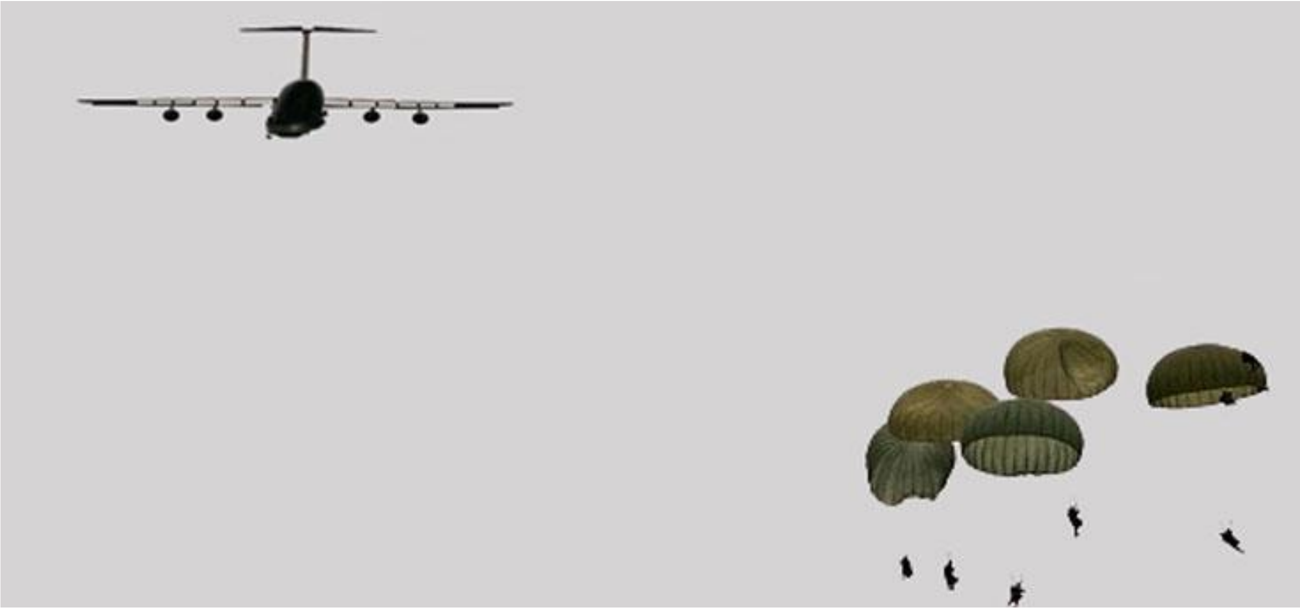

'এই প্যারাট্রুপিং-এর আইডিয়াটা কার ছিল, একটু বলবে প্লিজ?'

ঘন্টায় এক'শ আঠারো মাইল বেগে পড়তে থাকা শরীরটাকে যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দিতে দিতে চিৎকার করে উঠল হ্যানা হাংক।

হাতে হাতে বাঁধা ডিজিট্যাল অল্টিমিটারগুলোতে খুব দ্রুত উচ্চতা কমে আসছে।

২২০০......২১৯৩.........২১৮৮..

'দুই দেশের সরকার হ্যানা। কেউই আমাদের পাত্তা দিল না তেমন। আর তা ছাড়া এয়ারপোর্ট থেকে চপারের থেকে বেশি স্পিডে কিছুতে আসা যেত না,' স্ক্রিন থেকে চোখ সরায় না পার্কার।

'আমি যতদূর জানি সব থেকে ফালতু মডেলের হেলিকপ্টারটাও মাটি অবধি নামতে পারে।'

'কাম অন। তুমি ডেফিনিটলি চাইবে না আশেপাশের গ্রাম আমাদের সার্চ টিমে জয়েন করুক।'

'আর সার্চ!' চুলগুলো বাগে আনার আরও একটা ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে গজগজ করে হ্যানা, 'এমন চ্যাটিং এলিয়েন হলিউডও দেখাতে পারেনি।'

‘ওর এফ বি আই ডি-টা নিয়ে নিও হ্যানা। তোমার হাজার একটা বন্ধুর চেয়ে ভালোই হবে ......যত্তসব।’

অন্ধকারেও যেন কাউচের বেঁকে যাওয়া মুখটা দেখতে পেল হ্যানা।

‘আমি এখন তোমার দলে স্যাং। এস.এম.এস পাগল এলিয়েনের ব্যাপারটা একটু বেশি রকমের ওভারডোজ হয়ে যাচ্ছে।’

অন্ধকারে পাঁচটা শরীর পাক খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। কালো আকাশের নিচে, আরও কালো পৃথিবী। আর দুইয়ের মাঝের ফ্রি ফলে ভেসে থাকা খাসনবীশের মনে হল তাকে যেন বিশাল একটা ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওনার শখের প্যারাগ্লাইডিং-এর অভিজ্ঞতা মারাত্মক রকমের ফাঁকিবাজি হয়ে ফিরে আসছে প্রতি মুহূর্তে। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখার চেষ্টা করলেন। কালো জাম্পশ্যুটগুলোতে খুব আবছাভাবে চারজনকে দেখা যাচ্ছে। ডিসেকশন টেবিলে আটকে থাকা ব্যাঙের মতো হাত-পাগুলো ছড়ানো সবার।

শরীরটাকে যতটা পারো ছড়িয়ে দাও। উলটো বাতাসের ধাক্কা লাগিয়ে নিজের গতি কমিয়ে আনো। যতটা পারা যায়।

অল্টিমিটারের দিকে তাকালেন - ১০৩ MPH ২১১১ Ft।

‘ও কে গায়েজ, গেট রেডি,’ কানে লাগানো হেডসেটটায় জিমের গলা শোনা গেল, ‘এটা ম্যানুয়ালি করতে হতে পারে আমি পুল বলার সাথে সাথে। দশ নয় আট.......’

কাউন্টডাউন পুরোপুরি শেষও হল না। ঠিক ২০০৩ ফিটে এসে স্যুটের সাথে লাগানো এ.এ.ডি (অটোমেটিক অ্যাকটিভেশন ডিভাইস)-গুলো পিইইং করে একসঙ্গে শিস দিয়ে উঠল। একটা কাপড় ঝাড়ার মতো শব্দ হল। ব্যাকপ্যাক থেকে দলা পাকানো ক্যানোপিগুলো ছুটে গেল ওপরের দিকে। অল্টিমিটারগুলোতে দ্রুত স্পিড কমে আসতে লাগল।

প্যারাসুটগুলো যখন পুরোপুরি খুলল, ততক্ষণে ওরা আরও ৮০০ ফুট নেমে এসেছে।

৫৩ mph....৫২....৫১..........৪৮...

‘আর ইউ ও কে প্রফেসার?’ জিমের গলা শোনা গেল।

‘সেন্ট পার্সেন্ট!’

নিচের ইট-পাথরের অবয়বগুলোর দিকে তাকালেন খাসনবীশ। পৃথিবীটা দুলতে দুলতে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে হেলিকপ্টারটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু তার নাক বরাবর নেমে আসা লেজারটা অন্ধকার চিরে নেমে গেছে নিচের দিকে। বুলস আই হয়ে থেমে আছে পাশের একটা ঘাসজমিতে।

পাথরের গর্তগুলোর ওপর না নামাই ভালো। ভাবলেন প্রফেসার।

‘এবার একটু দৌড়তে হবে। একবার না একবার চালু বাস-ট্রেন থেকে তোমরা নেমেছ নিশ্চয়ই! তার আগে গগলসের ডানদিকের বোতামটায় সবাই চাপ দাও।’

বোতামটা চেপে ধরতেই মনে হল যেন অন্ধকারের গায়ে কেউ এক বালতি রেডিয়াম পেইন্ট ছুঁড়ে মারল। তারপর হালকা সবুজ আভায় স্পষ্ট হয়ে উঠল সব কিছু।

ঘাসজমিটা যখন পায়ে ঠেকল তখনও অল্টিমিটার প্রায় ৩ mph-এর ঘরে। পা ছোঁয়ান মাত্র স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই খাসনবীশ কিছুটা দৌড়ে গেলেন। প্যারাসুটটা পুরোপুরি মাটিতে নেতিয়ে পড়লে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে নিজেকে থামালেন প্রফেসার।

‘অল ও কে?’ নিজের ক্যানোপিটা ঠিক করতে করতে পার্কার বললেন, ‘আপাতত এগুলো ইট চাপা দিয়েই রাখা থাক।’

‘আমাদের রিসিভ করতে কি কারও আশার কথা নয়?’ দূরে ভাঙা দেওয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে হ্যানা বলে উঠল।

‘সারাবেরিয়ান?’

‘না, আই মিন পৃথিবীর কেউ?’

উত্তরে পার্কার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই সবার হেডসেটগুলো একসাথে বেজে উঠল, ‘ওয়েলকাম টু নালন্দা। দ্যা লাইট অফ নলেজ।’

(৭)
(সময় যেখানে থমকে দাঁড়ায়)

জেগে ওঠার সাথে সাথে পিঠের নিচে শক্ত পাথুরে মেঝেটা টের পেল তানি।

ঠাণ্ডা!

তারপর একটু একটু করে চোখ মেলল ও। একটা বিশাল ঘর। কেমন যেন স্যাঁতস্যাতে। প্লাস্টার ছাড়া ইটের দেওয়াল। বাতাসে জল শুকিয়ে যাওয়া আঁশটে গন্ধ।

আমি কোথায়?

ঘরের এক কোণ থেকে আসা কমলা আলোর রেখাটার দিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করল তানি। আলোর উৎসটা এখান থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। একরকম গলির মতো বাঁকে বোধহয় আলোটা রাখা।

তানি মাথায় একটু জোর দিল। হালকা চিনচিনে একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল মাথা জুড়ে। আর তারপরই বমির মতো হড় হড় করে একটু আগের ভয়গুলো বেরিয়ে এল। একসাথে! তানি চিৎকার করে উঠল।

'গুড ইভনিং ডিয়ার।' একটা অদ্ভুত ধরণের ঠাণ্ডা গলা ভেসে এল। তানি চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকাল। *কেউ নেই!*

'আশা করি তুমি তোমার লম্বা ঘুমটা উপভোগ করেছ,' কোল্ড স্টোরেজের জমা বরফের ওপর দিয়ে যেন ভেসে আসছে গলাটা। তানি আলোটার দিকে তাকাল। *ওখানে?*

'ঠিক ধরেছ। আমি ওখানেই আছি। কিন্তু আমাকে দেখার সময় এখনও আসেনি ডিয়ার। সময় হলেই সব পাবে। স-ব।'

'সরি? আমি ঠিক বুঝলাম না,' তানি আর কিছু বলার মতো পেল না।

'তোমার মনে এখন কিছু প্রশ্ন আসছে ডিয়ার?'

'আপনি আমাকে নকল করছেন?' তানি খেয়াল করে ওর ভয়টা হঠাৎ করেই কমতে লেগেছে, 'না, মানে কথায় কথায় ডিয়ার বলা আমারই একরকম হ্যাবিট।'

'তোমার কি সত্যিই মনে হয়, তুমি কথা বলছ?'

তানি ব্যাপারটা এতক্ষণে খেয়াল করল।

আরে তাই তো! 'কিন্তু এটা কিভাবে হয়!.......টেলিপ্যাথি!'

'কাছাকাছি। তোমার বোঝার জন্য এটা একটু জটিল।'

'বাবা বলে তুমি যেটা সহজ করে বোঝাতে পারবে না, তার মানে তুমি নিজেও সেটা ঠিকঠাক বোঝ না।'

'হুম,' গলাটা একটু ভারি হয়, 'তোমাদের জাতটা আর কিছু না হোক, কথা বলে দারুণ!'

'সেটা বোধহয় আপনার না ভাবলেও চলবে।'

'ভাবতেই আমার আসা ডিয়ার। সারাবেরা গ্যালাক্সি টু প্রোজেক্ট ২২৩, পৃথিবী। পুরো থ্রি হান্ড্রেড লাইট ইয়ারস।

'ওয়েল, এটা ঠিক টেলিপ্যাথি নয়। আমি শুধু আমার ভাবনাটুকু পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার ব্রেন সেটাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিচ্ছে। নিজের ভাষায়। নিজের শব্দে। তাই তোমার কথা বলার স্টাইলের সাথে আমার কথাগুলোর মিল থাকা খুবই স্বাভাবিক। বুঝেছ?'

তানি মাথা নাড়ে। তারপরই খেয়াল হয় সেটা দেখার জন্য সামনে কেউ নেই।

'তোমরা যেমন অনেকগুলো ভাষায় একসাথে,' গলাটা তানির মাথার মধ্যে বেজে চলে, 'মিলিয়ে মিশিয়ে কথা বল, তেমনি শুনছও মিলিয়ে মিশিয়ে।'

'ওকে!' তানির ভয়টা হঠাৎ করেই যেন মিলিয়ে গেছে। তেমন অবাকও হচ্ছে না। ওর তো এতক্ষণে আরেকবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা।

'ভয় খুব বাজে জিনিস ডিয়ার,' গলাটা ওর ভাবনাটুকু সাথে সাথে ধরে নিল, 'তোমার অ্যাড্রেনালিন আর অ্যামিগডালা দুটোই নিষ্ক্রিয় করা আছে।'

টেলিপ্যাথি........ মাইন্ড কন্ট্রোল........এলিয়েন! উয়াওও, এবার ডেফিনিটলি আমার সেন্সলেস হয়ে যাওয়া উচিত!

'তোমাদের সব থেকে বড়ো দোষ কী জানো?' তানিকে চমকে দিয়ে আবারও ওর চিন্তাগুলো গিলে নিল গলাটা, 'তোমরা নিজেদের শুধুমাত্র মানুষ বলে মনে কর। জাস্ট হাজারটা উপজাতি, তস্য উপজাতিওয়ালা একটা জাত। তোমরা ভুলে যাও তোমাদের বানানো পৃথিবী, মারামারি, খাওয়াখাওয়ির বাইরেও একটা বিশাল পৃথিবী আছে। কখনও ভেবে দেখেছ? বাড়ির কুকুরটা, বেড়ালটা, জানলায় এসে বসা কাকটার কথা কেন বোঝ না? অথচ ওরাও তো কথা বলে। ওদেরও ভাষা আছে...'

তানি কোনও উত্তর দিল না। গলাটা হঠাৎ করেই যেন ক্ষেপে উঠেছে।

‘তোমাদের মস্তিষ্ক যেই একটু উন্নত হল,’ জ্যৈষ্ঠের বিনা নোটিশে আসা কালবৈশাখীর মতো আছড়ে পড়তে থাকে গলাটা, ‘ওমনি তোমরা বাকিদের থেকে বেরিয়ে এলে। তাই তো তোমাদের ব্রেনের মাত্র একভাগ কাজ করে। বাকি তিনভাগের কাজ তোমরা শেখোইনি। পুরোপুরি ঘুমন্ত ওগুলো।’

‘পুরোপুরি?’ তানি কোনওরকমে নিজেকে জড়ো করে।

‘মাঝে মাঝে দু’একটা সেল বাই চান্স অ্যাকটিভ হয়ে যায়। তারপর তোমাদের বোঝার আগেই আবার ডিঅ্যাকটিভও হয়ে যায়। তোমাকে বললে বুঝবে। কোনও দিন কি এমন হয়েছে, যে তুমি হয়তো কারোর কথা ভাবছ, আর ঠিক তখনই সে তোমাকে ফোন করল? বা ধরো আকাশ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও কী মনে করে বেরোনোর আগে ছাতাটা সঙ্গে নিলে, আর সেদিনই তেড়ে বৃষ্টি এল?’

‘হ্যাঁ, অনেকবার হয়েছে,’ তানি মাথা নাড়তে গিয়েও নাড়ল না।

‘এবার দ্যাখো।’

তানি দেখল ঘরের আলোটা একটু যেন বেড়ে গেল। আর ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত রকমের ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধ পেল ও।

‘গন্ধটা পাচ্ছ? তোমার ব্রেনের একপাশের দুটো সেল শুধু অ্যাকটিভ করেছি। এটা একধরণের ব্যাকটেরিয়ার ডেডবডি পচে যাওয়ার গন্ধ। আলো বা ফোটন কণার টাচে এলেই এরা মারা যায়।’

আলোটা আবার কমে গেল। তানি আর গন্ধটা পেল না।

‘তো...’ তানির নিজেকে বাগে আনতে বেশ কষ্ট হল। ভয়টা কি আবার ফিরে আসছে? ‘তোমরা কারা? কী চাও?’

‘এর অনেকগুলো উত্তর হয়। সহজ উত্তর হচ্ছে আলো। কঠিনটা অন্ধকার।’

‘কোনওটাই বুঝলাম না...’

‘আসলে সবকিছু মার্ক করার জন্য তোমাদের একটা করে নাম দরকার....’

গলাটা থেমে গেল। নীরবতা। তানির পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই যেন হঠাৎ করেই জেগে উঠল।

কিছু একটা হতে চলেছে!

প্রথমে মৃদু একটা কম্পন টের পেল তানি। পায়ের নিচের মেঝেটা হালকা কাঁপছে। তারপর সেটা থেমে গেল। নীরবতা। ঘরের আলোটা আবার একটু বেড়ে গেল। আর সাথে সাথেই মেঝে জুড়ে একটা ফাটল ছড়িয়ে পড়ল বিনা নোটিশে। কাঁপা হাতে কেউ যেন একটা বৃত্ত এঁকে চলেছে তানিকে ঘিরে। তানি সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। পারল না।

মট মট শব্দটা থেমে গেল। তারপর তানিকে নিয়ে মেঝের ফাটা অংশটা পড়তে শুরু করল। ফ্রি ফল অনুভূতি চড়ে বসল সারা শরীরে।

‘আমি পৃথিবী আর নরকের মাঝে এক সেতু। আমি আলো, আমি অন্ধকার। আমি ক্যারণ।’

(৮)
(২৫ ফেব্রুয়ারি, রাত ১০:৪৩, নালন্দা, বিহার)

আমরা আসলে ইতিহাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছি!

একটু আগে ভাবছিলেন খাসনবীশ। সত্যিই তাই। সামনের বিশাল ভাঙাচোরা ব্যাপারটা আসলে মূল নালন্দার দশ পার্সেন্ট মাত্র। বাকি নব্বই এই এখানে মাটির তলায়। ওপরে গ্রাম বসে গেছে। তাই আর খোঁড়া হয়নি। ভোটতন্ত্রের দেশে ভোট ব্যাংক ঘাঁটাতে চায় কে? বিহার সরকারও না, ভারত সরকারও না। তাই ইতিহাস চাপাই থাকে। গাইড শুধু ট্যুরের শেষে শেয়ালের কুমিরছানা দেখানোর মতো করে বলবে, ‘এ যো দিখ রহা হ্যায় সাবলোগ? উ দেখিয়ে উধর গাঁও কা নিচে অ্যাইসে হি থোড়া দাফান হ্যায়। একই হ্যায়। দেখনে যেইসা কুছ নেহি।’

‘অল ক্লিয়ার। আজকের রাতটার জন্য নালন্দা আপনাদের। নো সিকিউরিটি, নো সিসি টিভি।’ হেডসেটের ভেতর থেকে গলাটা আবার ভেসে এল।

‘এক্সকিউজ মি, হু ইজ দিস?’ পার্কার প্রথম মুখ খুললেন, ‘আর এখানেই বা কী করে?’

‘আমি নেটওয়ার্কটা কিছুক্ষণের জন্য ধার নিয়েছি। আপনাদেরই সুবিধার জন্য।’

‘হ্যাকার!’

‘আমি ধার নেওয়া বলতে বেশি পছন্দ করব। আমি নালন্দা দু’বার গেছি। তাই নাসার কন্ট্রোলারের থেকে আমি কাজটা বেশি ভালো করতে পারব। হয়তো।’

‘কিন্তু, কেন?’

‘কারণ, আপনাদের আর আমার লক্ষ্য আলাদা নয়।’

‘সরি?’

‘না আমার এলিয়েন, সারা বেরা ওসব নিয়ে এতটা ইন্টারেস্ট নেই যে তার জন্য নেটওয়ার্ক ট্যাপ করব। কিন্তু......’

গলাটা একটু থামল। তারপর একটু জোর দিয়ে বলল, ‘ওরা তানিকে নিয়ে গেছে।’

‘হোয়াট?’ সবাই প্রায় একসাথে বলে উঠল।

‘তন্ময় তুমি!’ খাসনবীশ এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, ‘এসব কী বলছ!’

‘তুমি ওকে চেনো?’ কাউচ প্রশ্ন করে।

‘ডেফিনিটলি, আমার স্টুডেন্ট। আর একটা পরিচয় হল, ও তানির...’

‘দাদা,’ ওপার থেকে কথাটা শেষ করে তন্ময়, ‘এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, নাসার কন্ট্রোলারের কাছে এটা নিছক ডিউটি হলেও আমার কাছে ডু অর ডাই। এখানে একটা ছোট্ট ভুলও আমাকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়াবে। আর, আশা করি আপনাদের ভালোই হেল্প করতে পারব।’

‘আমারও তাই মনে হয়!’ পার্কারের গলায় স্পষ্ট বিস্ময়, ‘এই বয়সে নাসার নেটওয়ার্ক হ্যাক। আই গেস তুমি নালন্দার কন্ট্রোল রুমের নেটওয়ার্কও ট্যাপ করেছ?’

‘হ্যাঁ, ওদের বলা আছে আরকিওলজি ডিপার্টমেন্টের কিছু কাজ আছে। তাই ওদের আসা বারণ.....’

‘উয়াও, সত্যি এই বয়সে....... ফ্যাবুলাস। সব মিটে গেলে তোমার সাথে বসতে হবে।’

‘এক সেকেন্ড। তন্ময় তুমি কীভাবে এতটা শিওর হচ্ছ যে কাজটা সারাবেরিয়ানদেরই? আই মিন কিডন্যাপ বা ওরকম কিছু তো আমাদের এখানে নতুন নয়?’ পোড় খাওয়া জার্নালিস্ট প্রশ্ন তোলে। ডিসকভারির অফিসিয়াল মেইলে রোজ প্রায় ২০০টা এরকম স্প্যাম মেল আসে। কেউ ফ্লাইং সসার দেখেছে, তো কেউ পড়েছে জায়েন্ট স্কুইডের খপ্পরে। এগুলোর মধ্যে সত্যি খবরগুলো বেছে নেওয়ার কাজটা জিমদেরই করতে হয়।

‘কারণ,’ তন্ময় গলাটা ঝেড়ে নিল, ‘সাধারণ গুণ্ডা-বদমাশের পক্ষে টেলিপোর্টেশন করা সম্ভব নয়।’

‘টেলিপোর্টেশান!’ জিমের মনে হল ওর পায়ের তলাটা একটু যেন কেঁপে গেল।

‘আই গেস সো। প্রথমত, বাড়িতে তানি একাই ছিল। আর দরজা ভেতর থেকে লক করা। আমাদের ভেঙে ঢুকতে হয়েছে। বিলিভ মি, ওর বেরোনোর মতো অন্য আর কোনও রাস্তা নেই এই বাড়িতে।’

তন্ময় একটু থামল। আরেকবার গলাটা ঝেড়ে নিল। খাসনবীশের কেন যেন মনে হল তন্ময় কাঁদছিল। হয়তো এখনও কাঁদছে। ছেলেটা বড্ড বেশি চাপা।

‘জানিনা কতটা বিশ্বাস করবেন। তানির ঘরের ফ্লোরের কিছুটা ক্রিস্টালাইজ হয়ে গেছে। আমার ধারণা এটা টেলিপোর্টেশন-এর একটা এফেক্ট।’

‘আনবিলিভেবল!’ ববিপিন করে চুলগুলো বাঁধতে বাঁধতে হ্যানা বলে ওঠে।

ওদিক থেকে দ্রুত কি বোর্ড টেপার আওয়াজ হল।

‘আপনাদের ট্যাবে ছবিটা সেন্ড করলাম। পুলিশ আসার একটু আগে তুলেছি।’

সবাই রিচার্ডের আট ইঞ্চি ট্যাবটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। একটুখানি লোডিং হয়ে ছবিটা স্পষ্ট হল। কালো সিমেন্টের মেঝে। অফ ফোকাসে চেয়ার, টেবিলের পায়া, বিছানার চাদর ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। আর ফোকাসে সবুজ পান্নার মতো কী যেন চকচক করছে। প্রায় তিরিশ সেন্টিমিটার মতো রেডিয়াসের সিমেন্ট সবুজ ক্রিস্টালে পরিণত হয়েছে।

‘আসলে টেলিপোর্টেশনে পরমাণুগুলো,’ তন্ময় ব্রিফ দিতে থাকে, ‘ভেঙে গিয়ে যেখানে টেলিপোর্ট করা হবে সেখানে গিয়ে আবার জোড়া লাগে। এখন ভাঙার সময় পরমাণুগুলো কিছুটা হলেও শক্তি ছাড়বে। আর সেটা পাশের পরমাণু, মানে যেগুলো টেলিপোর্ট হচ্ছে না সেগুলোকেও অ্যাফেক্ট করবে। এখন ঠিক কীসে এগুলো হয়েছে আমি ব্যাখ্যা দিতে পারব না। আমি বরাবরই কেমিস্ট্রিতে টেনেটুনে পাশ করে আসছি।’

এই অবস্থাতেও সবাই হেসে উঠল।

‘চ্যাটিং এলিয়েন, প্যারাট্রুপিং, আর এখন টেলিপোর্টেশন। ফরগিভ মি। একদিনেই বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে,’ বিড় বিড় করল হ্যানা।

'অসম্ভব কিছু নয়,' কোমরের হোলস্টারটা ঠিক করতে করতে পার্কার বলে উঠল, 'কোয়ান্টাম ফিজিক্সে টেলিপোর্টেশনের কথা বার বার বলছে। নাইনটি এইটে ক্যালিফোর্নিয়ার একটা টিম একটা ফোটন কণাকে তিন ফুট মতো টেলিপোর্ট করতে পেরেছিল। সো নাথিং ইম্পসিবল।

'ওকে, এ সব নিয়ে পরেও ভাবা যাবে। এবার কাজে নামা যাক। তন্ময়, তুমি আমাদের ডাইরেক্সান বল।'

'ওকে,' তন্ময় স্যাটেলাইট ম্যাপটা অন করল। জুউউম... স্টপ।

'অ্যাটেনশন প্লিজ। একটু এগিয়ে গিয়েই একটা নিচু বাউন্ডারি দেওয়া ওয়াল পাবেন সবাই। নিচুই। আশা করি পেরোতে অসুবিধা হবে না। পেরিয়েই পর পর চারটে লম্বা পাথওয়ে মতো আছে। আমার মনে হয় চারজন চারদিক থেকে গেলে ভালো হয়।'

'গুড। লেটস গো!' পার্কার লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন, 'আশা করি সবার কাছে শক গান আছে? সবাই বুঝেসুঝে ব্যাবহার করবেন। আর তানির যেন কিছু না হয়। আই রিপিট, উই নিড তানি উইদআউট এনি কাইন্ড অফ ডার্টি ইনজুরি। রিমেমবার, এটা আর কোনও রিসার্চ টিম নয়। নাউ ইটস আ রেস্কিউ টিম। বোধহয় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম।'

(৯)
(__________)

......একটা অন্ধ করে দেওয়া ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে মাথার কোষে কোষে। কেউ যেন চুলগুলো পেছন থেকে টেনে ধরেছে। প্রচন্ড গতিতে নেমে যাচ্ছে ও। হাত-পা আলগা হয়ে আসছে উলটো হাওয়ার ধাক্কায়।

পড়তে পড়তে শরীরটা মাঝে মাঝে আছাড় খাচ্ছে মেঝের ভাঙা অংশটার সাথে। তার পরক্ষণেই আবার ভেসে উঠছে। আবার আছাড় খাচ্ছে। তার ছেঁড়া একটা লিফটের মধ্যে ও যেন আটকা পড়ে গেছে। সমস্ত চেতনা হারিয়ে যাচ্ছে কালো ঘূর্ণিপাকে। অন্ধকারে।

হঠাৎ, পড়তে থাকা শরীরটা ভাঙা অংশসমেত একটা নরম কিছুর ওপর আছাড় খেল। অন্ধকারগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। চারদিক ঝলসে উঠল সবুজ আলোয়।

নীচে কী? জল?

ভাবার সাথে সাথেই চারপাশের উপচে ওঠা জল ডুবিয়ে দিল ভাঙা মেঝেটাকে। তানির চোখে মুখে জল লাগতেই ব্যথাটা যেন অনেকটা কমে গেল।

মেঝেটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। জায়গাটা অনেকটা আলোকিত সুইমিং পুলের মতো। নিচ থেকে ঠিকরে উঠছে সবুজ আলো। তানি পা দুটো প্যাডেল করার চেষ্টা করল। জলের নিচে হাত পা নাড়ার অনুভূতিটুকু ফিরে এল অনেকদিন পর। তবে সেটা এখন আর ও তেমন এনজয় করতে পারছে না। একটু অক্সিজেনের জন্য ওর ফুসফুস দুটো মাথা ঠুকছে বুকের জেলখানায়। জোরে জোরে কিক মেরে মুখটাকে জলের ওপরে তুলল ও। তারপর পুরোপুরি নিশ্বাস নেওয়ার আগেই আবার ডুবতে শুরু করল। নিশ্বাসের সাথে জল ঢুকে গিয়ে আগুন জ্বেলে দিল মাথার মধ্যে। মাথার পিছনের দিকটা ঝিন ঝিন করে উঠল।

সুইমিং ট্রেনিং-এর পাঁচ বছরের গ্যাপ ডুবিয়ে দিচ্ছে ওকে। ছোটোবেলায় শেখা ফ্রিস্টাইল, আন্ডার ওয়াটার, বাটারফ্লাই সমস্ত কিছু যেন মনে এসেও আসছে না।

সাঁতার একবার শিখলে কেউ ভোলে না।

এই মুহূর্তে বস্তাপচা ডায়লগটাকে ঐতিহাসিক ভুল বলে মনে হচ্ছে তানির!

গায়ের সাথে লেপটে আসা জামাকাপড়গুলো আরও বেশি করে ভারি হয়ে উঠছে। দু'গালে আটকে রাখা নিঃশ্বাসটুকু ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে প্রতি মুহূর্তে। তানি দ্রুত ডুবে যাচ্ছে। ও আবারও হাত-পা ছোঁড়ার চেষ্টা করল। কিছুটা ওপরের দিকে উঠে গেল শরীরটা। কিন্তু, এটুকু যথেষ্ট না। ও অনেকটা ডুবে এসেছে।

আর তখনই তানি অন্ধকারটা দেখতে পেল। নিচ থেকে আসা আলো ঢেকে দিয়ে একটা কালো অবয়ব ওর দিকেই এগিয়ে আসছে! সেটা বড়ো হচ্ছে, আরও বড়ো, আরও....। ওর জিনিসটাকে চিনতে ভুল হল না।

সাঁতার জানা মানুষ কখনও ডোবে না। সে যেভাবেই হোক না কেন!

ও ধরে রাখা নিঃশ্বাসটুকু প্রায় পুরোটাই ছেড়ে দিল। *এতে করে আরেকটু সময় পাওয়া যাবে।* এক সেকেন্ড....দু সেকেন্ড....তারপরই তানি টের পেল ও ওপরের দিকে উঠছে।

ঠিক চার সেকেন্ডের মাথায় মেঝেটা তানিকে নিয়ে আবার জলের ওপরে জেগে উঠল। হাঁপানি রুগীর মতো টেনে টেনে শ্বাস নিল তানি। শীত শীত করছে। কিছুটা জল বমি করে বের করে দিল।

‘ভেরি গুড ডিয়ার।’ ক্যারণের গলাটা আবার ভেসে এল, ‘এই টেস্টটার দরকার ছিল। বিপদের সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া।’

তানি চারদিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেল না। সবুজ জলের ধারাটা সরু হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। আর দু’পাড় জুড়ে জেগে উঠেছে অদ্ভুত এক বন। আসলে বন বললে যার কিছুই বোঝানো হয় না। তার প্রতিটা গাছে, প্রতিটা ডালে, পাতায় খেলা করছে সবুজ আলো! আলোগুলো স্থির নয়। ঢিমে তালে জ্বলা টুনি বালবের মতো কমতে কমতে প্রায় নিভে যাচ্ছে। তার পরক্ষণেই আবার ঝলসে উঠছে গোটা বন।

ভাঙা মেঝেটা জল কেটে নিজে থেকেই এগিয়ে যাচ্ছে। জল কাটার হালকা কল কল শব্দ।

ব্যস, আর কিছু নেই।

তানি ভেজা চুলগুলো মুখ থেকে সরিয়ে পিঠের দিকে ফেলতে গিয়ে অবাক হল। *এর মধ্যে চুল শুকিয়ে গেছে! জামাকাপড় কোথাও এতটুকুও জল লেগে নেই।* তানির মনে হল একটা জলের ফোঁটা ওর কপালের কাছ থেকে রগ পেরিয়ে নেমে যাচ্ছে। সেটা গড়িয়ে যাওয়ার শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছে ও! ঠিক থুতনির কাছের ভাঁজটায় এসে যেন একটু থামল। তারপর তানি আর ওটাকে অনুভব করতে পারল না। শেষতম ফোঁটাটাও উবে গেল। ঠিক অন্যদের মতো!

(১০)

(২৫ ফেব্রুয়ারি, ১১:২৩, নালন্দা, বিহার)

25°08'12"N, 85°26'38"E-এর একটা মন খারাপ করা কালো আকাশের নিচে ভাঙা জিগস পাজলের মতো পড়ে আছে নালন্দা।

অশোক যখন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করেন, তখন এত বিশাল ব্যাপারটা ছিল না। এই জাস্ট ছোটোখাটো, শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা। *দেখাই যাক ছেলে-পিলে টোল ছেড়ে এখানে আসে কিনা!* তা এলো। আর এতই পিলপিলিয়ে আসতে লাগল, যে অচিরেই চিঁড়ে ভেজাতে জলের দরকার হয়ে পড়ল! চলো, বাড়াও জায়গা। এক রাজা এল, একটু বড়ো হল। পরের রাজা এল, আরও বড়ো করল। তারও পরের রাজা আরও ক’টা দাগ কাটল। আশপাশের কুড়িটা গ্রাম থেকে এল ছাত্রদের নাস্তাপানি। এই করতে করতে যখন ৬৩৭ নাগাদ হিউ এন সাং এসে নক করলেন, তখন অলরেডি বিশ্বের বৃহত্তম বিদ্যালয় স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে, অপেক্ষা করে আছে, আরও কিছুটা পরে বক্তিয়ার খিলজির হাতে ধ্বংস হওয়ার জন্য!

কাউচ খুব সাবধানে নিচের ঘরগুলো পেরিয়ে সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠে এল। ওর প্রত্যেকটা পা পড়ছে মিলিটারি ক্র্যাশ কোর্স মনে করে করে। এলোমেলো চুলগুলো প্যারাট্রুপিং-এর ধাক্কায় এখনও খাড়া হয়ে আছে। না, এলিয়েনের ব্যাপারটা এখনও মানা যাচ্ছে না। কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়! সামনের বিশাল ভাঙাচোরা জায়গাটার দিকে তাকাল। নাইট ভিশনে হালকা সবুজ হয়ে জেগে আছে সব কিছু।

নিচের ঘরগুলো আগের রাজাদের। পরে ওগুলো বুজিয়ে, ওর ওপরই আবার বড়ো করে ঘর করা হয়। কাউচ এখন আছে ছাদের লেভেলে। মোটা দেওয়ালগুলো রাস্তার কাজ করছে দিব্যি।

'ঘরের ছাদগুলো গেল কোথায়?' নিজের মনেই বিড়বিড় করল কাউচ।

'কাঠের সাপোর্ট ছিল,' কাউচ প্রায় লাফিয়ে উঠল। তার পরক্ষণেই কী হয়েছে বুঝতে পেরে দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। হেডসেটে তখনও তন্ময় বলে চলেছে, '......আগুন লাগার সময় কাঠ পুড়ে গিয়ে ছাদ ধ্বসিয়ে দিয়েছে।'

'আগুন?' কিছুটা নিজেকে সময় দিতেই প্রশ্ন করল কাউচ।

'হ্যাঁ, বক্তিয়ার খিলজি,' তন্ময় বলে চলে, 'এখানে তিনটে বড়ো বড়ো লাইব্রেরি ছিল, 'রত্নদধি', 'রত্নসাগর', 'রত্নরঞ্জক'। রত্ন মানে হচ্ছে গিয়ে.... জুয়েল ধরো। ট্রেজার। তো গাধাটা ভেবেছিল এগুলো এখানকার রত্নভাণ্ডার বোধহয়। তারপর এসে যখন কিছু পেল না, তখন আগুন জ্বেলে দিল। খবর পেয়ে অবশ্য প্রায় সব ছাত্র অধ্যাপকদেরই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নালন্দা বাঁচল না। শোনা যায় পুরো তিনমাস ধরে নাকি আগুন জ্বলেছিল। সব শেষ।'

'ভেরি স্যাড!'

একবার মাথা ঘুরিয়ে বাকিদের দেখবার চেষ্টা করল ও। দুটো পাঁচিল পরে খাসনবীশকে দেখা যাচ্ছে। আর কাউকে দেখতে পেল না। নখগুলো একটু চিবোল। তারপর টেনশন কাটানোর জন্যই যেন জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এখানে স্কলার ছাড়া এমনি নর্মাল স্টুডেন্টদের পড়তে তো নিশ্চয় প্রচুর খরচ হত?'

'এখানে শুধু স্কলাররাই পড়ত,' তন্ময় যেন ইতিহাস খুলে বসে আছে। সব উত্তর যেন ওর আলজিভে জমা আছে। শুধু জিভে আনার অপেক্ষা!

'মিন?'

'মানে এখানে আপনি রাজা না ফকির সেটা দেখা হত না। নালন্দার চারটে গেটওয়ে ছিল।'

'ওদিকের এনট্রানস-টা?'

'না। ওটা পরে দেওয়াল কেটে বানিয়েছে। প্রধান দরজাগুলোর একটাও পাওয়া যায়নি। হ্যাঁ, তো সেই প্রত্যেকটা গেটে একজন করে প্রফেসর থাকতেন, তাকে বলা হত দুয়ারপাল। সে আপনাকে দশটা প্রশ্ন করবে। টেন আউট অফ টেন হলে, ইউ আর ওয়েলকাম। এক কথায় আপনি লটারি পেয়ে গেছেন। থাকা, পড়া, খাওয়া সব একদম ফ্রি!'

'উয়াও গ্রেট!'

উত্তরে তন্ময় আর কিছু বলল না। কাউচের মনে হল ছেলেটা আসলে কথা বলে হালকা হতে চাইছে। ওর জুলির কথা মনে পড়ে গেল। কতদিন সামনাসামনি দেখা হয়নি। ওর সোফার হাতলের ওপর বসে চোখ বড়ো বড়ো করে যখন নাসার গল্প শোনে, ফায়ারপ্লেস থেকে কিছু আগুন এসে যেন ধরা দেয় নীল মণির অনেক ভেতরে। কাউচের মনে হয় ওই চোখ দুটো আরেকবার দেখার জন্য ও কবর থেকেও উঠে আসতে পারে। তন্ময়ও নিশ্চয় তানিকে খুব ভালোবাসে।

আমার সাধ্যের মধ্যে থাকলে, আমি সেটা ২০০% করব। মনে মনে ঠিক করে কাউচ।

'হেই চ্যাম ডু ইউ নো? আই জেলাস উইথ ইউ!'

'কেন!' তন্ময় সত্যিই অবাক।

'আরে এই বয়সে পার্কারের মতো একজনের প্রশংসা! যে সে জিনিস নয়। আজ অবধি আমাকেই একটা ভালো কমপ্লিমেন্ট দিল না!' নিজেই হাসল কাউচ।

তন্ময় বাকিদের কমিউনেটরগুলো অফ করে দিল। এখন শুধু কাউচই ওর কথা শুনতে পাবে। বড়ো করে একটা নিশ্বাস নিল। তারপর কথার সাথে ফিরতি নিশ্বাসটুকু মিশিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আসলে ওটা আমার কাছে কোনও কমপ্লিমেন্টই নয়। কিছুটা নিন্দা বলতে পারো।'

'হোয়াট! আর ইউ ক্রেজি?'

'বলতে পারো। আমি অন্যভাবে ভাবতে ভালোবাসি,' ওর গলা আগের মতোই শান্ত, 'উনি বলেছেন, এই বয়সে এত কিছু করা বা জানা সত্যিই খুব বড়ো ব্যাপার। মানে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে বয়সটা, এগুলো করা বা জানা নয়। আমি যদি আরেকটু বড়ো হতাম তাহলে এগুলো কোনও ব্যাপারই ছিল না! তাই তো? দ্যাট মিনস আমি আমার বয়সটাকে ওভারকাম করতে পারিনি,' তন্ময় একটু থামল। তারপর আবার বলল, 'যেদিন লোকে বয়স না দেখে শুধু আমার কাজটুকু দেখবে, সেদিন সত্যি সত্যিই আমি সাকসেস পাব। বয়সের দোহাই দিয়ে আমার ভুলত্রুটিগুলো ইগনোর

করে যাওয়া, একরকমের অপমান। লোকে তো আমার কাজটা দেখবে। ওখানে তো আর আমার বয়সটা লেখা থাকবে না।'

কাউচ কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না।

'না, সব মিটে গেলে আমাকেও বসতে হবে দেখছি।'

একবার ঘড়ির দিকে তাকাল।

'ওয়েল, যতদূর মনে হচ্ছে গোটাটা চেক করতেই রাত কাবার হয়ে যাবে।'

'হওয়ার তো কথা। শুধু ঘরই আছে ১০০০ মতো। বাকি ৯০০০ অবশ্য এখনও মাটির নিচে। তারপর আছে ক্লাসরুম, মন্দির, স্নানাগার। তুমি...ইয়ে তুমি করেই বলছি। এখন আছ হোস্টেলে।'

'ইটস অল রাইট। বাট তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ? স্যাটেলাইট থেকে!'

'ডেফিনিটলি নট। স্যাটেলাইট থেকে ম্যাক্সিমাম লোকেশন অবধি দেখা যায়। আরেকটু জুম করলে হয়তো তোমার মাথাটা ডটেড দেখাবে। আসলে তোমাদের কাঁধে লাগানো মিনি ক্যামেরাগুলোতে একটা করে জিপিএস ফিট করা আছে। ওটা থেকেই তোমাদের ক্যামেরার ভিউগুলোও পেয়ে যাচ্ছি।'

'উয়াওও। এটাও হ্যাকড!'

'রেন্টেড...'

'ওকে ওকে। তন্ময়, আমার যতদূর মনে হয় তুমি এখন VISON 00056-এর স্যাটেলাইট-টায় আছ। তোমাকে যে কোডটা দেখাচ্ছে, সেটা ডিকোড করলে এটাই পাবে। কিন্তু এখন অত টাইম নেই। এটা নাসা আর ইসরোর একটা জয়েন্ট প্রোজেক্ট, আর আমার যতদূর মনে পড়ছে, ওতে একটা থার্মাল ভিউ সিস্টেমও ইনস্টল করা আছে। তুমি একটু ওটা অ্যাকটিভ করার চেষ্টা কর, কিছু হেল্প হলেও হতে পারে......'

****

নালন্দা থেকে ঠিক ৪০৮ কিলোমিটার দূরে বসে তন্ময় আবার স্যাটেলাইট ভিউটা অন করল। ম্যাক্সিমাম জুম অবধি গিয়ে সাদা-কালো টপভিউটার একটা স্ক্রিনশট নিল। তারপর সেটাকে পাঠিয়ে দিল পাশের ট্যাবে। আরও কিছুটা জুম হল। *না, কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।*

ঘরটা এখনও অন্ধকার। চিলেকোঠার ঘররা বেশি আলো সহ্য করতে পারে না। নিচের ঘরগুলোয় মা-বাবা জেগে আছে। থানা, পুলিস, মিসিং ডায়েরি, খবর জানতে চাওয়া ফোন......... ঘুম আজ এ বাড়িতে আসবে না।

তিন জোড়া চোখ শুধু ভিজবে। দু'জোড়া নির্মম অসহায়তায়, আর একজোড়া স্ক্রিনের নীল আলোর সতর্কতায়।

ওয়ার্ম ক্যামটা অন হতেই নালন্দার পুরো নকশাটা ঢেকে গেল লাল আর হলুদ-সবুজ ছোপ ছোপ দাগে।

যার যেমন উষ্ণতা তার তেমন রঙ। TATS-এর পাঁচজনকে দিব্যি দেখা যাচ্ছে হালকা লালে। কিন্তু সবথেকে বেশি যেটা নজরে পড়ছে সেটা হল বিশাল একটা লাল ছোপ!

'ও মাই গড!'

তন্ময় স্পিকারটা মুখের কাছে ধরল। বাইরে কোথাও একটা কোকিল ডেকে উঠল। অসময়ে!

****

'অ্যাটেনশন প্লিজ,' দূরে দূরে থাকা পাঁচটা হেডসেট একসাথে ডেকে উঠল, 'আমি বড়ো মন্দিরটার কাছে একটা বিশাল এনার্জি সোর্স দেখতে পাচ্ছি। আই থিঙ্ক আমাদের সবাইকে ওখানেই যেতে হবে। আমি সবার ট্যাবে......'

কাউচ সামনেই অর্ধেক ভাঙা মন্দিরটা দেখতে পেল। *ওখানে কিছু তো একটা হচ্ছেই।*

ও হাঁটার গতি বাড়াল। তারপর দৌড়তে শুরু করল।

(১১)

সবুজ জলের ঠিক মাঝখানে ভাসতে থাকা একটুকরো মেঝের ওপর চুপচাপ বসেছিল তানি। ভেলাটা একই ভাবে এগোচ্ছে। আশেপাশের জঙ্গল জুড়ে চলছে আলো জ্বলা-নেভার খেলা। গাছের শিরা-উপশিরা দিয়ে সবুজ জলের আসাযাওয়া দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

প্লিজ এবার এটা শেষ হোক। ইটস এনাফ...

হঠাৎ সমস্ত আলো নিভে গেল। *অন্ধকার।* তারপর যেন খুব ভয়ে ভয়ে হালকা একটা কালচে সবুজ আভায় জেগে উঠল জায়গাটা। আলোটা এখন স্থির।

এ সবের মানে কি?

মন দিয়ে ভাবার চেষ্টা করল তানি। সবথেকে মাথা ধরানো আর্ট ফিল্মটার থেকেও এগুলো কয়েক কাঠি ওপরে।

সামনে একটা ডাঙা মতো জায়গা দেখা গেল। তানি উঠে দাঁড়াল। মেঝেটা ডাঙার কাছাকাছি এসেই যেন দূরে যেতে শুরু করেছে। এক মুহূর্ত দেখে নিয়েই লাফ মারল। সেটা তখনও বেশি দূর যায়নি। তানি পাড়ে এসে নামতেই মেঝেটা ডুবে গেল!

তাহলে ওটার ডিউটি এতটুকুই ছিল!

জায়গাটা একটা ছোটোখাটো মাঠের মতো। এখানে গাছপালা-ঘাস কিছু নেই। অন্ধকারে চোখটা সয়ে যেতেই ওর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে উঠল। এটা আসলে একটা দ্বীপ। দূরের গাছগুলো থেকে খুব অল্প একটু আলো এসে পড়ছে এদিকে।

এটা আবার কত নাম্বার নরক!

তানি এদিক-ওদিক তাকাতেই কিছু একটা টের পেল। চোখের কোণায় কিছু ধরা দিয়েই সরে গেল যেন। ও সাথে সাথে ঘুরে তাকাল। কিছু একটা এগিয়ে আসছে। অন্ধকারের থেকেও কালো, ধোঁয়ার চেয়েও ঝাপসা।

তানি নড়ল না। পিঁপড়ের একটা ছোটোখাটো দল যেন পিঠ দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ঘাম হয়ে!

মাটি থেকে ফুটখানেক ওপরে কিছু একটা নাড়াচাড়া করছে। সবুজ আলো পিছলে পড়ছে তার শরীরে।

ওটা আরও এগিয়ে এল। একজন মানুষ। লোকটাকে ঠিক ঠিক ভাবে চিনতে পারল তানি। একটু আগেই দেখেছে, ওর নিজের ঘরে। ওর জানলার সাথে হেলান দেওয়া বিছানায়। ভয়ঙ্কর চোখদুটো এখন আর দেখা যাচ্ছে না। চোখ বন্ধ।

'Welcome dear,' ক্যারণ ডেকে উঠল ওর মাথার মধ্যে।

'তুমি?.....' সামনের লোকটার দিকে আঙুল তুলল তানি। লোক বলা বোধহয় ভুল হবে। ভালো করে দেখে বুঝল, ওর বয়সিই একটা ছেলে।

'না ডিয়ার। ওটা আমি নই। তবে চিনে রাখো। ও আজ থেকে তোমার এবং তোমাদের ঈশ্বর হতে চলেছে। আর মাত্র কিছুক্ষণ।'

কিছুক্ষণ মানে? এটা সিনেমার ট্রেইলার নাকি? হাড্ডাহাড্ডি অ্যাকশনের শেষে একটা লেখা উঠে এসে বলে দেবে, পিকচার আভি বি বাকি হ্যায়! আর কয়েকটা দিনের অপেক্ষা। কামিং সুন! তানির মনে হল ওর মাথাটা বোধহয় ঠিকঠাক কাজ করছে না। সে জন্য ক্যারণের কথা উলটোপালটা মানে বের করছে।

'তুমি ঠিকই শুনেছ ডিয়ার,' গলাটা এখন অনেক বেশি জোরালো। কেউ যেন বড়ো হলঘরে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে চিৎকার করছে।

'তোমাদের ওই চার হাত, দশ হাতের বা হাতে পেরেক লাগিয়ে ঝুলে পড়া নকল ভগবানের এক্সপায়ার ডেট পেরিয়ে গেছে। এবার তারা শেষ।

'আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ এখন আর হবে না। আমরা আগেও এসেছি। দেখেছি। ভেবেছি তোমরা নিজেদের শুধরে নেবে। হাজার বছর আগে যখন শেষ আসি, তখনও তোমরা এতটা বিগড়াওনি। ধর্মের নামে পাগলামি থাকলেও মানুষে মানুষে বিশ্বাস ছিল। আমরাও তোমাদের বিশ্বাস করেছিলাম। তোমাদের মতো করে থাকতে দিয়েছিলাম।

'রেজাল্ট? দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ। ওজন স্তরে ফুটো....স্রেফ লোভে পড়ে নিজেদের গ্রহেরই কত কত জীবজগৎ মুছে দিলে! কী, না তোমাদের মস্তিষ্ক একটু উন্নত! তাও যদি পুরোটা হত। 'মাত্র ৩০০০ বছর আগের একটা ভাষায় বার্তা পাঠিয়েছিলাম। সেটা উদ্ধার করতেই কয়লা হয়ে গেলে!'

তানির মাথা যন্ত্রণাটা আবার শুরু হয়েছে। কথাগুলো এসে ধাক্কা দিচ্ছে ওর সারা শরীরে। ও খুব কষ্ট করেই মুখ খুলল, 'আমরা মরি, ধ্বংস হই তাতে তোমাদের কী?' এইটুকু বলেই যেন হাঁপিয়ে গেল তানি। ক্রি ক্রি করে একটা উদঘট শব্দ হল। *ক্যারণ হাসছে!*

'ডিয়ার তানি, বল দেখি, একটা বনে ২০টা বাঘ আছে,' ক্লাস টু-এর বাচ্চাকে অঙ্ক শেখানোর মতো করে শুরু করল ক্যারণ, 'হরিণ আছে ১০০টা। বাঘ হরিণ খায়, হরিণ পাতা, ঘাস এসব খায়। এখন আমি সব ক'টা বাঘকে সরিয়ে দিলাম। তাহলে কী হবে?'

তানির একটু অস্বস্তি হল। *আমি লজিকের ফাঁদে পড়ে গেছি!* কোনও রকমে বলল, 'হরিণগুলো সংখ্যায় বাড়বে। আর ক'দিনেই পুরো জঙ্গলটা খেয়ে ফেলবে।'

'কারেক্ট!' ক্যারণের গলায় জ্যাকপট জেতার আনন্দ, 'ইকোসিস্টেম। বাস্তুতন্ত্র। এবার জঙ্গলটার জায়গায় পুরো ইউনিভার্সটাকে ধরো। মহাকাশেও বিলিয়ন বছরের পুরোনো একটা ইকোসিস্টেম টিঁকে আছে। তোমার আই কিউ এই কনসেপ্ট ধরতে পারবে না। এটুকু বুঝে নাও, একটা চেন অনেক ঘুরে ঘুরে সবকিছুকে লিংক আপ করে আছে। একটা ধ্বসে গেলেই পুরো চেনটাই নড়বড়ে হয়ে যাবে।'

গলাটা থামল। তানি দেখল ছেলেটার পিছনের দিকে আলো জ্বলে উঠল। আলোটা ওপরে উঠছে। ছেলেটার আঁকাবাঁকা ছায়াটা বড়ো হতে হতে যখন তানির পা পর্যন্ত এসে থামল, তখন ও আলোর উৎসটা দেখতে পেল।

একটা মিনি সূর্য যেন। মডেল। ছেলেটার মাথার একটু ওপরে এসে সেটা থামল।

'আমাদের শরীর নেই। আমরা শক্তি। আমরা আলো, আমরা অন্ধকার। ক্যারণ।'

ভাঙা রেকর্ডের মতো কথাগুলো আবার বেজে উঠল তানির মাথায়।

ক্যারণ! তানি ভাবার চেষ্টা করল। সন্দেহ নেই শব্দটা ওর মেমরি থেকেই এসেছে। ক্যারণের পাঠানো ভাবনাগুলোর হয়তো খুব দুর্বল একটা অনুবাদ। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। দাদার কাছে শোনা। দাদার হাজারটা হবির মধ্যে একটা হচ্ছে গ্রিক মাইথলজি। ওই বলেছিল স্টিক্স নদীর মাঝি হল ক্যারণ। গ্রিক মতে স্টিক্স নদী আলাদা করে রেখেছে পৃথিবীর উপরিভাগ আর অন্তরভাগ। পাতাল এবং নরক। আলো ও অন্ধকার।

চমৎকার অনুবাদ! এর চেয়ে ভালো কিছু নাম হতেই পারে না। এই বডিলেস আর একেবারেই লজিকলেস জিনিসটার।

ক্যারণ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার যেন হেসে উঠল, 'লজিকলেস বলে কিছু হয় না ডিয়ার। যুক্তি ছাড়া আমরা কিছু বুঝি না। আমাদের সিস্টেমেও নেয় না। অনেক অনেক আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই তোমাদের মতো নানান যুক্তিহীন জিনিস নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে সময় নষ্ট করত। পরে আমরা নিজেরাই এর পরিবর্তন আনি। এখন আমরা চাইলেও যুক্তিহীন কিছু করতে পারব না। সিস্টেম বিদ্রোহ করে বসবে। আমরা লজিক থেকে শক্তি পাই। সে নিজের হোক কি অন্যের। এখন যেমন তোমার চিন্তাভাবনা থেকে পাচ্ছি।'

তানির সারা গা শিরশির করে উঠল। অর্ধেক বোঝা কথাগুলো যেন চারদিক থেকে ছেঁকে ধরল ওকে। আলোটা যেন আরও বেড়ে গেছে।

'এই শরীর না থাকাটাও একটা সমস্যা এখানে। এভাবে তোমাদের মতো শরীরসর্বস্ব জীবের ভগবান হওয়া মুস্কিল। তোমাদেরও মাটি পাথরের হাত-পাওয়ালা ঈশ্বর দেখে দেখে অভ্যাস। তাই একটা শরীরের দরকার। এ হবে আমার ছায়া, আমার রেখে যাওয়া জ্যান্ত ভগবান।'

তানি ছেলেটার দিকে তাকাল। সেই থেকে একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও সাড় নেই। বুকের ওঠানামা নেই। শুধু পোড়া কাঠের একটা ছায়া।

'কিন্তু এখানেও আরেকটা সমস্যা আছে। ওর সব আছে। শরীরে যথেষ্ট শক্তি, প্রকৃতিকে চেনার ক্ষমতা, ষষ্ঠেন্দ্রিয়। আমাকে শুধু ওর মাথার চারটে অংশই অ্যাকটিভ করতে হবে। বললাম না, তোমরা নিজেরাও জানো না তোমাদের ব্রেন একেকটা ম্যাজিক বক্স। টেলিপোর্টেশান, টেলিকাইনেসিস, টেলিপ্যাথি, হিপনোটিজম.... কী হয় না! জানলে খুশি হবে তোমাকে এখানে আনার সময় প্রায় কিছুই করতে হয়নি। জাস্ট তোমার ঘুমন্ত কয়েকটা সেল-কে দু'সেকেন্ডের জন্য জাগিয়েছিলাম। বলা যায় তুমিই আমাকে লিফট দিয়েছ!'

ক্যারণ একটু থামল। তানি আপ্রাণ চেষ্টা করছে মাথায় যেন কোনওরকম চিন্তা না আসে। ওর ভাবনাচিন্তা সবকিছু চলে যাচ্ছে ক্যারণের দখলে। শক্তি হয়ে!

'কিন্তু ওর যেটা নেই, সেটা হল আই কিউ! সারা পৃথিবীর ডাটা ধরার মতো ব্রেন স্ট্রাকচার ওর নেই,' ক্যারণ আবার শুরু করে, 'ব্রেন স্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য ছোটো থেকে অনুশীলন দরকার। অঙ্ক প্র্যাকটিস, এমনকি আঁকা গান যে কোনও ধরনের ক্রিয়েটিভ এক্সারসাইজ। ওর সেটা নেই। তোমাদেরই বানানো সমাজ। একদল পড়তে বিদেশ ছুটছে। আরেকদল পাঠশালা অবধিও পৌঁছচ্ছে না। অকাট মূর্খ। সো আই নিড ইওর আই কিউ। জন্ম থেকে এখন অবধি হয়ে আসা সমস্ত স্মৃতি, লজিক সব। এটা একধরনের মেমরি চার্জার সিস্টেম বলতে পারো।'

তানি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ওর সমস্ত কিছু দিয়ে চিৎকার করে উঠল। আর সাথে সাথেই মনে হল, সামনের দৃশ্যগুলো যেন ছিঁড়ে দু'ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। আগের সেই গুহা মতো ঘরটা দেখতে পেল এক ঝলক। এখন আর ঘরটার ছাদ নেই। ও ভাসতে ভাসতে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

'তানি.....' বালিশ চাপা দেওয়া একটা গলা যেন ডেকে উঠল দূর থেকে। ও সাড়া দিতে চাইল। পারল না।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই ছেঁড়া অংশটা আবার জুড়ে গেল। আবার দূরের কালচে সবুজ বন, হবু ঈশ্বরের মাথায় জ্বলতে থাকা ক্যারণ!

আমি আসলে এখানে নেই। এর কোনওটাই সত্যি নয়। চিন্তাটা যেন গিলে খেল তানিকে। ওর হাতের তালুগুলো ঘেমে উঠল। মাথার শিরা ফেটে পড়বে যেন।

‘দৃশ্যগুলো শুধু মিথ্যে ডিয়ার,’ ক্যারণ বলে উঠল, ‘কারণ তোমার শরীর তোমারই কাছের কয়েকজনকে সরিয়ে দেবে। ওসব তোমার না দেখাই ভালো। মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অনেকসময় আই কিউ-তে এফেক্ট করে। ইমোশন খুবই বাজে জিনিস। তোমার আই কিউ-র তো কিছু হতে দিতে পারি না।’

‘ওরা কারা?’

‘যারা আমার সম্বন্ধে জানতে চায় আর আমার পথে বাধা হলেও হতে পারে।’

‘TATS!’

‘রাইট। ওরা তোমার হাতেই ফুরিয়ে যাবে। তুমি টেলিকাইনেসিস করতে চলেছ প্রথম ও শেষবারের মতো। তুমি হবে ঈশ্বরের প্রথম সেবক। আর ওরা নতুন পৃথিবীর অল্প কিছু শহিদ....’

(১২)

(২৫ ফেব্রুয়ারি, ১১:৩১, নালন্দা)

গতকালের দিনটাই ছিল সহজতম দিন।

নেভি শিলের পুরনো ফ্রেজটা মনে পড়ে গেল কাউচের। একটা ইটের গম্বুজ মতো কিছুর গার্ড নিয়ে শুয়ে আছে ও। এটা আসলে একটা কবরস্থান। দূর থেকে পড়তে আসা বা পড়াতে আসা ছাত্র অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ মারা গেলে এখানেই কবর দেওয়া হত। যার যা সম্মান সেই অনুযায়ী জ্যামিতি পেত তার ওপরের ফলক। গোল, চৌকো, লম্বা...

কাউচ হালকা করে মাথা তুলল। দূরের ভেসে থাকা অবয়বটা এক ঝলক দেখা গেল। আর ঠিক তখনই একটা আস্ত ইট ছুটে গেল ওর কান ছুঁয়ে। ও মাথা নামিয়ে নিল।

সহজ সময় সত্যিই পেরিয়ে গেছে। আমরা অতীতে বাঁচি না। ভবিষ্যৎ তো আরওই কিছু না। আমরা বাঁচি বর্তমানে। বর্তমানে হাসি, বাস্তবে কাঁদি। লড়িও সেই বর্তমানে।

কট্টর বর্তমান এখন ইট হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। এই ভাঙা ইতিহাসের প্রতি ইঞ্চি আকাশে। প্রত্যেক নোনা ধরা বাস্তবে। শিকারের খোঁজে। *শিকারি হয়ে।*

যখন কাউচ প্রথম এসে পৌঁছল, তখনও এই সব কিছুই শুরু হয়নি। বড়ো মন্দিরের একপাশের ইট সরতে লেগেছিল সবে। যেন অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে সরে গিয়ে পোড়ামাটির ঢেলাগুলো জায়গা করে দিচ্ছিল ভেতরের আলোটাকে।

তারপরই, ইট সরে যাওয়া গর্তটা দিয়ে ভেসে উঠল তানি। হ্যাঁ তানি। কাউচের ওকে চিনতে অসুবিধা হয়নি। ওদের কোর ফাইলে ছবিটা দেখেছে অনেকবার। ওর পা দুটো মাটি থেকে প্রায় ১০ ফুট ওপরে। *ভাসছিল।* ভাসছিল ওর তিনদিক ঘিরে থাকা আলোর বলগুলো।

বাকি চারজনও জড়ো হয়েছিল একে একে। স্পিকারের ওপার থেকে তানির নাম ধরে চিৎকার করছিল তন্ময়। ও আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। পাঁচটা ক্যামেরা দেখাচ্ছে ওর বোন বাতাসে ভেসে আছে। আশেপাশে খেলা করছে মিনি সূর্যের মতো দেখতে তিনটে আলো।

হঠাৎ তানি হাত দুটো ওপরে তুলল। আর তারপরই ব্যাপারটা শুরু হল। ধ্বংসস্তূপ থেকে শ’য়ে শ’য়ে ইট উঠে আসতে লাগল শূন্যে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেগুলো ওদের লক্ষ করে ছুটে এল।

সবাই একেকটা করে গার্ড জুটিয়ে নিয়ে পজিশন নিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে পার্কারের কয়েকটা সাবধানবাণী এসেছে। এখন সবাই শান্ত। একা। কেউ জানে না এরপর কী করতে হবে....

করতে তো হবেই...

কাউচ দ্রুত চিন্তা করে নিল। প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু হল। তারপর সেটাকে পায়ের তলায় রেখে হেডসেটটা অন করল।

‘তন্ময়, আর ইউ ওকে?’

‘হ্যাঁ ঠিক আছি,’ ওদিকের আওয়াজটা যেন ভাঙা ভাঙা।

‘লিসেন, এভাবে বসে থাকলে কিছু হবে না,’ কাউচ ওর ডান কাঁধ থেকে ক্যামেরার ক্লিপটা খুলে নিল, ‘আমি মাথা তুলতে পারছি না। তোমাকে এবার আমার চোখ হতে হবে।’

‘আমি তোমার ট্যাবে ফুটেজ পাঠাব?’ তন্ময় খেয়ালও করল না যে কখন যেন ও কাউচ কে তুমি বলতে লেগেছে।

‘না অত সময় নেই। যা করার এক্ষুনি করতে হবে,’ কাউচ ক্যামেরা ধরা হাতটা পেরিস্কোপের মতো করে উপরে তুলল।

৪০৮ কিলোমিটার দূরে বাকি ক্যামেরাগুলো মিনিমাইজ করে তিন নম্বরটাই ফোকাস করল তন্ময়। এখন ও নিজেকে অনেকটাই সামলে নিয়েছে। তানি ভেসে আছে এখনও। হাত দুটো ব্রাজিলের যিশুর মতো করে দু’দিকে তোলা।

‘হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। তানি এদিকে পিঠ করে আছে।’

‘ওকে, ডিস্ট্যান্স?’

‘২০ মিটার মতো। ত্রিশও হতে পারে।’

‘শিট। এখান থেকে হবে না।’

‘কী?’

‘সামথিং শকিং।’

কাউচ কোমরের ডুয়েল হোলস্টার থেকে রাইসম এক্স 1 -এর শর্ট গানটা বার করে আনল। এটা একটা ভোঁতা মুখের মাল্টি ফাংশনাল স্টান গান। ওটার মুখে একটা কালো প্রবস লাগানো আছে। এইরকম পিঙ্ক, হোয়াইট নানারঙের প্রবস হয়। একেকটার ফাংশন, শক রেঞ্জ একেক রকম। ও কালো প্রবসটা খুলে নিল। *এটা ক্ষতিকর হতে পারে।* তারপর তার জায়গায় একটা ইয়েলো প্রবস সেট করল।

গান চেকড।

ও বুকে ভর দিয়ে কিছুটা পিছিয়ে এল। গম্বুজটা এখনও ওকে আড়াল করে রেখেছে। *আরেকটু।* এবার তানিয়ার মাথাটা দেখা গেল। কাউচ থামল কিছুক্ষণ।

‘তুমি কী করতে চাইছ?’ তন্ময়ের গলায় স্পষ্ট বিস্ময়।

‘তেমন কিছু না। হাজার হাজার স্কলাররা যে পথে হেঁটেছে সেটা দিয়ে একটু হাঁটব ভাবছি।’

ঠিক বাঁ পাশের নিচের দিকে একটা ঘর দেখতে পেল কাউচ। ডান পা’টায় চাপ দিয়ে শরীরটাকে একটা ভল্ট দিয়ে ঘরের কিনারার কাছে নিয়ে গেল। তারপর পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়ল ঘরের ভেতরে।

ঘরটা ছোটোই। একটা বেদি, প্রদীপ রাখার জায়গা আর ছাদ থেকে ঢালু হয়ে নেমে আসা ভেন্টিলেটর। সামনে বাইরে যাওয়ার দরজা। তারপর একটা ছাদ ছাড়া লন টানেলের মতো সামনের দিকে চলে গেছে।

কাউচ লন ধরে এগোতে লাগল। মাথার অনেকটা ওপরে তারার মতো ভেসে আছে টুকরো টুকরো ইট। একবার পড়তে লাগলে স্যাং কাউচের ইতিহাস হতে এক সেকেন্ডও লাগবে না।

‘তন্ময় আমাকে পজিশন বল। তুমি কি ওকে দেখতে পাচ্ছ?’

‘হ্যাঁ, থার্মাল সাইটটায় ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওই লাইট বলগুলো হিউজ পরিমাণের হিট রিলিজ করছে। তুমি ওখান থেকে লেফট নাও...’

বাঁকটা ঘুরতেই তানিকে দেখতে পেল কাউচ। একইভাবে বাতাসে ভেসে আছে। চোখ দুটো বন্ধ। এক মুহূর্তের জন্য জুলির বড়ো বড়ো চোখগুলো ভেসে উঠল। ওর গল্প চাই, যে গল্প বইতে থাকে না।

এই গল্পটা তোর জন্য জুলি।

কাউচ স্টানগানটা তুলল। ট্রিগার টিপতেই হিসসস করে তার সমেত ইয়েলো প্রবসটা ছুটে গেল তানির দিকে। পেন হয়ে, একটা নতুন গল্প লিখতে.......

(১৩)

তানির মনে হল কেউ যেন ওকে ধরে প্রচণ্ড জোরে একটা ঝাঁকুনি দিল। একটা ঝিনঝিনে ব্যথা পিঠ থেকে ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। বাজে পিকচার টিউবওয়ালা টিভির মতো সমস্ত দৃশ্যটা যেন কেঁপে উঠল। তারপর সমস্ত কিছু অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

নিকষ কালো অন্ধকার...

হঠাৎ তানি টের পেল ও চোখ বন্ধ করে আছে। *আরে ঠিকই তো!* ও সাথে সাথে চোখ মেলল। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারল না। একটা ভাঙা মতন জায়গা। কয়েকজন ছায়া ছায়া মানুষ। ওরা অনেকটা নিচে। আর ঠিক তখনই

খেয়াল করল ওর পায়ের অনেকটা নিচে মাটি দেখা যাচ্ছে। *আমি ভেসে আছি!* আর তিনটে আলো তিনদিক থেকে ঘিরে আছে ওকে। তিনজন ক্যারণ!

'তানিইই...'

নিচ থেকে একটা গলা উঠে এল।

'দাদা!'

'তানি, ভয় পেও না। আমরা...' *খাসনবীশ স্যার!*

এটা TATS-এর টিম! তানি কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলল। পারল না। মাথার যন্ত্রণাটা আবার ফিরে এসেছে। লক্ষ লক্ষ ছারপোকা যেন চেটেপুটে সাফ করে দিতে চাইছে মাথার সমস্ত ঘিলু। চুলগুলো গোড়া থেকে উপড়ে আসতে চাইছে যেন।

চোখের পাতায় প্রচণ্ড জ্বালা অনুভব করল তানি। মাথার রগ দুটো চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলো ও।

কেউ যেন জোর করে ওর চোখ দুটো বন্ধ করে দিতে চাইছে। তানি আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ও দেখল না, ওর চিৎকারের সাথে সাথে হাওয়ায় ভেসে থাকা সমস্ত ইট পড়তে শুরু করেছে। ও জানল না শেষ মুহূর্তে সরে গেলেও একটা ইট প্রচণ্ড জোরে আঘাত করেছে একজনের বাঁ কাঁধে। আর ও জানল না একটু আগে কাউচের স্পিকার থেকে চিৎকার করে ওঠা ওর দাদা চারদিক থেকে এখনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। অসহায় ভাবে।

মাটি থেকে দশ ফুট ওপরে ভেসে থেকে আবার চোখ বন্ধ করল তানি।

অন্ধকারে পুরোনো দৃশ্যগুলো ফিরে এল। ছেলেটার মাথার ওপর দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠেছে ক্যারণ। তার তেজ বাড়ছে। ওদিকে আর তাকানো যাচ্ছে না। বাতাস ভরে উঠছে মৃত ব্যাকটেরিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধে।

হাত দিয়ে চোখ দুটোকে আড়াল করল ও।

'এবার এটা শেষ করার সময় হয়েছে,' ক্যারণ চিৎকার করে উঠল মাথার মধ্যে।

হুট করে কোথা থেকে সাদা আলোর ঝাঁক ভেসে এল। কেউ যেন একটা বিশাল ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলল সব কিছু।

একেই কি হোয়াইট আউট বলে?

নিজের ছায়াটুকুও দেখতে পেল না তানি। তারপর কোত্থেকে যেন গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার এসে সামনে জমাট বাঁধল। ওগুলো একটা আকার নিচ্ছে। থ্রিডি পাজল যেন খাপে খাপে লেগে দ্রুত তৈরি হচ্ছে। সেই ছেলেটা। সে আর স্থির নেই। এগিয়ে আসছে তানির দিকে।

'সময় হয়ে গেছে,' আবার গমগম করে উঠল ক্যারণের গলা, 'মহান কাজের জন্য সামান্য কিছু ক্ষতি।'

তানি বেশ বুঝতে পারছে আসলে *সব শেষ।* ছেলেটা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ওর গায়ের বন্য গন্ধ নাকে যেন আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। তানি পিছিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু তার আগেই শক্তপোক্ত একজোড়া হাত দু'পাশ থেকে এসে চেপে ধরল মাথাটা। হৃৎপিন্ড যেন গলার কাছে উঠে এল।

'এক....দুই....তিন.....' একটা ঘড়ি যেন টিক টিক করে কোথাও এগিয়ে চলেছে। *কিছু হবে। এক্ষুনি হবে....*

ছেলেটা চোখ মেলল। চোখের জলে কেউ যেন দু'ফোঁটা সবুজ গুলে রেখেছে। পুরোনো ভয়গুলো দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসছে তানির মধ্যে। অ্যাড্রেনালিন বমি করে ভরিয়ে তুলছে সারা শরীর।

চোখদুটো বড়ো হচ্ছে। তানির সমস্ত সত্তা ঢেকে যাচ্ছে সবুজ অন্ধকারে।

বন্দি অবস্থাতেই প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেল তানির শরীর। তারপর তুলোভরা পুতুলের মতো নেতিয়ে পড়ল, এক পৃথিবীরই অন্য দুই হাতের মাঝে.......

(১৪)

(১১:৪৭ ভারত, কলকাতা)

পাশের বোতলটা থেকে একটু জল নিয়ে চোখে ছেটাল তন্ময়। জ্বালাটা একটু যেন কমল। ও ঘণ্টা দু'য়েকের বেশি কখনওই ল্যাপটপের সামনে বসতে পারে না। তাই আবার অন্ধকারে!

একবার ভাবল টিউবটা জ্বালবে। পরক্ষণেই সেটা বাতিল করল। *অন্ধকার অনেক কিছু ঢেকে দেয়। পাওয়া না পাওয়া সব কিছু।*

ট্যাবের ওপরের শাটার নামিয়ে ব্লু লাইট ফিল্টারটা অন করে দিল। এক ঝটকায় স্ক্রিনের ব্রাইটনেস কমে গেল অনেকটা।

কাউচের ক্যামেরার ফুটেজ দেখা যাচ্ছে। হ্যানা ঝুঁকে পড়ে ওর হাতটা দেখছে এখন। আর বিড়বিড় করে কী সব যেন বলছে। আমি ঠিক আছি মার্কা কিছু একটা বলল কাউচ। উত্তরে চোখ বড়ো বড়ো করে হ্যানা ধমক দিল। পার্কারও মেডিকেল কিট বের করতে করতে কিছু একটা বললেন....

কানে কিছুই যাচ্ছে না তেমন। নিজেকে হঠাৎ করে হেরে যাওয়া মানুষ বলে মনে হচ্ছে তন্ময়ের। যারা শুধু অজুহাত তৈরি করে। সেই সময় বাড়ি না থাকার অজুহাত, নিজের বোনকে বাঁচাতে না পারার অজুহাত.....

হ্যানার কাঁধের ওপর দিয়ে তানিকে দেখা যাচ্ছে। সুতোয় বাঁধা গ্যাসবেলুন যেন। হাওয়া দিলেই উড়তে চাইবে। হয়তো যাবেও। ওড়ার জন্য বোধহয় অজুহাত লাগে না।

আচ্ছা, ঠোঁট দুটো কি নড়ল?

তন্ময় ট্যাবের ওপর ঝুঁকে এল। জুম.......১০ ইঞ্চির স্ক্রিন জুড়ে তানির মুখটা ভেসে উঠল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় যেন সেটা কুঁচকে গেছে। হ্যাঁ, ঠোঁট নড়ছে। কথা বলার জন্য রীতিমত লড়াই করতে হচ্ছে তানিকে।

কথাগুলো বুঝতে তেমন বেগ পেতে হল না। এই খেলাটায় তানি তন্ময়কে ১০০১ বার হারিয়েছে। লিপ রিডিং করে গেস করতে হবে কী বলা হচ্ছে।

তন্ময় এবার জিতে গেল। ঠিক ঠিক ধরে ফেলল কথাগুলো। *ছায়াবাজি!* এই সময় ল্যাপটপের দিকে চোখ গেল ওর। বিশাল লালচে বিন্দুটা ছোটো হতে লেগেছে আচমকাই!

তানি লড়ছে! ওদের বিরুদ্ধে তানি লড়ছে।

তন্ময় এটুকু বুঝল এটা আসলে একটা মানসিক যুদ্ধ। ওকে নিজেকেই লড়তে হবে।

কিন্তু যুদ্ধটা কি সত্যিই ওর একার? বাকিদের কিছুই কী করার নেই! *একটু মেন্টাল সাপোর্ট?*

ও ওর মোবাইলে চৈতালীর নাম্বারটা খুঁজতে খুঁজতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কেউ নিজের স্পিকারটা লাউডে দেবেন? প্লিজ?'

(১৫)

'বলছি তো আমার ভাত খেতে ভালো লাগে না। পচা খাবার।'

বিছানার ওপর তানি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝবেলার ছাপোষা রোদটুকু এসে পড়ে ওর ঝুঁটি বাঁধা চুলে। আলোর ফুল হয়ে ফুটে থাকে ফোলা ফোলা দুই গালে, দুই চোখের মাঝে নাকের শর্টকাটে।

'ও দিদিভাই। রোজ রোজ ভালো লাগে না কিন্তু,' ঠাম্মা এগিয়ে আসে। অল্প কিছু সাদা চুল কাশ ফুলের মতো দোল খায় ফ্যানের হাওয়ায়, 'এই বয়সে এত দৌড়াদৌড়ি কি পারি! লক্ষ্মী সোনা আমার খেয়ে নাও। নইলে দাদাই খেয়ে নেবে কিন্তু।'

'দাদাই তো ইচকুলে।'

'ও বাবা! আচ্ছা গল্প শোনাব না কিন্তু তাহলে।'

'শুনিও না যাও,' তানি ঠোঁট ফোলায়। গালের কাছে লেগে থাকা ভাতটুকু টুপ করে খসে পড়ে। তারপর থালায় এসে মিশে যায় অন্য ভাতদের দঙ্গলে।

'আচ্ছা ঠিক আছে,' ঠাম্মা আরও এগিয়ে আসে। তারপর তানির নাকে নাক ঠেকিয়ে ফিস ফিস করে বলে, 'আইসক্রিম খাওয়াব।'

'প্রমিচ?'

'প্রমিস প্রমিস প্রমিস,' ঠাম্মা নাকটা আদর করে ঘষে দেয়। তানি ঠাম্মাকে জাপটে ধরে।

'ওরে ছাড় ছাড়। পড়ে যাব তো।'

তানি ছাড়ে না। আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। সাদা থানে মিশে থাকে ঠাকুমা ঠাকুমা গন্ধ। আর গন্ধের সাথে মিশে থাকা এক মেয়েবেলার গল্প। যেখানে দু'সেট খেলনাবাটি থাকলেও নিজেকে বিশাল বড়োলোক ভাবা যেত। মার্বেল কমিক্সের সাথে দু'প্যাকেট স্বপ্ন ফ্রি পাওয়া যেত এমনিই!

ঠাকুমা আরও কত কী যেন বলে যায়। হো হো করে হাসে। ঘরের রোদটা যেন বড়ো হয়। উজির প্রোমোশন পায় রাজার সিংহাসনে।

তখনই একটা টান অনুভব করে তানি। ঠাম্মা পিছিয়ে যাচ্ছে। ও আরও জোরে ঠাম্মাকে ধরতে যায়। পারে না। বছর তিনের ছোট্ট হাত আলগা হয়ে পিছলে যায় এক সময়। একটা কালো ছায়া টেনে নিয়ে যায় ঠাম্মাকে। ও ছায়াটাকে চেনে। *খুব ভালোভাবে চেনে।*

পুরো ঘরটা যেন সস্তা দামের কর্পূর হয়ে উবে গেল। আগের চারবারের মতো টুকরো টুকরো হয়ে হারিয়ে গেল পাঁচ নম্বর স্মৃতিটাও। নিমেষেই। তারপর প্রচণ্ড গতি নিয়ে শরীরটা ছুটতে শুরু করল। একটা লম্বা টানেলের মধ্যে দিয়ে কেউ যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দু'দিকে ছুটে চলা অন্ধকার। মাঝে মাঝে ফুটপাতের জংলি ফুলের মতো ফুটে থাকা টুকরো টুকরো স্মৃতি। মস্ত বই-এর মাঝে বুক মার্ক হয়ে ফুটে উঠছে মনের পর্দায়। পরক্ষণেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সবই ক্ষণিকের জন্য।

ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চের ডেস্কের নিচে লুকিয়ে শুকতারা পড়া। কিছু একটা সন্দেহ করে চটি ফটফটিয়ে অনি ম্যাডাম ছুটে আসে। তাড়াহুড়ো করে লুকোতে গিয়ে শুকতারাটা পড়ে যায়। মাটিতে পড়ার আগেই একটা কালো হাত এসে লুফে নেয় সেটা। তারপর হাতটা ধেয়ে আসে তানির দিকে। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় অন্ধকার টানেলে।

আরও একবার। আরও একটা স্মৃতি চলে গেল অন্য কারোর দখলে।

আবার অন্ধকার। ছুটে চলা। ষোল বছরের ধুলো সরে গিয়ে ভেসে উঠতে থাকে টুকরো টুকরো আলোছায়া। সাদা-কালোয়, হলুদে-সবুজে। হিপ্পোক্যাম্পাস ভুলে বেরিয়ে আসে একেকটা মূহুর্ত।

বৃষ্টি ভিজতে ভিজতে এগিয়ে আসা চৈতালীর মুখ। হাত ছুট উড়ে যাওয়া হলুদ ছাতা, গলির ক্রিকেটে কাচ ভেঙে দাদার পালিয়ে যাওয়া....

তানি বোঝে, সব এখন অন্য কারোর। হয়তো অন্ধ পৃথিবীর অদরকারী কিছু ব্লুপ্রিন্ট। সব কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। ক্লাস টেন অবধি হয়ে আসা হাসিকান্না, মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা অভিমান। সব। ও বোঝে এই অন্ধকার, এই ছুটে চলা টানেলের জন্ম ওরই মনের গভীরে। হাওয়ায় আজ খাতা খুলে গেছে। পেনটা শুধু অন্য কারোর হাতে।

চারদিক থেকে একটা চাপ অনুভব করল তানি। *আমাকে কি কেও ধরে রেখেছে?*

ঠিক তখনই অন্ধকার আবার আকার নিতে লাগল। তানি একটা টেবিলে বসে আছে। সামনে কী একটা বই খোলা। তানির সেটা পড়তে ইচ্ছে করল না। গুন গুন করে গান ভেসে আসছে পিছন থেকে, 'তারার পানে চেয়ে চেয়ে...নাই বা আমায় ডাকলে...'

মা! তানির হঠাৎ করে খুব কান্না পেল। *এটাও হারিয়ে যাবে!*

মা অন্য একটা গাও না, নিজের মনেই ভাবল তানি।

'একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে.......'

তানি সত্যিই অবাক হল। *স্মৃতি তবে পালটানোও যায়!*

হালকা হালকা হাওয়া দিচ্ছে। জানলার কাছে রাখা রজনীগন্ধার স্টিকদুটো গান হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে সারা ঘরে।

একটা সময় পর গান থেমে গেল। ঘাসের ওপর বৃষ্টি পড়ার মতো একটা গলা ভেসে এল বাতাসে, 'কি তানি ম্যাডাম, ছড়া মুখস্থ হল? বিকেলে ফাংশনে যেতে হবে তো নাকি?'

তানি মায়ের দিকে তাকাল। আচ্ছা, সব মায়েদেরই কি এত সুন্দর দেখতে হয়? পানপাতার মতো মুখ? পিঠের ওদিকে ঝাঁপিয়ে পড়া ভেজা চুল? ঘামতেলে রঙ করা গায়ের রঙ, কিম্বা টানা টানা ভুরুর মাঝখানে টিপ হয়ে আটকে থাকা সূর্য! সবার থাকে? বোধহয় হ্যাঁ, হয়তো না। এরকম মায়ের জন্য বোধহয় একজনকে তানি হয়ে জন্মাতে হয়। *পৃথিবীতে।*

'দুর, দাদা বলল এই ছড়াগুলোর কোনও মাথামুণ্ডু নেই। এক্কেবারে আনলজিক্যাল।'

'ব্যস, আর আপনিও হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন। এক্সপার্ট ওপিনিয়ন বলে কথা।'

'চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো,
শুঁকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারও...
তুমিই বল, এগুলোর কোনও মানে হয়?'

মা হাসল। তারপর আড়াই ফুটের তানিকে কোলে তুলে নেয়, 'সব কিছুর মানে হয় না সোনা। সবকিছুর মানে খুঁজতে নেই। মজাটাই নষ্ট হয়ে যায়।' তারপর তানির গালটা একটু টিপে দিয়ে বলে, 'বড়ো হ, বুঝবি। মানুষই একমাত্র লজিক ছাড়া, নিজের ভালোলাগা নিয়ে কাজ করতে পারে। আর কেউ পারে না।'

লজিক! আনলজিক! আরে তাই তো! ১৪০ ভোল্টের একটা শকওয়েভ যেন তানিকে ছুঁয়ে গেল। একটু আগে শোনা ক্যারণের কথাগুলো ফিরে এল আরেকবার,

......যুক্তি ছাড়া আমরা কিছু বুঝি না.....সিস্টেমে নেয় না.....সিস্টেম বিট্রে করে বসবে। আমরা লজিক থেকে শক্তি পাই। সে নিজের হোক কি অন্যের.....

ঠিক, আমরা পারি। শুধুমাত্র আমরাই পারি। হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স। তানি আর কিছু ভাবতে চাইল না। ওর ভাবনাগুলো আর নিজস্ব নয়। যা করার না ভেবেই করতে হবে। *অন দ্য স্পট!*

ওদিকে তখন দুলে দুলে ছড়া মুখস্থ চলছে। বারো বছর আগের সিনটা যেন কেউ প্লে করে দিয়েছে। চেনা ছক, চেনা স্ক্রিপ্ট। তানি জানে এর পর কী হবে। একটু পরেই নিশ্বাস ভারি হয়ে আসবে। গা গরম করে জ্বর আসবে প্রচণ্ড। এক সপ্তাহ আর বিছানা ছাড়বে না ও। বিছানা ওকে ছাড়বে না।

'মা, আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। চলো ক্লাবে যাই,' তানি প্রায় চিৎকার করে উঠল।

মা চোখ বড়ো বড়ো করে ফ্যালে, 'ও মা! সে তো সেই সন্ধে বেলায়। এখন গিয়ে ঝাঁট দিবি নাকি?'

'প্লিজ মা, বিকেল অবধি পৃথিবীও বাঁচবে না, আমিও বাঁচব না।'

'হুম বুঝেছি। দাদার থেকে পাকা পাকা কথা আমদানি হচ্ছে। আসুক আজ বাঁদরটা।'

তানি চেয়ারটা ফেলে মায়ের দিকে এগিয়ে গেল। প্রত্যেক পায়ের সাথে সাথে সব কিছু কেমন যেন ছোটো হয়ে আসছে। আড়াই ফুটের শরীরটা লম্বা হতে লেগেছে নিজে নিজেই। মায়ের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াল, তখন মায়ের চেয়েও দু'আঙুল ছাড়িয়ে গেছে। ও মায়ের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল।

মা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়, 'তানি!'

'হ্যাঁ মা, আমিও তানি। তবে ভবিষ্যৎ-এর। আসলে এটাই বর্তমান। মানে....যাক গে তোমাকে বোঝাতে পারব না। শুধু জেনে রাখো, আমার তোমাকে দরকার। আজকের বারো বছর পরের পৃথিবীকে বাঁচাতে তোমার সাপোর্টটুকু দরকার। আমাকে কি বিশ্বাস করা যায় না মা?'

মায়ের চোখটা চিকচিক করে উঠল। তানির হাতের ওপর চাপ বাড়ল অল্প। ঘরটা বড়ো হচ্ছে। তানি অনুভব করল সময় খুব দ্রুত বইতে লেগেছে। ও আর মা ছাড়া ঘরের সব কিছু পালটে যাচ্ছে। *একটু পরেই রাত নামবে।*

ও চোখ বন্ধ করল। এখন শক্তি দরকার। অনেক অনেকটা শক্তি। শক্তি সময়কে পালটে দেওয়ার। নিজের ইচ্ছেমতো! ক্যারণ এখনও চুপচাপ আছে। তানিকে ভাবতে দিচ্ছে নিজের মতো করে। গলার কাছে দাঁতগুলো গেঁথে রাখা পিশাচও চায় শিকার আরও একটু খেলুক। ফাতনা মাছকে খেলিয়ে নিতে চায় গোটা একটা পুকুর। আরও আরও বেশি পাবার লোভ!

ও কি সত্যিই কিছু বুঝছে না! নাকি.. আবারও নিজের ভাবনাগুলো গিলে নিল ও।

একটা পাড়ে এসে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ শুনে চোখ খুলল তানি। পাড়ার মাঠ। ৩৬৪ দিনের চেনা আকাশটা যেমন করে দেওয়ালির রাতে বদলে যায়, ঠিক তেমনি করে ফেস্টুন, বাঁশ আর হ্যালোজেন এসে আজ মাঠটাকে বদলে দিয়েছে। মা ওর হাতে আরও একটু চাপ দিল, তারপর চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে বলল, 'ভয় লাগলে চোখ দুটো বন্ধ করে নিস, কেমন?'

তানি গাল দুটো ফুলিয়ে বলে, 'আমি ভিতু নাকি?'

'দূর বোকা। তুই তো আমার ব্রেভ গার্ল। তাতিয়ানা মানে জানিস তো?'

পিইইইইইই করে মাইকগুলো গর্জে উঠল। তারপর কেউ স্টেজের ওপর থেকে অ্যানাউন্স করল, 'এবার আবৃত্তি পরিবেশন করবে, আমাদের খুদে শিল্পী তাতিয়ানা বসু।'

কয়েকটা হাততালির শব্দ শোনা গেল। তানি এগিয়ে গেল স্টেজের দিকে।

এসব কিছুই সেদিন হয়নি। আজ হচ্ছে। মস্তিষ্কের অজানা কোনও অংশ জাগিয়ে তুলেছে ক্যারণ। যেখানে কল্পনাগুলো সত্যি হয়। অন্তত দেখতে লাগে সত্যির মতো।

সামনে লাইন দিয়ে চেয়ার পাতা। অনেক অনেক মুখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওই তো লাল ফ্রক পরে চৈতালি বসে আছে। তার সামনের চেয়ারে দাদা খালি এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। আরও অনেককে দেখতে পেল ও। দূরে হ্যালোজেন বাল্বটার সাথে মিশে থাকা আলোটাও ওর নজর এড়াল না। ক্যারণ! নিচে পোড়া কাঠের হাত-পাওয়ালা মূর্তি। এত দূর থেকে অবশ্য চোখগুলো দেখা যাচ্ছে না।

'তানি শুরু করো, ভয় পেও না,' উইংসের দিক থেকে ব্যাজ পড়া একজন মেম্বার তাড়া দিল। তানি লোকটাকে চিনতে পারল না। শুধু বুঝতে পারল ওর হাইট আবারও কমে আসছে। তিন বছরের পুতুল পুতুল শরীরটা ফিরে আসছে আরও একবার। একটু পরেই নিচু করে সেট করা মাউথপিসটা নাগালের মধ্যে চলে এল।

এবার সময় এসেছে।

তানি বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিল। দূরে ক্যারণকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। *এটা তোমার জন্য ডিয়ার। দ্যাখো নেওয়া যায় কিনা।*

‘নমস্কার। সুকুমার রায়ের লেখা ছায়াবাজি,’ আধো আধো গলা ভেসে যেতে লাগল দু’গুণ চারগুণ হয়ে। চারিদিকে।

‘আজগুবি নয় আজগুবি নয় সত্যিকারের কথা -
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা…’

তানি বলে চলে। ছায়ার গল্প। ছায়া ধরার এক ব্যবসার গল্প, মেঘের ছায়া চেখে দেখার গল্প। গল্প শিশির ভেজা সাদা ছায়ার। যা ধরতে হলে একজনকে সুকুমার রায় হতে হয়। প্রত্যেক লাইনের সাথে সাথে যেন নরক উঠে আসছে মাঠ জুড়ে। হাওয়ার তোড় বাড়ছে। সামনের চেয়ারগুলো অদৃশ্য হতে লেগেছে একে একে। শুধু হ্যালোজেন কাঁপা কাঁপা রোদ্দুরে জন্ম নিচ্ছিল এক নতুন নাটক। বাতাসের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরছিল তানির গলার স্বর। অন্ধকার দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলছিল আপাত আনলজিক্যাল কিছু শব্দ।

‘কেউ যবে তার রয় না কাছে, দেখতে নাহি পায়…..’ এখন কথা বলতে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে তানিকে। ভেতর থেকে কিছু একটা উঠে এসে ওকে থামিয়ে দিতে চাইছে, ‘….গাছের ছায়া ফুটফুটিয়ে এদিক ওদিক চায়।’

তানি থামে না। একবার বাঁচার আলো দেখতে পেলে বাঘের থাবায় পড়া হরিণও মরিয়া হয়ে ওঠে। *শেষ দেখার জন্য!* পুরো পৃথিবী যেন চেপে বসেছে ওর বুকের ওপর। মাথার শিরা ছেঁড়া যন্ত্রণাগুলো ফিরে এসেছে আরও একবার।

ক্যারণ তার ভুল বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে স্ট্র ডোবানো তরলটা আর অমৃত নেই। ফাতনায় খেলিয়ে বেড়ানো মাছটা হাঙর হয়ে ফিরে এসেছে হঠাৎই। *এগুলো কী? কোনও মানেই তো হয় না!* একটার সাথে আরেকটার কোনও লিংক আপই তো নেই। সমস্ত সিস্টেম অকেজো হয়ে যাচ্ছে নিমেষেই।

শিকার শিকারি হয়ে উঠলে আর ফেরার পথ থাকে না….

‘থামো…..এক্ষুনি….থামো,’ ক্যারণের গলাটুকু যেন ঝড়ের মুখে খড়কুটো হয়ে উড়ে যাচ্ছে। ভেসে যাওয়া মানুষের চিৎকার হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারে। তার জায়গায় চেনা কয়েকটা গলা যেন এগিয়ে এগিয়ে আসছে, ‘তানি লড়ে যা। ইউ ক্যান ডু ইট….চিয়ার আপ মাই গার্ল….. দু’দিনের ফুচকা ট্রিট রইল তানি….’

লাস্টের কথাটা শুনে এর মধ্যেও হাসি পেল তানির। *চৈতালী! পাগলী কোথাকার।*

মট মট করে একটা শব্দ হল। মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়াটা পা-ভাঙা মূর্তির মতো খসে পড়ল। গোটা জায়গাটা যেন একটু কাঁপল। রাতের কৃষ্ণচূড়াগুলো রক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাঠ জুড়ে।

এই সময় তানির আবৃত্তি করা শেষ হল। চোদ্দ আনায় বিক্রি হয়ে গেল স্বপ্নের শিশি। শিশির ওষুধের জাদুতে ঝাপসা পর্দা নেমে আসছে সব কিছুর ওপরে।

তানি দেখল ছেলেটা কিছুটা এগিয়ে এল। এক পা…..দু পা…….। তারপর লুটিয়ে পড়ল। *ধুলোর আরামে।*

(১৬)
(১১:৫৫, কলকাতা)

আমরা জিতছি। হয়তো…

তন্ময় উঠে গিয়ে চিলেকোঠার দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল। যা চেঁচামেচি হচ্ছে! মায়েরা আবার উঠে না আসে।

ওরা তানিকে এই অবস্থায় দেখলে….

তন্ময় ট্যাবটার দিকে তাকাল। তানিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। চেহারার ভাঁজগুলো এখন সমান হয়ে গেছে। অনেকদিন পর এত ভালো করে মুখটা দেখল তন্ময়। *এত বড়ো হয়ে গেছে! কবে হল!* তারপর নিজেই হেসে ফেলল।

ভয়েস ফিল্টারটা অন করে আরও একবার চৈতালীর গলায় চিৎকার করে উঠল ও, ‘কাম অন তানি…..ফাইট…..ফুচকার দিব্যি কিন্তু।’

পাগলীটা এখানে থাকলে এগুলোই বলত হয়তো। তারপর ফিল্টারটা অফ করে নিজের গলায় চিৎকার করল। তারপর মা….. তারপর বাবা……

‘কী মনে হয় তন্ময়, কাজ হবে?’ হ্যানা আর চুপ থাকতে পারল না।

‘আই থিংক সো।’

তন্ময় ল্যাপটপের দিকে তাকাল। বিশাল লাল স্পটটা অনেক অনেক কমে এসেছে। এখন তানির শরীরের উষ্ণতা আলাদাভাবে ধরা পড়ছে থার্মাল সাইটে। আর দেখা যাচ্ছে খুব ছোটো ছোটো তিনটে ডট। আরও ছোটো হচ্ছে। আরও ছোটো….

আমরা সত্যিই জিতছি!

(১৭)

খুব ছোটোবেলায় একবার একটা স্বপ্ন দেখেছিল তানি। কার একটা বাড়িতে বেড়াতে গেছে। সেখানে আছে একটা কুয়ো। ও কী ভাবে যেন সেটার মধ্যে পড়ে গেছে। পড়ছে পড়ছে পড়ছে। অনেক নিচে কালো জলে টলমল করছে নীল আকাশের ছায়া। ও প্রাণপণ চাইছে চোখ বন্ধ করতে। কিন্তু পারছে না। স্বপ্নে বোধহয় চোখ বন্ধ করা যায় না! তারপর জল যখন ঠিক দু'আঙুল দূরে, তখনই সব কিছু থেমে গেল। রিমোটের পজ বটনে আঙুল চলে গেল আচমকাই। তারপর রিওয়াইন্ড। তানি আবার ওপরে উঠতে লেগেছিল। কালোর ওপর নীল দিয়ে কাজ করা আকাশটা দূরে চলে যাচ্ছিল আরও একবার।

হঠাৎ তানির মন কেমন করছিল। ওই অতটুকুনি জায়গার মধ্যে আটকে পড়া আকাশটার জন্য স্বপ্নের মধ্যেও কেমন যেন কষ্ট হচ্ছিল ওর। *কেন কে জানে!*

সেই কুয়ো থেকে উঠে আসার অনুভূতিটা যেন ফিরে এসেছে তানির মধ্যে।

গলি, তস্য গলি, কুটুদার চায়ের দোকানের পিছনের নালিপথ দিয়ে, পূরণ ভাড়াটেদের মেলে রাখা জামা, ক'দিন আগে পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া শাঙ্কু মাসির হাসি হাসি মুখ, আরও আরও হাজারখানেক ফেলে আসা হারিয়ে যাওয়া সময়ের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে টানেলটা। এখন আর তানিকে কেউ টানছে না। ঝড়ে দিক ঠিক রাখা চিলের মতো উড়ে চলেছে নিজে নিজেই। অন্ধকার টানেলটা স্বচ্ছ হয়ে গিয়ে সরে সরে যাওয়া স্মৃতিগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যেন উলটোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া একটা সিনেমার রিল! তানি সেদিকে তাকাচ্ছে না। ছুটতে হলে পিছনে তাকাতে নেই। শুধুই ছুটে চলা। সে ফিনিশিং লাইনে আলো থাক বা না থাক।

খেলে আসার পর ছুঁড়ে ফেলা ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটটা যেমন ঘরের এক কোণে পরেরদিন বিকেল অবধি ওমনিটিই থেকে যায়, টানেলটাও ঠিক সেই একই রকম আছে। যেমনটা যাওয়ার সময় ছিল। এই টানেলটার জন্যও যেন একটু কষ্ট হল তানির, যার পাঁজরে পাঁজরে মিউজিয়ামের মতো করে থরে থরে সাজানো ইতিহাস। কত ভালো লাগা, অভিমানে ভিজে আসা বালিশ। এর জন্ম হয়তো ওরই মাথায়। কোনও এক অসতর্ক কল্পনায়। আজকের পর আর থাকবে না। *কোনও দিন না।*

'তোমরা নিজেদের ধ্বংসের পথ নিজেরাই বেছে নিলে।'

ক্যারণের গলাটা কেমন যেন অন্যরকম লাগছে এখন। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে যেন। তানি ওপরের দিকে তাকাল। মাথার ওপর ক্যারণও ছুটে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। তবে এখন আর সেই তেজ নেই। আলোটা কমে ফ্যাকাসে মতো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কয়েক ঝলক ধোঁয়া বেরিয়ে এসে, হারিয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

তানি হাসল, ‘আমার তো মনে হয় না।’

‘তাহলে তোমার কী মনে হয়? তোমাদের ওই ভগবানরা তোমাদের বাঁচাবে?’

তানি আরও একবার হাসল, ‘আমাদের কোনও ভগবান নেই ডিয়ার। জীবনে চলতে চলতে কয়েকটা সাপোর্টের দরকার হয়। হলে পরীক্ষা দিতে দিতে, প্রথমবার সাইকেল শিখতে গিয়ে, অন্ধকার গলিতে একা ঢোকার আগে, একটা সান্ত্বনার দরকার হয়। না আমি একা নই, ওপরে কেউ আছে। সে ঠিক বাঁচিয়ে নেবে।’ তানি বলে চলে। বহুদিন ধরে মনের আনাচে কানাচে জমে থাকা কথাগুলো যেন বেরিয়ে আসে নিজে নিজেই। যেগুলো কোনওদিন কাউকে বলা হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি সাহস পায়নি। যদি লোকে পাকা বলে!

‘এটা আসলে একটা শক্তি। আমাদের মধ্যেই থাকে। শুধু সেটা বের করে আনতে একটা চার হাত, দশ হাতওয়ালা পুতুলের দরকার হয়ে পড়ে। অনেকেই জানে ওগুলো মাটি-পাথরের বেশি কিছু নয়, যারা নিজেরাই বাঁচে মানুষের দয়ায়। কিন্তু তবু ওরা আছে আর থাকবেও। ওই যে বললাম না, শক্তি। যখন পুরো পৃথিবী তোমার বিপরীতে চলে যাবে, তখন কাঁদার জন্য একটা তো কোল দরকার। হোক না সেটা মাটির, ঠাণ্ডা পাথরের,’ তারপর আবার হেসে বলল, ‘কিছু ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রাইজ নিয়েই বাঁচতে হয় ডিয়ার। সারা বছর ফাঁকি মেরে চলা ছেলেটা হঠাৎ করে ফার্স্ট হয়ে গেলে চলবে কেন? তার নিজেরই সহ্য হবে না যে।’

তানি সামনের দিকে একটা তীব্র আলো দেখতে পেল। বুকের ভেতর দিয়ে ক’টা সাদা কালো প্রজাপতি উড়ে গেল যেন। টানেলটার জন্য আবার মন কেমন করল। ক্যারণের জন্যও করল। কেন কে জানে!

মানুষ নিজের মনকে যেদিন পুরোপুরি বুঝে ফেলবে সেদিন বোধহয় মানুষ সত্যি সত্যিই ঈশ্বর হয়ে বসবে।

তানি আবার ক্যারণের দিকে তাকাল। ওটা কি আরও আবছা হয়ে গেছে? নাকি তানির চোখটা.....

‘জানি তোমরা আমাদের ভালোই চেয়েছিলে। তবে আমাদের ভালোটা একটু অন্যরকম, এই হল মুশকিল! তবে চিন্তা করো না। যতদিন মানুষ কারণ ছাড়াও কাজ করবে, আউটপুটের কথা না ভাবলেও ইনপুট দিয়ে যাবে, ততদিন মানুষ থাকবে। পৃথিবী থাকবে....’

(১৮)
(১২:১৫, নালন্দা)

বারোটা পেরিয়ে গিয়ে ঘণ্টা-মিনিটের কাঁটাগুলোর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এখন আর কেউ কথা বলছে না। ঝড় ওঠার আগে যেমন সব কিছু চুপচাপ হয়ে যায়। তেমনি ঝড় থেমে যাওয়ার পরও যেন সবকিছু থমকে থাকে। কেউ কোনও শব্দ করে না। সত্যি কথা বলতে কি, কেউ সেই অবস্থাতেই থাকে না।

ওরা পাঁচজন ওপরের দিকে তাকিয়ে ছিল। হাজার মাইল দূরে ট্যাবের জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিল তন্ময়ও।

তবে কি সবই বৃথা! কিছুই হবে না!

ঠিক তখনই বোধহয়, তানির শরীর ভেসে থাকা অবস্থাতেই একটু কাঁপল। তারপর কেমন যেন পালকের মতো নেমে এল আস্তে আস্তে। কেউ যেন খুব যত্ন করে ওকে নামিয়ে রাখল। ব্যথা ভুলে কাউচ ছুটে গিয়ে তানিকে ধরল। একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। ওর চোখ দুটো এখনও বন্ধ। মেঘলা রাতের বাদামি আলো খেলা করছে সারা মুখে। *আচ্ছা জুলিকে কি ঘুমোলে এরকমই লাগে?*

সবাই তানির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যুদ্ধ জেতা মানুষদের তো এটুকু প্রাপ্য! হ্যানা আঁজলা করে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে চোখে। কাউচ পালস চেক করতে বসল সাথে সাথেই।

সবাই তানিকে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ খেয়াল করল না আলোর বলগুলো ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ছোটো হয়ে আসছে ক্রমশ। উঠতে উঠতে একসময় ঢাকা পড়ে গেল কালো মেঘে।

ওপরে যেন একটা বিস্ফোরণ হল। মেঘের বিছানায় রাতের পরের সূর্যটা যেন গড়াগড়ি খেল একটু। একমুহূর্ত। তারপর সব আবার আগের মতো। আকাশ, পৃথিবী, মানুষ সব...........

মেঘ সরে গিয়ে রোগামতো একটা চাঁদ বেরিয়ে আসে এইসময়। জিরো পাওয়ারের জোছনা এসে দখল নেয় নালন্দার।

এইসব কিছুই ওরা দেখল না। ওরা ব্যস্ত। শুধু ট্যাবটা শাট ডাউন করার আগে তন্ময় দেখল চোখ বন্ধ অবস্থাতেই তানি যেন হাসছে। ঠোঁট নাড়ছে অল্প অল্প।

তন্ময়ের মাথায় কিছুটা নিজে নিজেই অনুবাদ হয়ে গেল ঠোঁটের ভাষা। তন্ময়ের কাছে যার কোনও মানেই দাঁড়ায় না। *পাগলী একটা!*

'গুড বাই ডিয়ার। রেন রেন গো অ্যাওয়ে, কাম এগেন অ্যানাদার ডে। তোমরা বৃষ্টির সাথে কথা বলতে পারো? আমরা পারি!'

(সব শেষের পরে)

আজ গাছটা সেজেছে নিজের মতো করে। যেন পাতায় পাতায় বরফ পড়েছে। যেন কাঞ্চনজঙ্ঘা ছুঁয়ে গেছে দিনের প্রথম আলো। আর না সাজলেই বা চলবে কেন? পাতায় পাতায় গোলাপি রঙে আগুন ধরাতে না পারলে, মৌমাছিদের কাছে টেনে না নিলে আর এমন নাম কেন! শরীর দিয়ে শিকড় বের করে বেঁচে থাকা কেন? ফুল ফোটানোর জন্যই তো! আশপাশটুকু ঝলসে দিতে না পারলে *সুন্দরী* নামখানাই যে বৃথা। বৃথা আস্ত একটা জঙ্গল! মাটি ফুঁড়ে শিখর উঠে আসার দেশ। পাখিদের হলিডে প্যাকেজ!

এই জঙ্গলেরই বোধহয় আস্তে আস্তে ডুবে যাওয়া মানায়। রাজারই তো মৃত্যু হয় ফকিরের মতো করে। আর বড়ো জোর একশোটা বছর কিংবা তাও না। তার আগেই সুন্দরবন হারিয়ে যাবে। *চিরদিনের মতো।*

তবু তো ফুল ফোটে, বসন্ত এসে হাওয়া ছোটায়। ঘাড়ের কাছে মৃত্যু নিয়েও লাল নীল কাঁকড়ারা ছুটে যাচ্ছে পাশের দিকে। ছোটো ছোটো মাছ গর্ত বদলায় প্রতিক্ষণে। পৃথিবী বিখ্যাত 'মাড ফ্ল্যাটস' - কাদার ওপর দিয়ে একটা ভোঁদড় নদী পেরোয়।

একটু দূরে পড়ে থাকা ছেলেটাকে নিয়ে কারোরই তেমন কৌতূহল নেই। ও তো কতই পড়ে থাকে। রাজার খাবার! শুধু মাঝে একটা দুটো ঢেউ এসে ছুঁয়ে যায় কালো শরীরটাকে। একটু পরেই হয়তো সে উঠে বসবে। এদিক সেদিক তাকাবে। দেখবে সূর্যটা অনেকটা উঠে এসেছে। ছায়া ছোটো হয়ে আটকেছে পায়ের নিচে। '*কি হয়েছিল*' ভুলে বাড়ির দিকে ছুট লাগাবে। যেখানে অপেক্ষার পালা চলে রোজ রোজ। কেউ না কেউ ঠিকই বসে থাকে। জঙ্গলের মানুষদের তো অপেক্ষাটুকুই সম্বল। পিছটানটুকুই শক্তি লড়ে যাওয়ার। ভয়ঙ্কর সুন্দরকে হারিয়ে দেওয়ার।

বন অবশ্য ওদের দিকে তাকায় না। মানুষ তো আশ্রিত মাত্র।

দিন বড়ো হয়। মাটির সোঁদা গন্ধ গিয়ে মেশে বাতাসে। চারপাশ শিউরে দিয়ে ধবল পাখিটা উড়ে যায়। সব নিজের নিয়মে চলে, নিজের নিয়মে ভাঙে।

আসলে, প্রকৃতির সব রহস্যই বড্ড বেশি সরল। শুধু তার সমাধানগুলোই একটু যা জটিল!

(অ্যাটেনশন প্লিজ,

এই শেষ বেলায় কয়েকটা কথা বলে নেওয়া যাক। গল্পে ব্যবহৃত সব রকমের আধুনিক ডিভাইস, টেকনোলজি, জায়গা কিন্তু একদম সত্যি। X1 শক গান, ক্লিপ ক্যামেরা সবই পাওয়া যায়। কিউ আর স্ক্যানার প্লে স্টোর থেকে সহজেই ইনস্টল করা যায়, আর অন্য গ্রহে এভাবে ডাটা পাঠানোর কথা সত্যিই ভাবা হচ্ছে। নাসার মেইন সেন্টার বারোটা। তেরো নম্বরটা আমার কল্পনা, এর অস্তিত্ব থাকলেও আমার জানা নেই। আসলে এই তেরো সংখ্যাটার ওপর পৃথিবীর সব থেকে উন্নত দেশটিরও কিছু কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। অনেক সময় তো তারা বারোর পর চোদ্দতে চলে যায়! তাই কিছুটা মজা করেই তেরো নাম্বারটা ব্যবহার করলাম।

স্টেট টেলিপোর্টেশন, এনার্জি টেলিপোর্টেশন আর পার্টিকেল টেলিপোর্টেশন - এই তিন ধরণের টেলিপোর্টেশনের কথা ভাবা হচ্ছে। ভিডিও কলও কিন্তু এক ধরনের টেলিপোর্টেশন। আবার টেলিপোর্টেশন ক্লোনিং-কেও ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে। আর ১৯৯৬-এর সাফল্যের কথা তো আগেই বলেছি। আমাদের থেকে উন্নত কোনও পৃথিবী হয়তো আরও কিছু সাফল্য পেয়েছে! এখন কারও মনে হ্যাকিং নিয়ে প্রশ্ন জাগতে পারে। তাহলে ৭ বছরের Betsy Davies-এর কথা বলতে হয়। ২০১৫-র জানুয়ারি ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN)-এর তরফ থেকে একটা পরীক্ষামূলক হ্যাকিং কম্পিটিশন করা হয়। সেখানে বেটসি মাত্র দশ মিনিট চুয়ান্ন সেকেন্ডের মধ্যে ওয়াই ফাই হট স্পট হ্যাক করে বসে। অতদূরও যাওয়ার দরকার নেই। আমাদেরই দেশের ছেলে রুবেন পাল, বাঙালী! ন'বছরের একজন এথিকাল হ্যাকার, অ্যাপ ডেভলপার, সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট! ২০১৪-র শিশুদিবসের দিন রুবেনের উদ্যোগে বিশ্বের বৃহত্তম হ্যাকিং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এবার আসা যাক ক্যারণের কথায়। সুন্দরবনের গভীরে কিন্তু এরকম আলো সত্যিই দেখা যায়। আজ্ঞে না, আলেয়া নয়। এর ধরণ একদম অন্যরকম। দেখতে চান? Ghost light of sundarban লিখে একটু সার্চ মারুন দেখি। হয়তো তারা এই পৃথিবীর কেউ নয়। তারা মাঝে মাঝে নেমে আসে। অনেক অনেক দূর থেকে। ওই আকাশটা থেকে যে পৃথিবীর সবথেকে বড়ো ব-দ্বীপ এলাকাটা স্পষ্ট দেখা যায়! ল্যান্ডিং-এর জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথায়?)

ছবিঃ তন্ময়, ইন্দ্রশেখর

শংকর সেন

বিখ্যাত হবার মজা যেমন, জ্বালাও কম না! সেই সব জ্বালা সামলে পড়াশুনা করা তাতিয়ানার বেশ মুস্কিল হচ্ছিল। তন্ময়ও যেন বিরক্ত হচ্ছিল ওদের পড়াশুনার ব্যাঘাতে। তাতিয়ানা ফিজিক্স নিয়েই পড়াশুনা চালাল, চৈতালি ডাক্তার হল। তাতিয়ানা খুব খুশি, "ডাকলেই পাওয়া যাবে এমন একজন ডাক্তার তো আমার থাকল!"

চৈতালী একটু বিমর্ষ হল যেন, "বাবা বলছে ইউ-কেতে যেতে – এম আর সি পি করে নিতে!"

তাতিয়ানা ওকে উৎসাহ দেয়, "তো চলে যা! মাত্র দু'টো তো বছর! তারপরে বিদেশে সেটলড হবার ইচ্ছা নেই তো তোর?"

"কক্ষনো না! আমি ঠিক করেছি – পোড়া হোক আর সোনার হোক, এই দেশে জন্মেছি, এই দেশেই মরব!"

তাতিয়ানা হাতটা চিৎ করে বাড়িয়ে ধরে, চৈতালি ওর হাতটাতে চাপড় মেরে হাতটা জড়িয়ে ধরে, খিলখিল করে হেসে ফেলে দু'জনেই।

অনিমেষবাবু ছেলেমেয়ের পড়াশুনার ব্যাপারে কোনওদিন তাঁর মতকে জোর করে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি। তাতিয়ানা এম এস সি করার পরে একটু দ্বিধায় পড়ল। ওর সামনে বিদেশে গিয়ে গবেষণার সুযোগ একেবারে খোলা। কিন্তু ও বুঝতে পারছিল – বাবার তা ইচ্ছা না। ওর নিজেরও কি তা ইচ্ছা নাকি? তবে ওর ইচ্ছা মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে, তার সুযোগ তো নাসার থেকে বেশী আর কোথাও পাবে না। নাসার দরজা তো ওর জন্য খোলাই আছে! তবু ও যেন একটু দ্বিধায় পড়ে। বাবা-মার বয়েস বাড়ছে। তারা কিছু না বললেও ও বোঝে – তারা চায় ও তাদের কাছেই থাকুক।

তন্ময় বাড়িতেই আছে, সুযোগ পেলেও কোথাও যায় নি। বোস ইন্সটিটিউটে একটা গবেষণা সেরে সায়েন্স কলেজে পড়ায়, বিয়ে করার নামও করে না। তাই বাবা-মা তো চাইবেই একটা মেয়ে অন্তত ঘরে থাকুক! তাদেরও তো বয়েস হচ্ছে!

একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে ওর দ্বিধা আরও বেড়ে গেল। এক বক্তা বললেন – বর্তমান মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বপ্ন কী? তা হল ছেলেমেয়েকে বিদেশে পাঠিয়ে একলা একটা ঘরে থেকে মরে যাওয়া। না, ওর বাবা-মাকে ও সেই দলে কিছুতেই পড়তে দেবে না।

চৈতালি ওর হাতে হাত রেখে যতই কথা দিক, ইউ-কেতে গিয়ে ওখানকার এত প্রশংসা করে যে তাতিয়ানার বুঝতে অসুবিধা হয় না – ও ওখানেই স্থায়ী ডেরা করার দিকে যাচ্ছে। ওর পিসিও যখন তখন এদেশের নিন্দা আর ওদেশের প্রশংসা করে, তাতিয়ানার শুনতে কেমন যেন লাগে! মানুষগুলো এ রকম পালটে যায় কী করে? যেখানে জন্ম নিল, অন্নজল নিয়ে বড়ো হল, সেই দেশকেই এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কী করে?

তন্ময় কিন্তু ওর অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের চর্চাকে কেমন যেন একটু বাঁকা চোখে দেখতে শুরু করেছে। ও বুঝতে পারে – দাদা চায় না যে সে এই পথে আর এগিয়ে যায়। কিন্তু কেন যে দাদার আপত্তি তা ও বোঝে না।

বাবা-মা কোনওদিন ওদের ছাড়া কোথাও বেড়াতে যায় না। বাবার এক বন্ধু অহীনকাকু বেঙ্গালুরুতে আছে, পড়ে পা ভেঙেছে, বাবাকে খুব দেখতে চাইছে। তাতিয়ানা জোর করেই বাবা-মাকে পাঠাল, "যাও, ঘুরে এস! বেঙ্গালুরু ছাড়াও মাইসোরে ভালো করে দেখে এস কী কী দেখার আছে। সব ভালো করে জেনে আসবে, আমি আর দাদা পরে যাব!" ওর ছোটোবেলায় একবার অহীনকাকু ওদের বাড়ি এসে ওর সাথে কত বকবক করেছিলেন, কত খেলা খেলেছিলেন! যাবার আগে বাবাকে বলেছিলেন, "অনিমেষ, তুই খুব লাকি যে তোর একটা মেয়ে আছে! আমার শুধু একটা ছেলে, সব থেকেও ঘরটা যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে!" সে'দিন থেকেই অহীনকাকুকে তাতিয়ানা খুব পছন্দ করে।

বাড়িতে এখন ওদের আলাদা ঘর আছে, তবুও ওদের সবারই অভ্যাস ড্রইং রুমে একসাথে বেশিরভাগ সময় কাটানো। তাই দাদার সাথে তাতিয়ানার মাঝে মাঝে ঝগড়া লাগলেও তা বাবা-মা'র মধ্যস্থতায় বেশীদুর এগোতে পারে না। ফাঁকা বাড়িতে দাদার সাথে বেশ ঝগড়া লেগে গেল তাতিয়ানার, তাতিয়ানা না রাগলেও ও বুঝতে পারে দাদা বেশ রেগেছে। ও দাদাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করে, "দাদা, তুইই তো আমাকে ওই মেসেজটা নিয়ে গবেষণা করতে কত উৎসাহ দিয়েছিলি! এখন যখন আমি সেই পথে এগোতে চাইছি, তুই বাধা দিচ্ছিস কেন?"

তন্ময় আরো রেগে যায়, "আমি তোকে উৎসাহ দিয়েছিলাম তার কারণ ছিল, এখন বারণ করছি তারও কারণ আছে!"

"কী কারণ বল না!"

"বলা যাবে না। তুই ভালোভাবে নিতে পারবি না!"

"দাদা, এটা ঠিক না। তুইই কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমাকে শিখিয়েছিলি – সব ব্যাপারে অকপট থাকতে, খোলাখুলি সব কথা আলোচনা করতে!"

এবার গুম খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দুম করে বলে ফেলে তন্ময়, "ওটা একটা মজার ধাপ্পা ছিল।"

"কী বলছিস দাদা!" আকাশ থেকে যেন পড়ে তাতিয়ানা।

"ঠিকই বলছি, ধাপ্পা আর মজা যাই বলিস – ওটা আমারই সৃষ্টি।"

কোমরে হাত দেয় তাতিয়ানা, "মনে হচ্ছে এখন তুই আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছিস!"

এবার রেগে যায় তন্ময়, "এখন না, তখনই ধাপ্পা দিয়েছি।"

তাতিয়ানা দাদাকে চেনে, ও বোঝে – দাদা মিথ্যা বলছে না। তবু ওর বিস্ময় কাটে না, "কিন্তু কেন?"

"সে তুই বুঝবি না!" হাত নাড়ে তন্ময়।

"দাদা, তুইই তো বলিস – বোঝানোর মতো করে বললে সবাই বুঝতে পারে। আমি যাতে বুঝি সেইভাবেই আমাকে বোঝা!"

খানিক চুপ থেকে বলতে শুরু করে তন্ময়, "আমাদের বাড়িটা দোতলা হবার পরে আমি সব পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেয়ে যাই বাবার একটা মোটা খাতা আর ডায়েরি। খাতাটার উপরে লেখা ছিল – আমি যা পারলাম না আমার কোনও উত্তরসূরী যদি তা পারে তার জন্যেই এটা রাখলাম। আমি দু'টোই মন দিয়ে পড়ে ফেললাম, জানলাম বাবার খুব ইচ্ছা ছিল অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করে। সংসারের চাপে চাকরি নিলেও বাবার সেই

ইচ্ছা মরেনি। বাবা একটা কোড তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছিল, অন্য গ্রহ বা গ্যালাক্সিতে কোনও বুদ্ধিমান জীব থাকলে তাদের কাছে কোডটা পাঠালে তারা যে ভাষাভাষীই হোক না কেন তারা যেন কোডটার পাঠোদ্ধার করতে পারে। তুই শুনলে অবাক হবি ওই চব্বিশটার তত্ত্ব বাবা বুঝে ফেলেছিল।

তুই তখন বেশ ছোটো, আমি একটু বোঝবার মতো বড়ো হয়েছি। বাবা আমাকে নিয়ে ছাদে গিয়ে তারা দেখাত আর বলত – ওখানেও আমাদের মতো হয়তো কেউ আছে, শুধু আমরা যোগাযোগ করতে পারছি না। তখন আমাদের দেশে কম্পিউটার-মোবাইল ফোনের যুগ আসে নি, কিন্তু স্যাটেলাইট কানেকশন সবে চালু হয়েছে। তাই বাবার পক্ষে মহাকাশে কোনও বার্তা পাঠানো অসম্ভব ছিল যেটা নাসার কাছে অসম্ভব ছিল না। ডায়েরিটা পড়ে জানলাম বাবা তার দুই একটা নমুনা নাসার কাছেও পাঠিয়েছিল – কিন্তু তারা পাত্তা দেয় নি। সায়েন্স কংগ্রেসে বাবা এই কথা তোলায় তাকে অপমানিতও হতে হয়। সবটা পড়ে আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল – ভাবলাম বাবার এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে। তাই আমি ওই কোডটা তৈরি করি – মানে বাবার থেকে কিছুটা টুকলি করে বাকিটা নিজে বানাই। আমার কাছে মহাশূন্যে পাঠানোর ব্যবস্থা থাকুক আর না থাকুক ইন্টারনেট কানেকশন আছে আর নিজের আইডেন্টিটি গোপন রেখে কোডটা ছড়িয়ে দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয় নি। আরও কয়েকজনের সাথে কোডটা মেসেজ করে তোর কাছেও পাঠাই যাতে আমাকে কেউ সন্দেহ না করে। দেখ, তাতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। কিন্তু বাবার অত কষ্টে করা গবেষণাকে কেউ মূল্য দেয় নি। তাই এখন আমি চাই না – তুই একটা ফালতু জিনিসের পিছনে ঘুরে তোর জীবনটা বরবাদ করিস।”

“দাদা, বাবা কিন্তু জানলে –”

“বাবা জানে, আমি বলেছি।”

“বাবা বাধা দেয় নি?”

“না। হেসে বলেছে – তোর যখন ইচ্ছা হচ্ছে কর। দেখ না, কী হয়! কিছু ভালো ফলও তো হতে পারে!”

তাতিয়ানা ওর কাঁধে হাত রাখে, “দাদা, তুই বাবাকে খুব ভালোবাসিস, না?”

“তোকেও। তাই আমি তোর জীবনকে একটা মিথ্যের পিছনে ছুটতে দিতে চাই না।” ধরা গলায় বলে তন্ময়।

“জানি দাদা। তোর মতো অতটা না হলেও – আমিও বাবাকে ভালোবাসি আর আমার দাদাকেও। তোদের অমতে আমি কিছু করব না, কথা দিচ্ছি। তবে আমি যে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সকে ভালোবেসে ফেলেছি। এই কোডের ব্যাপারটা বাদ দিয়েও তো আমি এই বিষয়ে কাজ করতে পারি।”

“একটু বাস্তবটাকে বোঝ, তাঁতি। তোর কোডটা নিয়ে যা নাম হয়েছে তাতে কি তা সম্ভব?”

কী বলবে ভেবে পায় না তাতিয়ানা – কথাটা তো সত্যিই। ছোটোবেলা দাদা ‘তাঁতি’ বলে ডাকলে ও খুব রেগে যেত। এখন বোঝে দাদা যখন ওর প্রতি ভীষণ নরম হয় তখনই ওকে তাঁতি বলে ডাকে – আর তাই দাদা তাঁতি ডাকলে তাতিয়ানাও নরম হয়ে যায়।

ছাদে হঠাৎ একটা কী রকম অদ্ভুত শব্দ হল। আজকাল এই এলাকাতে চোর বদমাইসের উপদ্রব শুরু হয়েছে। তন্ময় চট করে উঠে দাঁড়ায়, “দাঁড়া, দেখে আসি কীসের শব্দ!”

“আমিও যাই চল!” দাদাকে একলা ছাড়ে না তাতিয়ানা।

ছাদের দরজা খুলেই দাঁড়িয়ে পড়লো তন্ময়, “কে, কে তোমরা?”

ততক্ষণে তাতিয়ানাও পাশ থেকে উঁকি মেরেছে, ছাদে দাঁড়িয়ে দু’জন, না না! তিনজন তো! – দু’জন মানুষের মতো দেখতে হলেও যেন মানুষ না, কিছু একটা অন্য রকম – অন্যজন একটু যান্ত্রিক আকৃতির। ওদের একজন হেলতে দুলতে এগিয়ে এল, “আমাদের চেনা উচিত তোমাদের, তোমরা তো গল্পের পোকা! অ্যাং আর গোলাপীবাবুর কথা তো পড়েছ! আর আমাকে চিনতে তো ভুল হবার কথা না! তোমাদের মেসেজ পেয়েই আমরা একসাথে এসেছি। বলো কী সমস্যা তোমাদের, কীসের দুঃখ? তোমরা এত ভালো দুই ভাইবোন – ঝগড়াই বা করছিলে কেন?”

মাথা নীচু করে নড করে দরজা থেকে সরে দাঁড়ায় দুই ভাইবোন। তন্ময় বলে, “বলতে হবে কেন? হাতটা ধরুন, তবেই তো সব বুঝে যাবেন পিকে সাব! নয়তো গোলাপীবাবু একটু পাকস্থলী খাটিয়ে ভাবুন, কিংবা

অ্যাংসাহেব আমাদের টিপেটুপে দেখুন! আসুন, ভিতরে আসুন, বাবা যাবার আগে কিলো দুই গাজর মজুত করে গিয়েছে, আপনার খাবার কোনও অসুবিধা হবে না পিকে সাব। গোলাপীবাবু, আপনার যখন শুধু একাধিক জিভ আছে, দাঁত নেই - আপনি নিশ্চয়ই লিকুইড খাবেন। অ্যাং সাহেব কী খান আমি জানি না, বুঝিও না। তবে বাঙালিরা এখনও অতিথিপরায়ণ, পার্থিব কিছু হলে আমরা জোগাড় করবই! পিকে সাব, আপনি বাংলা শিখলেন কবে? আসার পথে কারও হাত ধরেছিলেন, না অ্যাংসাহেবের কাছে শিখলেন? উনি তো চোদ্দহাজার ভাষা জানেন! তিনজনে এক হলেন কী করে?”

ততক্ষণে পিকে তাতিয়ানার হাত ধরে ফেলেছে, অ্যাং তন্ময়ের সারা শরীর টিপে টিপে দেখতে শুরু করেছে আর গোলাপীবাবু একবার এর আরেকবার ওর মুখের দিকে, কানের গোড়ায় তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে আর পেটে হাত বুলোচ্ছে। তারপরে তিনজনে একসাথেই বলে উঠলো, “তোমাদের বাবার যে সম্মান পাওয়া উচিৎ ছিল তা যেন তিনি পান তাই তোমরা চাও। বেশ এস, একটা বুদ্ধি পাকাই - যাতে তা হয়!”

তাতিয়ানা হাসল দাদার দিকে তাকিয়ে, “দাদা, তোর মিথ্যেটা কিন্তু সত্যি হল!”

ফিরে আসার আগেই অনিমেষবাবু ওদের ফোন পেলেন, “বাবা, তোমার নামে নাসা থেকে চিঠি এসেছে, ওখানকার তিনজন অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট তোমার সাথে দেখা করতে আসছেন। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এস।”

আকাশ থেকে পড়েন অনিমেষবাবু, “আমার সাথে? কেন?”

তন্ময় বলে, “মহাকাশে খবর যেতে তো অনেক সময় লাগে, তার আগেই ভুলে যাওয়া তোমার উচিত হয় নি! তোমার বানানো কোডে খবর পেয়েই তো তিন তিনজন ভিনগ্রহী এখন আমাদের অতিথি। তারাও তোমার সাথে দেখা করার জন্য ব্যগ্র।”

সামলাতে কিছুক্ষণ সময় লাগে অনিমেষবাবুর। ততক্ষণে তাতিয়ানা দাদার হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়েছে, “বাবা, এবার তো তোমার আর দুঃখ নেই?”

সামান্য শব্দ করে হাসলেন অনিমেষবাবু, “তোদের মতো ছেলেমেয়ে আছে আমার, আমার আর দুঃখ কী রে?”

দুলদুলি

শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

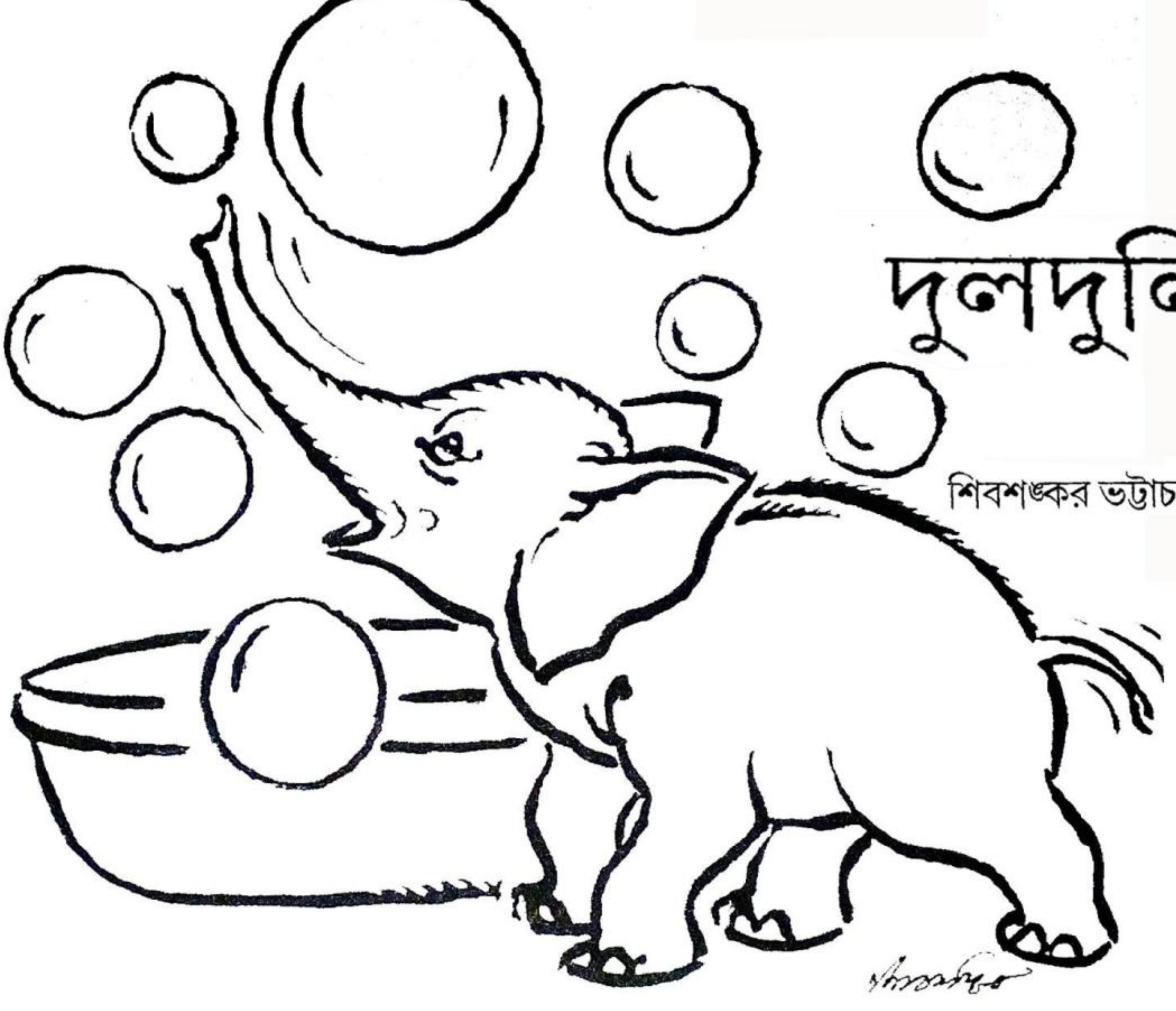

তোমরা কেউ দুলদুলিকে দুষ্টু বোলো না। ও বেশ শান্তশিষ্ট ছোট্টখাট্টো ভালো মানুষটি। থুরি, মানুষ কোথায়, ও বেশ ভালো হাতি। একমাস আগে ও জন্মেছে এই সার্কাসের তাঁবুতে। জন্মের সময় ও আরও ছোটো একটা কাপড়ের পুতুলের মতো নরম ভারি মিষ্টি দেখতে ছিল। খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর জোর তেমন ছিল না ওর ছোটো ছোটো পায়ে। ওর মা শুঁড় দিয়ে ঠেলেঠুলে খাড়া করবার সময় গোল একটা বলের মতো গড়াগড়ি খাচ্ছিল বলে রিং মাস্টার ওর নাম দেন 'ইল্লু গুল গুল'। দুধ খাবার সময় মাঝে মধ্যে মা ভুল করে ফেলে বলে দড়ির খেলার ওস্তাদ ওসমান ওকে ডাকে 'ভুলুয়া'। এবার ওর আসল নামটা কী করে হল বলি।

বড়ো মাপের মাথা, তার উপর খাড়া খাড়া লোম। লটপটে কান। সরু নলের মতো নুলনুলে শুঁড় আর গোলগাল শরীরের তলার চারটি পা। লেজের কথা বলতে মনে নেই। বিশেষ করে ওটিই নড়েচড়ে বেশি। শুঁড় আর লেজ নিজের নিজের কাজ করেই চলেছে সর্বক্ষণ। আর গুবলু-গাবলু শরীরটা সামনে পিছনে দুলেই চলেছে। থামতে জানে না! তাই ওর রকমসকম দেখে হরিপদ জোকার নাম দিয়েছে দুলদুলি। থেকে গেল সেটাই।

সর্কাসের এই অ্যাত্ত বড়ো তাঁবুটার তলায় সবাই সারাদিন কাজে ব্যস্ত। শুধু কোনও কাজ নেই দুলদুলির। ঘুম থেকে উঠে শুঁড় দুলিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো আর মাঝে মাঝে ছুট্টে গিয়ে মায়ের দুধ খাওয়া, এই ওর সারাদিনের কাজ। দুষ্টুমি করে না বলে সবাই ওকে ভালোবাসে, নজরে নজরে রাখে। শুধু মাঝে মাঝে দুলদুলি টের পায় কে যেন ওর গায়ের ভেতর থেকে সুরসুরি দিচ্ছে। তখন কিছু না করে ও থাকতে পারে না। তাও এমন কিছু নয়। একদিন গেটের কাছে একগোছা টিকিট কেড়ে নিয়ে ওড়ানো, ম্যানেজারের বেড়ালকে তাড়া করা, পাখির খাঁচার দরজা খুলে দেওয়া আর হরিপদ জোকারের চশমা নিয়ে পালানো। এরকম কিছু গোলমেলে কাজ মাঝে মাঝে করলেও এটুকু কাজের জন্য ওকে দুষ্টু বলে। আদর আদর গলা করে বকুনিও দেয়। আবার কাপড় কাচা

হয়ে গেল ফেনা ওঠা সাবান-জলের বেলুন ওড়াতে ওর মতো কেউ পারে না। মোট কথা, আসলে দুলদুলি মোটেই দুষ্টু নয়, সে তোমারা যাই বলো।

বড়ো গোল তাঁবুটার চারপাশে অনেকগুলো ছোটো ছোটো তাঁবু। তাতে থাকে খেলোয়াড়, জোকার, কুলি, ম্যানেজার, পাহারাদার, পালোয়ান, রিং মাস্টার, মালিক, নানারকম লোকজন। আর আছে খাঁচায় ঢাকা রেললাইনের ওপর খাঁচা-গাড়িতে বন্দি হয়ে বাঘ, সিংহ, চিতা, হায়না, ভালুক, বনমানুষ আর রংবেরঙের পাখির দল। বড়োমাপের পাখিগুলো থাকে খাঁচার বাইরে। বেড়ি লাগানো পায়ে টুকুস টুকুস ঘুরে বেড়ায়, উড়ে যায় না।

আর ছাড়া থাকে মালিকের পোষা দুই রামছাগল চককর সিং আর বককর সিং। ওরা নিজের ইচ্ছেমতো এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। উট, ঘোড়া আর হাতিদের থাকবার জায়গা মূল গেট দিয়ে সার্কাসের বড়ো তাঁবুতে যাবার পথের দু'ধারের চাঁদোয়া ঢাকা মাঠে। শেকল বাঁধা পায়ে ওরা দিনের বেলায় ওখানেই ঝিমোয় আর কলাপাতা নারকেলপাতা চিবোয়। সন্ধে হলেই খেলা দেখাতে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়।

দুলদুলির মা হরিমতী হাতিদের দলের সবচেয়ে বড়ো খেলোয়াড়। বল খেলা, ছবি আঁকা, ঘন্টা নেড়ে গণেশপুজো, তিন চাকার সাইকেল চালানো আর টুলের ওপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে ব্যালান্সের খেলা ওর মতো এত ভালো আর কেউ জানে না! আরও কত কী পারে হরিমতী। কোনও জানোয়ার সার্কাসের জোকার হয়েছে কোথাও? হরিপদ জোকার বলে, হরিমতী নাকি ওর চেয়েও বড়ো জোকার। ছবি আঁকার খেলা দেখাবার সময় মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের গায়ের রং লাগিয়ে দেয়। গোল পোস্টে বল না মেরে রিং মাস্টারের গায়ে বল মেরে দেয়। জোকারদের গায়ে শুঁড়ে করে ধুলো ছুঁড়ে মারে। এরকম আরও কত কী যে করে! এগুলো কোনওটাই ওকে শেখানো হয়নি, নিজের থেকেই করে। এরকম মায়ের মেয়ে দুলদুলি তো একটু গোলমেলে হবেই। একটা ওর অসুবিধে, যখন তখন ঘুম পাওয়া। ঘুম পেলে শুঁড় থেকে বাঁশির মতো শব্দ হয় ওর। আর স্বপ্নে কত কী যে দেখে!

খাঁচার বাইরে চককর-বককর, হাড়গিলে বুড়ো যার নাম সনাতন, খান চারেক কুকুর, একটা কাবলি বেড়াল, দুটো লালমুখো চোট খাওয়া বাঁদর যাদের মিচকে আর ফিঁচকে বলে ডাকে সবাই আর দুলদুলি। ওদের দড়ির বাঁধনটিও নেই। অবশ্য খেলা আর মহড়ার সময় সকলেই খোলা থাকতে পায়। এদের সবাই খুব ভালোমানুষ না হলেও নিজেরা মিলেমিশেই থাকে। তবে ডাকু নামের মালিকের খাস গ্রে হাউন্ড কুকুরটাকে সমঝে চলে সবাই। খুব যে আঁচড়ায় কামড়ায় বা হাঁকডাক করে তা নয়। ওর চোখ! কাজ তো সারাদিন মালিকের খাটের তলায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা আর মাঝে মাঝে কালো হাঁড়ির মতো মুখটা তুলে আধবোজা মুখে ঘুম ঘুম চোখে তাকানো, যার তল খুঁজে পাওয়া যায় না। ওই চাউনিতেই সবার শিরদাঁড়ায় শীত করতে থাকে। সবার করলেও দুলদুলির নয়। তবে ডাকুর কাছে ঘেঁষতেও যায় না ও।

এই তো সেদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভরপেট দুধ খেয়ে আবার একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল দুলদুলি। মিচকে আর ফিঁচকে ওর গা মাথা থেকে উকুন বেছে দিচ্ছিল। হঠাৎ কী করে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখে মা নেই। আংটা শেকল আছে, মা নেই। মায়ের গায়ের গন্ধ আছে, মা নেই। নেই তো নেই, কোথাও নেই।

গোল গোল ঘুম ভাঙা চোখদুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাকে খুঁজল দুলদুলি। ঠোঁট ভেঙে একটু কান্না কান্না আওয়াজও করল। তারপর ধড়ফড় করে উঠে টলমল করতে করতে চলল মাকে খুঁজতে।

মস্ত বড়ো তাঁবুটার ভেতরে ঢুকলে দুলদুলির চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দিন রাত্তির কতগুলো করে আলো যে জ্বলে ওখানে! মাঝের গোল চত্বরটায় তখন সবাই খুব ব্যস্ত মহড়া চলছে পুরোদমে। ওই টুকুনি দুলদুলিকে কেউ দেখতে পেল না। রিংয়ের চারপাশ ঘুরে দেখা হয়ে গেলে ও চলল পর্দা ঠেলে বাইরে।

মা নেই! নটবর উট ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল একবার, তারপর চোখ বুজিয়ে বোধহয় কিছু চিবোতে লাগল। মুখে খাবার না থাকলেও সারাক্ষণ ও যে কী চিবোয় কে জানে? ওকে কিছু জিজ্ঞেস করে কোনও লাভ নেই। কারও সঙ্গে কোনও কথাই বলে না, এত গম্ভীর। অন্য হাতিরা তখন একগাদা কলাপাতা নিয়ে খাওয়ায় ব্যস্ত। এর ওর পেটের তলা দিয়ে ঘুরঘুর করল খানিকক্ষণ দুলদুলি। ওরা কেউ চেয়েই দেখল না।

মাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। বড়ো তাঁবুর বাইরে ছোটো তাঁবুগুলো, চানের চৌবাচ্চার পাশে, সার বাঁধা খাঁচাগুলোর আশপাশ, নেই। সব দেখা হয়ে যাবার পর মালিকের তাঁবুর কাছে আসতেই ভেতর থেকে চাপা গলায় আওয়াজ এল, 'গররর!' ডাকু ঠিক টের পেয়েছে। আর সেখানে থাকতে আছে! সাথে সাথে পায়ে তাড়া লাগল দুলদুলির, ছোট ছোট। এক ছুটে খিড়কি দরজার বাইরে। চককর সিং আর বককর সিং কাঠের বেড়ার ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল, "ব্যা বব্বো।" অর্থাৎ, কোথায় যাওয়া হচ্ছে। সবার সবকথার জবাব ভালোমতো দিতেই শেখেনি বেচারা দুলদুলি। মায়ের সঙ্গেই যা একটু কথা হয়। তাও আধো আধো ইশারা ইঙ্গিতে। কোনওমতে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "মা কই?"

বককর সিং তার বাঁকা শিং আর লটপটে কান নেড়ে বলল, "বাজার গেছে হয়তো, ফিরে আসবে এক্ষুনি।"

বাজার ব্যাপারটা কী জানা নেই দুলদুলির। চলতি পা থামাতেও পারল না। খিড়কি দোরের ওপারে মেঠো পথ ধরে ছুটতেই লাগল টলমল পায়ে। লম্বা গলা লাল নীল চোখ ল্যাম্প পোস্ট ডাকল পেছন থেকে, "কুথা যাস রে তু?"

তাঁবুর মাথায় দড়ি ধরে দোলা খেতে খেতে খ্যাঁক খ্যাঁক করল মিচকে আর ফিঁচকে, "পালানো হচ্ছে? দেশে আইনকানুন নেই বুঝি?"

শুনতেই পেল না দুলদুলি। বুড়ো হাড়গিলে সনাতন লাফিয়ে লাফিয়ে ডানা ঝটপটিয়ে পিছু ডাকল; দেখলই না দুলদুলি।

এদিকটায় লোকজন নেই, বাড়িঘর নেই। চলতে চলতে ঝোপঝাড় বাড়তে লাগল আর তার মধ্যে লাল মাটির পথটাও হারিয়ে গেল একসময়। পথের শেষে ঘন বন। ঝোপ ঠেলতে ঠেলতে দুলদুলি এল বনের মধ্যে। শুঁড় তুলে বাতাস শুঁকে ভালো লাগল ওর। কী সুন্দর বুনো বুনো গন্ধ এখানে! ঠিক মায়ের গায়ের গন্ধের মতো। ভালো লাগায় কাঁটা দেওয়া গায়ে দু'চক্ষু বুজিয়ে জোরে জোরে নাক টেনে বুনোগন্ধ শুঁকছে, এমন সময় কে যেন কড়া গলায় মাথার ওপর থেকে বলে উঠল, "লতুন মনে হতেছে যেন?"

চমকে উঠে চারদিকে পাকটাক খেয়ে তবে তাকে দেখতে পেল দুলদুলি। মাথার ঠিক ওপরে ভারি অদ্ভুত চেহারার কে যেন বসে আছে। খরখরে চামড়ার ছোটোখাটো গা। দুটি দুটি চারটি পা, লম্বা লেজটি পাকানো, বড়ো বড়ো চক্ষুদুটো লাট্টুর মতো ঘুরছে। ছিল সবুজ, ওমা, নিমেষে রং পালটে হয়ে গেল গোলাপি। গোলাপি থেকে নীল হতেই দুলদুলি জিজ্ঞেস করল, "তুমি বুঝি জাদুকর?"

অমনি অনেকগুলো গলা এক সাথে বলল, "আমরা সবাই জাদুকর। কিন্তু তুমি কে? এই বনের মধ্যে এলে কোত্থেকে?"

"আমি তো মাকে খুঁজতে এসেছি। খুঁজে পাচ্ছি না।"

ততক্ষণে চারপাশের ঝোপঝাড়ে হাজির হয়েছে আরও ক'জন। গোল গোল লাট্টু চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে। একজন আবার চট করে তার শরীরের থেকেও লম্বা জিভ বার করে ছুঁড়ল একটা পোকার দিকে। নিমেষে পোকা পেটে চালান হয়ে গেছে। এতক্ষণ ভয় ভয় পাচ্ছিল দুলদুলির। পোকা খাওয়ার কায়দা দেখে হাসি পেয়ে গেল বেজায়। সারা গা কাঁপিয়ে দুলদুলি হেসেই অস্থির। ওর হাসি দেখে জাদুকর রাগের চোটে গায়ের রং কালো করে চোখ পাকাল, "অত হাসবার কী আছে?"

হাসি চলে গিয়ে আবার কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল দুলদুলির মুখটা। অমনি কে একটা থপ থপ করে লাফিয়ে এসে বসল ওর সামনে। লম্বা লম্বা হাত-পা, হলুদে রঙের গা, কথা বলে গ্যাঙোর গ্যাং, গোলগোল চোখ কপালে তোলা।

"নতুন দেখছি? এখানে কী ব্যাপার?"

"মাকে খুঁজে পাচ্ছি না," বলল দুলদুলি।

"এ বনে তো হাতি নেই। অন্য কোথাও গেল কি না দ্যাখো।" বলে এক লাফে ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে কোথায় চলে গেল সে।

এবারে হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল দুলদুলি। সার্কাসের তাঁবুতে নেই, রাস্তায় নেই, এখানেও নেই। মা কোথাও নেই কেন?

"আহা, কেঁদো না কেঁদো না। অত বড়ো লোক কি হারিয়ে যেতে পারে? আসবে ঠিক ফিরে।" বলতে বলতে একটা কাঁটাঝোপ ঝুমঝুমিয়ে এসে হাজির হল সামনে। ভয়ে ভয়ে দুলদুলি লুকোল গিয়ে একটা মস্ত বড়ো গুঁড়ির আড়ালে। ওখান থেকে গোল গোল চোখে চেয়ে দেখে, ও মা! কাঁটাঝোপের তলায় চারটে পা আর কী মিষ্টি মিষ্টি হাসিমুখের একজন।

"ভয় পেয়ো না, আমি সজারু। ঠিক খুঁজে দেব তোমার মাকে। ভয় পেয়ো না।" সাদা কালো ছিট ছিট কাঁটাঝোপটা কথা কইল। তারপর ঝুমঝুমিয়ে হাঁটা দিল গভীর বনের দিকে। দুলদুলি আর কী করে। চলল তাঁর পিছু পিছু।

এ বনে রোদ্দুর ঢোকা বারণ। মস্ত মস্ত গাছগুলোর মাথায় সবুজ নীল চাঁদোয়া। যেন মস্তো বড়ো একটা সার্কাস। তবে কড়া আলোর বদলে সবটা কেমন ছায়া ছায়া, মায়া মায়া।

দুলদুলি বেচারা জন্ম থেকে শুধু সার্কাস জানে। তাঁর খেলোয়াড় জানে। মাথার ওপর হুপ-হাপ করে দড়িবাজির খেলোয়াড়রা হাজির হল কোত্থেকে। এ-ডাল থেকে ও-ডাল পেল্লায় লাফ দেখে তাক লেগে যায়। শুধু কি তাই, লতা ধরে দোল খাওয়া আর গাছের গা বেয়ে ওঠানামা। কয়েকজনের কোলে আবার ছানাও আছে। মায়ের বুক আঁকড়ে ধরে তারাও দড়িবাজির খেলায় মেতেছে। হঠাৎ কালো মুখ, সোনালি গা, যার অর্ধেক অবশ্য পাকা, এক বুড়ো ওস্তাদ এসে বসল। দুলদুলির ঠিক মাথার কাছে নাড়াচাড়া করতেই ও শুঁড় বাড়িয়ে ধরে ফেলেছে। আর যাবে কোথায়? লেজে টান পড়তেই বুড়ো ওস্তাদ বেতাল হয়ে পড়েছে ডাল ফসকে নিচে। পড়বি তো পড়, দুলদুলির পিঠের ওপর সটান। দুলদুলিও দিয়েছে প্রাণপণে ছুট বনজঙ্গল ভেঙে। ও যে এমন ছুটতে পারে নিজেরই জানা ছিল না দুলদুলির, তায় পিঠের ওপর এমন একটা বোঝা নিয়ে।

"ও রে থাম থাম, পড়ে যাব যে!" বলল বুড়ো ওস্তাদ। ওর বোধহয় সুড়সুড়ি লেগে থাকবে। হেসে সারা হয়ে যাচ্ছে বুড়ো। হাসি শুনে ভরসা পেয়ে থামল দুলদুলি। পিঠ থেকে নেমে মাথা ঘোরা কমবার পর বড়ো ওস্তাদ এসে বসল দুলদুলির মুখোমুখি। কালো মুখে একগাল হাসি তার।

"যেমন মিষ্টি তেমনি দুষ্টু! কে রে, তুই?"

"আমি দুলদুলি।"

"এখানে কেন?"

“মাকে খুঁজতে এসেছি।”

“নিবাস কোথায়, মানে থাকা হয় কোথায়?”

“সার্কাসে।”

মস্ত বড়ো হাঁ করেছে ওস্তাদ। সার্কাস-টার্কাস কী জানা নেই বোধহয়। ডুলডুলি কানটান চুলকে বোঝাল কোনওমতে।

“ওই যে মস্ত বড়ো তাঁবু বনের ধারে।”

“বনের চেয়েও বড়ো?”

“সবাই কত খেলা দেখায়।”

“আমাদের চেয়ে ভালো খেলা দেখায়?”

এবারে ডুলডুলির ছোটো মাথায় গোল লাগল। তাঁবুর ভেতরের সার্কাসটা বেশি ভালো না বাইরের এই মস্ত বড়ো সার্কাসটা? অনেকক্ষণ কান লটপট আর শুঁড় দোলনোর পর ডুলডুলি ঠিক বুঝতে পারল না কী উত্তর দেওয়া যায়। বুড়ো ওস্তাদ চার হাতে-পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “চল, তোর মাকে খুঁজে দেখি।”

বুড়ো চলছে লম্বা লেজটি তুলে আগে আগে। ডুলডুলি চলল তার পিছু পিছু সজারু বন্ধুর সাথে। চলতে চলতে নাকে এল সোঁদা সোঁদা ভেজামাটির গন্ধ। খুশি হয়ে উঠল ডুলডুলির মনটা। আর একটু এগোতেই পাহাড়, তার গা বেয়ে নেমে আসছে ঝরনা! নীচে বড়ো বড়ো পাথরের খাঁজে ঝাঁপিয়ে পড়া জল-ফেনা, ছিটকে ওড়া জলের কণায় রোদ্দুর পড়ে সাতরঙা আলোর আর একটা যেন ঝরনা। ডুলডুলির চোখ জুড়িয়ে গেল, কী সুন্দর, কী সুন্দর! থপথপিয়ে জলে নেমে গেল ডুলডুলি চান করতে। বুড়ো হনু-ওস্তাদ আর সজারু বসে রইল পাড়ে। আকাশছোঁয়া পাহাড়ের ওপর থেকে জলের ধারা পাহাড়ের ওপর পড়ে মস্ত বড়ো দিঘির মতো তৈরি হয়েছে। আর একদিক থেকে নদী বয়ে জল চলেছে নিচের দিকে। বনের মাঝখান দিয়ে সাপের মতো আঁকাবাঁকা নদী। চান করে ভারি আরাম দিঘির জলে। দম নিয়ে একটা ডুব দিতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল ডুলডুলির। জলের তলায় ওলটানো বাটির মতো গা থেকে মুন্ডু বার করে কারা যেন চেয়ে আছে ওর দিকে। শুঁড় বাগিয়ে একটু ছুঁতেই অবাক কান্ড, শুঁড় ঢুকে গেছে বাটির ভেতর। খুব মজা পেল ডুলডুলি। এমনটি কেউ পারে না ওদের সার্কাসে। খুশি হয়ে জোরসে হাততালি দিতেই কতগুলো কালো কালো মাথা একসঙ্গে ভেসে উঠেছে জলের ওপর। ডুলডুলিকে এক নজর দেখে কলর-বলর করে কী কথা কয়ে আবার টুপ করে ডুব দিয়ে জলের তলায়। আবার ভেসে উঠেছে অনেকটা দূরে। খানিক বাদেই আবার ডুব। অবাক কান্ড! ওদের ছুঁচোর মতো গা, হাঁসের মতো ঠোঁট আর নৌকোর দাঁড়ের মতো লেজ। ভারি ব্যস্ত লোক তো! একটু কথা কইবার জো নেই!

পাড়ে বসে থাকা হনু-ওস্তাদ বলল, “বাসা বাঁধছে, ডিম পাড়বার সময় হয়েছে যে। ওদের বলে হংসচঞ্চু। ওপারে আছে ভোঁদড়দের দল। দেখে আয় গিয়ে, মাছ ধরবে বলে কাঠকুটো দিয়ে বাঁধ বেঁধেছে নদীতে।”

ও মা! সত্যিই তো। দুটো বড়ো পাথরের আড়ালে চালাক চালাক দেখতে হাতে-পায়ে ছটফটে তিন-চারটে ভোঁদড় জল আটকাতে ব্যস্ত। জমে ওঠা জলে কতরকম মাছ কিলবিল করছে।

“অ্যাই ওদের ধরছো কেন গো? কী করেছে ওরা?” বলল ডুলডুলি।

“খাব ওদের।”

“মাছ আবার কেউ খায় নাকি? খেতে হয় তো দুধ।”

একজন মেয়ে ভোঁদড় ডুলডুলির শুঁড়ে আলতো চাটি মেরে বলে গেল, “সে তোমার মতো ছোটোরা খায়। বড়োরা খায় মাছ। নইলে ভোঁদড় হয়ে জন্মানো বৃথা।”

ডুলডুলির শুঁড়ের দোলায় বাঁধ একটু ভেঙে যাওয়ার মাছগুলো, “থ্যাংক ইউ” বলে লাফিয়ে পালাতে লাগল আর ভোঁদড়েরা তাড়া করল ওকে। ছুট ছুট। দৌড়ে পাড়ে উঠে আসতেই হনু-ওস্তাদ আর ঝুমঝুমি দিদি এগিয়ে চলল বনের ভেতর, যেখানে উই আর পিঁপড়েদের মধ্যে বেদম লড়াই চলছে। হনু-ওস্তাদ বলল, “উইপোকাদের ডানা গজালে লাল পিঁপড়েদের হিংসে হয়। তখন লড়াই বাঁধে।”

লড়াইয়ের মাঠ থেকে উইপোকারা আকাশে উড়তেই যুদ্ধ-টুদ্ধ শেষ। লম্বা দাঁড়া সবজেরঙা ডাইন ফড়িংরা, “কী বোকা, কী বোকা” বলতে বলতে টপাটপ উই আর পিঁপড়ে খেতে লাগল। দুঃখ দুঃখ মুখ করে ওড়া উই আর পিঁপড়ের ঢিপির পাশ দিয়ে চলা শুরু করতেই বর্মচর্ম গায়ে একজন এসে হাজির। নাম তার বনরুই! ছুঁচলো মুখের ভেতর থেকে নিজের গায়ের থেকেও বেশি মাপের জিভ বার করে প্রাণভরে পিঁপড়ে আর উই খেতে লাগল সে। দেখে ডুলডুলি অবাক!

চলতে চলতে অনেক দূর! বন এবার হালকা হয়ে আসছে। বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ির পাশে পাশে বনের ফাঁকে নদী দেখা যাচ্ছে। ডুলডুলি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মাথার ওপর শন শন অনেক ডানার আওয়াজ। আর একটু এগোতেই বন পাতলা হয়ে এসেছে। নদী চওড়া হয়ে শেষমেশ পড়েছে যেখানে বন শেষ, সেখানে নীল জল আকাশপাতাল জুড়ে লাফালাফি করছে। সাদা ফেনার মুকুট মাথায় বড়ো বড়ো ঢেউ পাড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বনের শেষে এখানে বালির পাড়। সেখানে হাজার হাজার লাল ধেঙো বাঁকা ঠোঁট

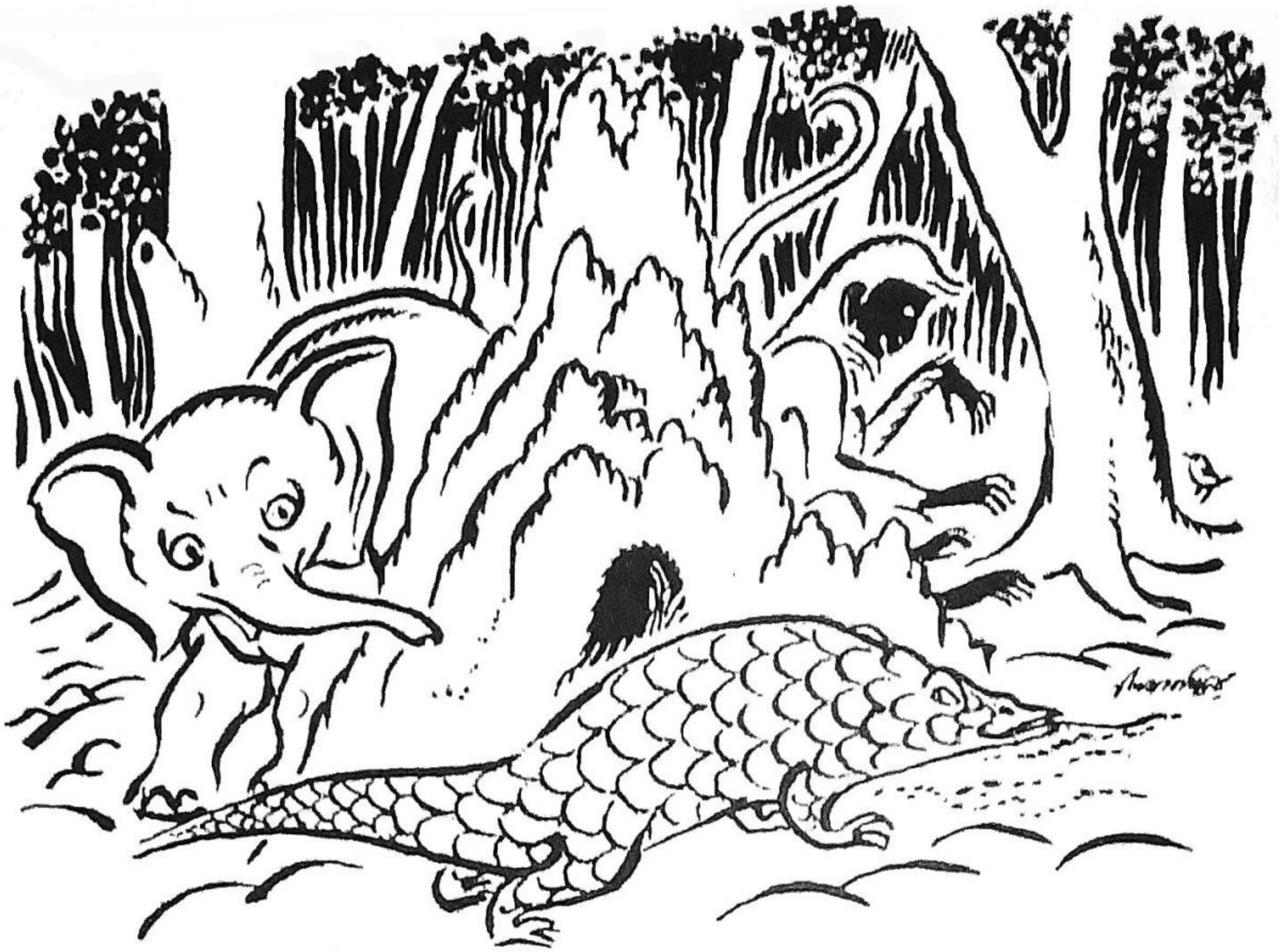

বড়ো বড়ো পাখির দলের ডাকাডাকিতে ঢেউয়ের শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে। জলের ফেনা দেখে ডুলডুলি খুব খুশি। ছুট্টে গিয়ে শুঁড়ে জল নিয়ে বেলুন বানাবার চেষ্টা করেও কিছু হল না। নাকে মুখে নোনাজল ঢুকে সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। ঢেউয়ের ধাক্কায় গড়াগড়ি নাকানিচোবানি হয়ে ডুলডুলি বেচারা জব্দ হয়ে গেল! বুড়ো ওস্তাদ একগাল হেসে বলল, "একে বলে সমুদ্দুর। পাখিগুলোকে বলে আগুনপাখি। ফিরে চল এবার।"

ঝুমঝুমি সজারুদিদি বলল, "বনের ভেতর দিয়ে ফিরে গেলে রাত হয়ে যাবে যে! সমুদ্দুরের ধার দিয়ে সোজা গেলেই হয়, পথও বেশি নয়। এতক্ষণে ওর মাও বোধহয় ফিরে এসেছে।"

তিনজনে এবার ছুট লাগাল বালির ওপর দিয়ে। ল্যাগব্যাগে ঠ্যাং ক'জন আগুনপাখিও মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলল পথ দেখিয়ে।

কিছুটা যেতেই দূরে দেখা গেল সার্কাসের বড়ো তাঁবুর চুড়ো, আর সার বেঁধে দূর থেকে কারা যেন এদিকেই আসছে। আর একটু কাছাকাছি আসতেই মা হরিমতী আর তার পিঠে বসে থাকা হরিপদ জোকারকে দেখা গেল। পিছু পিছু নটবর উটের পিঠে বসে থাকা মিচকে আর ফিঁচকে, রামছাগল চককর সিং, বককর সিং আর তাঁর পেছনে ঘোড়ার পিঠে রিং মাস্টার। সবাই মিলে মিছিল করে চলেছে ডুলডুলিকে খুঁজতে!

তারপর কত যে আদর করল সবাই আদরের ছোট্ট মেয়ে ডুলডুলিকে, বলবার নয়। বুড়ো হনু-ওস্তাদ আর ঝুমঝুমিদিদি সার্কাসে চাকরি পেল।

ডুলডুলি মায়ের পেটের তলায় চলতে চলতে বলল, "কোথায় ছিলে তুমি? কত খুঁজলাম!"

"বাজারে গিয়েছিলাম তো! এসে দেখি তুই নেই! দুষ্টু মেয়ে!"

"আমার খবর পেলে কোথায়?"

"সনাতন থাকতে খবর পেতে দেরি হয়? বনের ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে ওই তো খবর আনল!"

মাথার ওপর আগুনপাখিদের দলকে টা টা করে বুড়ো হাড়গিলে সনাতন ওর বিশাল ডানা মেলে নেমে এল নিচে। হরিমতী শুঁড় দিয়ে চোখের জল মুছে তাকাল দুলদুলির দিকে।

"বনের ভেতর কী দেখলি?"

দুলদুলি শুঁড় দুলিয়ে খুশি খুশি গলায় বলল, "সার্কাস!"

ছবিঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

চোরপাখি

শিশির বিশ্বাস

ছোটোকাকুকে এই জন্যই এত ভালো লাগে সুমনের। ওর মনের কথা ছোটোকাকু যেন ঠিক কীভাবে টের পেয়ে যায়। এতও জানে ছোটোকাকু! সুমন তো গোড়ায় মাকেই জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু বলতেই পারল না মা। খানিক দেখে-টেখে বলল, “ছোটো কাঠঠোকরা হবে বুঝি। নতুন এসেছে তো বাগানে!”

নতুন তো এসেছেই। সুমন গতকালই দেখেছে পাখিদুটোকে। চড়ুইয়ের থেকেও ছোটো। হালকা নীল রঙের পিঠ। পেটের দিকটা গাঢ় বাদামি। লেজটা দেখে মনে হয় কেউ বুঝি দুষ্টুমি করে কাঁচি চালিয়ে ছেঁটে দিয়েছে। লম্বা সূচলো ঠোঁট দিয়ে দিনভর দুটিতে জানালার পাশে মস্ত আমগাছের গা ঠুকে ঠুকে খাবার খুঁজছে। মধ্যে মধ্যে ডালের নিচের দিকে পা আটকে ঝুলন্ত অবস্থায় ঠোকরাতে ঠোকরাতে মুহূর্তের মধ্যে এ-মাথা থেকে ও-মাথা এমন ছুটে যায় দেখে ফিক করে হেসে ফেলেছিল সুমন।

গতকাল সারাদিনটা জানালা দিয়ে পাখিদুটো দেখেই কাটিয়ে দিয়েছে। দিনটা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, একটুও বোঝা যায়নি। মাত্র সাতদিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছে সুমন। দিনভর জানালার ধারে এইভাবে বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকা যে কী কষ্ট! অথচ উপায়ই বা কী। কোমর থেকে গোটা ডান পা'খানা প্লাস্টারে মোড়া। কবে যে আবার হাঁটতে পারবে! গোড়াতে তো বুক ঠেলে কান্না আসতে চাইত।

সন্ধের আগেই পাখিদুটো কোথায় উড়ে গেল, আর দেখা গেল না। সুমনের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল তখন। মনে মনে প্রার্থনা করেছিল, হে ভগবান, পাখিদুটো কাল যেন আবার আসে।

সেই রাত্তিরেই ছোটোকাকু ধানবাদ থেকে এল। সুমনের দুর্ঘটনার খবর পেয়েই দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে চলে এসেছে। ছোটোকাকুকে দেখেই সুমনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

ছোটোকাকুর বাড়ি আসা মানেই সুমনের দিনগুলো রঙিন হয়ে ওঠা। দিনগুলো তখন যে কীভাবে পেরিয়ে যায়! অথচ এবার সবকিছুই অন্যরকমের। ছোটোকাকু ওর পাশে বসে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝিয়েছে, “ছিঃ সুমন, পুরুষমানুষের কখনও কাঁদতে নেই।”

রাত্তিরে ছোটোকাকু ওকে অনেকক্ষণ ধরে ট্রেজার আইল্যান্ডের গল্প শুনিয়েছে। গল্পের ঘোরে সকালে সুমন ভুলেই গিয়েছিল পাখিদুটোর কথা। হঠাৎ জানালার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল। আরে, পাখিদুটো আজকেও এসেছে! ছোটোকাকু পাশে বসে কাগজ পড়ছিল। সুমন ডেকে দেখাল।

কাগজ থেকে মাথা তুলে ছোটোকাকু পাখিদুটোকে খুঁটিয়ে দেখছিল। সুমন জিজ্ঞেস করে, "কী পাখি ও-দুটো, কাকু?"

ছোটোকাকু ওর দিকে তাকিয়ে বলে, "ভারি সুন্দর পাখি, তাই না রে, সুমন! নামটাও ভারি মজার, চোরপাখি। ইংরেজি নাম, নাটহ্যাচ। কাঠঠোকরাদের স্বজাত। তবে কাঠঠোকরা নয়। আগে দেখিসনি কখনও?"

সুমন মাথা নেড়ে বলল, "পাখিদুটো কালকেই বাগানে এসেছে কাকু। সারাদিন দেখেছি।"

ছোটোকাকু বলে, "কেমন জোড়ায় ঘুরছে দেখেছিস? দাঁড়া, একটা মজা করব।"

কিন্তু কী মজা? ছোটোকাকু তখন আর কিছুই ভাঙল না।

ব্যাপারটা বোঝা গেল বিকেলে। ছোটোকাকু বাগান ঘুরে কোথা থেকে ইঞ্চি চারেক মোটা শুকনো গাছের গুঁড়ির ছোট্ট একটা টুকরো জোগাড় করে করাত চালিয়ে সেটা লম্বালম্বি চিরে ফেলল। ছোটোকাকুর বাক্সে এসব যন্ত্রপাতি সবসময় মজুত থাকে। তারপর হাতুড়ি, বাটালি নিয়ে সারা বিকেল ধরে ঠুকে ঠুকে টুকরোদুটোর চেরা দিকে নৌকোর খোলের মতো গর্ত করে ফেলল। শেষে গর্তের একটা করে দিক গুঁড়ির ধার পর্যন্ত বার করে দিয়ে, টুকরোদুটো ফের যেমন ছিল সেইভাবে জুড়ে একটা মোটা তার দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল।

গোড়ায় ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি সুমন। কিন্তু ছোটোকাকু টুকরোদুটো জুড়ে দিতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তাই ছোটোকাকু যখন জিজ্ঞেস করল, "এটা কী হল বল দেখি।" সুমন তৎক্ষণাৎ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, "গাছের কোটর।"

সত্যিই গাছের গুঁড়ির টুকরোটার ভেতর সুন্দর একটা কোটর তৈরি করেছে ছোটোকাকু। একপাশে বড়সড় একটা ফোকর, কোটরের মুখ। সন্ধ্যার মুখে ছোটোকাকু সেটা সুমনের জানালার সোজাসুজি আমগাছটার ডালে শক্ত করে বেঁধে রেখে এল।

মজাটা বোঝা গেল দিন দুয়েক পর। পাখিদুটো যথারীতি আমগাছে আসে খাবারের খোঁজে। হঠাৎ বড়ো পাখিটা এ-ডাল ও-ডাল ঘুরতে ঘুরতে ছোটোকাকুর সেই গুঁড়িটার ওপর এসে বসে। তারপর এদিক ওদিক খানিক তাকিয়ে টুক করে কোটরের ভেতর ঢুকে যায়। একটু পরেই দেখা গেল, কোটরের ভেতর থেকে মুখ বার করে পাখিটা ঘাড় বেঁকিয়ে চারপাশ দেখছে।

ছোটোকাকু বাড়ি ছিল না। আসতেই খবরটা দিল সুমন। ছোটোকাকু কিন্তু একটুও অবাক হল না। শুধু বলল, "আরও অনেক মজা হবে। তুই শুধু আমাকে চিঠি দিয়ে খবর জানাবি।"

সেদিন বিকেলেই ছোটোকাকু ধানবাদ ফিরে গেল। সুমনের মনটা একটু খারাপ হয়ে গেলেও পরদিনই ও ভুলে গেল সব। কী আশ্চর্য! পাখিদুটো সকাল থেকেই রাজ্যের খড়কুটো ঠোঁটে করে সেই কোটরে জড়ো করতে শুরু করেছে। বাসা বাঁধছে।

ধানবাদে সেদিনই চিঠি লিখল সুমন। ক'দিন পরেই এল ছোটোকাকুর চিঠি। ছোটোকাকু লিখেছে,

'সেলিম আলির বই থেকে চোরপাখির প্রাথমিক পরিচয়টুকুই সেদিন তোকে শুনিয়েছিলাম। চোরপাখি জোড়ায় ঘোরে না। দেখেই বুঝেছিলাম, ওদের ডিম পাড়ার সময় হয়েছে। সুবিধামতো গাছের কোটর পেলেই বাসা বাঁধবে। এবার কিন্তু তুই আমাকে চোরপাখির বাকি সব খবর দিবি। ভালো করে লক্ষ করা চাই।'

সবশেষে চিঠির নিচে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে,

'আশা করি সুমন সোনার এখন আর সারাদিন শুয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে না।'

সত্যি আজকাল সুমনের খাওয়ার সময়টুকুও বুঝি নেই। ছোটোকাকু একটা সুন্দর বই দিয়ে গিয়েছে। উইজার্ড অফ ওজ। কিন্তু পড়ার সময় কোথায়। সারাদিন জানালা দিয়ে পাখিদুটো দেখেই কেটে যায়।

বাসা তৈরি হয়ে গেছে। খুদে খুদে ঠোঁটে কাদা এনে কোটরের মুখটা বোঝাই করে ফেলেছে। মাঝখানে ছোট্ট একটু ফুটো রেখেছে মাত্র। তাই দিয়েই দিব্যি যাওয়া আসা করে। ছোটোপাখিটা আজকাল বাসা ছেড়ে বড়ো একটা বার হয় না। বড়োটা ঠোঁটে করে খাবার এনে ফুটো দিয়ে খাইয়ে যায়।

দিনগুলো আজকাল যে কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতেই পারে না সুমন। এর মধ্যে ছোটোকাকু একবার এসে ঘুরে গেছে। ইদানীং সুমন একটা খাতায় ওদের রোজকার কাজকর্মের সব খবরাখবর লিখে রাখছে। যেমন সেদিনই ও দেখল, কোত্থেকে একটা বীজ নিয়ে এল পাখিটা। তারপর ডালে বসে পায়ে চেপে ধরে ঠোঁটে ঠুকে ঠুকে দিব্যি খোসাটা ছাড়িয়ে ফেলে ভেতরের শাঁসটা খেয়ে ফেলল। এছাড়া এমনিতে তেমন ডাকাডাকি না করলেও মাঝে মধ্যে যখন ঘাড় বেঁকিয়ে শিস দেয়, ভারি মিষ্টি লাগে শুনতে।

খাতাখানা দেখে ছোটোকাকু ওর পিঠ চাপড়ে দিয়েছে। ছোটোকাকু এবার চলে যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল পাখিদুটোর দৌড়ঝাঁপ। দিনভর খাবার খুঁজে বেড়াবার বিরাম নেই। ঠোঁটে কিছু খাবার জমলেই গর্ত দিয়ে ঢুকে পড়ে ভেতরে। পরমুহূর্তেই পাখিদুটো আবার খাবারের খোঁজে বেরিয়ে যায়।

গোড়ার দিকে বাচ্চাদের সাড়াশব্দ বিশেষ পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই দিব্যি চিঁ চিঁ ডাক শুনতে পেল সুমন। সেই শুরু। তারপর তাদের চেল্লানির বিরাম নেই।

পরের মাসে ছোটোকাকু এল না। চিঠিতে সুমনের দ্রুত উন্নতির খবর পেয়ে ছুটি নেয়নি আর। সত্যিই সুমনের উন্নতি দেখে বাড়ির সবাই খুশি। মাত্র আড়াই মাসেই ফ্র্যাকচার প্রায় জোড়া লেগে গেছে। এক্স-রে রিপোর্ট দেখে ডাক্তারবাবু বলেছেন, সপ্তাহখানেকের মধ্যে প্লাস্টার কেটে দেবেন। অবিশ্যি সুমনের ওসব দিকে এখন মোটেই হুঁশ নেই। ওর মন এখন সবসময় পড়ে রয়েছে বাচ্চাগুলোর দিকে।

দুটো বাচ্চা হয়েছে। আজকাল দিব্যি ওরা বাসার ফুটো দিয়ে বাইরে মুখ বার করে। এদিক ওদিক তাকায়। বাপ-মাকে সামনে দেখলেই অ্যাত্ত বড়ো একটা হাঁ। দুটোর মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা লেগে যায় কে কত বড়ো হাঁ করতে পারে। মধ্যে মধ্যে ডানা ঝাপটায়। বোধহয় আর দিন কয়েকের ভেতর উড়তে পারবে।

ইতিমধ্যে সুমনকে একদিন হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হল। প্লাস্টার কেটে দিলেন ডাক্তারবাবু। একবারে ভালো হয়ে গেছে ওর পা। কিন্তু সুমন হাঁটতে পারে কই! কেমন সরু হয়ে গেছে পাখানা! ইস্কুলের ডাকসাইটে রাইট আউট সুমন কোনও জোরই পায় না। ডাক্তারবাবু বাড়িতে একটু একটু করে হাঁটতে বলেছেন। অথচ হাঁটার কথা বললেই বুক কেঁপে ওঠে। সাতদিনে বাবা-মার কাঁধে ভর দিয়েও একটানা কয়েক পাও হাঁটতে পারে না। এর মধ্যেই সেদিন দুপুরে ব্যাপারটা ঘটে গেল।

বাড়িতে প্রায় কেউ নেই। মা পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে। সুমনের চোখে ঘুম নেই। জানালার পাশে খাটে শুয়ে যথারীতি তাকিয়ে আছে। বাচ্চাদুটো প্রায়ই গর্তের মুখে এসে বসে থাকে। সুন্দর পালক গজিয়েছে। একটু বুঝি চোখ ফিরিয়েছিল ও। হঠাৎ একটা চিক চিক শব্দে সুমন চমকে দ্যাখে, কী কাণ্ড! দুটো বাচ্চাই ওড়ার মহড়া দিতে গিয়ে একসাথে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মাটিতে। আর তৎক্ষণাৎ পাশের বাড়ির বেড়ালটা এসে হাজির।

ক'দিন ধরেই সুমন দেখছে বেড়ালটা প্রায়ই এসে ওত পেতে থাকে। সেদিন তো গাছেও উঠেছিল ছানা খেতে। শেষটা ঠোক্কর খেয়ে পালিয়েছে। আজ বেড়ালটা প্রথমবারেই হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়ত। নেহাত ওদের বাপ-মায়ের ঠোকরানির চোটেই পারছে না। চিক চিক শব্দে সামনে ওরা ছোঁ মেরে ঠুকরে চলেছে বেড়ালটাকে।

হঠাৎ কী যে হল। 'মা' বলে চিৎকার করেই সুমন লাফিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। তারপর একদৌড়ে বাগানে। বেগতিক দেখে বেড়ালটা মুহূর্তে ভোঁ দৌড়। আর সেই সাথে দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে বাচ্চাদুটোও ফুড়ুত করে তুখোড় উড়িয়ের মতোই বাপ-মায়ের সঙ্গে গাছের আড়ালে কোথায় হারিয়ে গেল।

দেখে হায় হায় করে উঠল সুমন। ওর এতদিনের সঙ্গী পাখিদুটো বাচ্চা নিয়ে গেল কোথায়! হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ও। হঠাৎ চমক ভাঙল মায়ের ডাকে। ওর চিৎকারে মা কখন ঘুম চোখে উঠে এসেছেন। ওকে বাগানে ওইভাবে দেখেই দৌড়ে এলেন, "ওমা সুমন, তুই বাগানে হেঁটে এসেছিস! হাঁটতে পারছিস!"

ছুটে এসে তিনি জড়িয়ে ধরলেন সুমনকে। আর তক্ষুনি সুমনের চমক ভাঙল, আরে, তাই তো! হেঁটে কোথায়, সে তো দৌড়েই বাগানে এল! একটুও কষ্ট হচ্ছে না। রীতিমতো শক্ত পায়েই ও দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সুমনের মনে হল, চোরপাখি দুটো এই ক'মাস ওর কষ্টটুকু কোন ফাঁকে চুরি করে নিয়ে গেছে। ওর দু'চোখ ভরে জল এল হঠাৎ, ছোটোকাকুর জন্য।

মন কেমন

দীপান্বিতা রায়

"মটরুয়া, এ মটরুয়া......সো গঈ কেয়া.....তানি দরওয়াজা খোল দো বাবুয়া......মটরুয়া....."

শীতকাল। ঘড়ির কাঁটাও দশটার ঘর ছাড়িয়ে গেছে বেশ খানিকক্ষণ। মফস্বল এলাকায় এমনিতেই সন্ধের পর দ্রুত রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়। আর এই ইস্পাত কারখানার ছোট্ট কলোনিতে তো মানুষের জীবন চলে কারখানার ভোঁ-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে। সকাল ছটায় ফ্যাক্টরির গেট খোলে। তার ঠিক পনেরো মিনিট আগে ঘড়িঘর থেকে বিকট শব্দে ভোঁ বেজে সবাইকে বলে দেয়, সময় হল, এবার কাজে চলো হে....

শিফটে শিফটে ডিউটি। সকালের লোকেরা বাড়ি ফেরে দুপুর দুটোয়। দুপুরে যারা যায় তাদের ছুটি রাত দশটায়। কারখানার চোখ কিন্তু রাতেও খোলা থাকে। তার কাছে হাজিরা দিতে আর একদল গেট পেরিয়ে ঢোকে রাত দশটায়। আকাশের ঘুম ভাঙলে তবে তাদের বাড়ি ফেরার সময় হয়। তাই রাত দশটায়, রাতের লোকেরা গেটের ভিতরে আর দুপুরের লোকেরা নিজের নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়লেই রাস্তাঘাট শুনশান। ঘরে ঘরে সবাই আলো নিভিয়ে মশারির নিরাপদ আশ্রয়ে। এলাকাটা মালভূমি অঞ্চল বলে ঠাণ্ডাও পড়ে খুব বেশি। শীতের দিনে ঘড়ির কাঁটা দশটা ছাড়িয়ে আরও অর্ধেক রাস্তা এগিয়ে যাওয়া মানে প্রায় মধ্যরাত। ঝিমঝিমে কুয়াশা ভেদ করে তাই মটরুয়ার বাবার হাঁকডাক শোনা যায় অনেকটা দূর থেকেও।

লালির মা ছোট মেয়ের গায়ে লেপটা টেনে দিতে দিতে বিড়বিড় করে বলেন, "নির্ঘাৎ মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওইটুকু মেয়ে কখনও এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে? এত দেরি করা কেন বুঝি না বাপু। একটু আগে আগে এলেই হয়।"

"নিশ্চয় কোথাও ব্রেকডাউন হয়েছে। সেটা সামলে দিয়ে তবে বেরোতে পেরেছে। যাদবলালের কাজের ধরনটাই ওরকম। কী করব বলো......"

দীপক মিত্র মানে লালির বাবার কথাগুলো শুনে চুপ করে থাকেন প্রতিমা। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েন না। কান পেতে থাকেন। মটরুয়ার বাবা একটু পা-টা টেনে হাঁটেন। কারখানার ধাতুর পাত লাগানো বিশেষ ধরনের জুতোর একঘেয়ে ঠংঠং শব্দের মাঝখানে একসময় কড়াং করে একটা আওয়াজ হয়।ঘুম ভেঙেছে মটরুয়ার। পিতলের ছিটকিনি খুলছে। পাশ ফেরার শব্দে প্রতিমা বোঝেন দীপকও এতক্ষণ জেগেই ছিলেন।

রোলিং মিল কলোনিতে মটরুয়াদের ঠিক পাশের বাড়িটাই হচ্ছে লালি-মিলিদের। মাঝখানে শুধু একটা সিঁড়ির ব্যবধান। দোতলা ব্লকগুলোতে চারটে করে কোয়ার্টার। ওপরে দুটো, নিচে দুটো। মাঝখানে সিঁড়ি। একেবারেই সাধারণ দু-কামরায় থাকার ব্যবস্থা। সামনে ছোট্ট একটুখানি বাগান। সেখানে কেউ শখ করে দু-চারটে ফুলগাছ লাগায়। কেউ এমনিই ফেলে রাখে। আধমানুষ উঁচু কাঁটাতার আর মেহেন্দির বেড়া দিয়ে বাগানগুলোকে আলাদা করা। সবটাই খুব মামুলি, সাধারণ।

যদিও লালির সেরকম মনে হয় না মোটেই। সে তো জন্ম থেকে এখানেই বেড়ে উঠেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম কলোনিটাকে তার দিব্যি লাগে। লালিদের বাগানটা ছোট হলেও তিনটে বড় বড় গাছ আছে। অশ্বত্থ, নিম আর পেয়ারা। তারমধ্যে পেয়ারা গাছটা লালির সবথেকে পছন্দের। বছরে দুবার, শীত আর বর্ষায় গাছে পেয়ারা ধরে। তার আগে সুন্দর সাদা সাদা ফুল ফোটে।

পেয়ারাগাছটার চেহারাটিও বেশ মজাদার। মোটা কাণ্ডটা অল্প একটু ওঠার পরেই এপাশ-ওপাশ ডাল বেরিয়েছে। তাই সিঁড়ি বাওয়ার মত বেশ এডাল-ওডাল করে চট্‌ করে পৌঁছে যাওয়া যায় মগডালে। আবার মোটা ডালে দুপাশে দু-পা ঝুলিয়ে বসাও যায় আরাম করে। মায়ের মারের হাত থেকে বাঁচার জন্য পেয়ারাগাছটাই লালির নিরাপদ আশ্রয়। সেরকম দরকারও প্রায়শই হয়। তার কারণ, মায়ের মতে লালির রকমারি দুষ্টুবুদ্ধি।

আর লালি মনে করে আসল কারণ হল তার ছিঁচকাঁদুনে বোন মিলি। লালি এখন ক্লাস সিক্স। তারমানে যথেষ্ট বড় আর হোমরাচোমরা। মিলির উচিত দিদিকে যথাযথ সম্মান করে চলা। কিন্তু মিলি তো তা করেই না, উপরন্তু লালি যদি বড় দিদির অধিকারে তাকে একটু কান মুলে দেয় কিংবা মাথায় গাঁট্টা মারে, তাহলে এমন চিল চিৎকার জোড়ে যে প্রতিমা নির্ঘাৎ খুন্তি হাতে ছুটে আসেন। মিলির কোনও দোষ তিনি সহজে দেখতে পান না। তাই খুন্তির ঘা লালির পিঠে পড়ারই সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে লালিকে পেয়ারা গাছের মগডালে উঠে বসতেই হয়। মোটাসোটা প্রতিমা নিচে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ খুন্তি হাতে চেঁচামেচির পর হতাশ হয়ে রান্নাঘরে চলে যান।

কারখানা থেকে বাবা বাড়ি ফিরলে তাঁর কাছে নালিশ হয় ঠিকই, কিন্তু সেটা নিয়ে লালির তেমন কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কারণ মা যতই রেগে চিৎকার করেন বাবাও ঠিক ততখানিই চোখ পাকিয়ে তাকান লালির দিকে। তারপর গম্ভীর মুখ করে আলতোভাবে লালির কানটি ধরে যেন কত জোরে আড়াইপ্যাঁচ দিচ্ছেন এমনভাবে হালকা করে মুলে দেন। লালিও যেন কত ব্যাথা পাচ্ছে এমনভাবে মুখখানা কাঁচুমাচু করে ফেলে। ব্যাস, মা খুশি হয়ে বাবার জন্য পরোটা ভাজতে যান।

মিলিও ততক্ষণে দিদির শাস্তি দেখে কাঁদোকাঁদো। তাই দুইবোনে ভাব হতে দেরি হয় না। মা পরোটা আর ডিমভাজা নিয়ে এলে বাবা তার থেকে দু-টুকরো কেটে দুজনের মুখে পুরে দিয়ে চা খেতে খেতে মায়ের কাছে সারাদিনের গল্প শোনেন। মিলিও লালিকে নিয়ে বাগানে এস তাদের লোহার লম্বা গেটটায় চড়ে প্লেন প্লেন খেলে। কিংবা দুজনে দুজনের ফ্রকের ঝুলটা ধরে মুখে কু-ঝিকঝিক আওয়াজ করতে করতে ট্রেন চালায়।

কিন্তু লালি তো এখন একটু বড় হয়ে গেছে! তাই এই খেলাগুলো তার ঠিক পছন্দ হয় না। বড্ড বেশি ছেলেমানুষী মনে হয়। অথচ মিলি তো এছাড়া অন্য কিছু খেলতেই পারে না। একটু যে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলবে তারও উপায় নেই। মিলি ছুটে তাকে ধরতেই পারবে না। একবার চোর হলে যদি সারাক্ষণ চোর হয়েই থাকতে হয় তাহলে মিলিরই বা খেলতে ভালো লাগবে কেন। মুশকিল হচ্ছে লালিদের এই রাস্তাটায় অনেকগুলো কোয়ার্টার থাকলেও ঠিক লালির সমবয়সী কোনও বাচ্চা নেই। হয় তারা মিলির মত ছোট। আর নয়তো এতটাই বড় যে লালিকে খেলতে নেবে না। তাও লালি মাঝে মধ্যে বড়রা যখন মোড়ের মাথায় হইহই করে ধাপসা কিংবা বুড়ি-বাসন্তী খেলে তখন সেখানে গিয়ে ঢুকেছে, কিন্তু পাত্তা পায়নি বিশেষ।

গতবছর গরমের ছুটিটা তাই লালির একটু মনমরাভাবেই কাটছিল। সেই সময় হঠাৎ একদিন এসে হাজির হল মটরুয়া। যাদবচাচার মেয়ে। লালিদের পাশের কোয়ার্টারটাই যাদবচাচার। কালো মত মানুষটি। লম্বা বেশি নয়। তবে বেশ পেটানো চেহারা। খাকি রঙের প্যান্টের সঙ্গে তেলচিটে, কালির দাগ মাখা ওভারঅল পরে জুতোর ঠংঠং শব্দ তুলে কারখানায় যায়। একাই থাকে। নিজেই রান্নাবান্না করে খায়। লালির সঙ্গে যাদবচাচার এমনিতে কোনও কথাবার্তাই হয় না। তবে ওদের বাগানে একটা বড় বেলগাছ আছে। লালিকে সেখান থেকে মাঝে মাঝে মায়ের পুজোর জন্য বেল পাতা পেড়ে আনতে হয়। গরমের শুরুতে গাছে ফুল ফোটে। ভারি

চমৎকার সুগন্ধ তার। তারপর বর্ষার শুরুতে যখন ঢুপঢাপ বেল পড়তে শুরু করে তখন যাদবচাচা লালিকে ডেকে বলে, “এ বেটি বেল লে যা। ভাবিকো দে দেনা।”

মা বেল পুড়িয়ে শরবত বানান। বাবা খেতে ভালোবাসেন। যাদবচাচা নিশ্চয় ভালোবাসে না। কারণ মা কখনও চাচাকে শরবত দেন না। বরং শীতের দিনে মাঝেমধ্যে বেশি করে দুধ আর এলাচগুঁড়ো দিয়ে চা বানান। বাবা গিয়ে যাদবচাচাকে ডেকে আনেন। দুজনে মিলে বসে চা খায় আর গল্প করে। বাবার কাছেই লালি শুনেছে, যাদবচাচা নাকি খুব ভালো মিস্ত্রি। হাতের কাজে রীতিমত নাম-ডাক আছে। কারখানার সাহেব-সুবোরাও খাতির করে চলে।

এহেন যাদবচাচার বারান্দায় একদিন সকালবেলা একটা বাচ্চামত মেয়েকে বসে থাকতে দেখে লালি তো অবাক। তার থেকে সামান্য একটু ছোট হবে হয়ত মেয়েটা। রোগাসোগা চেহারা। মাথার ঢেউ খেলানো চুলগুলোতে একটা বেণী বেঁধে নিচে একটা লাল ফিতের ফুল। তবে বেণীটা সম্ভবত আগের দিন রাতে বাঁধা হয়েছে। তাই আলগা হয়ে গিয়ে দুপাশ থেকে চুল বেরিয়ে পড়েছে। চোখেমুখে সকালের আলোয় একদম অচেনা একটা জায়গাকে দেখার বিস্ময়।

লালিকে দেখেই মেয়েটার চোখদুটো চকচক করে ওঠে, তারপরেই ফিক্ করে হেসে দেয়। লালিও অমনি এক ভোঁ দৌড়ে সোজা মায়ের কাছে রান্নাঘরে, “মা মা, যাদবচাচার বাড়িতে একটা মেয়ে এসেছে। বারান্দায় বসে আছে।”

লালির কথা শুনে মা একটু আশ্চর্য হয়ে তাকান। রান্নাঘরেরই একপাশে চেয়ারে বসে বাবা চা খাচ্ছিলেন। কাপটা জানলার তাকে নামিয়ে রেখে বলেন, “হতে পারে। যাদবলাল তো বাড়ি গেছিল। হয়তো মেয়েকে নিয়ে এসেছে। কত বড় রে মেয়েটা?”

“এই আমার মতই.... না না আমার থেকে একটু ছোট হবে....”

“ওঁর তো শুনেছি তিন মেয়ে। এটা তাহলে বোধহয় ছোটটা....”

কিছুক্ষণের মধ্যেই মায়ের কাছে যাবতীয় বৃত্তান্ত জেনে ফেলে লালি। মেয়েটার নাম মটরু। যাদবচাচার ছোট মেয়ে। বয়স বছর দশেক মানে লালির থেকে একটু ছোট। যাদবচাচার নাকি নিজে রান্না করে খেতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই দেশে গিয়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছেন।

“ওইটুকু মেয়ে নিজে নিজে রান্নাবান্না, বাসনমাজা সব করবে কী করে গো ? ওদের তো আর কোনও কাজের লোকও নেই। তাছাড়া ওর বাবার তো কখনও সখনও নাইট-ডিউটিও পড়ে। তখন মেয়েটা থাকবে কোথায়?”

যাদবচাচার কাণ্ডকারখানা দেখে মা দুশ্চিন্তায় পড়লেও কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল, মটরু বেশ কাজের মেয়ে। অন্তত বাপ-বেটির মত রান্না সে করতে পারে। রান্নার পদ অবশ্য বেশি নয়। রুটির সঙ্গে ডাল আর একটা ভাজি। ভৈঁসা ঘি বয়ামে ভরা থাকে। তাই একটু মাখিয়ে দেওয়া। তারপর বাসনক'টা ধুয়ে ফেলা। সরকারি চুল্লায় কয়লা ঠেসে মুখ বন্ধ করে রাখলে রোজ রোজ আগুন দেওয়ারও দরকার পড়ে না। তবে রান্না আর বাসনক'টা ধুয়ে রাখা ছাড়া আর কোনও কাজ মটরু করে না। ঘরে ধুলো জমে। ছাদ থেকে ঝুল নেমে আসে নাকের ডগায়। তাতে তার কিছু যায় আসে না। সে আপনমনে বাগানে ঘুরে বেড়ায়। মোড়ের মাথার গুমটি দোকান থেকে চুরান কিনে এনে মনোযোগ দিয়ে বসে বসে চাটে আর অপেক্ষা করে কতক্ষণে লালি স্কুল থেকে ফিরবে।

লালির সঙ্গে দারুণ ভাব হয়ে গেছে মটরুয়ার। যদিও ওর নাম মটরু কিন্তু যাদবচাচা যেহেতু মটরুয়া বলে ডাকে, তাই লালিও ওকে মটরুয়াই বলে। স্কুল থেকে ফিরে, খাওয়া-দাওয়া সেরে লালি বাগানে বেরোলেই মটরুয়া চলে আসে দরজার হুড়কোটা টেনে দিয়ে। তারপর চলে নানারকম খেলা। রাস্তায় গোল, চৌকো নানারকম ঘর কেটে কিৎ কিৎ, ডাংগুলি, লাল লাঠি কিংবা নিদেন পক্ষে স্কিপিং দড়ি নিয়ে লাফানো। সব খেলাতেই মটরুয়ার দারুণ উৎসাহ। আগের বছর জন্মদিনে বাবা ওদের দুবোনকে দুটো ব্যাডমিন্টন রাকেট কিনে দিয়েছিলেন। মটরুয়া ব্যাডমিন্টনটা শিখে নেওয়ার পর দারুণ খেলা জমে। মাঝেমাঝে মিলি এসে ঝামেলা করে অবশ্য। কারণ একটা রাকেট তো তার। তাই তাকেও খেলায় নিতে হবে। তখন চোখে চোখে ইশারা করে মটরুয়া কিংবা লালির মধ্যে কেউ একজন কিছুক্ষণের জন্য মিলিকে র‍্যাকেটটা দিয়ে দুধুভাতু করে খেলতে দেয়।

এক একদিন আবার খেলা তেমন জমে না। সেদিন দুই বন্ধুতে বসে বসে গল্প করে। লালির তো গল্প অনেক। স্কুল, স্কুলের বন্ধু আর দিদিমণিদের গল্প। মামাবাড়ি আর ঠাকমার বাড়ি যাওয়ার গল্প। মটরুয়ার গল্পের অবশ্য স্থান একটাই, আরা জেলায় তাদের পিলাপাতি গাঁও। তবে বৈচিত্র অনেক। লালির ভারি ভালো লাগে মটরুয়ার কাছে তাদের গাঁওয়ের গল্প শুনতে। সেখানে নাকি তাদের এই রোলিং মিল কলোনির মত ইঁট-সিমেন্টের বাড়ি হয় না। মাটির বাড়ি। মোটা মোটা দেওয়াল। ভিতরটা নাকি গরমির দিনেও ঠাণ্ডা থাকে। মটরুয়ারদের বাড়ির সামনে মস্ত উঠোন। রোজ তার মা আর দিদি মিলে সেটাকে পরিষ্কার করে মুছে রাখে। সেই উঠোনে একটা খাটিয়া পেতে বসে থাকে মটরুয়ার দাদি । খাটিয়ায় বসে বসেই সারা সংসারের ওপর কড়া নজর রাখে । আর দাওয়ায় যে বিশাল নিমগাছটা আছে, তার ফল মাটিতে পড়লেই সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করে । ওই নিমফল পিষে তেল বের করা হয়। নিমের তেল নাকি শরীরের পক্ষে খুব ভালো। শীতের দিনে ওই দাওয়াতেই বসে রোদে পিঠ দিয়ে ভাত খাওয়া হয়। গরমকালে খাটিয়া পেতে শোয়া।

মটরুয়াদের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া সবজি ক্ষেত। সেখানে ভিন্ডি, বেগুন হয়। মাচা বেঁধে ধুঁধুলের লতা ওঠানো থাকে। এক কোনে একটা মস্ত ইঁদারা আছে। শুখার দিনে সারা গাঁওয়ের মানুষ মটরুয়াদের ইঁদারা থেকে জল নিতে আসে। ওদের ইঁদারার জল নাকি কখনও শুকোয় না। রাতে ঘুমের মধ্যেও নাকি মটরু ইঁদারা থেকে জল তোলার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনতে পায়। মা মাঝে মাঝে রাগ করে কিন্তু দাদি নাকি বলে দিয়েছে জল নিতে কাউকে বারণ করা চলবে না।

বাপু কারখানায় কাজ করে টাকা পাঠায়। তাই গাঁওয়ে জমি-জিরেত আছে । গাই, ভঁইসও আছে। দাদি নিজে হাতে দুবেলা দুধ দোয়। অড়হড়ের ক্ষেত আছে মটরুদের। লম্বা লম্বা সরু গাছ। ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে গেলে তাদের মত ছোট বাচ্চাদের খুঁজেই পাওয়া যায় না। গাছে যখন অড়হরের শুঁটি আসে তখন সেই কাঁচা অড়হড় খেতে খুব মিঠা। মটরু ক্ষেতে নেমে কোঁচড় ভরে অড়হড় তুলে আনত। দিদিরা বড় বলে ওদের যখন-তখন বাড়ি থেকে বেরোন মানা। তাই সেই কাঁচা অড়হড় বাড়ি এনে তিন বোনে মিলে খেত। অড়হড় পাকলেই কোথা থেকে উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি। সবুজ গা। টুকটুকে লাল ঠোঁট। টিয়াপাখি খুব ভালো লাগে মটরুর। এই রোলিং মিল কলোনিতে কোথাও টিয়াপাখি নেই দেখে ভারি আশ্চর্য লাগে তার। চারটে ব্লক দূরে কৃষ্ণাদিদিরা বাড়িতে টিয়াপাখি পোষে। মাঝে মাঝে গিয়ে সেই খাঁচার পাখিটাকেই দেখে আসে সে। মটরু মুখে না বললেও তার কথা শুনে লালি বুঝতে পারে গাঁওয়ের জন্য মন কেমন করে তার। মন কেমন করে মা আর দিদিদের জন্য।

মটরুর সঙ্গে লালির অতখানি ভাবসাব প্রতিমার খুব একটা পছন্দ হয় না। একে তো স্কুল-টুলের পাট নেই মেয়েটার। তার ওপর চিরকুট্টি নোংরা। রুক্ষ চুলে তেল-চিরুণি কিছুই পড়ে না। উকুনও থাকতে পারে। গায়ে সাবান দেওয়ার তো প্রশ্নই নেই। স্নানটাও রোজ ঠিকমত করে কিনা সন্দেহ। জামা-কাপড় ময়লা, ধুলোমাখা । সাধারণত দু-তিন মাসে একদিন যাদবলাল সোডা-সাবান দিয়ে নিজের আর মেয়ের জামা-কাপড় একসঙ্গে ফুটিয়ে দেয়। মটরু সেদিনটা পেনি পরেই ঘোরে। তারপর কয়েকদিন জামাটা একটু পরিষ্কার থাকলেও আবার যে কে সেই। কিন্তু লালিক এসব কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয় । স্কুল থেকে ফিরে জামা-কাপড় ছাড়ারও তর নেই, মুখে দুটো গুঁজেই ভোঁ দৌড়।

লালির বাবাকেও বলে কোনও লাভ নেই। গম্ভীর মুখে সবকথা শুনবে ঠিকই। কিন্তু তারপর নির্ঘাৎ বলবেন, “আরে এগুলো কোনও চিন্তা করার ব্যাপারই নয়। সমবয়সী, তাই বন্ধুত্ব হয়েছে। দুজনে একসঙ্গে খেলছে। বন্ধু তো মানুষের অনেকরকমই থাকে.....”

প্রতিমা তাই গতবছরটা চুপচাপই ছিলেন। কিন্তু এবছর লালির হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার রেজাল্টটা একটু বাড়াবাড়ি রকম খারাপ হওয়ায় আর মেনে নিতে পারলেন না, “পড়া নেই শোনা নেই সারাটা দিন শুধু টো-টো কোম্পানি। যখনই দেখছি মটরুর সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে। খবরদার যদি আর বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েছ। স্কুল থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরেই পড়তে বসবে। নম্বর যা হয়েছে তাতে তো এবার আর নতুন ক্লাসে ওঠা হবে বলে মনে হচ্ছে না.....”

দীপকের খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। তবু প্রতিমার তাড়নায় একজন প্রাইভেট টিউটরের ব্যবস্থাও হল। লালি স্কুল থেকে ফেরার একটু পরেই তিনি পড়াতে আসেন। তাই বিকেলে খেলা বন্ধ। ছুটির দিনগুলোকেও একেবারে নিশ্ছিদ্র রুটিনে মুড়ে দিয়েছেন প্রতিমা। হাতে মাত্র একটা মাস সময়। তারপরেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। ততদিন অন্তত মেয়ের ব্যাপারে কোনওরকম নাক গলানো চলবে না বলে কড়ার করে নিয়েছেন দীপককে দিয়ে।

বেচারা লালির শুকনো মুখটা দেখলে কষ্ট হয় দীপকের। কিন্তু তার থেকেও বেশি কষ্ট হয় মটরুকে দেখলে। লালির তো তবু স্কুল আছে, স্কুলের বন্ধু আছে, পড়াশোনা আছে। মটরুর তো কিছুই নেই। সারাদিন সে শুধু ছোট্ট বাগানটাতেই একলা ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে দু-হাঁটুতে মুখ রেখে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে

থাকে। দীপক লক্ষ করেছেন, লালির স্কুল থেকে ফেরার সময় হলেই বাগানের গেটটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মটরু। কিন্তু মায়ের ভয়ে লালি বেচারি বন্ধুকে একটু হাত নেড়েই ঘরে ঢুকে পড়ে।

অ্যানুয়াল পরীক্ষা বলে কথা। রাত্তিরে তাই আজকাল খাওয়া-দাওয়ার পরও পড়তে বসতে হয় লালিকে। দশটার ভোঁ বেজে যাওয়ার পরে যাদবলাল যখন এসে মটরুকে ডাকাডাকি করে, তখন বইয়ের পাতায় চোখ থাকলেও লালির কানদুটো যে সেদিকেই খাড়া হয়ে থাকে বুঝতে অসুবিধা হয় না বাবার।

প্রতিমা অবশ্য গম্ভীর মুখে উল বোনেন। তবে কেন জানি না রোজই ডাকাডাকিটা শুরু হলেই বোনা থামিয়ে একমনে ঘর গুণতে থাকেন। মটরুর ছিটকিনি খোলার শব্দটাই হলেই বোনার কাঁটা দুটো সচল হয় এবার। আর মিলি বাবার কোলের কাছ থেকে ঘুমো ঘুমো মুখটা তুলে বলে, "মটরুদিদি একলা একলা কী করে ঘুমোয় বাবা ? অন্ধকারে ভয় লাগে না ?"

কদিন ধরেই জব্বর ঠাণ্ডা পড়েছে। বিকেল হতে না হতেই রাস্তাঘাট শুনশান। এদিকে লালির পরীক্ষাও শুরু হয়ে গেছে। বাড়িতে তাই বেশ একটা গম্ভীর পরিবেশ। এরমধ্যে অফিসের কাজে দীপককে কয়েকদিনের জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে মনে হল প্রতিমা যেন একটু বেশিরকম চুপচাপ। কারণটা জানতে চাইলে চোখের ইশারায় চুপ করে থাকতে বললেন প্রতিমা। একটু পরে লালি পাশের ঘরে বই-খাতা নিয়ে বসে পড়লে নীচু গলায় বললেন, "মটরুটার খুব শরীর খারাপ। ভীষণ জ্বর। উঠতে পারছে না। এদিকে কারখানায় ব্রেকডাউন চলছে। তাই ওর বাবাকে ডিউটিতে যেতেই হচ্ছে।"

"সে কী ! তুমি জানলে কী করে?"

"কদিন ধরেই লক্ষ করছিলাম, মেয়েটাকে একেবারেই বাইরে দেখা যাচ্ছে না। তো সেদিন বেলপাতা পাড়তে গিয়ে মনে হল ঘর থেকে গোঁ গোঁ আওয়াজ আসছে। বারান্দায় উঠে দেখি দরজা খোলা। মটরু মাটিতে পড়ে আছে। খাটিয়াতেই শুয়ে ছিল। জ্বরের ঘোরে গড়িয়ে পড়ে গেছে। গা দেখি একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।"

"ডাক্তারকে খবর দিয়েছিলে ?"

"ওর বাবাকে না জিজ্ঞাসা করে কী করে দিই বলো ? কোনওরকমে মেয়েটাকে তুলে শোয়ালাম। এই ঠাণ্ডায় একটা কাঁথা গায়ে দিয়েছে। বিছানাটা চিটচিটে ময়লা। দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। বাড়ি থেকে একগ্লাস দুধ আর ক্যালপল নিয়ে গিয়ে খাওয়ালাম। একটা কম্বলও দিয়ে এসেছি গায়ে চাপা দেওয়ার জন্য।"

কোনওরকমে বুকের মধ্যে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দীপক বললেন, "লালিকে কিছু বলোনি বুঝি?"

"না। বললেই বড্ড মনখারাপ হয়ে যাবে। আটকানোও যাবে না। কান্নাকাটি করবে। আর দুটো মোটে পরীক্ষা বাকি। কিন্তু তুমি যাদবলালকে বলো ছুটি নিতে। ওইটুকু বাচ্চা মেয়ে। অত জ্বর....বাড়িতে একলা থাকতে পারে ! হাসপাতালে দিতে বলো নাহলে....."

গজগজ করতে থাকেন প্রতিমা। সেদিনও রাতে বেশ দেরি করেই ফেরে যাদবলাল। পায়ের শব্দে টের পান দীপক। তবে ডাকাডাকি শোনা যায় না। পরের দিন মটরুর বাবার সঙ্গে কথা বলে একটু বিরক্ত হয়েই বাড়ি এসে প্রতিমাকে বলেন, "এদের ব্যাপার-স্যাপার কিছু বুঝি না। ছুটি নাকি নিতে পারবে না। প্ল্যান্টে একটা নতুন অর্ডার এসেছে। সেটার কাজ চলছে। আরে বাবা, সাহেবকে তো বলতে হবে যে মেয়ের এরকম অসুখ। সেও বলবে না। এদিকে হাসপাতালে দিতেও রাজি নয়......."

"মেয়েটা কেমন আছে দেখলে ?"

"বলল তো একটু ভালো আছে। জ্বরটা নাকি কমেছে। দেখে তো কিছু বুঝলাম না....."

"আর বুঝেও কাজ নেই। আজ লালির অঙ্ক পরীক্ষাটা হয়ে যাক। কাল সকালেই আমি মেয়েটাকে এখানে নিয়ে চলে আসব......"

"সে কী গো ! লালির ইতিহাস পরীক্ষা তো এখনও বাকি....."

"থাকুক গে। অমন বাপের ভরসায় রাখলে মরে যাবে তো মেয়েটা....ওসব পরীক্ষা আমাকে দেখাতে এস না....."

হতবাক দীপককে প্রায় মুখ ঝামটা দিয়ে উঠে যান প্রতিমা। লালি খবরটা জেনে যায় রাতেই। মটরুদিদিকে বাড়িতে আনা হবে জেনে মিলিও বেজায় খুশি। দুই বোনেই ভোর থেকে উঠে ছটফট করছে। কিন্তু যাদবলাল রাতে অনেক দেরি করে ফিরেছে। তাই তার ঘুম থেকে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিলেন প্রতিমা। কিন্তু

লালির তো অত দায় নেই। সে কোন সময় সুট্ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে প্রতিমা কিংবা দীপক কেউই টের পাননি।

হঠাৎ মেয়ের চিৎকারে দুজনে ছুটে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। যাদবলালের কোয়ার্টারের বারান্দায় একটা বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেটাকে একেবারে মটরুর মতই দেখতে। কিন্তু তার চুলগুলো পরিষ্কার করে তেল দিয়ে দু-বিনুনিতে বাঁধা। নিচে লাল ফিতের ফুল। পরনে একটা ধপধপে কাচা জামা, সঙ্গে কমলা রঙের সোয়েটার। দু-চোখে আবার হালকা একটু কাজলের টান। প্রতিমাকে দেখে একগাল হেসে মেয়েটা বলে ওঠে, "মাঈ আ গইলবা চাচি। বাপু নে তার ভেজা থা। বুখার সুনকর কালহি সামকো টিরেন মে আ গয়ী মেরে মাঈ।"

"মটরুয়াদিদির মা এসে গেছে, মটরুয়াদিদির মা এসে গেছে....." দুহাতে তালি দিতে দিতে লাফাচ্ছে মিলি। প্রতিমা একটু মুচকি হেসে দীপকের দিকে তাকিয়ে বলেন, "যাক্, যাদবলাল তাহলে ব্যবস্থাটা ঠিকঠাকই করেছে। যাই গিয়ে মটরুয়ার মায়ের সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি। লালি তুমি পড়তে বোসো, ইতিহাস পরীক্ষা বাকি আছে কিন্তু....."

মেয়ের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে এবার আর নিজেকে সামলাতে না পেরে হো-হো করে হেসে ওঠেন লালির বাবা।

অলঙ্করণঃ অর্ণব চক্রবর্তী

শাশ্বতী চন্দ

"হরিণ! হরিণ," আচমকা চিৎকার করে সামনের সিটে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঋক।

রাজু পাকা ড্রাইভার।পাহাড়ে গাড়ি চালানোর জন্য যে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়, যে কোনো আচমকা বিপদে যে মাথা স্থির রাখতে হয় সে বিষয়ে পূর্ণ সচেতন।তবু তারও হাত কেঁপে গেল সামান্য। নিপুণ হাতে তাল সামলে ধমকে উঠল, "ও কী করছ খোকাবাবু? অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত একটু হলে।"

এন. জে.পি স্টেশন থেকে যখন জিপে উঠছিল তখনই রাজুর সংগে ধুন্ধুমার হয়ে গিয়েছিল ঋকের। কারণটা আর কিছু না। রাজু ঋককে খোকাবাবু বলে ডেকেছিল।

"খোকাবাবু? আমি? কভি নেহি।" ক্লাস সিক্সে পড়া ঋক গর্জন করে উঠেছিল।

বচসা অনেকদূর গড়াতে পারত। তবে তার আগেই ঋকের বাবা মনোময় এক প্যাকেট চিপস কিনে ঋকের হাতে দিয়ে টেনেটুনে জিপে তুলে দিয়েছিল। চিপস মুখে নিয়ে তো আর ঝগড়া করা যায় না। জিপের জানালার পাশে বসেও না। ফলে ঝগড়া মুলতুবি রেখেছিল ঋক।

কিন্তু এখন রাজুর খোকাবাবু সম্বোধন ভালো করে কানেই ঢোকে নি ঋকের। এতটাই উত্তেজিত হয়ে রয়েছে সে। আবারও চিৎকার করল, "হরিণ। দেখলে তোমরা? ইশ। ছবি তোলা হল না। কখন থেকে বলছি বাবা, তোমার মোবাইলটা আমার হাতে দাও। তুমি শুনছই না। ও কী? তোমরা সবাই হাসছ কেন?"

সামনের সিটে বাবা কৌশিকের কোল ঘেষে বসেছিল পাঁচ বছরের তিতলি। ও বলে বসল, "হরিণ না গো ঋকদাদা, ওটা তো ছাগল। ধ্যাত।তুমি না–"

আবারও হাসির তুফান উঠল চারদিকে। মরীয়ার মত বলে উঠল ঋক, "কক্ষনো না। আমি হরিণ আর ছাগলের ফারাক বুঝি না নাকি? ছাগল নাকি আমি? ছাগল কখনো অত বড় হয়? অত বড় শিং থাকে? যত্তসব।"

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে মনোময় বললেন, বলছিলাম কি ঋক,ওটা কিন্তু ছাগলই। পাহাড়ি ছাগল। আকারে একটু বড়। শিংটাও বাহারি। না না, তাই বলে তোকে কিন্তু আমরা ওই প্রাণীটা মানে ইয়েটা ভাবছি না। তুই নিজেই বললি যদিও।"

মা কস্তুরী হাত বাড়িয়ে ঋকের চুলে আদর দেন, "ঘুমিয়ে পড়েছিলি তুই?"

“না। ঠিক ঘুম না। চোখটা একটু লেগে গিয়েছিল।” ঋক লজ্জিত মুখে বলে।

“সেইজন্যই। চটকা ভাঙতেই ছাগল দেখে হরিণ ভেবেছিস।”

ও পাশ থেকে মীনা কাকিমা বলেন, “তাই বলে ছাগলকে হরিণ? কোথায় হরিণের সোনালী গা, আর কোথায় ছাগলের মিশকালো শরীর! তোর কল্পনাশক্তি আছে বটে ঋক!”

জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়ায় ঋক। রাগ হয় নিজের ওপর। ছাগলকে হরিণ ভাবার বোকামি করেছে বলে শুধু নয়, কেমন করে ঘুমিয়ে পড়ল সেই কথা ভেবেও। চারপাশে প্রকৃতি আর অপরূপ সৌন্দর্য মেলে বসে আছে। সবুজ পাহাড়।এ কটা করে বাঁক ঘুরছে জিপটা,আর সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য বদলাচ্ছে। কোথাও পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসছে ঝর্না। কোথাও পাহাড়ের ঢালে অজস্র রংচঙা ফুল ফুটিয়ে হাসছে বুনোলতা। আবার কোথাও দিনের বেলাতেই ছায়া ঘনিয়েছে গাছপালার ঘনতার কারণে। সবই কী রোমাঞ্চকর!

তার ওপর তিস্তা নদী তো আছেই! নাচতে নাচতে লাফাতে লাফাতে যেন ঋকদের সংগেই চলেছে। অদ্ভুত সবজেটে জল। তীব্র স্রোত। নদীর এমন রঙ, পাহাড়ের এমন রূপ, ঝরনার এমন আওয়াজ আগে কখনো দেখেনি শোনেনি ঋক। সব মনের মধ্যে রেখে দিতে হবে। ফিরে গিয়ে গল্প বলতে হবে বন্ধুদের। বন্ধুরা ওকে গোয়া, শিমলা, আন্দামান, মন্দারমনির কম গল্প তো শোনায়নি! এতদিন শুধু চুপ করে শুনেই গিয়েছে ঋক। এবার ওর শোনানোর পালা। ওর কালিম্পং ভ্রমণের গল্প। যাতে কোনো গল্প বাদ না পড়ে যায় সেজন্য একটা ডায়েরি এনেছে ঋক। লিখে লিখে রাখবে সব জায়গার নাম। জানালায় থুৎনি নামিয়ে রেখে নিবিষ্ট হয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে ঋক।

ভিতরে আবার গল্প শুরু হয়ে গিয়েছে বড়দের মধ্যে। ঋকের বাবা মনোময়, মা কস্তুরী, বাবার বন্ধু কৌশিককাকু, মীনা কাকিমা আর কাকুর মেতে তিতলি। এই ছয়জনের টিম বানিয়ে ঘুরতে আসা হয়েছে। অবশ্য সাড়ে পাঁচও বলা যায়। পাঁচ বছরের তিতলিকে তো গোটা মানুষ বলা যায় না! যদিও গলার জোরে একাই দেড় মানুষ বরাবর। আর দুষ্টুমিতে পুরো এক ডজন মানুষের বরাবর। এই ঋককে চিমটি কেটে দৌড়াল। এই ঋকের জুতো লুকিয়ে রাখল। এইসবই চলছে। তবে ঋক রাগ করছে না। এতদিন পর বেড়াতে আসা হল! মন এত ফুরফুরে হয়ে আছে যে রাগ করার কথা ভাবতেই পারছে না।

সত্যি বহুদিন পর বেরোনো হল। সেই কোন ছোট্টবেলায় বাবা মায়ের সঙ্গে কন্যাকুমারীকা গিয়েছিল। আবছা আবছা মনে পড়ে সমুদ্রের ঢেউ ফেনা আর শঙ্খ কিনতে মায়ের দরকষাকষি। ব্যাস। তারপর সব ছুটি তো বাড়িতে বসেই কেটেছে। পচা কলকাতায়। গরমের ছুটিতে গরমে ঝলসাও। পূজার ছুটিতে ভিড়ে হিমসিম খাও। আর পরীক্ষার পরের ছুটি? তখন তো শুনতে হবে, সারাদিন খেলে আর টিভি দেখে নষ্ট না করে একটু ডিকশনারিটা তো ঘাঁটতে পারো ঋক! স্টক অফ ওয়ার্ড বাড়বে। দূর দূর। জীবনটাই হেল হয়ে গেল।

এই কথাটাই বলা শুরু করেছিল ইদানিং বাড়িতে। যদিও জানত লাভ নেই। ঘুরতে যাওয়ার পরিস্থিতি ওদের বাড়িতে নেই। ঠাকুরদা প্যারালাইজড হয়ে বিছানায় ছিলেন বহুদিন। বাড়িটাই হাসপাতাল হয়ে উঠেছিল। ওই অবস্থায় কেউ যে ঘুরতে যায় না তা ছোট হলেও জানে ঋক।

তারপর ঠাকুরদা তো একদিন আকাশের তারা হয়ে গেলেন। ঠাম্মি ঘর থেকে বেরোতেই চান না। আর ঠাম্মিকে একা ঘরে রেখে তো ঘুরতে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। বোঝে ঋক। অবুঝ বায়নাদার ছেলে তো সে নয়। তবু মন তো খারাপ হয়! বিশেষ করে বন্ধুরা যখন ঘুরতে যাওয়ার ছবি দেখায়, গল্প বলে, স্যুভেনির উপহার দেয়, মন মেঘলা হয়।

একদিন বন্ধুদের থেকে উপহার পাওয়া সব স্যুভেনির, শঙ্খের পেনস্ট্যান্ড, চাবির রিং, কড়ির পুতুল সব বের করে মাকে গিয়ে বলেছিল, “এগুলো নিতে আমার লজ্জা করে। আমি তো কাউকে কিছু দিতে পারি না।”

এক পলক তাকিয়েই মা আবার রান্নায় মন দিয়েছিলেন। কিছুই বলেননি।

দুদিন পর মা নিজে থেকেই ডেকে বলেছিলেন, “আমরা ঘুরতে যাচ্ছি। চারদিনের জন্য।কোথায় যাচ্ছি বল তো?”

কোথায় যাওয়া হচ্ছে এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি ঋক। যাওয়া হচ্ছে এতেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়েছিল। বরং কবে যাচ্ছি কবে যাচ্ছি করে করে মায়ের মাথা খারাপ করে দিয়েছিল।

জেনেছিল যাওয়া হবে কালিম্পং। তার পাশের ডেলো পাহাড়, লাভা লোলেগাঁও, রিশপ। লোলেগাঁওতে থাকা হবে একরাত। সব মিলিয়ে চারদিনের ট্যুর। ঋকের ছোটপিসি এসে এ কয়েকদিন ঠাম্মির কাছে থাকবেন। তাইনা যাওয়া হচ্ছে! শুনে ঋকের তো ইচ্ছে হচ্ছিল ছোটপিসিকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দেয়।

সেই বড় সাধের ট্যুর এটা। ঋক জানালা দিয়ে মাথা বের করে পাহাড় অরণ্যের গন্ধ মাখে। আর জিপটা পাহাড়ি পথে পাক খেতে খেতে, আকাশের নীল আর বনের সবুজ মাখতে মাখতে এক সময় পৌঁছে যায় কালিম্পং।

ফুলে ফুলে আলো হয়ে আছে ডেলোর উপত্যকা।চারদিক যেন ছবির মত সাজানো,গোছানো। আকাশ এত নীল,বাতাস এত শুদ্ধ!কলকাতায় কোনদিন বোঝেনি তো ঋক! বাবা বললেন, “অনেক ওপরে উঠে এসেছি যে! এখানে দূষণ নেই। তাই সব এত ঝলমলে উজ্জ্বল।”

আর সেই উজ্জ্বল ফুলের ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝলমলে ডানার প্রজাপতি। তিতলির কী খেয়াল হল! ছুটল প্রজাপতি ধরতে। একটা প্রজাপতি দেখে। ছুটে যায় ধরতে। প্রজাপতি কি আর অত বোকা? ডানা ঝাপটে উড়ে পালায়। খিলখিল করে হাসে তিতলি। প্রজাপতির সংগে বুদ্ধির লড়াইতে হেরে গিয়েও হাসে। সেই হাসির ঝলমলানিতে চারপাশ আরো আলো হয়ে যায়।

ঋক বলে, “তিতলিকেও প্রজাপতির মত দেখাচ্ছে।”

ও পাশ থেকে কস্তুরী বলে উঠলেন, “তিতলি মানে তো প্রজাপতিই। জানতি না?”

“হুঁ,” মাথা নাড়ল ঋক, “আমার বয়স একটু কম হলে আমিও তিতলির মত প্রজাপতি ধরা প্রজাপতি ধরা খেলা করতাম।”

কস্তুরী আর মীনা খুব জোরে হাসলেন, “বয়স কম হলে মানে কী? ও ঋক? তুই কি বুড়ো হয়ে গিয়েছিস নাকি?”

“না। বুড়ো হব কেন? বড় হয়েছি। বলতে বলতে দু’পকেটে দু’হাত ঢুকিয়ে ঋক হাঁটে এগিয়ে যাওয়া বাবা আর কৌশিককাকুর দিকে।

কস্তুরী বলেন, ঘুরতে এসে ঋক কিন্তু বেশ খোশমেজাজে আছে। হবেই তো। আজকালকার বাচ্চার এত একা। স্কুলটুকুই যা বন্ধু পায়। ঘরে এসে সেই তো একা। কাঁহাতক আর টিভি দেখে সময় কাটাবে?

“ঠিক বলেছ। সায় দেন মীনা, “আমরা কত ভাইবোন একসঙ্গে বড় হয়েছি! পাড়াতেও কত বন্ধু ছিল! বিকেলে দল বেঁধে হইহই। হুল্লোড়। খেলা।”

অবাক চোখে তাকায় ঋক। বড়রা বোঝেন! এত বোঝেন! আর ঋক ভাবত, বড়রা বোঝেনই না! ঋকের একা একা লাগে। স্কুলের সময়টা বাদ দিলে আর তো একটাও বন্ধু নেই ঋকের। ঋকদের পাড়ায় ঋকের সমবয়সী একটা বাচ্চাও নেই। লম্বা ছুটিগুলো দমবন্ধ হয়ে আসে ঋকের। সেইজন্যই তো একটা পুষ্যি আনতে চেয়েছিল। কুকুর। বিড়াল। পাখি। যা হোক।

মা বললেন, “কুকুরের অনেক হ্যাপা।”

ঠাম্মি বললেন, “বিড়াল খুব ঘর নোংরা করে, মাগো!”

আর পাখি? বাবা বলে দিলেন, “খাঁচায় পাখি পোষা নিষ্ঠুরতা। মুক্ত আকাশেই পাখির অধিকার।”

আরে বাহ। একটা বাচ্চার অধিকার তবে কী? শুধু সব কিছুতে না না শোনা?

তবে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র তো ঋক নয়। পাখি জোগাড় করেছে ঠিকই। টিয়া পাখি। খাঁচাসুদ্ধ। রৌনক। ওর ক্লাসেই পড়ে। ওদের বাড়িতে এক পাখিওয়ালা পাখি দিয়ে যায়। লুকিয়ে। খাঁচায় পাখি পোষা আইনত নিষিদ্ধ কিনা! ওদের বাড়ির লোক লুকিয়েই পোষে। রৌনকই জোগাড় করে দিয়েছে। জন্মদিনে উপহার পাওয়া টাকা থেকে দাম মিটিয়েছে ঋক। অনেক কান্ড করে লুকিয়ে ঘরে ঢুকিয়েছে সেদিন পাখির খাঁচা।

ঋকদের বাড়িতে পিছন দিকে মানে বাগানের দিকে একটা সিঁড়ি আছে যেটা দিয়ে ছাদে উঠে যাওয়া যায় সরাসরি। ছাদের ওপরেও আছে ছোট ছাদ। চিলেকোঠার ওপর আরেকটা ঘর। হাড্ডুলপাড্ডুল দিয়ে ভর্তি। কেউ

বিশেষ যায় না ও ঘরে। সেখানেই রেখেছে। রোজ সকালে ছাদে ব্যায়াম করতে যাচ্ছি বলে ছাদে উঠে পাখিকে জল দেয়। ছোলা দেয়। বিকেলে মায়ের রান্নাঘর থেকে লুকিয়ে আনে ভাত। বকবক করে। নাহলে পাখি কথা শিখবে না জানে। যদি ও দু'মাস হয়ে গেল। পাখি শুধুই ট্যাঁ ট্যাঁ করে। তবু আশা ছাড়ে না ঋক। রোজই ঋক খাঁচার কাছে গিয়ে বলে, "বল পান্না,গুড মর্নিং।" পান্না শুধুই ঘাড় ঘোরায় আর একফালি জানালা দিয়ে একটুকরো আকাশ দেখে।

মনোময় ডাকেন, "এদিকে আয়। দেখ,কী সুন্দর উড়ছে মানুষ।"

মানুষ উড়ছে? দৌড়ে যায় ঋক। দেখে প্যারা গ্লাইডিং করছে লোকে। কী সুন্দর প্যারাশুটের মত কী একটা করে আকাশে ভেসে পড়ল একজন। পিছনে দাঁড়িয়ে রইল গাইড। সুতো টেনে আর ছেড়ে হাওয়ার দিক অনুযায়ী ভাসিয়ে দেবে বলে।

"আমিও। আমিও," ঋক লাফাতে শুরু করল। কস্তুরী চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছেন। কিন্তু দেখবে না ঋক। প্যারা গ্লাইডিং না করলে জীবনই বৃথা। বন্ধুদের শোনানোর মত একটা অভিজ্ঞতা হবে বটে। এর আগে বন্ধুদের কেউ আকাশে ভাসেনি।

এমন সময় মনোময়ের পকেটে রাখা সেলফোনটা শব্দ করে বেজে উঠল। মনোময়ের কথা শুনে বুঝতে পারল, ছোটপিসি ফোন করেছেন। মনোময় তারপর ফোনটা ঋকের হাতে দিয়ে, "পিসির সঙ্গে কথা বল," বলে একটু ওদিকে সরে গেলেন। ইশারা করে যে কস্তুরীকেও ডেকে নিলেন তা নজর এড়াল না ঋকের। তার মানে এখন ঋকের আবদার নিয়ে দুজনের আলোচনা চলবে। ভালোই হয়েছে। এই ফাঁকে পিসির সঙ্গে দরকারি গোপনীয় কথাটা সেরে নিতে পারবে ঋক।

" হ্যাঁ পিসি।পান্নাকে খেতে দিয়েছ ঠিকঠাক?"

"দিয়েছি রে বাপু দিয়েছি। একী অনাসৃষ্টি কান্ড রে বাপু? গুরুজনদের লুকিয়ে পাখি পোষা?"

"তোমাকে তো বলেছি। তুমি কি গুরুজন না নাকি? একজনকে বললেই তো হল!"

"আমাকে তো বলেছিস ঠেলায় পড়ে। না হলে এই ক'দিন তোর টিয়াকে ভাত জল দিত কে? কিন্তু দাদা বৌদি জানতে পারলে তোর পিঠে স্কেল ভাঙবে।"

"দূর! কেমন করে জানবে? ছাদে ওঠে নাকি কেউ? শুধু আমি উঠি। আর মিন্তিমাসি কাপড় মেলতে আর তুলতে আসে। মিন্তিমাসি কানে কম শোনে। পান্না ডাকলে বুঝবেও না। আর মা? পান্না ডাকলে ভাবেন, বাগানের গাছে টিয়া এসেছে। পান্না ছোলা খেয়েছে?"

"শুধু কি ছোলা? লংকা দিলাম। তাও কুটকুট করে খেল। তবু কাজটা তুই ভালো করছিস না।"

ঋক দেখল বাবা আসছেন এদিকে। তাই, "ঠিক আছে পিসি, পরে কথা হবে," বলে ফোন কেটে দিল।

মনোময় বললেন, "রিস্ক কিন্তু আছে। বায়না করার আগে ভেবে দেখ।"

একুশ বাইশ বছরের একটা নেপালি ছেলে এগিয়ে এল, "রিস্ক তো সব কিছুতেই আছে স্যার। লিটিল মাস্টার যখন সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরোয়, তখনও তো রিস্ক থাকে। আমি সাত বছর ধরে কাজ করছি। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় নাই। আমার নাম সুরেশ। আমিই নিয়ে যাব লিটল মাস্টারকে। আমার রিস্কে।"

প্রথমটায় ভয় পেয়েছিল একটু ঋক।তারপরেই দারুণ এক শিহরণ। অনাবিল আনন্দে যেতে একটু সময় লাগল। কত নিচে ঘরবাড়ি, গাছপালা, আঁকাবাঁকা রাস্তা! ঘরগুলোকে তো দেশলাই বাক্সের মত দেখাচ্ছে। এইটুকুন এইটুকুন। কত উপরে চলে এসেছে ওরা! কেমন সুন্দর ভেসে যাচ্ছে। ঠান্ডা বাতাস লাগছে চোখেমুখে। মেঘগুলোকে ছুঁয়ে ফেলতে পারবে নাকি? ওই যে চিলদুটো উড়ছে,ওদের? ঘাড় না ঘুরিয়েই সুরেশকে বলল, "আরো একটু উঁচুতে যাবে? চিলগুলোর কাছে?"

সুরেশ বলল, "চিড়িয়া তো আকাশের জীব আছে। ওদের মত উড়তে মানুষ থোড়াই পারে।"

আকাশ আরো তীব্র নীল। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল ঋকের। চোখের কোন জ্বালা করছিল। দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে নামল চোখ বেয়ে। পড়ল সুরেশের সুতো ধরা হাতে। সুরেশ চমকে বলল, "ভয় পাচ্ছ? ফিরব?"

মাথা নাড়ল ঋক। না। ভয় নয়।

"না ফিরতে হবে না।"

কেমন করে বোঝাবে ওর এই মূহূর্তে পান্নার জন্য মন খারাপ করছে। দু'মাস পান্নার উড়ান বন্ধ করে রেখেছে খাঁচায় পুরে রেখে। দুমাস আকাশের জীবকে আকাশ থেকে বঞ্চিত রেখেছে। কলকাতা ফিরেই খাঁচার দরজা খুলে উড়তে দেবে ওকে। আহা। উড়তে এত সুখ!

একটা সিদ্ধান্তই হালকা করে দিল ঋকের মন। ইয়াহুউ বলে চিৎকার করে আবার ভেসে গেল আনন্দে। পিছন থেকে মুচকি হাসল সুরেশ, এই লিটিল মাস্টারের মাথায় পোকা আছে নাকি? এই কাঁদে। এই হাসে।

গ্রাফিক্‌স্‌- ইন্দ্রশেখর

খোক্কস

শিবানী রায়চৌধুরী

মূষিকরতন মাত্র তিন ইঞ্চি লম্বা হলে কী হবে, তার মাথায় এক বাক্স বুদ্ধি। এক দিন সে গভীর বনের মধ্যে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা ল্যাজমোটা খ্যাঁকশিয়াল মূষিককে দেখতে পেয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে এগিয়ে এল। মূষিকের কাছে এসে হাসি হাসি মুখে বলল, ‘ছোট্ট মূষিক, ছোট্ট মূষিক, গুটি গুটি পা ফেলে কোথায় যাচ্ছ? ঐ বড় গাছের তলায় আমার গর্তে এস। একসঙ্গে দুপুরবেলা ভূরিভোজন করব। আমার কাছে ভাল ভাল খাবার আছে। ধান, চাল, ডাল, গম, চিনে বাদাম, কাজু বাদাম, আম, কাঁঠাল, খেজুর....তুমি খেয়ে শেষ করতে পারবে না।’

মূষিকরতন বলল, ‘শিয়ালমশাই, তোমার মতো দয়া কারও নেই। কিন্তু আমি তো আজ খেতে পারব না। আমি আজ দুপুরবেলা খোক্কসের সঙ্গে খাব।’ শিয়াল তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, ‘খোক্কস? খোক্কস আবার কে? আগে তো তার নাম শুনিনি!’

মূষিক বলল, ‘খোক্কস। তুমি কি তাকে চেন না? রাক্ষসের ভাই খোক্কস।’

শিয়াল বলল, ‘আমি খোক্কস টোক্কস চিনি না। আমি খালি খরগোসকে চিনি।’

শুনে মূষিক বলল, ‘খরগোসকে তো তুমি চিনবেই। তবে খোক্কসকে একবার দেখলে ভুলবে না।’ ‘তার মূলোর মতো দাঁত, কূলোর মতো কান, জালার মতো পেট।’

শিয়াল জানতে চাইল, ‘কোথায় খোক্কসের সঙ্গে দেখা করবে? তোমাকে কি খাওয়াবে?’ মূষিক বলল, ‘কাছেই। ঐ ঝোপের ধারে দেখা হবে। খোক্কস যা সবচেয়ে ভালবাসে তাই খাওয়াবে।’ শিয়াল জানত চাইল, ‘খোক্কস কী খেতে সবচেয়ে ভালবাসে?’

মূষিক বলল, ‘আগুনে ঝলসানো শিয়ালের মাংস খেতে ভীষণ ভালবাসে।’ একথা শুনে শিয়ালমশাই ‘ওরে বাব্বা’ বলে ল্যাজ গুটিয়ে এক দৌড়।

মূষিকরতন আপন মনে বলল, ‘বোকা বুদ্ধু শিয়াল। কিছুই জানে না। খোক্কস বলে কোন কিছু নেই।’

মূষিকরতন ঘন বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। একটা গোলগাল হুতুমপ্যাঁচা মূষিককে দেখতে পেয়ে ভাবল বেশ মোটাসোটা ছোট্ট ইঁদুর। গায়ে মাংস আছে। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘ছোট্ট মূষিক, ছোট্ট মূষিক, গুটি গুটি পা ফেলে কোথায় যাচ্ছ? গাছের মগডালে আমার বাসায় একটু কেক বিস্কুট খেয়ে যাও। মিষ্টি কিসমিস আর চালকুমড়োর মোরব্বা দেওয়া কেক। কেকওয়ালার বাক্স থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে এসেছি।’

মূষিকরতন বলল, ‘প্যাঁচাদিদি, প্যাঁচাদিদি, তোমার মতো ভাল কেউ হয় না। কিন্তু আমি তো আজ খেতে পারব না। আমি তো এখন খোক্কসের সঙ্গে চা খেতে যাচ্ছি।’ প্যাঁচা তার ডানা দুটো ঝেড়ে বলল, ‘খোক্কস? খোক্কস আবার কে? আগে তো তার নাম শুনিনি!’

মূষিক বলল, ‘খোক্কস। তুমি কি তাকে চেন না? রাক্ষসের ভাই খোক্কস। তার গদার মতো পা আর ছাতার মতো হাত। নরুণের মতো ধারালো লম্বা নখ।’

পেঁচা জানতে চাইল, ‘কোথায় খোক্কসের সঙ্গে দেখা করবে? কী খাওয়াবে?’

মূষিক বলল, ‘কাছেই। ঐ নদীর ধারে দেখা হবে। খোক্কস যা সবচেয়ে ভালবাসে তাই খাওয়াবে।’

প্যাঁচা জিজ্ঞেস করল, ‘কি সবচেয়ে ভালবাসে?’ মূষিক উত্তর দিল, ‘মুচমুচে প্যাঁচার বড়া।’

একথা শুনে হুতুমপ্যাঁচা ‘ওরে বাব্বা’ বলে ডানা ঝাপটে ধর্ ফর্ করে উড়ে গেল। মোটাসোটা মূষিকরতন আপন মনে বলল, ‘বোকা বুদ্ধু প্যাঁচা। কিছুই জানে না। খোক্কস বলে কোন কিছু নেই।’

মূষিকরতন আবার বনের মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করল। এবার একটা গায়ে ছোপ ছোপ দাগকাটা গোখরো সাপ মূষিককে দেখতে পেল। সাপ মূষিককে দেখে ভাবল কি তেল চুকচুকে বাদামী রঙের ইঁদুর। মূষিকের কাছে গিয়ে বলল, ‘ছোট্ট মূষিক, ছোট্ট মূষিক, গুটি গুটি পা ফেলে কোথায় যাচ্ছ? কাঠগাদায় আমার বাড়িতে আজ মহা ভোজ হচ্ছে। আমার কাছে খেয়ে যাও।’

মূষিকরতন বলল, ‘গোখরোদাদা, গোখরোদাদা। তোমার মতো চমৎকার মন কারও নেই। কিন্তু আমি তো আজ খেতে পারব না। আমি তো এখন খোক্কসের সঙ্গে ভোজ খেতে যাচ্ছি।’ গোখরো তার ফনা তুলে বলল, ‘খোক্কস? খোক্কস আবার কে? আগে তো তার নাম শুনিনি!’

মূষিক বলল, ‘খোক্কস। তুমি কি তাকে চেন না? রাক্ষসের ভাই খোক্কস। তার ভাঁটার মতো লাল চোখ আর সাপের চেয়েও বড় লকলকে জিভ। সারা গায়ে ফণীমনসার কাঁটা।’

গোখরো জানতে চাইল, ‘কোথায় খোক্কসের সঙ্গে দেখা করবে? কী খাওয়াবে?’ মূষিক বলল, ‘কাঠগাদার কাছে পুকুরের ধারে দেখা হবে। খোক্কস যা সবচেয়ে ভালবাসে তাই খাওয়াবে।’ গোখরো জিজ্ঞেস করল, ‘কী খেতে সবচেয়ে ভালবাসে?’ মূষিক উত্তর দিল, ‘চাকা চাকা করে কাটা সাপের ঝোল।’

একথা শুনে গোখরো সাপ ‘ওরে বাব্বা’ বলে সরসর করে শুকনো পাতার মধ্যে মিলিয়ে গেল। তেল চুকচুকে মূষিকরতন আপন মনে বলল, ‘বোকা বুদ্ধু । গোখরো কিছুই জানে না। খোক্কস বলে কোন কিছু নেই।’

মূষিকরতন আবার এগিয়ে চলল। হঠাৎ সে দেখতে পেল বনের ভেতর থেকে কে যেন বেরিয়ে আসছে। ‘ওরে বাব্বা’ বলে মূষিক দাঁড়িয়ে পড়ল।

ও কে আসছে? মূলোর মতো দাঁত, কুলোর মতো কান, জালার মতো পেট। গদার মতো পা আর ছাতার মতো হাত। নরুণের মতো ধারালো লম্বা নখ। আবার তার ভাঁটার মতো লাল চোখ আর সাপের চেয়েও বড় লকলকে জিভ। সারা গায়ে ফণীমনসার কাঁটা।

মূষিকরতন ভয়ে সিঁটকে গেল, 'এ যে দেখছি খোক্কস!'

মূষিকরতনকে দেখে খোক্কস মহা খুশি। এক গাল হেসে মূষিককে বলল, 'আমার কী খেতে ইচ্ছে করছে তুমি শুনবে? দুটো পাঁউরুটির মধ্যে তোমাকে পুরে একটা ইয়া মোটা স্যান্ডউইচ খেতে খুব ইচ্ছে করছে। দারুণ ভাল লাগবে।'

মূষিকরতন বলল, 'আমাকে খেতে ভাল লাগবে বল না। আমি একটুও ভাল খেতে না। আমি এই বনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জন্তু। আমার পেছন পেছন এস। একটু পরেই দেখবে আমাকে দেখে সবাই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।'

মূষিকের কথা শুনে খোক্কস হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'ঠিক আছে। তুমি এগিয়ে চল। আমি তোমার পেছনে হাঁটছি।'

মূষিক আর খোক্কস হাঁটতে শুরু করল। ওরা হাঁটছে তো হাঁটছেই। খোক্কস বলল, 'আমি শুকনো পাতার মধ্যে হিস হিস শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

মূষিক বলল, 'ওতো গোখরো সাপ হিস হিস করছে। হ্যালো, গোখরোদাদা, তোমার কী হয়েছে?' গোখরো একবার খোক্কসকে মাথা থেকে পা অবধি দেখল আর বলল, 'আমি চললাম ছোট্ট মূষিক।' গোখরো সাপ সর সর করে কাঠগাদায় মিলিয়ে গেল।

মূষিকরতন খোক্কসকে বলল, 'দেখলে তো আমি কী বলেছিলাম।?'

খোক্কস বলল, 'অতি আশ্চর্য!'

ওরা আরো কিছুক্ষণ হাঁটার পর খোক্কস বলল, 'আমি সামনের ঐ বড় গাছে হুতুম হুতুম শুনতে পাচ্ছি।' মূষিক বলল, 'ওতো হুতুম প্যাঁচা ডাকছে। হ্যালো প্যাঁচাদিদি, তোমার কী হয়েছে?'

হুতুম প্যাঁচা একবার খোক্কসকে মাথা থেকে পা অবধি দেখল আর বলল, 'আমি চললাম ছোট্ট মূষিক।' তারপর প্যাঁচা ডানা ঝটপট করে উড়ে গাছের মগডালে মিলিয়ে গেল।

মূষিকরতন খোক্কসকে বলল, 'দেখলে তো আমি কী বলেছিলাম?'

খোক্কস বলল, 'আমার মুখ দিয়ে কথা সরছে না!'

মূষিকরতন আর খোক্কস বনের মধ্যে আরো খানিকটা এগিয়ে গেল। খোক্কস এবার বলল, 'সামনের পথ থেকে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

মূষিক বলল, 'ও তো খেঁকশিয়াল হাঁটছে। হ্যালো শেয়াল মশাই, তোমার কী হয়েছে?'

শিয়াল একবার খোক্কসকে মাথা থেকে পা অবধি দেখল আর বলল, 'আমি চললাম ছোট্ট মূষিক।' তারপর এক দৌড়ে তার গর্তে মিলিয়ে গেল। মূষিকরতন খোক্কসকে বলল, 'দেখলে তো আমি কী বলেছিলাম।? সবাই আমাকে ভয় পায়। আমি হচ্ছি এই বনের রাজা।' 'অনেক বেলা হল। খিদেয় আমার পেট চোঁ চোঁ করছে। আমি এখন কী খাব?'

তখন খোক্কস বলল, 'তোমাকে আমি কী খেতে দেব? আমি তো তোমাকে নেমন্তন্ন করিনি!'

তারপর মূষিক গান ধরল,

'তিন ইঞ্চি মূষিকরতন গভীর বনের রাজা,
আজ বিকেলে, গরম তেলে খাবে খোক্কস ভাজা।'

গান শুনে খোক্কস বাবাগো মাগো বলে দুমদাম করে তার গদার মতো পা ফেলে পালিয়ে গেল। মূষিকরতন তখন খাবারের খোঁজে হাঁটতে লাগল। যেতে যেতে কাঁঠালগাছের তলায় একটা শুকনো বিচি কুড়িয়ে পেল। মনের আনন্দে মূষিক বিচিটা চিবতে লাগল। গভীর বনে আর কোন শব্দ নেই। চারদিক চুপচাপ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: গল্পটি ইংরেজ শিশু সাহিত্যিক জুলিয়া ডোনাল্ডসন লিখিত 'দ্য গ্রাফলো' অনুসরণ করে লেখা

অলঙ্করণঃ রাহুল মজুমদার

শিবুস্যার আর ফিল্ম ডাইরেক্টর

বাবিন

“তোদের এই রূপকুমারের কথায় আমারও অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে গেল,” শিবুস্যার স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বললেন।

ব্যস, ওই একটি কথায় আমাদের এতক্ষণের যুদ্ধটা এক লহমায় থেমে গেল। একটা আস্ত গল্পের ইঙ্গিত পেয়ে সব্বাই গোল্লা গোল্লা চোখে স্যারের দিকে ঘুরে গেল।

কথাটা হচ্ছিল আজকালকার বাংলা সিনেমার জনপ্রিয়তম নায়ক রূপকুমারকে নিয়ে। ওঁর নতুন ছবি রিলিজ করবে আগামী শুক্রবার, তাই খবরের কাগজের পাতায় তার বিজ্ঞাপন পড়েছে। পাড়ার রক উত্তাল ওঁকে নিয়ে। রূপকুমারের উচ্চারণ নিয়ে অনেকেই খুব হাসাহাসি করছে। প্রায় পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই রূপকুমারের বাচনভঙ্গি একটু বাচ্চাদের মতো আধো আধো। সেটাই অনেকের হাসির কারণ। কিন্তু অনেকে আবার সেই ভঙ্গিটাই ওঁর প্লাস পয়েন্ট বলছেন। কেউ কেউ বলছেন, রূপকুমার নাকি মোটেই অভিনয় পারেন না, সুদ্ধু ঢিসুম-ঢিসুম করেই দর্শকদের মন জয় করে চলেছেন। অন্যদের বক্তব্য, রূপকুমার যদি অভিনয় নাই পারতেন তাহলে আজ এতগুলো বছর ধরে ওঁর ছবিতে বক্স অফিস তোলপাড় হয় কী করে? ঘটনাটা নিয়ে আমাদের বন্ধুরাও দ্বিধা বিভক্ত।

আমরা বলতে আমি, ডাকু, পিন্টু, রাজা আর পিলু। সক্কলে ক্লাস নাইনে পড়ি। আর শিবুস্যার হলেন আমাদের কোন্নগর হাইস্কুলের অঙ্কের মাস্টার। আমাদের কারোরই আত্মীয় নন। নগেনজেঠুর বাড়ির নিচের তলায় ভাড়া থাকেন। একটি ঘর আর কমন বাথরুম নিয়েই ওঁর সংসার। বাড়ির নিচের তলায় আরও দুটি পরিবার ভাড়া থাকেন। তাদের সঙ্গেই চানঘরটি শেয়ার করতে হয়। স্যার একা মানুষ। বিয়ে-থা করেননি। নিজের লোক বলতেও কেউ নেই। তাই ওঁর কোনও সমস্যাও নেই। রোজ সকালে ন'টার মধ্যে স্নান-খাওয়াদাওয়া সেরে রওনা দেন ইস্কুলে। বিকেল পাঁচটায় ফের বাড়ি। আর বাকিটুকু সময় বসে কাটান লাইব্রেরি থেকে আনা গল্পের বই পড়ে। হপ্তায় তিনদিন সন্ধেয় আমাদের অঙ্ক কষান। ভুল হলেই প্রাপ্য একটি করে গাঁট্টা। শুধু গাঁট্টা নয়, রামগাঁট্টা! যে না খেয়েছে সে কী বুঝবে তার মর্ম!

শিবুস্যারের একটি গুণ আছে। চমৎকার গল্প বলতে পারেন। প্রতি গল্পই আনকোরা। বই থেকে ঝাড়া নয়। সবই নাকি তাঁর জীবনের উপলব্ধ জ্ঞান। স্যারের গল্পের স্টক অফুরন্ত। হেন জায়গা নেই যে উনি যাননি। হেন কাজ নেই উনি করেননি। এখন সব ছেড়েছুড়ে এই কোন্নগরে এসে থিতু হয়েছেন। ফি রোববার আমরা বেলা দশটা দিকে পড়া না থাকলেও হানা দিই স্যারের বাড়ি। স্যার তাঁর চৌকির ওপর বাবু হয়ে বসে একটি জমজমাট গল্প বলেন, আর আমরা মেঝেতে শতরঞ্জির ওপর হাঁ করে বসে গিলতে থাকি। ওঁর গল্প শুনতে আমাদের হেব্বি লাগে। স্যারের গল্পের একটি বিশেষত্ব আছে। গল্প বলা হয়ে গেলে উনি আমাদের সামনে এমন এক-একটি নমুনা পেশ করেন যা দেখে ওঁর ওইসব অবিশ্বাস্য গল্পগুলোর ওপর আমাদের বিশ্বাস-ভক্তি-শ্রদ্ধা অটুট থেকে যায়।

ডাকু উৎসুক কন্ঠে বলে ওঠে, “শুরু করুন স্যার, আপনার আজকের গপ্পো।”

“প্রথমেই বলে রাখি, এই ঘটনাটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক খ্যাত-বিখ্যাত মানুষের নাম। তাই এঁদের নাম প্রকাশ করা যাবে না।” স্যার আমার দিকে চেয়ে বললেন, “বাবিন, তুই তো শুনেছি আজকাল লিখতে-টিখতে শুরু করে দিয়েছিস। তা লেখ মন্দ নয়, কিন্তু খবরদার, এঁদের সত্যিকারের নাম প্রকাশ করলে কাজটা খারাপ হয়ে যাবে। বুঝলি?”

আমি মুচকি হেসে বলি, “ঠিক আছে, লিখলে নাম পাল্টে দেব। কেমন?”

স্যার খুশি হয়ে চৌকির ওপর ভালো করে বাবু হয়ে বসে বলতে শুরু করেন, “তখন আমি কাজ করি এক ফিল্ম ডাইরেক্টরের সঙ্গে।”

“আপনি সিনেমা করতেন?” পিন্টু প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, “কী বলছেন, স্যার!”

"উফ্!" শুরুতেই ব্যাঘাত পেয়ে স্যার যারপরনাই বিরক্ত হন, "কখন বললুম যে আমি সিনেমা করতুম? বলছি যে এক নামকরা সিনেমার ডাইরেক্টরের সঙ্গে কাজ করতুম।"

"ওহ্, তাই বলুন।" পিন্টু আশ্বস্ত কণ্ঠে বলে, "তা কী কাজ করতেন?"

রাগত চোখে পিন্টুর দিকে চেয়ে শিবুস্যার বললেন, "সবুর কর তো ছোঁড়া! মধ্যিখান থেকে কি গল্প বলা যায়? যখন যেটা বলার আপনা আপনিই আসবে।"

আমি পিন্টুকে থামাই, "তুই চুপ কর তো, পিন্টু। স্যার, আপনি বলতে থাকুন।"

স্যার আবার বলতে শুরু করলেন, "ভদ্রলোকের নাম ধরে নে, কান্তি চট্টোপাধ্যায়। আমি স্ক্রিপ্ট লিখে দিই ওঁর ফিল্মের জন্য। উনি গল্প বেছে দেন আর আমি তার ডায়ালগ লিখি; শট ডিভিশনও করে দিই নিজের মতো করে। কান্তিবাবু তাতে কারেকশন করে নিতেন আমাকে পাশে বসিয়ে। তার থেকে আমারও জ্ঞান বাড়তে থাকত। যখনকার কথা বলছি তখন এত ফিল্ম স্কুলের রমরমা ছিল না। খুব কম মানুষই পুনে গিয়ে ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে ছবি বানানো শিখে আসত। তখন ছবি তৈরি শিখতে গেলে ডাইরেক্টরদের পিছু ধরা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। তা কান্তিবাবু মানুষ ভালো ছিলেন। কম বাজেটে ছবি বানাতেন। নতুনদের সুযোগ দিতেন। তার কাছে প্রথম কাজ করে কালে অনেক নাম করেছে এমন হিরো অঢেল আছে।

"কথাটা মিথ্যে নয় যে এককালে আমারও অভিনেতা হবার ভারি ইচ্ছে ছিল। সদ্য গ্রাম থেকে আসার পর বেশ কিছুদিন আমি টালিগঞ্জে ডিরেক্টরদের ঘরে হত্যে দিয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু পরে বুঝলুম, আমার দ্বারা অভিনয় হবে না। কারণ, ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই আমার হাত-পা কাঁপতে শুরু করে দিত। দু-একটা ফিল্মে সাইড রোলও করেছিলুম অবিশ্যি। পরে ফিল্ম পাড়ার কয়েকজন আমাকে সুবুদ্ধি দিল। ভেবে দেখলুম, ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার চেয়ে পিছনে দাঁড়ানো এমন কিছু খারাপ নয়। বরং চোখের সামনে নতুন নতুন হিরো-হিরোইনদের উত্থান পতন দেখাও কম রোমাঞ্চকর নয়!

"সেইমতো একদিন কান্তিবাবুর কাছে হাজির হয়েছিলুম। কিছুদিন ঘোরাবার পর উনি আমাকে নিজের দলে ঢুকিয়ে নিলেন। প্রথম প্রথম কান্তিবাবুর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র দেখা শোনা করতুম। তারপর ক্যামেরার দেখভাল করা। কীভাবে ছবি ওঠে এসবও দেখাশোনা করতুম। টাকাপয়সা তেমন কিছুই পেতুম না বললেই চলে। তবে দুপুরে খাওয়াদাওয়া পেতুম আর সামান্য যাতায়াত খরচা। তাতেই আমি খুশি ছিলুম। হপ্তায় তিনদিন এক বন্ধুর দাদার ক্লাস থ্রিতে পড়া ছেলেকে টিউশনি পড়িয়ে আমার হাতখরচা উঠে যেত সেই সময়। থাকতুম বড়বাজারের এক মেসবাড়িতে। খাওয়াদাওয়া একটা পাইস হোটেলে।"

এই সময়ে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতে পিন্টু গিয়ে দরজা খুলতে কিকিদিদি এল একটা থালায় করে চা আর আমাদের জন্য খানিকটা ঘরে ভাজা কুঁচো নিমকি নিয়ে। দিদি জানত যে রোববার এইসময় আমরা থাকি স্যারের কাছে। কিকিদিদি নগেনজেঠুর মেয়ে। আমরা দিদি বললেও, ওঁকে মধ্যবয়সী বলা যেতেই পারে। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে গিয়ে আবার বাবার আশ্রয়েই থাকত ওই বাড়িতে। নগেনজেঠুর আর কোনও সন্তান ছিল না। ওই একটি মাত্রই কন্যা। শিবুস্যার একা মানুষ বলে রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট রাখেননি। নগেনজেঠুর বাড়িতেই যখন যা রান্না হত তাই জুটত ওঁর কপালে। উনি বাড়িভাড়ার সঙ্গে খাইখরচ বাবদ একটা মূল্য ধরে দিতেন। স্যারের খুব চায়ের নেশা। তাই কিকিদিদি মাঝে মাঝে চা করে দিয়ে যেত। সঙ্গে মুখরোচক কিছু।

চা আর নিমকি শেষ হতে স্যার আবার শুরু করলেন তার কাহিনি।

"একটু একটু করে মন দিয়ে কাজ করে আমি কান্তিবাবুর সুনজরে পড়ে গেলুম। উনি আমাকে স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ শেখাতে শুরু করলেন। তা শিখলাম। উনি বলতেন, আমার লেখার হাত নাকি মন্দ নয়। খুশি মনে আমি লিখতে থাকলুম। রোজগারও বেশ হতে লাগল।

"সেই সময় কান্তিবাবুর হাতে বেশ কিছু নতুন অভিনেতা উঠে এসেছিলেন। উনি নিজের হাতে গড়ে পিঠে অভিনেতা তৈরি করতেন। তাই প্রতিদিনই ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ওঁর অফিসে নতুন নতুন প্রচুর ছেলেমেয়ের ভিড় লেগেই থাকত। সকলেরই স্বপ্ন নায়ক-নায়িকা হবার। কিন্তু সবার দ্বারা কি সব কাজ হয়? যেটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম, সেটা সবাই বুঝতে পারত না। তাই আমি সবার থেকে বায়োডাটা আর পোর্টফোলিও জমা নিয়ে ভিড় হালকা করে দিতুম।"

"এই পোর্টফোলিও ব্যাপারটা কী?" পিলু জিজ্ঞেস করল।

"পোর্টফোলিও জানিস না?" স্যার ভারি বিরক্ত হন, "সিনেমাতে নামতে গেলে প্রথম কাজটি হল কোনও নামী ফটোগ্রাফারের কাছে গিয়ে নিজের বেশ কিছু ভালো ভালো ফটো তুলিয়ে একটা সুন্দর অ্যালবাম বানিয়ে নিয়ে যেতে হয় ডাইরেক্টর-প্রডিউসারদের কাছে। একেই বলে পোর্টফোলিও।"

"ওহ্, আচ্ছা। বুঝলাম।" পিলু বলে।

স্যার আবার বলতে শুরু করেন, "তো সেবার কান্তিবাবু একটা নতুন বই ঠিক করলেন।"

"বই?" পিলু ফুট কাটল।

স্যার ভারি বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি জানি যে অনেকেই সিনেমাকে ভুল করে বই বলে। কিন্তু তাদেরও খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। কারণটা কী, জানিস?"

পিলু ঘাড় নাড়ে।

"হুহ্!" স্যার নাক সিঁটকে বলেন, "এই হল তোদের মস্ত দোষ! সামান্য কিছু শিখলেই সক্কলকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার বদভ্যাস। একেই বলে ফ্লকসিন্যসিনিহিলিপিলিফিকেইশন!"

"কী? কী? কী বললেন?" আমরা সবাই একযোগে প্রায় আঁতকে উঠি!

স্যার মুচকি হেসে ওই বিদঘুটে শব্দটা আবার উচ্চারণ করে বললেন, "জানি তোরা বুঝতে পারবি না কথাটার মানে। শুনে রাখ, এর মানে সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।"

ডাকু জিজ্ঞেস করে, "কোথায় পেলেন এই শব্দটা?"

"আ মোলো যা!" স্যার আকাশ থেকে পড়েন, "তোরা কি ভাবলি আমি শব্দটা এক্ষুনি বানালুম তোদের শোনাবার জন্য? ওটা হল ইংরেজি ডিকশনারির সবচেয়ে বড়ো শব্দ। বিশ্বাস না হয় বাড়ি গিয়ে খুলে দেখিস।" স্যার বানান করে করে উচ্চারণ করলেন শব্দটা, "F l o c c i n a u c i n i h i l i p i l i f i c a t i o n!"

পিলু মিচকে হেসে বলে, "না, আমি বলছিলাম কী, ওই সিনেমাকে বই বলাটা..."

স্যার একবার পিলুর দিকে চেয়ে একটা 'হুহ্' গোছের শব্দ করে রুপোর ডিবে থেকে এক খিলি পান নিয়ে মুখে ফেলে বললেন, "একেই বলে অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী! শোন, আগেকার দিনে সিনেমা তৈরি হত নামী দামী সাহিত্যিকদের গল্প অবলম্বনে। তাই লোকে সিনেমাকে বই বলত। তবে ছায়াছবি বা শুধু ছবি বলাটাই সঠিক। বলি, মাথায় কিছু ঢুকল?"

আমি বলি, "পিলু, তুই থামবি? গল্পটাকে বারবার আটকে দিচ্ছিস কেন?"

পিলু ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "এই আমি মুখে কুলুপ দিলুম। আর একটি কথাও বলব না। স্যার, আপনি চালিয়ে যান।"

স্যার ব্যাজার মুখে ফের বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ, তা যা বলছিলুম। তখন আমি কান্তিবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর হয়ে গেছি। সেবার উনি সাহিত্যিক মন্দোদরী সামন্তের একটি বই বাছলেন সিনেমা তৈরি করার জন্য। সেই সময় মন্দোদরী সামন্তের বই ছিল হটকেক। জমজমাট গল্প-উপন্যাস লেখায় ওঁর জুড়ি পাওয়া ভার। তাঁর একটি জনপ্রিয় উপন্যাস কান্তিবাবু আমায় দিলেন চিত্রনাট্য লেখার জন্য। সিনেমার কাগজগুলোও কী করে যেন খবরটা পেয়ে গেল। তারা ফলাও করে খবরটা ছেপে দিল। সঙ্গে এটাও লিখে দিল যে আগামী সিনেমার বিভিন্ন রোলের জন্য কান্তিবাবু প্রচুর নতুন অভিনেতা খুঁজছেন। ব্যস, কান্তিবাবুর বাড়ি-অফিস সর্বত্র উঠতি অভিনেতাদের মেলা লেগে গেল। সব্বাই একটা রোল চায়। অনেকে তো সোজাসুজি নায়ক হবার জন্য পাগল। এমনও হয়েছে যে স্পটবয়দের দিয়ে আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে, যদি তাকে নায়কের রোল দেওয়া হয় তো আমাকে খুশি করে দেবে। অনেক খরচ করতেও পিছপা হবে না!

"এসব শুনে আমার মাথা গরম হয়ে যেত। আমি বিশ্বাস করি যে, ট্যালেন্ট থাকলে নির্ঘাৎ তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু যারা এভাবে সিনেমায় চান্স পাবার জন্য পয়সা খরচা করতে চায় তাদের ট্যালেন্টই নেই, অথবা নিজের ওপর বিশ্বাসটুকুই নেই। এদের দ্বারা কিস্যু হবে না। মিষ্টি মিষ্টি করে দু'কথা শুনিয়ে দিতুম এসব পাবলিককে।

"যাই হোক, স্ক্রিপ্ট লেখা, কারেকশন সবই প্রায় শেষের পথে। সেই সময় একদিন আমি আর কান্তিবাবু যাব চুঁচুঁড়োর দিকে একটা শুটিং স্পট ফাইনাল করতে। আমি সক্কাল সক্কাল চলে এসেছি কান্তিবাবুর বাড়ি। ওঁর সঙ্গে বেরুব আটটার সময়। ওঁর বাড়িতে ঢোকার সময়ই দেখলুম, একটা সুন্দরমতো ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুঝলুম, সিনেমায় চান্স পাবার জন্য হত্যে দিচ্ছে। আমি দেখেও না দেখার ভান করে ভেতরে ঢুকে গেলুম। কান্তিবাবু তৈরি হয়েই ছিলেন। ওঁর ড্রাইভার আমাদের হাওড়া স্টেশনে ছেড়ে দেবে। সেখান থেকে ট্রেনে করে যাব চুঁচুঁড়ো।"

"ট্রেনে করে?" এবার রাজা বলে উঠল, "এত বড়ো পরিচালক ট্রেনে চাপবে?"

শিবুস্যার এবার আর রাগ করলেন না। বরং দুঃখু দুঃখু একটা হাসি হেসে বললেন, "তখন ডাইরেক্টররা মোটেও বেশি পয়সাওয়ালা হতেন না। অনেকেরই গাড়ি কেনা বা তার পেট্রল যোগাবার মতো অবস্থা ছিল না। কান্তিবাবুরও গোটা আষ্টেক সিনেমা করে নামডাক ঢের হলেও একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির ওপরে উঠতে পারেননি। অবিশ্যি সিনেমার কাজে প্রোডিউসারের ঘাড় ভেঙে এসব খরচা আদায় করাই যেত, কিন্তু কান্তিবাবু বড়ো সাদাসিধে আর ভালোমানুষ ছিলেন। প্রোডিউসারের টাকাকে নিজের টাকা বলেই ভাবতেন। চুঁচরো পর্যন্ত গাড়িতে গেলে যা খরচা তার চেয়ে হাওড়া পর্যন্ত গাড়িতে গিয়ে তারপর ট্রেনে গেলে অনেক সাশ্রয় হয় বলে এই ব্যবস্থা।

"তা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চাপব আমরা, এমনি সময় সেই ছেলেটা হামলে পড়ল কান্তিবাবুর ওপর, 'স্যার আমার নাম মদনমোহন জানা। বড়ো আশা নিয়ে অনেক দূর থেকে এসেছি, একটু যদি দেখতেন!"

"বাবা! এত্তদিন পরেও নামটা মনে রেখেছেন?" পিলু ফের ফুট কাটল।

আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। এই বুঝি স্যার খাপ্পা হয়ে গল্প বলা না বন্ধ করে দেয়! তাই পিলুকে একটু ধমক দিয়েই বললাম, "কী হচ্ছে, পিলু? এমন একটা নাম একবার শুনলেই মনে থেকে যায়। আমি হলে আমারও ঠিক মনে থেকে যেত।"

গল্পের ফ্লো এসে যাওয়াতে স্যারের মুড ভালোই রয়েছে দেখছি। তাই রাগ না করে শিবুস্যার সহাস্যে বললেন, "শুধু তাই নয়, গল্পটা শেষ হলে তোরাও জানতে পারবি যে কেন ওই নামটা আমি ভুলিনি। যাক, তারপর শোন..." এই বলে স্যার ফের

গল্পে ফিরে গেলেন।

“কান্তিবাবু বিরক্ত মুখে বললেন, ‘স্টুডিওতে অফিসে পোর্টফোলিও জমা দিন। যদি ফিট হয় তো নিশ্চয়ই জানাব।’

“ছেলেটি নাছোড়বান্দা, ‘স্যার ওখানে তো অনেকেই এমন জমা দিয়ে থাকে। তার ভিড়ে হারিয়ে যায় হয়তো। প্লিজ, একটু যদি কনসিডার করতেন.... আমি বর্ধমান থেকে এসেছি। অনেক থিয়েটার করেছি, প্রচুর সার্টিফিকেট...’

“আমি ছেলেটিকে বললাম, ‘তুমি স্টুডিওতে এস। রাস্তাঘাটে এসব কথা হয় নাকি?’

“ছেলেটি তবুও অনুনয় করে বলতে লাগল, ‘স্যার আমাকে মাত্র দশটা মিনিট দিন, আমি আপনাদের একটা ডেমো দেখাতে পারতুম...”

পিন্টু উসুখুসু করছিল কিছু একটা বলার জন্য। স্যার সেটা আন্দাজ করেই ওর দিকে চেয়ে বললেন, “ডেমো বলতে কোনও সিনেমার বা নাটকের খানিকটা অংশ অভিনয় করে দেখাবার কথা বলতে চাইছিল।”

পিন্টু বিজ্ঞের মতো যেন কত বুঝেছে এমনি ভাব করে বলল, “ও!”

স্যার আবার গল্পে ফিরে গেলেন, “ওকে আর কোনও কথা না বলতে দিয়ে আমরা গাড়িতে উঠে পড়লুম। কান্তিবাবু মন দিয়ে সকালের খবরের কাগজটা দেখতে দেখতে উচ্চারণ করলেন, ‘ডিসগাস্টিং!’

“হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে আমরা নির্দিষ্ট প্লাটফর্ম থেকে চুঁচুঁড়ো যাবার জন্য ব্যান্ডেল লোকাল ট্রেনে উঠে পড়লুম। ট্রেনে বসার জায়গাও পেয়ে গেলুম। মিনিট পনেরো পর ট্রেন ছাড়ল। রোববারের সকাল বলেই বোধহয় কামরায় খুব একটা ভিড় নেই। আমরা মৃদু স্বরে ফিল্ম নিয়েই আলোচনা করছিলুম। খানিক পর বালি স্টেশন থেকে একটা ভিখিরি উঠে হেঁড়ে গলায় সিনেমার গান গেয়ে ভিক্ষা করতে লাগল। প্রচন্ড কর্কশ কণ্ঠ। সুর-তাল-লয়ের মা-বাপ নেই। আমাদেরও আলোচনার সুর কেটে গেল। কান্তিবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, ‘এই হয়েছে এক জ্বালা। আর কিছু পেল না তো ভিক্ষে করতে নেমে পড়ল পথে!’

“গায়কটি চলে যাবার খানিক পরে গাড়ি শ্রীরামপুরে থামতে অতি নোংরা শতছিন্ন পোষাক পরা এক ভিখিরি উঠল ভিক্ষা করতে। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। মাথার চুল এলোমেলো। হাতে একটি পুরনো টুপি। সেটাকেই সবার দিকে বাড়িয়ে অতি বিচ্ছিরি আর ভুল উচ্চারণে ‘হেল্প মি, প্লিজ হেল্প মি’ বলে কিছু সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। অনেকেই দয়াপরবশ হয়ে ওর টুপিতে সিকিটা কি আধুলিটা রাখছিল। চেহারা দেখে আমারও ভারি মায়া হল। আমি পকেট থেকে একটা সিকি বের করে ভিক্ষে দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু কান্তিবাবু আমাকে আলতো করে চিমটি কেটে ধীর স্বরে বললেন, ‘এইসব লোকগুলোকে আমি একদম পছন্দ করি না। চেয়ে দেখ, হাট্টাকাট্টা জওয়ান একটা লোক ভিক্ষে করছে! লজ্জাও করে না! ছিঃ!’

“ভিখিরিটি বোধহয় কান্তিবাবুর কথাটা শুনে ফেলেছিল। সে এগিয়ে এসে কান্তিবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কান্তিবাবু বিব্রত বোধ করে বলে উঠলেন, ‘এসব কী হচ্ছে? কাঁদছ কেন?’

“সে বলতে লাগল, ‘বাবু, বিশ্বাস করুন, আমি ভিখিরি নই। আজ তিনমাস হয়ে গেল আমাদের চটকল বন্ধ হয়ে গেছে। কোনও দিকে কোনও রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না। আত্মীয়স্বজন, সব জায়গায় হাত বাড়িয়েছি, কিন্তু সবাই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। একটা কাজের খোঁজে কোথায় না কোথায় গেছি, কেউ কোনওরকম সাহায্য করল না। এদিকে কাল রাত থেকে মেয়েটার জ্বর, পেটে খাবার নেই। তাই বাধ্য হয়েই আমি এই পথে নামলুম। দেবেন, বাবু? একটা কাজ দেবেন? তাহলে তো আমাকে এই ভিক্ষেটা করতে হয় না।’

“কান্তিবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করলেন। তারপর বেশ কয়েকটা নোট ওর টুপিতে দিলেন। এরপর নিজের একটা কার্ড ওর হাতে দিয়ে বললেন, ‘মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো, হয়তো কোনও রাস্তা দেখাতেও পারি।’

“ভিখিরিটি হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে কান্তিবাবুর পাদুটো জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, ‘আপনি ভগবান স্যার, আপনি ভগবান।’ প্রসন্ন হাসিতে কান্তিবাবুর মুখটা ভরে উঠল।

“ট্রেন থেকে নেমে কান্তিবাবু বললেন, ‘আমি শুধুমাত্র তাদেরই সাহায্য করি যাদের সত্যিকারের দরকার আছে আমার সাহায্যের। এই যে লোকটিকে কার্ড দিলুম, দেখো জীবনে ও অনেক উন্নতি করবে। ও কিন্তু ভিক্ষা করতে চায়নি। নেহাত পরিস্থিতির বশবর্তী হয়েই কাজটা করেছে। সৎভাবে বাঁচতে চাইছে। আমার একটু সাহায্য ওকে অনেক দূর নিয়ে যাবে, মিলিয়ে নিও।’

“তা কান্তিবাবু ভুল কিছু বলেননি। জীবনে অনেক উন্নতি করেছে মদন।” শিবুস্যার স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে কথাটা বললেন।

“অ্যাঁ! কী বলছেন?” আমরা পাঁচজনেই প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারণ করলুম কথাগুলো।

“হ্যাঁ, ওটা মদন ছিল। অভিনেতা মদনমোহন জানা।” স্যার হাতের কাছে পড়ে থাকা একটা পেনের উল্টোদিক দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে বললেন, “জীবনে অনেক সিনেমা করেছে মদন। আজকাল তোরা তো বটেই তোদের বাপ-মাও সেকালে ওর ফিল্মের খুব ভক্ত ছিল। তিরিশ বছর ধরে পর্দা কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে! তবে ওকে প্রথম সুযোগ দেন কান্তিবাবুই। সেদিন সকালে কান্তিবাবুর বাড়ি থেকে খেদিয়ে দেবার পরও বেচারি হাল ছাড়েনি। ও একটা ডেমো দেখাতে চেয়েছিল, তাই আমাদের পিছুপিছু ট্যাক্সি করে হাওড়া স্টেশন চলে যায়। আমাদের অভিনয় করে দেখাবার জন্য সঙ্গে ভিখিরির বেশভূষা নিয়ে গিয়েছিল। ট্যাক্সিতে

বসে সেসব ধড়াচুড়ো পরে নিয়ে কুলিদের রাস্তা দিয়ে স্টেশনে কায়দা করে ঢুকে পড়ে। তাড়াহুড়োয় প্রথমে অন্য একটা কামরায় উঠে পড়েছিল। শ্রীরামপুরে কামরা বদলে আমাদের কামরায় এসে ভিক্ষে করার অভিনয় করতে থাকে। ব্যস, বাকিটা তো ইতিহাস।”

আমি ভারি অবাক হয়ে বলি, “আপনি যে এই মদনমোহন জানার কথা বলছেন, কই আমি তো এই নামে কোনও অ্যাক্টরকে চিনি না!”

“আরে বাবা, এই নামের কোনও হিরোকে কি লোকে মন থেকে মেনে নেবে?” স্যার আমাদের অজ্ঞতায় যেন ভারি বিরক্ত হন, “ওকে তোরা চিনিস রূপকুমার নামে।”

“রূপকুমার!” আমরা আঁতকে উঠি, “আপনি, আপনি রূপকুমারের সঙ্গে কাজ করেছেন?”

“হুঁ হুঁ বাবা, বিশ্বাস হল নি তো?” শিবু স্যার মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন, “কান্তিবাবুই ওকে প্রথম সুযোগ দেন।”

“কিন্তু এই গল্পটা তো রূপকুমার কোনওদিন কোনও ইন্টারভিউতে বলেননি! আর রূপকুমারের নাম যে মদনমোহন জানা, এটাও তো প্রথমবার শুনলাম!” ডাকু আমাদের সবার হয়েই যেন প্রশ্নটা করে।

“নামডাক হয়ে যাবার পর সব্বাই এসব কথা ভুলেই যায়।” স্যার নির্বিকারভাবে কান চুলকোতে চুলকোতে বলেন, “কান্তিবাবুকেই বা কতজন মনে রেখেছেন বল? রূপকুমারকে নিয়ে প্রথম ছবি করার পরই উনি রিটায়ার করে নেন। আমিও ফিলিমের দুনিয়াকে টাটা বাই বাই করে চলে যাই অন্যদিকে। সে আর এক গপ্পো।”

আমি জিজ্ঞেস করি, “তা আপনি ফিল্ম লাইন ছেড়ে দিলেন কেন? বেশ তো লিখছিলেন স্ক্রিপ্ট।”

“না রে, ভাই,” স্যার বলেন, “খুব গোলমেলে লাইন, বাপু। আমার পোষাল না। তাছাড়া কান্তিবাবুর মতো ভালোবাসা কারও কাছে পাইনি যে।”

এই বলে স্যার চৌকি থেকে নিচে নেমে দেয়ালে ঝোলা চাবিটা দিয়ে তাঁর সেই বিখ্যাত তোরঙ্গটা খুলতে লাগলেন। আমরা গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে রইলুম কী রাজৈশ্বর্য্য বেরিয়ে আসে তার জন্য। আমরা জানতুম, স্যার নির্ঘাত গল্পের শেষে

একটা কিছু নমুনা পেশ করবেন আমাদের কাছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই স্যার তোরঙ্গ থেকে বের করে নিয়ে এলেন একটা জটাজুট দাড়ি। আমাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে স্যার বললেন, "এটা সেই মদনমোহন জানা ওরফে রূপকুমারের দাড়ি, যেটা পরে ট্রেনে ও আমাদের ভিখিরির অভিনয় করে ধোঁকা দিয়েছিল।"

আমরা সবাই হইহই করে সেটা টানাটানি করে দেখতে লাগলুম। আমি আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় কিকিদিদি আর একপ্রস্থ চা নিয়ে ঢুকল। টেবিলে চায়ের ট্রেটা রাখতে গিয়ে কিকিদিদি যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আমাদের হাত থেকে দাড়িটা টেনে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলল, "গেলবার রামায়ণ পালার পর বাল্মীকির যে দাড়িটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, এটা মনে হচ্ছে..."

আমরা ভারি অবাক হয়ে স্যারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালুম।

স্যার ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, "আর প্রশ্ন নয়। চা এসে গেছে, এবার আমি চা খেয়ে নাইতে যাব। আজ আবার খাসির মাংস রান্না হয়েছে। চটপট না খেলে সব ঠান্ডা জল হয়ে যাবে। চল বাবা-সকল, এবার নিজের নিজের ঘরকে চল।"

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

“দুষ্টু পাখি, মিষ্টি পাখি, কোথায় গেলি?”

“এই তো আমি,” শিউলিগাছের আড়াল থেকে মান্টি দিল সাড়া।

ছোটন বলে, “দূর বোকা মেয়ে, চেঁচাস কেন, মিষ্টি পাখি পালিয়ে যাবে, আর যাবে না ধরা। সেই যে পাখি নরম-সরম, ঠোঁটদুটি যার টুকটুকে লাল, চিকন পালক হলদে-কালো, সেই পাখিটা কাল থেকে যে সেই লুকোলো, আর তো তাকে যায় না দেখা!”

ছোট্ট দু'বোন মান্টি-ছোটন দুপুরবেলা ঘন বনের আড়ালটাতে একা; কালকে তাদের খাঁচা থেকে হুশ করে সেই দুষ্টু পাখি সেই যে গেল উড়ে, সেই পাখিকে খুঁজতে গিয়ে মান্টি-ছোটন দুইটি বোনে বেড়ায় বনে ঘুরে।

চড়া রোদের আকাশ যেন মাথায় গায়ে ঢালছে আগুন। বনের লতা শুকিয়ে গেছে, গাছগুলো সব শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে সোজা। এই গরমেও দুই বোনেতে খেলা ফেলে এই বনেতে, চলছে পাখি খোঁজা।

বাড়ির পাশে এই বাগানে অনেক পাখি থাকে। তাদের মাঝে এই পাখিটা কোনখানে যে মুখ লুকোলো, কে তার খবর রাখে?

পাখিটা তো দিব্যি ক'দিন ছিল ওদের ঘরে। রঙিন খাঁচায় থাকত বসে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখত শুধু এদিক ওদিক; ঠোঁট ডুবিয়ে ছোট্ট বাটির জল খেত সে। টুই-টুই-টুই টিটির টিটির কতরকম কথা, মাঝে মাঝেই ইচ্ছে হলে মিষ্টি সুরে শিসও দিত। দুটি বোনের সঙ্গে তো বেশ ভাবও ছিল। তবে কেন এমন করে পালিয়ে গেল? কী ছিল তার বায়না? মাথা খুঁড়েও দুটি বোনে কিচ্ছু ভেবে পায় না।

সপ্তাখানেক আগে, যেদিন প্রথম এই পাখিটা এল ওদের ঘরে, ওদের বাপি নাম দিল তার ‘টুইটি’। হয়তো পাখির ডাকটা শুনেই এমনতর নাম। নাম ধরে তার ডাকলে ও তো সাড়াও দিত। মায়ের হাতে খাবার খেতে কী ভালোই না বাসত! সেই আদরের পাখি ওদের কাল বিকেলে হঠাৎ করেই যেই না গেল উড়ে, মায়ের সে কী মনখারাপ যে সারা সন্ধেজুড়ে! রাত্রিবেলা বাপি এলেন, সব শুনে তো তাঁরও ভীষণ শোক। ততক্ষণে মান্টি-ছোটন কেঁদে কেঁদেই লাল করেছে চোখ।

যা হোক, তবুও রাত কেটে যেই সকাল হল, চলল খোঁজাখুঁজি। কিন্তু বৃথাই। টুইটি কি আর এ তল্লাটে আছে? সে তো পগারপার। কাজেই তেমন আগের মতোই দুটি বোনের মুখ রইল ভার।

সময়মতো বাপি গেল অফিস। কাজকর্ম সেরে নিয়ে মা যেই শোবার ঘরে, ঠিক তখনই দু'বোন মিলে অ্যাডভেঞ্চার করে। পেছনদিকের বাগানটাতে চুপিচুপি গিয়ে, এ গাছ সে গাছ, এ ঝোপ সে ঝোপ ঘুরে দু'চোখ মেলে খুঁজে বেড়ায় তাকে। নানান পাখির ডাক শুনে ঠিক বুঝতে চেষ্টা করে, কোনও গাছের ডালে পাতায় টুইটি যদি লুকিয়ে বসে থাকে!

তিনটে দিকে হয়েছে খোঁজা, পুবদিকটা বাকি। একটু আগেই দু'বোন মিলে পূর্বদিকে এল। এইদিকে তো অনেকগুলো বড়ো বড়ো গাছ। সূয্যিমামার রোদটা আড়াল করা। একটু যেন গা ছমছম ভাব। দু'জনে তাই কেউই কারুর হাত ছাড়ে না, শক্ত করে ধরা।

এমন সময় হঠাৎ যেন চেনা গলার শিস! খুবই চেনা, খুবই চেনা। ছোটন বোনের হাতটা চেপে ধরে। মান্টি কেমন বোকার মতো দিদির দিকে তাকায়। হঠাৎ দিদি কেন এমন করে? ছোটন মুখে আঙুল দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, “চুপ করে থাক, টুঁ শব্দটি করবি না তো মুখে।”

মান্টি তাকায় বড়ো বড়ো চোখে, “কেন দিদি? কী হয়েছে?”

ছোটন বলে, “চুপ। মনে হচ্ছে এবার বোধহয় খুঁজে পাব ওকে।”

দিদির কথা শুনেই বোনের মিষ্টি হাসি মুখে। বুক যে ভরে সুখে। ধীরে ধীরে দু'জন মিলে এগিয়ে যায় বনের ভেতরপানে। আগাছা আর ঝোপঝাড়ের ফাঁকে কেমন ভেজা ভেজা মাটি। মাঝারি এক পেয়ারাগাছ হাতের পরে হাত তুলেছে ঐ আকাশের দিকে, দাঁড়িয়ে সেইখানে। সেই গাছেরই একটু উঁচু দুটো ডালের মধ্যিখানে ছোট্টমতন একটা পাখির বাসা। সেখান থেকে ভেসে আসছে ডাক – টুই টুই টুই টিটির টিটির, খুব চেনা সেই ভাষা।

ওই আমাদের টুইটি না? মান্টিসোনা কেঁপে ওঠে খুশির শিহরণে।

ছোটনেরও বুকে কাঁপন, আনন্দ তার মনে। ওই তো এবার যাচ্ছে দেখা একটু একটু করে। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে হলুদ-কালো পালক। কিন্তু ও কী? সবুজবরণ গাছে, টুইটি কি ঠিক একলা বসে আছে? ছোট্ট বাসায় ওর সঙ্গে কারা?

ছোটন দিশেহারা। তারপরই সে দাঁড়িয়ে পড়ে, ভুরু কুঁচকে গাছের দিকে দ্যাখে। ছোটোবোনের হাতটা ধরে বলে, “এইখানে তুই দাঁড়া। আমি একটু এগিয়ে দেখে আসি।”

মান্টি দাঁড়ায়। বাধ্য মেয়ের মতো। দু'চোখে তার প্রশ্ন ঘোরে যত। ঐ তো দিদি যাচ্ছে গাছের দিকে। এবার তাদের টুইটিকে কি ফিরে পাবে ঠিক আগেরই মতো?

ছোটন তখন চুপটি পায়ে এগিয়ে যায় আরও। বুক টিপটিপ তারও। গাছের থেকে একটু দূরে দাঁড়ায়, পায়ের ওপর ভর করে তার গলাটাকে উঁচু করে বাড়ায়।

সেখানে কী দ্যাখে? কী দেখে তার দু'চোখ বেয়ে নামে জলের ঢেউ? কেউ জানে না, জানে না তা কেউ।

শুধুই দেখা যায়, ওই তো ছোটন আসছে ফিরে বোনের কাছে চুপিচুপি পায়। তারপরে সে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বোনকে আদর করে কোলে তুলে ফিরে চলে সেই গাছটার কাছে, যেখানে সেই টুইটি বসে আছে।

দু'বোন মিলে দ্যাখে, ছোট্ট বাসায় ছোট্ট দুটো কিউট কিউট ছানা, চোখ ফোটেনি ভালো করে, ঠোঁট বাড়িয়ে, মুখ বাড়িয়ে ছুঁতে চাইছে তাদের মায়ের ডানা। চাইছে খাবার, চাইছে আদর, আহ্লাদে আটখানা। আর তাদের মা, ওদের প্রিয় টুইটিরানি, সোহাগভরে যত্ন করে ঢাকছে তাদের গা।

দুটি বোনের চোখেই যেন অপার বিস্ময়! এ কী দেখছে তারা? টুইটি তবে মা? এই গাছে তার বাচ্চাগুলো আছে? আর তারা এই সাত-সাতটা দিন, খাবার ছাড়া, মাকে ছাড়া...

দুটি বোনের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে যেন বাঁধনহারা। এই পাখিকে কেমন করে নিয়ে যাবে তারা? টুইটি যে আজ মা। তাকে ওরা কক্ষনও তো নিয়ে যাবে না। না, কিছুতেই না।

মান্টি-ছোটন ফিরতে থাকে বাড়ি। মনে তাদের আনন্দেরই বান। আকাশ-বাতাসজুড়ে খুশির গান, সেই খুশিটা ভুবন জুড়ে ভাসে। সূয্যিমামা পশ্চিমে দেন পাড়ি। দুপুর গিয়ে বিকেল নেমে আসে।

ছবিঃ সন্দীপ পাল

পাশের বাড়ির মিঠিদিদির বিয়ে। সকাল থেকেই ফোচনের ব্যস্ততার শেষ নেই। মিঠিদের সাথে ওদের প্রায় আত্মীয়ের সম্পর্ক। তাই আইবুড়ো ভাত থেকেই নেমন্তন্ন। ঝিমলি আগে থেকেই ভালো জামাকাপড় রেডি করে রেখেছিল। কিন্তু ফুচকাকে কিছুতেই টুপি পরানো যাচ্ছিল না। পৌষমাসের দিন, ভালোই ঠান্ডা আছে। নিজে হাতে এই ম্যাচিং টুপিটা বুনেছে ঝিমলি। পরিষ্কার বলে দিয়েছে, টুপি না পরলে বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ। অতএব আমাদের ফোচন চক্রবর্তীকে কম্প্রোমাইজ করতেই হল। আজ আবার সঙ্গে জুটেছে মাসতুতো বোন মিশকা। সেও আরেক যন্তর। ফর্সা, গোলগাল চেহারা। মুখ দেখে কিচ্ছুটি বোঝার উপায় নেই কী সাঙ্ঘাতিক জিনিস। সেও একটা নতুন পিঙ্ক ফ্রক আর পিঙ্ক হ্যাট পরে ফুচকাদাদার পেছন পেছন ঘুরছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে আজ ছুটি পেয়ে গেছে ঝিমলি। ভেবে রেখেছে, সকালে পার্লার খুলতে খুলতেই গিয়ে ফেসিয়াল ইত্যাদি করিয়ে নেবে। নিয়ে সোজা ব্যাঙ্কের লকার থেকে গয়নাগাটি তুলে বাড়ি। মিঠিদের বাড়ি জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়বে। কাজকর্ম সেরে এসে আবার স্কুলের কাজ নিয়ে বসতে হবে। একগাদা প্রজেক্ট জমে আছে, চেক করতে হবে। এস.এ. টু-এর কোয়েশ্চেন পেপার জমা দেওয়ারও সময় হয়ে এসেছে। এই স্কুলে যেন হাঁফ ছাড়ার উপায় নেই।

মিঠিদের বাড়ি গিয়ে দেখে ফুচকা আর মিশকা সারাবাড়ি ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। জলখাবারে লুচি-তরকারি হয়েছে। লুচি তো ফুচকার হট ফেভারিট। মিশকাটার খাওয়া নিয়ে বড্ড বায়না। তবে আজ

ফুচকাদাদার দেখাদেখি মিশকাও বেশ পরিপাটি করে লুচি-তরকারি খাচ্ছে। ঝিমলি খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। যাক, পেটটা তো ভরল। বিয়েবাড়ির ব্যাপার, খেতে কত অবেলা হবে।

ঝিমলি জলখাবার খেয়ে বেরোবে বেরোবে করছে, এমন সময় হৈ হৈ করে গায়ে হলুদের তত্ত্ব ঢুকল। ঝিমলিও দাঁড়িয়ে গেল। দারুণ তত্ত্ব পাঠিয়েছে মিঠির শ্বশুরবাড়ি থেকে। শাড়ি, কাপড়, জামা, জুতো, ব্যাগ ছাড়াও মিঠি ভালোবাসে বলে বেশ কয়েক ট্রে চকোলেট আর সফট টয়। ফুচকা আর মিশকাকে তো সামনে থেকে সরানো যাচ্ছে না। বাচ্চাগুলোকে আর কী বলবে? ঝিমলির নিজেরই যা লোভ হচ্ছে। তবুও চোখের ইশারায় দুই ভাইবোনকে বলল সামনে থেকে সরে আসতে। গায়ে হলুদ পর্ব শুরু হয়ে গেছে। আচমকা কেউ এসে মুখে হলুদ লাগিয়ে দেওয়ার আগে কেটে পড়াই ভালো। যাওয়ার আগে ফুচকা আর মিশকাকে ডেকে বেশ কড়া গলায় বলে গেল, "কোনওরকম দুষ্টুমি করবে না, কোনওকিছুতে হাত দেবে না। আর ঠিক সময় বাড়ি গিয়ে স্নান করে নেবে। নইলে সন্ধেবেলা যখন বর আসবে, তোমরা কিন্তু ঘরে আটকে থাকবে।"

সুবোধ বালক-বালিকার মতো ঘাড় নেড়ে তারা একছুট। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত জ্ঞান শোনার সময় কই? ঝিমলি বেরিয়ে যেতেই ওরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দুটোতে মিলে বাড়িময় ছুটোছুটি করতে ব্যস্ত। ফুচকাকে এ-বাড়ির সকলেই খুব ভালোবাসেন। যেতে আসতে অনেকেই মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন বা গালটা টিপে দিচ্ছেন। মিশকাকে তেমন কেউ চেনেন না। ফুচকার মাসতুতো বোন। ছুটিতে মাসির বাড়ি বেড়াতে এসেছে, তাই ওরও নেমন্তন্ন। এরই মাঝে মিঠিদিদির কোলে বসে বেশ পোজ মেরে ছবিও তোলা হয়ে গেছে ওদের। বেলা গড়াতে চলেছে। এদিকে যখন গায়ে হলুদের পর্ব চলছে, ওদিকে দুপুরের রান্না বসে গেছে। মাছ ভাজার গন্ধ ঠিক পৌঁছে গেছে শ্রীমান ফোচন চক্রবর্তীর নাকে। আর তাকে পায় কে? গিয়ে হাজির হয়েছে উঠোনে, যেখানে শামিয়ানা খাটিয়ে রান্না হচ্ছে।

ফোচন বা মিশকা কেউই এর আগে কোনওদিন বিয়েবাড়ির রান্না দেখেনি। এত বড়ো বড়ো হাঁড়ি, কড়াই, হাতা-খুন্তি দেখে তো দু'জনের চক্ষু ছানাবড়া। ভাত, ডাল, তরকারি ততক্ষণে হয়ে গেছে। একটা কড়াইয়ে তখন ঝুরঝুরে আলুভাজা ভেজে তোলা হচ্ছে। পাশে বিশাল বড়ো থালায় লম্বা ফালি ফালি করে বেগুন কেটে রাখা। আলুভাজা উঠলেই এবার বেগুনির পালা। অন্য এক স্টোভে বিশাল বড়ো কড়াইয়ে মাছ ভাজা হচ্ছে। কিছু মাছ ইতিমধ্যেই ভেজে তুলে রাখা হয়েছে। পাশে বসে একজন মশলা বাটছেন। মাছের কালিয়া হবে। মাছের গন্ধে উঠোন ম ম করছে। জিভে তো জল আসছে দুই ভাইবোনের। বাচ্চা দুটোর মনের ভাব বুঝতে পেরেই বোধহয় ঠাকুর সস্নেহে ওদেরকে, "এই, এদিকে এস," বলে ডেকে দু'জনকে দু'পিস মাছভাজা দিলেন কাগজের প্লেটে করে। দু'জনে পরম তৃপ্তি করে মাছভাজা খাচ্ছে, এমন সময় ঝিমলির মা এসে হাজির। ছেলেমেয়েগুলোর বাড়ি ফেরার নাম নেই, অবেলায় স্নান করলে ঠান্ডা লাগবে। তাই উনি নিজেই নিতে এসেছেন। বাড়ির কোথাও খুঁজে না পেয়ে উনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন এদের দু'জনকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে। ইশ, কী লজ্জার কথা! বাড়িতে যেন খেতে পায় না। সবার সামনে কিছু না বললেও মনে মনে বললেন, 'চল একবার বাড়ি, দেখাচ্ছি মজা।'

বিয়ের লগ্ন তাড়াতাড়ি। তাই বিকেল হতেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। মহিলামহল সাজগোজে ব্যস্ত। কারও শাড়ির কুঁচি ঠিক হচ্ছে না, কারও আবার চোখের মেক-আপ বা হেয়ার স্টাইলটা পছন্দসই হচ্ছে না। আয়নার

সামনে ঠেলাঠেলি। কেউ কেউ তো এখনও পার্লার থেকে ফিরতেই পারেননি। কনের সাজ প্রায় হয়ে এসেছে। ফুচকা আর মিশকা ওখানেই ঘোরাঘুরি করছে। কী সুন্দর লাগছে মিঠিদিদিকে। যেন একদম রাজকন্যা। মাঝখানে গিয়ে অবশ্য পেট ভরে চিকেন পকোড়া খেয়ে এসেছে। কফিতে কোনও আকর্ষণ নেই ওদের।

হঠাৎ নিচ থেকে কে যেন চেঁচাল, "বর এসে গেছে, বর এসে গেছে।"

ব্যস, যেন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার সুরের টানে হুড়মুড় করে সব ছুটে চলল নিচে। কনে পড়ে রইল একা। কনে এখন সেকেন্ডারি। একা অবশ্য নয় মিঠি। গুণমুগ্ধ দুই খুদে পাহারাদার বসে আছে ওর সঙ্গে। মিঠি নিজে স্মার্টফোনে ব্যস্ত, সেলফি তুলতে আর হোয়াটস-অ্যাপ করতে। নিচে তখন জামাইবরণ চলছে। উলু আর শাঁখের আওয়াজে বাড়ি মুখর। জামাই বেচারা হাসি হাসি মুখে আদরের অত্যাচার সহ্য করছে।

ছেলে আশীর্বাদ শেষ, এবার মেয়ে আশীর্বাদের পালা। মিঠিকে ওপর থেকে আনতে হবে। এতক্ষণে সবার টনক নড়েছে যে মিঠি ওপরে একা।

মিঠির ঘরের সামনে যেতেই সবার চক্ষু ছানাবড়া। মিঠি ভয়ে থরথর করে কাঁপছে; চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। চেঁচিয়ে কাউকে ডাকারও ক্ষমতা নেই। মেঝেতে পড়ে একটা লোক ছটফট করে কাতরাচ্ছে। ফুচকা আর মিশকা মিলে তাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করছে। ফুচকা লোকটার গায়ের ওপর উঠে ঠিক বাঘের মতো লোকটার গলার কাছে কামড়ে ধরে আছে। আর মিশকা লোকটার পায়ে সমানে আঁচড়ে কামড়ে যাচ্ছে।

"সর্বনাশ, এ কী করছিস তোরা?" বলে এগিয়ে ফুচকা আর মিশকাকে সরাতে গিয়েই চোখে পড়ল লোকটার হাতের মুঠোতে মিঠির সোনার হার, দুল। লোকজন দেখে সাহস পেয়ে মিঠি গলার স্বর ফিরে পেয়েছে। মাকে জড়িয়ে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছে, কান কেটে রক্ত ঝরছে। বিয়েবাড়ির মধ্যেই থানাপুলিশ। এক বিশ্রী ব্যাপার। ফুচকা আর মিশকাকে আদরে আদরে ভরিয়ে দিলেন সকলে। ওদের জন্যই এত বড়ো একটা দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। বাকি বিয়ের অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নেই কেটে গেছিল। পরেরদিন সকালে ক্যালকাটা টাইমসের হেডলাইন 'ডোমেস্টিক ফেলাইন্স ফয়ল থেফট এটেম্পটঃ সেভ ব্রাইডাল জুয়েলারি'। সঙ্গে ফুচকা আর মিশকার হাসি হাসি মুখের ছবি।

ছবিঃ জয়ন্ত বিশ্বাস

প্রেতছায়া

সৌরভ রায়

কাল রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে পুরনো ঘটনার কথাটা মনে পড়ে আবার যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। অনেকদিন বলা ঠিক হবে না, সত্তর দশকের শেষের দিকের ঘটনা হবে। তখন কলকাতা শহরে এত ভিড় ছিল না। আমরা তখন বাবার চাকরির সুবাদে মোমিনপুরে কাছে রিমাউন্ট রোডের পোর্টের কোয়াটার্সে থাকতাম। ব্রিটিশ আমলের পুরনো বিশাল বাড়ি। আমরা তখন একতলায় আর উল্টোদিকে চ্যাটার্জিদের ফ্ল্যাট। চ্যাটার্জিকাকুরা তিন ভাই, ভাইপোরা সব মিলিয়ে বিরাট সংসার। আমরা নিয়ম করে সন্ধেয় রোজ বাড়ির সামনের সিঁড়িতে বসে আড্ডা মারতাম। সে যুগে কলকাতায় রোজ নিয়ম করে লোডশেডিং হত আর আমরা হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশুনা করতাম। তবে গরমে ও মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে প্রায়শই আড্ডায় এসে চুপচাপ বসে যেতাম। ছোটো ক্লাসে পড়ি বলে বিশেষ চাপও ছিল না।

সেরকমই এক সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ লোডশেডিং চলছে, রাত প্রায় দশটা তো হবেই। কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে লোক চলাচল অনেক কমে গেছে। অন্ধকারে অনেকক্ষণ বসে থাকায় চোখ সয়ে গিয়ে সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গান, গল্প চলছে প্রায় আট-দশজন মিলে। সামনে দিয়ে এক অচেনা বোধহয় অবাঙালি পুরুষ বেশ দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল এদিক ওদিক না তাকিয়ে। হঠাৎ আমাদের সবার সামনে আসতে লোকটি চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেল। একজন দু'জন নয়, প্রায় দশজন মানুষের সামনে দিয়ে!

অতর্কিতে ব্যাপারটা হয়ে যাওয়ায় সবাই হতচকিত হয়ে গেছিল মুহূর্তের জন্য। সম্বিত ফিরল ছোটোকাকার গলায়, "একি হল রে?"

ব্যস, তারপরে তো হৈহৈ রৈরৈ কান্ড! আওয়াজ শুনে চ্যাটার্জি পরিবারের আরও কয়েকজন দাদাও তখন ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভূতের উপর আলোচনা ও গবেষণাও শুরু হয়ে গেল। এমনিতে কাঁটাপুকুর মর্গ কাছে হওয়াতে সারা দিনরাত ধরে সামনের রাস্তা দিয়ে মরা মানুষদের মিছিল চলত। কিন্তু এতগুলো লোকের সামনে দিয়ে একটা লোকের বেমালুম গায়েব হয়ে যাওয়া যেন ভূতের চ্যালেঞ্জ।

ঘটনা সেখানে শেষ হল না কিন্তু। আড্ডায় ভূতচর্চা বেড়ে গেল। এর মধ্যে কে যেন সিঁড়ির কোনায় একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিল। তার আলোয় অন্ধকারটা আরও কমে গেছিল। তখনও আড্ডা, হাসি, ভয় দেখানো, ঠাট্টা চলছে। হঠাৎ পরিষ্কার দেখলাম, বড়ো রাস্তার ডানদিকের থেকে কে একজন বেশ ধীরপায়ে চলে আসছে। তার কোমরের তলায় ফুলপ্যান্ট পরা পাদুটো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু উপরে ঘোর অন্ধকার, যেন শরীর বিহীন এক শরীর হেঁটে চলে যাচ্ছে। এদিকে যাকে বলে পিন ড্রপ সাইলেন্স। সবাই অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখছে মাত্র কয়েক হাত দূর থেকে। হঠাৎই এক দাদা, "কে যায়?" বলে হ্যারিকেন হাতে তেড়ে গেলেন। কিন্তু কে কোথায়? আড্ডা সেদিনের মতো ভেঙে গেল।

আমার তখন দশ-এগারো বছর বয়েস হবে। ভয়ে সারারাত ঘুমোতে পারিনি। আজও মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়।

প্রফেসর বৈদ্যনাথ ও প্রফেসর বৈদ্যনাথ

চন্দন কুমার দেব

প্রফেসর বৈদ্যনাথ বর্তমান বৈজ্ঞানিক সমাজে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। বাস কোচবিহার শহরে। দেশবিদেশের বিভিন্ন কনফারেন্স, সিম্পজিয়ামে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন বহুবার। প্রফেসর বৈদ্যনাথ যে ধরনের বৈজ্ঞানিক, সে ধরনের বৈজ্ঞানিক আজকালকের দিনে সত্যই খুব অল্প। এককথায় হি ইজ অফ রেয়ার কাইন্ড। পদার্থ, রসায়ন, গণিতশাস্ত্র, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত জীবন এমনকি মরণোত্তর জীবন কিছুই তার কাজের এলাকার বাইরে নয়। তথাপি গত কয়েক বছর ধরে তিনি যে বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন তা এসবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি যে বিষয়ে কাজ করছেন তা হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। তবে এটি কনভেনশনাল জন ম্যাকার্থের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থেকে খানিকটা আলাদা। তারই প্রবর্তিত বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার নাম রাখা হয়েছে কেমিকো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যা প্রধানত পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও কম্পিউটার সায়েন্সের এক মসৃণ ব্লেন্ড।

প্রফেসর বৈদ্যনাথ আটান্ন বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক। তবে তার কাজের উদ্যম, উৎসাহ তাকে আটান্ন বছরের যুবক বানিয়ে রেখেছে। প্রফেসরের মাথাভরতি টাক, মাথার পেছনের দিকে শুভ্র লম্বা চুল, গোঁফটাও কিছুটা পেকে গেছে। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারায় বিজ্ঞানীর সাথে কিছুটা সাহিত্যিকের ভাব এনে দিয়েছে।

আজ কয়েকদিন হল প্রফেসর বৈদ্যনাথ সাদা বালির সমুদ্রসৈকত জাপানের অকিওয়ানাতে আছেন। প্রফেসর বৈদ্যনাথের এই বর্তমান গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা করছে জাপানের একটি বেসরকারি সংস্থা। সংস্থার প্রেসিডেন্ট ফিউমা নাকামুরা কগ্নিটিভ সায়েন্সে বিশ্বে নামীদামী নামগুলোর মধ্যে গোনা হয়। দুই শতাধিক গবেষণাপত্র শুধুমাত্র কগ্নিটিভ সায়েন্সে অর্থাৎ মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালীর ওপর। তার অনুরোধেই জাপানে আসেন প্রফেসর বৈদ্যনাথ। নাকামুরার সঙ্গে বৈদ্যনাথের প্রথম কথা হয় জার্মানিতে কোনও এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে। সেখানেই প্রফেসর বৈদ্যনাথ প্রথম কেমিকো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা বলেন। যা ম্যাকার্থের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থেকে হবে অনেকটাই আলাদা। যাতে মস্তিষ্ক তৈরি হবে জটিল সার্কিট আর হাজারো রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে।

এই অভিনব প্রস্তাবে চমৎকৃত নাকামুরা বক্তৃতা শেষে প্রফেসর বৈদ্যনাথের সঙ্গে চা-বিরতির সময় আলাপ শুরু করে দিলেন। সকলে বেশ চমৎকৃত ও উৎসাহিত বিজ্ঞানের এই নতুন শাখা নিয়ে। কিন্তু ফিউমা নাকামুরা নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, “আমার সংস্থা আপনাকে অর্থনৈতিক সাহায্য করতে প্রস্তুত। আপনি চাইলে আগামী বছর থেকেই কাজটি শুরু করতে পারেন।”

এর আগে প্রফেসর বৈদ্যনাথের নাকামুরা সম্পর্কে শুধু শুনে বা গবেষণাপত্রে পড়ে এসেছেন। এই প্রথমবার দেখা। উচ্চতায় পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির বেশি নয়। সামনের দিকের চুল খাড়া খাড়া, দাড়িগোঁফের বালাই নেই। নীল স্যুটের ভেতরে ধবধবে সাদা শার্ট, অত্যন্ত কম বয়স। অত্যন্ত কম বয়স বলছি কারণ, তিনি প্রফেসর বৈদ্যনাথের থেকে বয়েসে প্রায় বিশ বছরের মতো ছোটো আর এই বয়সেই এই সাফল্য একেবারেই খাপ খায় না।

এ অবধি জাপানে আসা প্রফেসর বৈদ্যনাথের জন্য তেমন কার্যকর হয়নি। কারণ, নাকামুরা যে মিটিংয়ের জন্য তাঁকে এখানে ডেকেছিলেন, তাতে বিজ্ঞান কম ব্যবসায়িক আলোচনাই বেশি হয়েছে। এই প্রজেক্টের প্রোডাক্ট কী আকারে বাজারজাত করা হবে, এইসব বিষয়ে আলোচনা প্রফেসর বৈদ্যনাথকে কিছুটা ক্লান্ত করে দিয়েছে। এইবার প্রফেসর বৈদ্যনাথ বুঝতে পারছেন নাকামুরার এই ব্যবসায়িক সাফল্যের কারণ। প্রফেসর বৈদ্যনাথ শুধু অবাক হলেন বিজ্ঞানের এত বড়ো হস্তি মিটিংগুলোতে একবারের জন্য বিজ্ঞানের কথা বললেন না, মানব কল্যাণের কথা বললেন না!

প্রফেসর ফিউমা নাকামুরা আরও কয়েকটা মিটিং রেখেছেন। মিটিং শিডিউল দেখে বৈদ্যনাথ কিছুটা ব্যথিত। কারণ, সবকটি মিটিংই ব্যবসা-সংক্রান্ত। তাই নাকামুরাকে বুঝিয়ে বলে এসব থেকে দূরে অকিওয়ানেতে এক নিরিবিলি জায়গায় একটা হোটেলে আছেন প্রফেসর বৈদ্যনাথ। সমস্ত খরচা বহন করছে নাকামুরার সংস্থা।

নাকামুরা অর্থ নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কারণও বোধহয় অনর্থক নয়। কারণ, এই প্রজেক্টে তারা পয়সাও ঢেলেছে প্রচুর। বৈদ্যনাথ এবং নাকামুরার মিটিং ছিল টোকিওতে। কিন্তু প্রফেসর বৈদ্যনাথের এখন প্রায় দু'হাজার কিমি দূরে অকিওয়ানাতে পরম শান্তিতে নিজের কাজে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছেন। এতদূরে আসার একমাত্র কারণ কোলাহল থেকে দূরে থেকে নিজের গবেষণায় মনোনিবেশ করা। তিনি আছেন এক নিরিবিলি পার্সোনাল স্যুইটে। বৈদ্যনাথ এত ঐশ্বর্য্য পছন্দ না করলেও সংস্থার অনুরোধে এবং নিঃসঙ্গতার প্রয়োজনীয়তায় এখানে তিনি থেকে যান।

এবার প্রফেসর বৈদ্যনাথের বর্তমান প্রজেক্ট সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়া যাক। এই কেমিকো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রবক্তা স্বয়ং প্রফেসর বৈদ্যনাথ হলেও সমস্ত দায়িত্ব তিনি একা বহন করছেন না। সারা বিশ্বের নামীদামী দশজন বৈজ্ঞানিক একসাথে কাজ করছে। তবে অনেকগুলি মডিউল আছে প্রফেসর বৈদ্যনাথের হাতে। সমস্ত রোবোটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দেখছেন প্রফেসর বৈদ্যনাথের জার্মান বন্ধু কার্ল হ্যান। তবে রসায়ন ও কম্পিউটার সায়েন্স দেখছেন প্রফেসর বৈদ্যনাথ নিজে। এই প্রজেক্টের প্রোডাক্ট যা তৈরি হবে তা হল একটি হিউম্যানয়েড ব্রেইন। যার অপার ক্ষমতা মানব সভ্যতাকে এগিয়ে দেবে অনেকটা। এই ব্রেইন প্রধানত কাজ করবে ননলিনিয়ার পলিনমিয়াল প্রবলেম বা এনপি প্রবলেমের ওপর। কাজ করবে গড পার্টিকেলের ওপর। ওজনে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে বেশি হবে না। তৈরি হবে জটিল সার্কিট। যার বিল্ডিং ব্লক হবে কৃত্রিম স্নায়ু বা আর্টিফিশিয়াল নিউরন। নিউরনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ইলেকট্রিক সিগন্যালের মাধ্যমে। এই সিগন্যাল আসবে এক ধরনের তরল থেকে যা মানুষের ক্ষেত্রে আমরা রক্ত হিসেবে জানি। এই মস্তিস্কের সমস্ত কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রত হবে একটি ছোট্ট চিপের নির্দেশ অনুসারে। এই চিপে যা থাকবে তা হল একটি অ্যালগোরিদম লাইব্রেরি। আর এই লাইব্রেরির কাজ করবার জন্যই প্রফেসর বৈদ্যনাথের অকিওওানাতে আসা। এই হিউম্যানয়েড ব্রেইনটি মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে কিছু ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস দ্বারা।

প্রফেসর বৈদ্যনাথ গতকাল অনেক রাত অবধি অ্যালগোরিদম সম্বন্ধে অনেক ভেবেছেন। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। গতকাল অনেক রাত অবধি জাগাতে তার মাথাটা ঝিমঝিম করছে। রাত্রি জাগার ঘটনা এই প্রথম নয়। কোনও জটিল গবেষণায় তাকে প্রায়শই অনেক রাত্রি জাগতে হয়। আজ মাথা ঝিমঝিম করার কারণ অন্য। কাল রাতে দুঃস্বপ্নরকমের কিছু একটা দেখেছেন। দেখেছেন পৃথিবী ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য তিনিই দায়ী। তাঁকে সবাই দোষারোপ করছে। নাকামুরার হিংস্র চেহারা দেখে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। তখনও ঠিকঠাক ভোর হয়নি। প্রফেসর আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

কলিং বেল বেজে ওঠায় আবারও ঘুম ভাঙল সোয়া সাতটা নাগাদ। দরজা খুলতেই প্রফেসর বৈদ্যনাথ দেখলেন ফিউমা নাকামুরা। বললেন, “ওহা ইও” অর্থাৎ, শুভ সকাল।

প্রফেসর বৈদ্যনাথও বললেন, “গুড মর্নিং।”

“আপনি ফ্রেশ হয়ে নিন। তারপর কথা বলব।” এই বলে নাকামুরা হোটেল স্যুইটের ব্যালকনিতে বৈদ্যনাথের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হাতেমুখে জল দিতে দিতে প্রফেসর বৈদ্যনাথ বুঝে উঠতে পারছেন না, এত সকাল সকাল নাকামুরা এত বড়ো বিজনেস মিটিং ছেড়ে কেন তার সঙ্গে করতে এলেন? প্রফেসর বৈদ্যনাথ ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন নাকামুরা এরই মধ্যে চা ও ব্রেকফাস্ট আনিয়ে রেখেছে। ধূমায়িত চা অপেক্ষা করছে প্রফেসরের জন্য, যা এখন খুবই প্রয়োজন।

আজকে নাকামুরাকে দেখে একটু বিষণ্ণ বলে মনে হচ্ছে। নাকামুরা একটু তীক্ষ্ণ সুরে বললেন, “তো প্রফেসর, আপনার লাইব্রেরির কী খবর?” একটু বিনয়ী হওয়ার চেষ্টা করে, “আই অ্যাম সরি, মানে আপনার অ্যালগোরিদম লাইব্রেরির কী খবর?”

শেষটায় খানিকটা উদাসীনতা।

“ও হ্যাঁ, কাজ হচ্ছে।” বৈদ্যনাথ স্বাভাবিকভাবেই বললেন। আরও বললেন, “একক অ্যালগোরিদম তৈরি, কিন্তু ওদের সমন্বয় বা ইনট্রিগেশন শুধু বাকি। আর প্রধান সমস্যা হল সেখানেই।”

নাকামুরা হঠাৎ আগ্রহী হয়ে বললেন, “ও প্রফেসর, হ্যাভ ইট।” এবং চা ও প্রাতরাশের দিকে ইশারা করলেন।

প্রফেসর বৈদ্যনাথ চা নিতে নিতে বললেন, “আপনি আপনার এত বড়ো বিজনেস মিটিং ছেড়ে কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।”

নাকামুরা একটু সন্দেহের সুরে বললেন, “গতকাল রাতে আপনি প্রোডাকশন প্ল্যান্টে কী করছিলেন, আর আপনি আমায় মিথ্যা কেন বলেছেন? আপনার অ্যালগোরিদম লাইব্রেরির ইনটিগ্রেশন তো হয়ে গেছে।” কথা শেষ করেই হাতের ফাইলটা দেখিয়ে বলল, “এই তো তার ব্লুপ্রিন্ট।”

প্রফেসর বৈদ্যনাথ আকাশ থেকে পড়লেন। নাকামুরা যে প্রোডাকশন প্ল্যান্টের কথা বলছে তা অকিওয়ানা থেকে দু'হাজার কিমি দূরে। তাছাড়া তিনি ওখানে যাবেনই বা কেন। এই মুহূর্তে তিনি অ্যালগোরিদম নিয়ে এতটা ব্যস্ত। তার ওপর নাকামুরা এ কোন ফাইল নিয়ে এসেছে?

বৈদ্যনাথ ফাইল খুলে দেখলেন, শেষে দিকটায় গতকালের তারিখ। তারই হাতের কাটাকুটি লেখা আবার কাটাকুটি করা। আবার লেখা এবং শেষ অবধি সমীকরণ মিলে যাওয়ার মতো অ্যালগোরিদমের ইনটিগ্রেশন সম্পন্ন করা। প্রফেসর বৈদ্যনাথ মনে মনে আওড়াতে লাগলেন, "আমি সফল, আমি সফল।" বলতে বলতে শরীর যেন কেমন অবসন্ন হয়ে গেল। কথা জড়িয়ে আসতে লাগল। শুধু দেখা গেল নাকামুরার ঠোঁটের কোণে এক তীক্ষ্ণ পৈশাচিক হাসি। কালো কাপড় পরা কয়েকজন এসে বৈদ্যনাথকে ধরাধরি করে কোথাও একটা নিয়ে যেতে থাকল। শুধু বোঝা গেল, এরা নাকামুরার শাগরেদ। তবে কি নাকামুরাই চায়ের সঙ্গে কিছু মিশিয়েছে? প্রফেসর ঘুমের কোলে ঢলে পড়লেন।

যখন ঘুম ভাঙল তখন বৈদ্যনাথ নিজেকে একটা চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় পেলেন। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। যে প্রফেসর বৈদ্যনাথকে জলের গ্লাস এগিয়ে দিল তাকে দেখে তার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় বৈদ্যনাথের মাথা ঝুঁকে ছিল। জল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির জুতো আর গাউন প্রফেসর বৈদ্যনাথের সঙ্গে একই ব্র্যান্ড। মুখ তুলে যা দেখলেন তাতে রক্ত হিমশীতল হয়ে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বৈদ্যনাথ নিজে।

গ্লাস মুখের সামনে এগিয়ে দিয়ে জল খেতে দিয়ে সে বলল, "শান্ত হও, সব বুঝিয়ে বলছি।"

প্রফেসর বৈদ্যনাথ ক্লান্ত, শ্রান্ত। এখনও ঘুমপাড়ানি ওষুধের নেশা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তিনি ভাবছেন, 'আবারও কোনও স্বপ্ন-টপ্ন দেখছি না তো?'

জলদাতা বৈদ্যনাথ এবার একে একে সমস্ত ঘটনা বলতে শুরু করল। তার কথার সারমর্ম যা দাঁড়ায় তা হল কিছুটা এইরকম।

এই দ্বিতীয় বৈদ্যনাথ এসেছে পৃথিবী থেকে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবীর মতো এর একটি গ্রহ থেকে। নাম আরস্ভেনাস। যা অবিকল পৃথিবীর মতোই। মতো বললে ভুল হবে, ওটা ওই সৌরজগতের পৃথিবী। কিন্তু সেটি ভেনাস বা শুক্রের মতো অত কাছে না হলেও পৃথিবী থেকে সূর্যের যা দূরত্ব তার থেকে কম। পৃথিবীর সাথে এই আরস্ভেনাসের মিল হল পৃথিবীর সমস্ত কিছুর অর্থাৎ কীটপতঙ্গ, গাছপালা, পশুপাখি থেকে শুরু করে সবকিছুর প্রতিরূপ বা রেপ্লিকা সেখানে আছে। তাই প্রফেসর বৈদ্যনাথেরও রেপ্লিকা থাকাটাই স্বাভাবিক। শুধু রেপ্লিকা বললে ভুল হবে কারণ, এই রেপ্লিকার কাজকর্মও থাকে একই। কিন্তু আরস্ভেনাস ওই সৌরজগতের সূর্যের কিছুটা কাছাকাছি থাকায় প্রতিমুহূর্তে একটু একটু করে প্রায় বিশ বছর এগিয়ে গেছে অর্থাৎ আজ আরস্ভেনাসে যা একই ঘটনা বিশ বছর পরে পৃথিবী ঘটে। তারই সূত্র ধরে আরস্ভেনাসের বৈদ্যনাথের পৃথিবীতে পদার্পণ।

এসব ঘটনা শুনে বৈদ্যনাথ অবাক ও স্তম্ভিত। কত বিচিত্র জিনিসই না প্রকৃতিতে আছে। আরস্ভেনাসের বৈদ্যনাথের কথায় বৈদ্যনাথ চমকে উঠলেন, "তুমি বা আমি যে অ্যালগোরিদম লাইব্রেরি বানিয়েছি তাতে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, যা তোমাকে ছাড়া সম্পন্ন করা যেত না। যার ব্লু প্রিন্ট আমি নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গতকাল রাতে তা বেহাত হয়ে যায়। নাকামুরার হাতে পড়ে যায়।"

প্রফেসর বৈদ্যনাথ বললেন, "হিসেব মতো আমি তো অতীতের বৈদ্যনাথ। তুমি যা করেছ ভবিষ্যতে আমি তাই করব, কিন্তু হঠাৎ আমাকে কী দরকার?"

ভিনগ্রহের বৈদ্যনাথ রহস্যময় হাসি হেসে বলল, "মানুষকে অনেক সময় নিজের অতীতের সাথে কথা বলতে হয়। না হলে সে ভবিষ্যতে এগোতে পারে না।"

প্রফেসর বৈদ্যনাথ প্রশ্ন করলেন, "তোমার কাছ থেকে অ্যালগোরিদম লাইব্রেরির ব্লুপ্রিন্ট কী করে বেহাত হয়ে গেল?"

"এ হল আমার বন্ধু কোকা নাকামুরা।" বলে আধ আলোছায়া ঘরের অন্যদিকটায় ইশারা করল।

এতক্ষণ প্রফেসর বৈদ্যনাথ দেখতে না পেলেও অন্য বৈদ্যনাথের কথা অনুসারে ঘরের অন্যদিকটায় ঘুরতেই দেখতে পেলেন একজন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, অত্যাচারিত লোক তার দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

প্রফেসর বৈদ্যনাথ উদ্বিগ্নতার সাথে প্রশ্ন করলেন, "এ কে?"

ভিনগ্রহের বৈদ্যনাথ বলল, "এ হল ফিউমার ভাই। বয়সে ফিউমার থেকে বছর পাঁচেকের বড়ো। কগনিটিভ সায়েন্সে ফিউমার যত নাম যশ, যা কিছু আছে, তার আসল মালিক এ। নাম কোকা নাকামুরা। প্রথম প্রথম আত্মকেন্দ্রিক, গবেষণামগ্ন, ঘরোয়া কোকা বুঝতেই পারেনি তার সহযোগী ভাই তার আত্মকেন্দ্রিকতার সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে। যখন সে বুঝতে পারল নিজের গবেষণার বিন্দুমাত্র কপিরাইট তার দখলে নেই ততক্ষণে সময় অনেকটাই পেরিয়ে গেছে। যখন কপিরাইটের কথা কোকা বলেছে এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছে ঠিক তখনই ফিউমা ওকে ঘরে বন্দি করে রেখেছে। লক্ষ করে দেখবে গত কয়েক বছরে ফিউমা নাকামুরার কোনও ভালো গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়নি।"

প্রফেসর বৈদ্যনাথ মাথা নাড়লেন, "সবই বুঝলাম, কিন্তু এটা বুঝলাম না ব্লুপ্রিন্ট কীভাবে ওর হাতে গেল।"

অন্য বৈদ্যনাথ বলল, "অ্যালগোরিদম সম্পূর্ণ করার জন্য তোমাকে যতটা প্রয়োজন ছিল ততটাই প্রয়োজন ছিল কোকা নাকামুরাকে। মনে করে দেখ যেদিন মিটিং শেষে তুমি ফিউমাকে কগনিটিভ সায়েন্সের কিছু জটিল সমীকরণ সমাধান করতে অনুরোধ কর, কারণ সেগুলো অ্যালগোরিদম লাইব্রেরির জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু সেটা প্রবঞ্চক ফিউমার পক্ষে সমাধান করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই ও কোকার কাছে আসে জোর করে সমীকরণের সমাধান করে নিতে। ফিউমা যখন সেখানে যায় আমরা দু'জনে অর্থাৎ আমি ও কোকা ততক্ষণে মোটামুটি সফল হয়ে গেছি। দুর্ভাগ্যবশত ফাইলটা কোকার হাতে থাকে এবং

আমাকে সরে যেতে হয়। কোকার হাতের ব্লুপ্রিন্ট সম্পূর্ণ ভেবে ফিউমা ওটা কেড়ে নেয়। গোপন ক্যামেরা বা সিসিটিভি ফুটেজে ওরা আমাদের অনেকক্ষণ নজর রাখছিল। আমাকে দেখে ভুলবশত ভাবে যে তুমি ওখানে ছিলে এবং তুমি কোকা সম্পর্কে সব জেনে গিয়েছ। তাই ও গতরাতেই অকিওয়ানা গিয়ে সকাল পর্যন্ত তোমার ওপর নজর রেখে তারপর তোমাকে বন্দি করে। তবে এখন আমি সিসিটিভি ক্যামেরা হ্যাক করেছি আমার এই ছোট্ট ঘড়িটির মাধ্যমে। এখন আমি ওদের যা দেখাতে চাইব ওরা তাই দেখতে পাবে।”

এসব আলোচনা হওয়ার সময় হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে ভিনগ্রহের বৈদ্যনাথ নিজের হাতের ঘড়িতে একটা বোতাম টিপতেই খানিকটা আবছা হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘরে প্রবেশ করল ফিউমা নাকামুরা ও তার কয়েকজন সাথী। ফিউমা বলে উঠল, “ধন্যবাদ প্রফেসর। আমাদের হিউম্যানয়েড মস্তিষ্ক তৈরির কাজ কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে। তাই তোমার ও কোকার আর কোনও প্রয়োজন আমার জীবনে নেই। আর আমি কয়েকদিনের মধ্যে সবার ভগবান হয়ে যাব। তাই তোমাদেরকে তোমাদের ভগবানের কাছে পাঠাতে এসেছি।”

কথা শেষ করেই টাইপ-২৬-এর একটা রিভলবার বার করতেই অদৃশ্য এক ঘুষি ফিউমা নাকামুরাকে ধরাশায়ী করে দিল। আশেপাশের নাকামুরার দলের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা গেল। অদৃশ্য মার খেয়ে ফিউমার দল এদিক ওদিক ছিটিয়ে গেল। অবাক করে দিয়ে একদল পুলিশ ঘরের ভেতর ঢুকে নাকামুরাকে ও তার সাথীদেরকে ধরে নিয়ে গেল।

প্রফেসর বৈদ্যনাথ আবারও কিছুই বুঝতে না পারলে অন্য বৈদ্যনাথ সব ঘটনা খুলে বলল। পুলিশকে খবর করেছিল আরস্ভেনাসের বৈদ্যনাথ। এবার আরস্ভেনাসের বৈদ্যনাথ প্রফেসর বৈদ্যনাথকে একটা খবরের কাগজ দিল, দি জাপান টাইমস। প্রথম পাতায় ফিউমা নাকামুরার উদ্ভ্রান্তের মতো ছবি ও পুলিশের হাতে বন্দি। তারিখ প্রায় ছয়মাস পরের। কাগজে যা লেখা ছিল তা পড়ে ফিউমার মাথা ঘুরে গেল। তাতে যা দেখা গেল তার কিছুটা এরকম,

বিখ্যাত কগনিটিভ বৈজ্ঞানিক ও বহুজাতিক সংস্থার সিইও-এর ষড়যন্ত্র ফাঁস ও গ্রেফতার।

সংবাদ সংস্থাঃ বিখ্যাত কগনিটিভ বৈজ্ঞানিক ও বহুজাতিক সংস্থার সিইও ফিউমা নাকামুরা গ্রেফতার হয়েছেন। তিনি ও তার সংস্থা সমসাময়িক কালে একধরনের হিউম্যানয়েড মস্তিষ্ক তৈরি করছিলেন যা মানব কল্যাণের জন্য তৈরি হলেও নাকামুরা তা ব্যবহার করতে চান পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করার জন্য। তারই প্রজেক্টে কাজ করছিলেন কেমিকো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জনক প্রফেসর বৈদ্যনাথ বলে প্রশাসন জানতে পারে। নাকামুরার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাষ্ট্রনেতার মস্তিষ্কে ভরে দেয়া হবে এই হিউম্যানেড ব্রেইন। যার মাধ্যমে তার ইশারায় চলবে গোটা বিশ্ব...

প্রফেসর বৈদ্যনাথের বললেন, “সবকিছু ঠিকঠাকই হত। কিন্তু তোমার আসার কোনও গুরুত্বপূর্ণ কারণ?”

আরস্ভেনাসের বৈদ্যনাথের বলল, “হ্যাঁ, প্রথমত ফিউমা কোকাকে মেরে ফেলত। তা আটকানো দরকার ছিল। দ্বিতীয়ত যে অ্যালগোরিদম লাইব্রেরি তৈরি হচ্ছিল তার সীমাবদ্ধতা দূর করা একমাত্র সম্ভব হত শুধু বর্তমান বৈদ্যনাথ, ভবিষ্যৎ বৈদ্যনাথ ও কোকা নাকামুরার দ্বারাই।”

আজ ক’দিন হল বৈদ্যনাথ ঘরে ফিরেছেন। জাপানে কাজ শেষ হয়েছে। মনে হচ্ছে প্রবল ঝড়ের পরে শান্তি। কিন্তু কিছু আক্ষেপ থেকে গেল। ভবিষ্যতের বৈদ্যনাথের কাছে অনেক কিছু জানার ছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। কিন্তু এই ভেবে বৈদ্যনাথ খুশি হলেন ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতেই থাকা ভাল।

অলঙ্করণঃ ইন্দ্রশেখর

আচমকা টেলিফোনটা ঝনঝনিয়ে উঠল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন রজত। বেড সুইচ টিপে আলোটা জ্বালালেন। ঘড়ি বলছে এখন কাঁটায় কাঁটায় রাত দুটো। ফোনটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ফোনটা বাজছে তো বাজছেই। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে খাট থেকে নেমে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে ফোনটার দিকে যেই না হাত বাড়িয়েছেন অমনি সব চুপচাপ। ফোনের রিং বেমালুম থেমে গেল। হঠাৎ একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরের মধ্যে। ঘড়ির কাঁটা বলছে টিক, টিক, টিক। খাটের খুব কাছ থেকে একটা টিকটিকি বলে উঠল ঠিক, ঠিক, ঠিক। এইসব কিছু ছাপিয়ে রজত নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি শুনতে পাচ্ছেন।

এই নিয়ে পর পর দু-দুটো রাতে বিশ্রী অভিজ্ঞতা হল রজতের। কী যে মাথায় ভূত চেপেছিল তাঁর, এই তাঁবুতেই থাকবেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আর মুখ্যমন্ত্রী অবধি অনুরোধ করেছিলেন এখানে না থাকার জন্যে। কিন্তু দীর্ঘ বছর ধরে থর মরুর বুকে একটা তাঁবু বেখাপ্পাভাবে পড়ে রয়েছে কেবলমাত্র একটা ভূতুড়ে টেলিফোনের কারণে এ কথাটা আর যেই হোক অন্তত আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডাইরেক্টর রজত বোস বিশ্বাস করেননি। নানান সার্ভের কাজে তাঁর সহকারীদের প্রায়শই আশেরপাশের তাঁবুগুলোতে থাকতে হয়, অথচ তাঁদেরই মাঝখানে ভানগড় ফোর্টের মতো এই তাঁবুটা আর সঙ্গে লাগোয়া আরও চারটে তাঁবুকে এত বছর ধরে সবাই এড়িয়ে যাচ্ছেন। আবার পর পর দু'রাত যে অভিজ্ঞতা হল তাও ফেলে দেওয়ার নয়। প্রতি রাতে ঠিক দুটোয় টেলিফোন বেজে ওঠে। ধরতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কেটে যায়। অথচ ফোনের লাইন কাটা। ব্যাপারটা আপাত ভৌতিক হলেও এর পেছনে যেন অন্য রহস্যের গন্ধ পান রজত।

জয়সলমীরের সকালটা একদম জমজমাট। দেশি-বিদেশি টুরিস্টরা ক্যামেরা নিয়ে খুচুক খুচুক ছবি তুলেই চলেছেন। সকাল সাতটাতেই বালি বেশ গরম হয়ে উঠেছে। চারদিকের হৈ চৈয়ে রাতের আতঙ্কটা দিব্যি ভুলে থাকা যায়। চট করে মুখহাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলেন রজত। এই 'রুকস্যাক' তাঁবুর মালিক মিস্টার তিলক বর্মার বাড়িতে আজ চায়ের নেমন্তন্ন। বর্মা মানুষটি বেশ হাসিখুশি।

চা, কেক, পুরি-সবজিতে আড্ডা জমে উঠল। খাওয়া শেষ করে আরেক দফা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রজত জিজ্ঞেস করলেন, “বর্মাসাব, এই তাঁবুর গল্প আমি অনেকের কাছে শুনেছি খাপছাড়া খাপছাড়া। আর আমি তো আপনাকে আগেও বলেছি, এই গল্প আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এ ঘটনাটা তো আপনার সামনেই ঘটেছিল, নাকি?”

“হাঁ, সাব। একদম আমার চোখের সামনে ঘটা। এখনও ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়।”

“তাহলে আপনার কাছ থেকে আমি ঘটনাটা ডিটেলে আরেকবার শুনতে চাই।”

বর্মা চায়ের কাপ টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে শুরু করলেন, “ঘটনার সূত্রপাত সাত-আটবছর আগে। তখন এই তাঁবুগুলো ছিল টুরিস্টদের হৈ হৈ করার জায়গা। মরুভূমি দর্শন আর থাকার জন্যে আমার রুকস্যাক তাঁবুগুলোই ছিল টুরিস্টদের প্রথম পছন্দের। বুঝতেই পারছেন যে যথেষ্ট রমরমা বাজার ছিল আমার। সে বছর অনেক পার্টির মধ্যে এক সদ্য বিবাহিত দম্পতিও ছিলেন। তারা এই তাঁবুটিতে উঠেছিলেন এক রাত্রে। পরদিন সকালে সবাই মিলে উটে চড়ে মরুভূমি দর্শনে বের হন। সেদিনই ঘটে সেই দুর্ঘটনা। খানিক দূর যাওয়ার পরই চালকরা টের পায় যে মরুর ঝড় খুব দ্রুততার সাথে ধেয়ে আসছে তাদের দিকে। অতএব উটের মুখ ঘুরিয়ে যত দ্রুত সম্ভব সবাইকে তাঁবুতে ফিরিয়ে আনা হয়। যে যার তাঁবুতে নিরাপদভাবে ফিরে এলেও ফিরে আসেননি সেই নব্য বিবাহিতার স্বামী। উটটিও বেপাত্তা। ঝড়ের তাণ্ডব থামলে পরে সবাই চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করেন। পরিশেষে সেই উটটি মেলে বটে, কিন্তু ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরের দিন রেসকিউ টিম খোঁজাখুঁজি করে মাঝ মরুভূমি থেকে একটা মৃতদেহ পায়। আর সেই খবর তারা ফোন করে আমাদের জানালে সেই মহিলা ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে মারা যান। সম্ভবত মহিলার কোনও হার্টের সমস্যা ছিল। পরে যখন সেই মৃতদেহ শনাক্তকরণের জন্য নিয়ে আসা হয় তখন দেখা গেল যে সে দেহ এক বিদেশি পর্যটকের, সেই মৃতা স্ত্রীর স্বামীর নয়। আকস্মিক এরকম দুর্ঘটনায় সবার মধ্যেই একটা শোকের ছায়া নেমে আসে।

“এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর সবাই সব ভুলে যায়। এমনকি আমিও প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। ঐ তাঁবুতে আবার অন্য যাত্রীরা আসতে থাকেন। সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে যায়। তারপর প্রায় বছর খানেক বাদে একদিন ঐ তাঁবুর নামে একটা অভিযোগ আসে। যাত্রীরা অভিযোগ করতে থাকেন যে প্রতিরাতেই ঐ তাঁবুর টেলিফোনে কেউ একজন ফোন করে তার স্ত্রীকে চান। তারা প্রথম প্রথম ভাবতেন যে কেউ ভুল করে এই নম্বরে ফোন করছে। পরে ভাবতে লাগলেন যে কেউ ইচ্ছে করে রোজ গভীর রাতে ফোন করে রীতিমতো বিরক্ত করছে তাদের। ব্যাপারটা বুঝে দেখতে আমি একদিন রাতে ফোনটা ধরলাম। তখন রাত প্রায় দুটো। একটা ফ্যাসফ্যাসে গলার মালিক ফোনের ওপার থেকে অদ্ভুত কাঁপা কাঁপা গলায় তার স্ত্রীর খোঁজ করছিলেন। আমি যথারীতি বললাম, ‘আপনি বোধহয় ভুল নম্বরে ফোন করছেন বারে বারে। আপনি কি জানেন যে এটা কোথাকার নম্বর?’

‘এটা রুকস্যাক হোটেল না?’

‘হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু এখানে আপনার স্ত্রী নেই।’

‘আমিও জানি যে আমার স্ত্রী এখানে নেই।’

‘আপনি জানেন? তাহলে জেনেশুনে কেন ফোন করেছেন?’

‘আমি জানতে চাই যে আমার স্ত্রী কোথায়।’

“আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়লাম। তাও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললাম, ‘আরে মশাই, আমরা কী করে জানব যে আপনার স্ত্রী কোথায়?’

“ওপারের স্বর কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘বিশ্বাস করুন, আমি সব জায়গায় খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও ওকে খুঁজে পাইনি।’

‘তাহলে পুলিশে জানান। এখানে ফোন করলে কি আমরা আপনার স্ত্রীকে খুঁজে দিতে পারব?’

‘কিন্তু আমার স্ত্রী তো এখান থেকেই হারিয়েছে।’

‘কী আশ্চর্য! আপনার স্ত্রী কি বাচ্চা মেয়ে নাকি যে হারিয়ে যাবে? আর আমাদের হোটেল থেকে কেউ হারায়নি।’

‘হারিয়েছে। মনে করে দেখুন। ঠিক একবছর আগে। আমি আর আমার স্ত্রী আপনার হোটেলে উঠেছিলাম। মনে পড়ে?’

“তখন আমার খটকা লাগে। জানতে চাই, ‘কী হয়েছিল বলুন তো?’

‘মনে পড়ল? সেই যে একটা মরুঝড়ে পড়েছিলাম সব যাত্রীরা। তখন আমার উটটা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে অন্য রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করল। আমি চিৎকার করে আমার স্ত্রীকে ডাকছিলাম, কিন্তু ততক্ষণে তার আর অন্যান্য উটগুলো পুরো উলটো পথে রওনা দিয়ে দিয়েছিল। আর আমার ডাক কেউ শুনতেই পেল না।’

‘তারপর?’

‘তারপর আমি হঠাৎ উটের পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেলাম। প্রচণ্ড বালির ঝড় আমার উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল, আর আমি বালিচাপা পড়তে থাকলাম। তারপর একসময় আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।’

“আমি স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছি আর ফোনের ওপারের জন একটানা বলে চলেছে, ‘জ্ঞান হতে দেখি তখন অনেক রাত। আকাশে ঝিকিমিকি করছে তারারা। আর আমি মরুভূমির মাঝে শুয়ে। উঠে দেখলাম, আমি হাওয়ায় ভাসছি। আমার আত্মা আমার দেহ ছেড়ে দিয়েছে। সেই থেকে আমি আমার স্ত্রীকে খুঁজছি। এই একবছরভর খুঁজে চলেছি। গোটা শহরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, এমনকি আমার নিজের বাড়িতেও কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না।’

“এরপর বিশ্বাস করুন রজতসাহাব, ঐ ফোন আর আমি হাতে ধরে রাখতে পারিনি। আমি তাড়াতাড়ি ফোন রেখে দিয়েছিলাম আর সবাইকে ঐ টেন্টগুলো ফাঁকা করে দিতে বলে আমি নিজেও ওখান থেকে পালিয়ে চলে এসেছিলাম। তারপর আমি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে সব ফোনের লাইন কাটিয়ে দিই। পুরনো ফোন, তাই ভাবলাম এখন পড়ে থাক। পরে নয় সময় করে সরিয়ে দেব। কিন্তু কোথায় কী? আবার সেই ফোনই রাত দুটোয় বাজতে শুনেছে বেয়ারা চম্পকলাল। তারপর প্রতিদিন রাত দুটোয় ওটা বাজে। আর আমার ব্যবসা তো লাটে উঠল। বাধ্য হয়ে আমাকে সব তাঁবু সিল করে দিতে হল।”

এতক্ষণ পর রজত মুখ খুললেন, “সিল করে দিলেন কেন? তাঁবুগুলো খুলে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যেত।”

“না বাবু, না। অত সোজা হল না। আমি তাঁবু খুলতে গেলেই মনে হত, কিছু একটা আছে ভেতরে। আমি তাঁবু খুলতে

গেলেই আমাকে টুঁটি চেপে ধরবে। আর সাতবছর ধরে অমনি করেই ফেলে রাখতে হল।” বলেই ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। আপন মনেই মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বললেন, “সে অনেক বছর আগের কথা, জনাব। এখন আর সে ভূত ধরা দেবে না, দেবে না।”

* * *

বর্মার বাড়ি থেকেই হোটেলগুলো দেখা যায়। সেই যাত্রায় যে সমস্ত উটচালকেরা ছিল, তারাও নিশ্চয়ই সেই ঘটনার সাক্ষী। সেই গোটা ঘটনায় আরও কিছু ঘটেছিল বলে তার বিশ্বাস। কিন্তু সমস্ত ঘটনা একজনের থেকে জানা কখনওই সম্ভব নয়। তাই রজত ঠিক করলেন, সেই দিনের মরুঝড়ে যে উটচালকরা সঙ্গে ছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

কিন্তু সবার সঙ্গে কথা বলেও বিশেষ কিছু লাভ হল না। সবাই কমবেশি সেই একই সুর গেয়ে যাচ্ছে। রজতের বারে বারে মনে হচ্ছে, সবাই যেন সবকথা বলছে না। কিছু কথা চেপে যাচ্ছে।

দুপুরের খা খা রোদে মরুতট প্রায় শূন্য। টুরিস্টরা যে যার তাঁবুতে অথবা অন্যত্র ঘুরতে গেছেন। এসব ভাবতে ভাবতে রজত বালির ওপর দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হল মরুভূমির ভেতর ঢুকে পড়েছেন। রজতের কাছে যদিও কম্পাস রয়েছে, তাও তাঁর মনে হল যেন তিনি রাস্তা হারিয়েছেন। হঠাৎ চারদিক কেমন শান্ত চুপচাপ হয়ে গেল। যেদিকেই তাকাও শুধু বালি আর বালি। এভাবে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়াটা তাঁর একদম উচিত হয়নি। কম্পাসটা পকেট থেকে বের করতে যাবেন, আচমকা একটা বিকট শব্দে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। চমকে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন দুটো শকুন ঘোরাঘুরি করছে আর বিশ্রী শব্দে ডাকছে। যাক, শকুন। অন্যকিছু নয়। টের পেলেন, এরকম শুনশান একটা জায়গায় শকুনের ডাকও কত ভয়ানক শুনতে লাগে।

কিন্তু কোনদিকে যাবেন কিছুতেই বুঝতে পারছেন না যে। কম্পাসের কাঁটা বলছে উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে এসেছেন। তাঁবুতে ফিরতে হলে তাঁকে আরও উত্তরে যেতে হবে। কয়েক পা হাঁটতে হাঁটতেই তাঁর মনে হল শকুনগুলোও যেন পিছু পিছু চলেছে। তিনি আরও কিছুটা এগোলেন, আর কী আশ্চর্য, শকুনগুলোও নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করে চলল। এবার তাঁর একটু একটু ভয় করছে। তিনি ঠিক রাস্তায় এগোচ্ছেন তো? রাস্তা যে আর ফুরোয় না। আর শকুনগুলোও তাঁর মাথার ওপরে ঘুরেই চলেছে। পায়ে সমস্ত জোর এনে রজত এবার উত্তরদিক বরাবর ছুটতে আরম্ভ করলেন। কতটাই বা হেঁটে এসেছে তিনি? এখন যত দ্রুত সম্ভব তাঁবুতে ফেরা দরকার। কিন্তু বালির ওপর দিয়ে পা আটকে যাচ্ছে। এদিকে গলা শুকিয়ে কাঠ। চোখ জ্বালা করছে। দরদর করে ঘামছেন। হঠাৎ কিছুতে যেন পা বেঁধে গিয়ে দুড়ুম করে মুখ থুবড়ে পড়লেন। মুখে চোখে বালি ঢুকে যা তা কাণ্ড। চোখ ঝেড়েঝুড়ে তাকিয়ে দেখে আঁতকে উঠলেন। একটা কঙ্কালের কয়েকটা হাড়ে তার পা আটকে হোঁচট খেয়েছিল। শুধু পাটাই যা দেখা যাচ্ছে তার, আর বাকি শরীর তো বালির নিচে ডুবে আছে। দেখে তো মনে হচ্ছে মানুষেরই পা।

ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন রজত। মনে হচ্ছে, এটা কোনও মহিলার কঙ্কাল। পায়ে বালিমাখা ধাতব নূপুর পরা। বালির নিচ থেকে হলদে রঙের শাড়ির একটু অংশও বেরিয়ে রয়েছে। কঙ্কালটা কতটা বালির নিচে ডুবে আছে দেখার কৌতূহল হল তাঁর। আশেপাশের বালি সরাতে লাগলেন তিনি। পা ধরে অনেক টানাটানি করলেন, কিন্তু না, এ তোলার ক্ষমতা তাঁর নেই। যন্ত্রপাতি দিয়ে রীতিমতো বালি খুঁড়ে তবে বের করতে হবে। আহা রে, কোন অভাগী হয়তো কোনও বিপদে তাঁর মতোই রাস্তা হারিয়ে তারপর এখানেই মারা গেছে। ভাবলেন কাউকে নিয়ে এসে যদি তোলানো যায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, তিনি এখান থেকে বেরোবেন কী করে? রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন তো। কম্পাসটা যতটা সম্ভব উঁচুতে তুলে দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু উত্তর বরাবর চলতে চলতে তিনি যে কখন আবার পশ্চিমে চলে এসেছেন বুঝতেই পারেননি। শকুনগুলোরও পাত্তা নেই। এখন বেশ বুঝতে পারছেন যে ঐ শকুনগুলোই ওকে এই পথে টেনে এনেছে। তবে দূরে মনে হচ্ছে কিছু উট আসছে। ভাগ্য খুব ভালো বলতে হবে যে উটগুলো ঠিক এদিকেই আসছে। সেদিকে হাত দেখিয়ে ছুটে গেলেন রজত। অনেকগুলো উট নিয়ে কিছু যাত্রী তখন মরুভ্রমণে বেরিয়েছে। ঘড়ির কাঁটাও দুপুর গড়িয়ে বিকেলের পরে এসে ঠেকেছে।

উটের চালকদলের মধ্যে একটা ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে ছিল। রজত তাকে বললেন, "আমাকে তুই হোটেলে নিয়ে যেতে পারবি?"

"জী, সাব। জরুর।"

"আর তারপর যদি তোকে নিয়ে এখুনি আবার এখানে ফিরে আসি, তুই ঠিক এই জায়গাটাই আমাকে চিনিয়ে দিতে পারবি?"

"হাঁ, জী। য়হ জগহ জেয়াদা দূর নহি হৈ সাব।"

"দেখ ভাই, ঠিক এই জায়গাটাতেই ফিরে আসতে হবে কিন্তু। পারবি তো?"

"জী, জনাব। জরুর সকেঙ্গে।"

"চল তা'লে, জলদি চল।"

এই বলে তারা একটা উট নিয়ে ছুটল হোটেলের দিকে। কিছু লোক, কোদাল আর শাবল নিয়ে আধাঘণ্টার মধ্যেই আবার ফিরে এল সেই জায়গায়। কিন্তু কই? কই? কই? কঙ্কালের চিহ্ন অবধি নেই। সবাই চতুর্দিক তোলপাড় করে খুঁজল, কিন্তু কঙ্কাল নেই।

তাঁবুতে ফিরে আসতে বেশ রাত হয়ে গেল। কিন্তু রজতের ছটফটানি ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছে না। একটা গোটা মানুষের কঙ্কাল বালির নিচে আবার চাপা পড়ে যেতে পারে, কিন্তু ভোজবাজির মতো উড়ে যাবে কী করে? তিনি অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। টেলিফোনটা যেন একটা জলজ্যান্ত দানব। ঘরের এক কোনা থেকে রজতের প্রতিটা গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ করে যাচ্ছে যেন। ঘড়িতে এখন সাড়ে সাতটা। নাহ্, এমন কিছু রাত তো নয়। ঝপাঝপ গায়ের সোয়েটারটার ওপর একটা শাল জড়িয়ে হাতে একখানা বড়ো টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

কিন্তু এই টেলিফোন রহস্য তাকে সমাধান করতেই হবে। একগাদা প্রশ্ন তাঁর মাথায় জমাট বেঁধে রয়েছে। উত্তরগুলো খুঁজে বের করতেই হবে।

* * *

আচমকা কোনও খবর না দিয়ে আসায় বর্মা একটু হকচকিয়ে গেছেন। কিন্তু যথাসম্ভব মুখে সেই পুরনো হাসিটা টেনে এনে ভেতরে আসতে বললেন। হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে এসে রজত বললেন, "আমি বসতে আসিনি, বর্মা। আমাকে কয়েকটা খবর জানাতে পারবেন?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বলুন না।"

"আচ্ছা বর্মা, আপনি তো বললেন সেই মহিলা মানে হারিয়ে যাওয়া সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী আপনাদের সবার চোখের সামনেই হার্ট ফেল করে মারা যান। কী, তাই না?"

"হাঁ, বিলকুল। একদম আমার চোখের সামনেই মারা যান।"

"তো তারপর সেই বডির কী করলেন?"

বর্মা একটুও না চমকে বললেন, "আমরা তো সেই বডি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। আর পুলিশ সেই বডি..."

"আর পুলিশ সেই বডি? কী করেছিল সেই বডির?"

"আজ্ঞে, পুলিশ তো মনে পড়ছে যদ্দুর, সেই বডি তার অরিজিনাল ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়।"

"তার মানে পুলিশ জানতে পেরেছিল তাদের আসল ঠিকানা?"

"জী, মানে, তাই তো মনে হচ্ছে।"

রজত শ্যেনদৃষ্টিতে বর্মার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে তিনি বললেন, "জী, আপনি পুলিশকে জিজ্ঞেস করতে পারেন লোকাল থানায় গিয়ে। তারাই তো সব ব্যবস্থা করেছে।"

রজত দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "আমার সেটাই সবার আগে করা উচিত ছিল। পাপ করলে তার শাস্তি পেতেই হয় বর্মাজী।"

বলেই ধাঁ করে বেরিয়ে গেলেন। বর্মা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাঁর চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

থানাটা আবার বড্ড দূর। রজত নিজের মনে মনেই নিজেকে ধিক্কার দিলেন। তাঁর সবার আগে উচিত ছিল লোকাল থানাতেই পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখার। কিন্তু তিনি তো গোড়াতে ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে চাননি। কিন্তু পর পর ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা সম্পূর্ণভাবেই অসংলগ্ন হতে পারে না। থানায় গিয়ে কিছু জিনিস জানা গেল। তাঁর আসল পরিচয় জেনে ও.সি. তাঁকে যথেষ্ট খাতির যত্ন করলেন। আর এও জানালেন যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কথা অমান্য করে তিনি ঐ টেন্টে থেকে মোটেই ভালো কাজ করেননি। যদি কিছু হয়ে যেত তাহলে তারা উপরমহলের কাছে কী জবাবদিহি করতেন। কিন্তু রজতের এখন এসব ভাবার সময় নেই। তিনি আজ সারাদিনে যা যা ঘটেছে সমস্ত সবিস্তারে পুলিশকে জানালেন। আর পুলিশ জানালেন যে সেই ঘটনার পর সেই মহিলার বডি শনাক্ত করতে কোলকাতা থেকে তার বাবা-মা আসেন আর তাদের হাতেই সেই মৃতদেহ তারা তুলে দেন।

"কিন্তু তারাই যে তার অরিজিনাল মা-বাবা তা কি আপনারা নিশ্চিত ছিলেন? মানে, তারা কি সেরকম প্রমাণ নিয়ে এসেছিল?"

"দেখুন, এসব ক্ষেত্রে আমাদের যা প্রাথমিক তদন্ত তা করেই আমরা বডি ছেড়ে দিই। কিন্তু মা-বাবা বলে পরিচয় দিয়ে কান্নাকাটি করে যারা মৃতদেহ সনাক্ত করল, তাদের পরিচয় আর অত খবর নিয়ে দেখিনি আমরা।"

হাতের মুঠো পাকিয়ে টেবিলের ওপর সজোরে একটা ঘুসি মেরে রজত বললেন, "এই কাঁচা কাজটা আপনারা করতে পারলেন? ড্যাম ইট!"

"কী করি বলুন তো মশাই? সেই মুহূর্তে অন্য স্টেটের এক টুরিস্ট কী বিচ্ছিরিভাবে মারা গেলেন, যার স্বামীও নিরুদ্দেশ। সঙ্গে আরেক টুরিস্ট, যিনি আবার স্কটল্যান্ড থেকে এসেছিলেন তিনিও ঐ একই মরুঝড়ে মারা গেলেন। তাদের বডি নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে যেকোনও অবস্থায় বডি শনাক্ত হয়ে গেলেই আমরা বেঁচে যাই আর কী। তো তার জন্যেই তাড়াহুড়োয়..."

রজতের অসহ্য লাগছিল এসব। থানা থেকে বেরিয়ে দ্রুত তাঁবুর দিকে পা বাড়ালেন। চোখের সামনে শুধু বারবার ভেসে উঠছিল বালির ভেতরে ডুবে থাকা একটা বেওয়ারিশ কঙ্কাল। পুলিশকে সেকথা বলে বিশেষ লাভ হল বলে তো মনে হল না। উফ্, কী অসহ্য!

তাঁবুর কাছাকাছি আসতেই তার যেন মনে হল খুব কাছেই কয়েকজন কথা বলছে। একাধিক নারীপুরুষের কণ্ঠস্বর যেন। প্রথমে ভাবলেন, কে কথা বলছে তা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা কীসে। কিন্তু তিনি যতই তাঁবুর দিকে এগোচ্ছেন মনে হচ্ছে শব্দগুলো সেদিক থেকেই আসছে যেন। তার তাঁবুর সামনে এসে মনে হল যেন পেছনের তাঁবুটাতেই কেউ কথা বলছে। কিন্তু পেছনের তাঁবু তো ফাঁকা। কারও তো থাকার কথা নয়। তিনি দেখার জন্যে এগিয়েই বুঝলেন যে কথাগুলো আসলে তারও পেছনের তাঁবুটা থেকে আসছে। এভাবে একটা করে তাঁবু এগোতে এগোতে তিনি শেষ তাঁবুটাতে এসে দেখলেন সেখানে কেউ নেই। কিন্তু মনে

হচ্ছে কথাগুলো যেন সামনেই কোথাও থেকে ভেসে আসছে তার কানে। তিনি কৌতূহল দমন করতে না পেরে আরেকটু এগিয়ে গেলেন। তারপর আরেকটু। খানিকক্ষণ বাদে টের পেলেন যে মরুভূমি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেও থামতে পারছেন না কিছুতেই। ক্রমেই এগিয়ে চলেছেন গাঢ় অন্ধকারের দিকে। মরুভূমি এখানে ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছে। উপায়ন্তর না দেখে রজত হাতের টর্চটা জ্বালালেন। তার পাদুটো যে কোনদিকে টেনে নিয়ে চলেছে তা ঠাওর করার কোনও উপায় নেই।

চলতে চলতে হঠাৎ দেখলেন, মরুভূমির মাঝখানে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। আর তিনিও ক্রমে সেদিকেই এগিয়ে চলেছেন। একসময় গতি ধীর হল। আগুনের কিছুটা আগেই তিনি থামলেন। আগুনের সামনে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। তাঁর সামনে কোশাকুশি থেকে ক্রমাগত কীসব যেন ঢেলে যাচ্ছেন নিজের মাথায়। উবু হয়ে বসে সেই আগুনের আঁচও মাথায় নিচ্ছেন। একসময় বৃদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর দিকে চাইলেন। সেই দৃষ্টিতে রজতের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। চোখ তো নয় যেন কঙ্কালসার মুখের কোটরে লাল টুনিবাল্ব জ্বলছে। হাত-পা অস্বাভাবিকরকম সরু। বৃদ্ধ ওঁর চোখ থেকে মুখ ফেরালেন আবার আগুনের দিকে। রজতের পাদুটো যেন বালির সাথে গেঁথে রয়েছে। সর্বাঙ্গ অসম্ভব ভারী ঠেকছে। নড়াচড়া করার ক্ষমতা অবধি নেই। বৃদ্ধ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলতে আরম্ভ করলেন এক না শোনা কাহিনি। সেই কাহিনিতে একটা কথা বারে বারে ঘুরতে লাগল, “আর থাকবে না। আর থাকবে না।”

সেই কথা শুনতে শুনতে রজতের কান লাল হয়ে উঠল। চোখ জ্বালা করতে লাগল। সারা শরীরে আগুন গরম রক্ত বইতে থাকল।

* * *

যখন রজতের চোখ খুলল তিনি দেখলেন তাঁকে ঘিরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে। উঠতে গিয়ে টের পেলেন গায়ে অনেক জ্বর। সারা শরীর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে তাঁর। জানতে পারলেন, উটের সারি তাকে মাঝ মরুভূমিতে পড়ে থাকতে দেখে নিয়ে আসে তাঁবুতে। জয়সলমীর থানার ও.সি. তার জ্ঞান ফিরতে দেখে কাছে আসেন। জানতে চান গতরাতে তিনি বর্মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কি না। কারণ, তারপর থেকেই তাকে নাকি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রজত মাথাটা দু’হাতে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। তার কথা বলার শক্তি প্রায় নেই বললেই চলে। পুলিশকে তাঁর পিছু পিছু আসতে বলে তিনি মরুভূমির দিকে আবার পা বাড়ালেন। জ্বরে তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখলেন, দুটো শকুন তাদের মাথার ওপর ঘোরাঘুরি করছে। সবাই সবিস্ময়ে দেখল শকুনগুলোই পথ চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর রজত কেবল তাদের অনুসরণ করছেন মাত্র।

খানিকটা পথ গিয়ে সবাই থামলেন। একটা জায়গায় বালির ওপর কয়েকটা সোনার আংটি, হার, দুল এসব পড়ে আছে। সেই জায়গার বালি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল বর্মার মৃতদেহ। কেউ আসুরিক শক্তি প্রয়োগ করে তার মাথাটা ছিঁড়ে ধর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। যা কোনও মানুষের কাজ হতেই পারে না। আর সঙ্গে একটা হলুদ শাড়ি জড়ানো কঙ্কাল। তার হাতে চুড়ি, শাঁখা, পলা, পায়ে নূপুর।

রজত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শবদেহ আর কঙ্কালের শ্রাদ্ধকাজ করালেন। দুটো আত্মাই এবার শান্তি পাবে। গতরাতে দেখা সেই বৃদ্ধরূপী কঙ্কালসার জীবটিই সাতবছর আগের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া সেই মহিলার স্বামী। সেই দুর্ঘটনায় আরও দু’জন মারা যান। যাদের একজন বিদেশি ছিলেন, তার দেহ শনাক্ত হয়। কিন্তু আরও এক অভাগী সেদিন সেই বালিতে চাপা পড়ে দমবন্ধ হয়ে মারা যায়। তার দেহই বদল করা হয়েছিল সেই নব বিবাহিতা বধূর মৃতদেহের সঙ্গে। টাকা দিয়ে কিছু মানুষের মুখ বন্ধ করে সবার চোখের আড়ালে সেই দেহ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর কিছু লোককে তার বাড়ির লোকজন সাজিয়ে একটা মিথ্যে গল্প রচনা করা হয় যে সে হার্টফেল করে মারা গেছে। পুলিশের তদন্তেও তাইই ধরা পড়ে। কিন্তু আসল ঘটনা হল যে সেই বউটি স্বামীর শোকে ভয়ে আতঙ্কে তাঁবুর ভেতরেই গলায় দড়ি দিয়েছিল। পাছে অপঘাতে মৃত্যুর দোষে হোটেলের বদনাম হয় ও ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় তাই বর্মা নিজেই সেই লাশ মাঝ মরুভূমিতে পুঁতে দিয়ে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল।

সমস্ত কাজ মিটিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ও.সি. রজতকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমি শুধু একটাই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছি না। সেই মৃতার স্বামীর তবে কী হল? তার অতৃপ্ত আত্মা কি তবে কোনও কালেই শান্তি পাবে না?”

রজত হেসে বললেন, “সে ব্যবস্থা সে নিজেই করে গেছে। কাল রাতে আমার চোখের সামনেই সে নিজের শ্রাদ্ধ করে তার অতৃপ্ত আত্মাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। আর সে কথা দিয়েছে কোনও টেলিফোন উৎপাতও আর থাকবে না, থাকবে না।”

সূর্য তখন মাঝ আকাশে পুরোদমে তার তেজ বিকিরণ করছে। রজত কপালে দু’হাত দিয়ে চোখ ঢেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, দুটো শকুন ওদের মাথার অনেক উঁচু দিয়ে কর্কশ স্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে গভীর মরুভূমির দিকে।

অলঙ্করণ-অংশুমান

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

রাজামশাই ভারি চিন্তায় পড়েছেন। মুখচোখ গম্ভীর, থমথমে। সভায় এসেছেন ঠিকই, কিন্তু কারও সাথে বিশেষ কথা-টথা বলছেন না। মাঝে মাঝে রাজমুকুট খুলে টাকে হাত বোলাচ্ছেন আর জল খাচ্ছেন। ক'দিন থেকেই এমন চলছে। জরুরি কাজকর্ম সব ডকে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী পড়েছেন মহাবিপদে। প্রথমে ভেবেছিলেন, পাশের দেশের রাজা হয়তো যুদ্ধ-টুদ্ধ পাকাবার মতলবে আছে। আর রাজা বুঝি সেই সংবাদ টের পেয়েছেন। রাজামশাই আবার যুদ্ধ-টুদ্ধ বিশেষ পছন্দ করেন না। নেহাত শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাই হয়তো মুষড়ে পড়েছেন। অগত্যা মন্ত্রী গুপ্তচর পাঠালেন পাশের দেশে। চর খবর নিয়ে এল, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। যুদ্ধের কোনও সংবাদ নেই। বরং পাশের দেশের রাজা দুর্মুখ সিংহ এখন ভীমরুলের উৎপাত ও বাতের ব্যথায় নিজেই কুপকাত।

তাহলে হলটা কী! রানিমা মন্ত্রীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে রাজবৈদ্য আরোগ্যাচার্যকে খবর দিলেন।

"ক'দিন থেকে মহারাজ কিছু খাচ্ছেন-টাচ্ছেন না। রাতবিরেতে উঠে কীসব বিড়বিড় করে বকছেন আর পায়চারি করছেন। কোনও কাজে মন নেই। সবসময় গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন।" বললেন মহারানি।

সব শুনে পাক্কা পাঁচ মিনিট নাড়ি দেখে আরোগ্যাচার্য মাথা নেড়ে বললেন, "বায়ু কুপিত হয়েছে। মাথায় মহাভৃঙ্গরাজ তেল লাগাতে হবে। খেতে হবে ব্রহ্মবটিকাচূর্ণ ছাগলের দুধে সেদ্ধ করে। সবরকম আমিষ আহার বন্ধ। তবে নিরামিষ আহারে কোনও বিধিনিষেধ নাই। রাবড়ি, ক্ষীর, পায়েস, গোকুল নাড়ু সবকিছুই খাওয়া যাবে।"

মহারাজ হাঁফ ছাড়লেন। যাক বাঁচা গেছে। বৈদ্যব্যাটা অন্তত মহাকালমেঘ বটিকা ও তৎসহ পঞ্চতিক্ত সেব্য বলেনি। তাছাড়া রাজভোগে রোজ রোজ মাছ-মাংস খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। তার চেয়ে নিরামিষ ঢের ভালো। রাবড়ি আর ক্ষীরের কথা মনে হতে নোলায় বান ডাকল। রাজামশাই ঢোঁক গিললেন।

ক'দিনের চিকিৎসায় একটু উন্নতি হয়েছে মহারাজের। এখন আর ততটা গোমড়া মুখে থাকছেন না। দু-একটা কথাও বলছেন। রাজসভাতেও নিয়মিত আসছেন। কাজটাজ করছেন। পরিস্থিতি অনুকূল বুঝে মন্ত্রীমশাই কথাটা পেড়েই ফেললেন, "মহারাজ, আপনার গভীর চিন্তার কারণ কী! কোনও অজানা আতঙ্ক কি ঘনীভূত হয়েছে?"

দুধপুলি, পাটিসাপটা সহযোগে প্রাতরাশটা শেষ করার পর থেকেই মহারাজের মনটা বেশ ফুরফুরে ছিল। তাই এতদিন যে কথাটা বলব বলব করেও লজ্জায় বলতে পারেননি সেই কথাটা বলেই ফেললেন, "বুঝলে মন্ত্রী, একটা প্রশ্ন নিয়ে আমি বড়ো সমস্যায় পড়েছি!"

"কী প্রশ্ন মহারাজ, বলুন যা আপনাকে এতদিন ধরে কুরে কুরে খাচ্ছে! পারলে এক্ষুনি সমাধান করে দেব। আর যদি অতীব কূটপ্রশ্ন হয় তাহলে সভাপণ্ডিতদের খবর দেব।"

মহারাজ মাথা নেড়ে বললেন, "এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তোমার কিম্বা সভাপণ্ডিতদের কম্ম নয়। এ বড়ো কঠিন প্রশ্ন। এতদিন ভেবেও আমি কোনও উত্তর পাইনি।"

মন্ত্রী ব্যাগ্রভাবে বলল, "তবুও বলুন, মহারাজ। সবাই মিলে ভেবে যদি কোনও সমাধান পাই।"

রাজামশাই এবার সব দ্বিধা ঝেড়ে প্রশ্নটা করেই ফেললেন, "বল দেখি, গঙ্গাফড়িংয়ের রং কেন সবুজ হল?"

প্রশ্ন শুনে মন্ত্রীর তো আক্কেল গুড়ুম হবার জোগাড়। ভাবলেন, রাজার মাথাটা বোধহয় বিগড়েছে। না হলে বুড়ো বয়সে এমন ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করেন! এই প্রশ্নের জন্যই কিনা রাজা নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছেন! যাই হোক, মনের ভাব চেপে রেখে মন্ত্রী যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আজ্ঞে, ছেলেবেলা থেকেই তো দেখছি গঙ্গাফড়িংয়ের রং সবুজ। অন্য রং তো হয় না, মহারাজ।"

রাজামশাই মুচকি হেসে বললেন, "সেইটাই তো সমস্যা। সবুজ রং হল কেন? অন্য রংও তো হতে পারত!"

মন্ত্রী বা সভার অন্য কেউ অনেক ভেবেও উত্তর দিতে পারল না। সেদিনের মতো সভা ভঙ্গ হল।

বিকেলবেলা কাজু পেস্তার বরফি আর দইয়ের লস্যি খেতে খেতে রাজামশাই ভাবছিলেন রাজ-উদ্যানে অনেকদিন যাওয়া হয়নি। আজ সেখানে বৈকালিক ভ্রমণে গেলে কেমন হয়! হয় তো ভালোই। কিন্তু সেখানে কি তিষ্টোনোর জো আছে! কোন গাছের ফাঁকে ঘুটুং ঘাপটি মেরে থাকবে কিচ্ছু বলা যায় না। একবার সামনাসামনি হলেই তো হল। লজ্জার একশেষ এক্কেবারে।

ঘুটুং হল রাজ-উদ্যানপালকের ছেলে। ছোঁড়া যেমনি ফুটফুটে তেমনি বিচ্ছু। রাজা ভারি ভালোবাসেন এই বুদ্ধিমান ছেলেটিকে। সে মাঝে মাঝেই রাজ-উদ্যানে বেড়ানোর সময় রাজার সঙ্গী হয় আর সময়ে সময়ে এমন দুমদাম প্রশ্ন করে যে তার উত্তর যোগাতে রাজা হিমসিম খান। এই তো সেদিন রাজার সাথে বেড়াতে বেড়াতে একথা সেকথার পর ফস করে প্রশ্ন করেছিল, "আচ্ছা, তোমাকে রাজা বানাল কে বল দেখি?"

রাজা প্রশ্ন শুনে খুব ঘাবড়ে গেলেন। রাজার বাবাও রাজা ছিলেন, তাঁর বাবাও রাজা ছিলেন। রাজপদ বংশানুক্রমিক। কিন্তু একথা বললে ঘুটুং বলবে তাকে কে রাজা করল কিংবা তার বাবার বাবাকে কে রাজা করেছিল। এইভাবে প্রশ্নের স্রোত চলতেই থাকবে। তাই রাজা সেদিকে না গিয়ে বুদ্ধি করে উত্তর দিলেন, "প্রজারাই আমাকে রাজা করেছে।"

ঘুটুং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, "এত লোক থাকতে তারা তোমাকেই কেন রাজা করল?"

এবারেও রাজা দমলেন না। উত্তর দিলেন, "তারা আমাকেই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ভেবেছিল বোধহয়।"

ঘুটুং বলল, "ও, তাহলে তুমি এ রাজ্যের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক।" তারপর ছাড়ল তার সেই মোক্ষম প্রশ্ন, "আচ্ছা বল তো, গঙ্গাফড়িংয়ের রং কেন সবুজ?"

এবারে রাজা কুপোকাত। এমনিতে রাজা অঙ্কে ভালো হলে কী হবে, জীবনবিজ্ঞানে আর ইতিহাসে তিনি বরাবরই কাঁচা। খুব অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন রাজা। কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ করলেন না। বরং চালাক চালাক ভাব দেখিয়ে, "কাল বিকেলে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব," বলে কোনওমতে কেটে পড়লেন। সেই থেকে একমাস ধরে ঘুটুংয়ের প্রশ্নের ভয়ে আর উদ্যানমুখো হননি রাজামশাই।

আজ সবে চালতাগাছটা পেরিয়েছেন আর কোত্থেকে পেয়ারা খেতে খেতে ঝুপ করে উদয় হল ঘুটুং।

"কী ব্যাপার রাজামশাই, তোমার কি শরীর-টরীর খারাপ হয়েছিল? একমাস ধরে বাগানে আসছ না যে!"

রাজামশাই আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন, "তা একরকম বলতে পার। আসলে বুড়ো হয়েছি তো, শরীর সবসময় ঠিক থাকে না।"

একথা সেকথার পর রাজা ভাবলেন, ঘুটুং বোধহয় তার প্রশ্নের কথা ভুলে গেছে। ভালোই হল, ল্যাঠা চুকল।

কিন্তু নাহ্! ভবী ভুলবার নয়। ঘুটুং বলল, "তা না হয় হল। আমার প্রশ্নের উত্তর তো তুমি এখনও দিলে না, রাজামশাই।"

রাজা ভুলে যাওয়ার ভান করে বললেন, "কোন প্রশ্নটা বল তো?"

ঘুটুং বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, "ধুর, তুমি বড্ড ভুলে যাও। সেই যে বললাম না গঙ্গাফড়িংয়ের রং কেন সবুজ হল?"

এবার আর এড়ানোর উপায় নেই। রাজাকে হার মানতে হল। তিনি বললেন, "উত্তরটা ঠিক কী হবে বুঝতে পারছি না।"

"ঘুটুং বলল, "অ্যাঁ! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি রাজাগিরি কর! যাক, মন দিয়ে শোনো, গঙ্গাফড়িংরা তো সব সবুজ ঘাস আর লতাপাতার জঙ্গলে থাকে তাই ওরা পাখিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের গায়ের রংও ঘাস-জঙ্গলের মতো সবুজ করে রাখে ফলে পাখিরা ওদের চট করে ধরতে পারে না। এবার বুঝলে তো?"

রাজার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তবুও ঘুটুংকে একটু মুশকিলে ফেলার জন্য বেয়াড়া প্রশ্ন করলেন, "ওর গায়ের রংটা সবুজ হল কী করে?"

ঘুটুং বলল, "সেটা তো আরও সোজা। গঙ্গাফড়িং সবসময় সবুজ ঘাসপাতা খায়, তাই ওর গায়ের রং সবুজ হবে না তো কি তোমার মতো ফর্সা হবে?"

রাজা আবার একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, গরুছাগলও তো সবুজ ঘাসপাতা খায় কিন্তু ওদের গায়ের রং তো কই সবুজ হয় না। কিন্তু ঘুটুংকে আর না ঘাঁটানোই ভালো মনে করে থেমে গেলেন। বলা তো যায় না, শেষমেশ আবার একটা বিদঘুটে প্রশ্ন করে প্যাঁচে ফেলুক আর কি! অগত্যা রাজামশাই প্রচণ্ড খুশি হয়ে ঘুটুংকে পরদিন সকালে তাঁর সাথে রাবড়ি ও ক্ষীরের মালপোয়া সহযোগে প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ জানিয়ে প্রাসাদের পথ ধরলেন।

গ্রাফিক্স্ ইন্দ্রশেখর

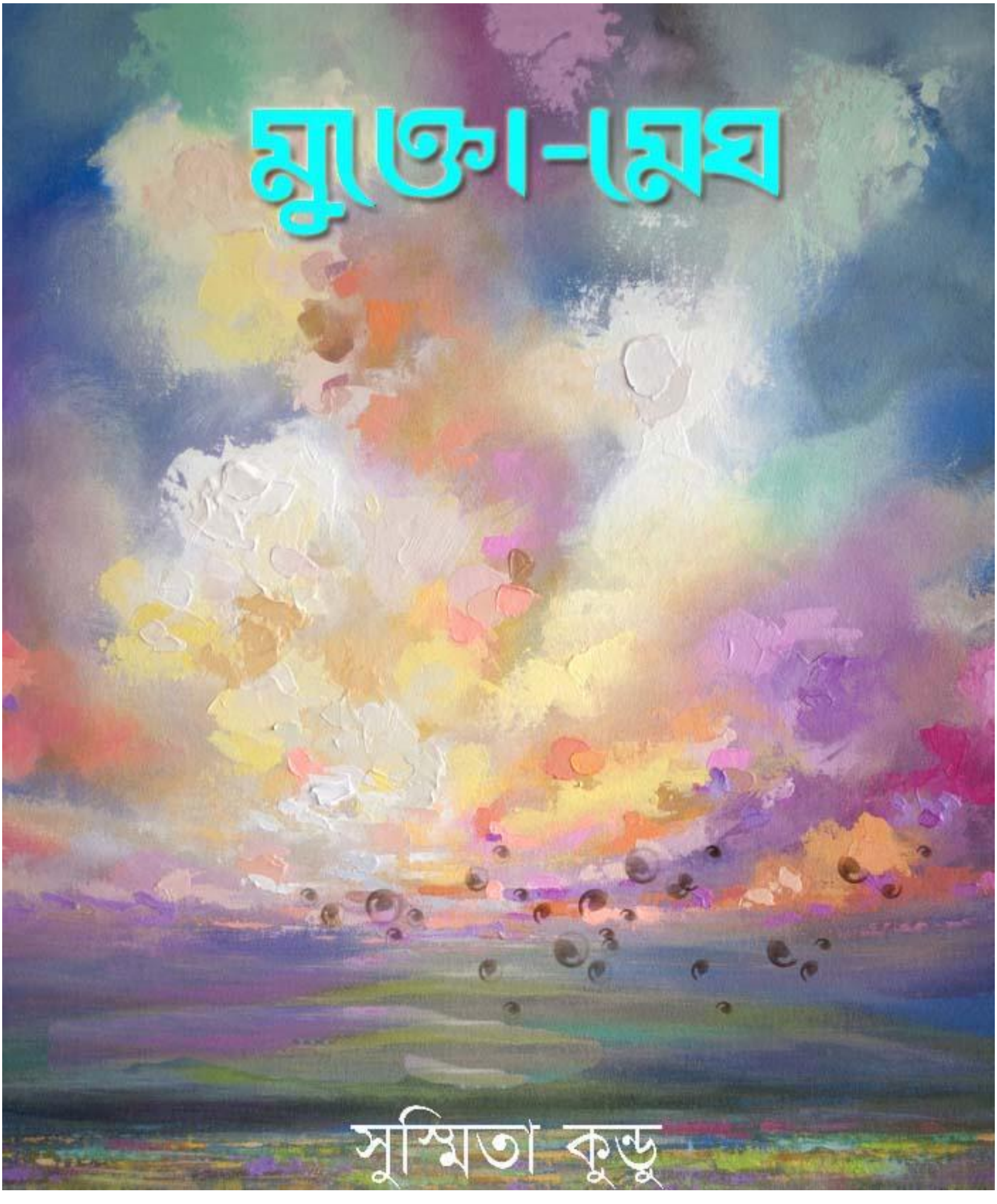

"সে অনেক অনেকদিন আগের কথা। একটা দেশ ছিল। আর পাঁচটা দেশের থেকে একটু আলাদা।"

"কেন আলাদা, মা? সেখানে বুঝি রাজামশাইয়ের ইয়াব্বড় গোঁফ নেই বাবার মতো?"

"না না, তা নয়।"

"তবে কি রানিমা তোমার মতো পাস্তা রাঁধতে পারে না? নাকি রাজপুত্তুর নয়ের ঘরের নামতা ভুলে যায় খালি আমার মতো?"

"আরে, কী জ্বালা! সেসব কেন হতে যাবে?"

“ও! তাহলে নির্ঘাত প্রজারা সব ভারি গরিব। খেতে-পরতে পায় না। সবসময় কাঁদে।”

“উঁহু! মোটেই না। বরং পুরো উল্টো।”

“মানে? প্রজারা সব তবে সেই পি.টি. ক্লাসের ব্যায়ামের মতো শীর্ষাসন করে নাকি?”

“ফের বাজে বকছিস? যা, তোকে আর গল্পই বলব না।”

“না না, মা! এই আমি মুখে আঙুল দিলুম। আর কিচ্ছুটি কইবুনি কো। দোহাই তোমার, গল্পটা বল। নইলে যে সে ‘আলাদা দেশটার’ কথা ভেবে ভেবে আমার আর ঘুম হবে না। কাল তবে বেলা করে উঠব। আর স্কুলের দেরি হলেই তো তুমি আমায় বকবে।”

“ঠিক আছে, বাবা! হয়েছে। পাকা বুড়ো কোথাকার। এবার চুপটি করে শোন।”

“হুমমমম। লক্ষ্মী মাটা আমার। বলো...”

“সেই আলাদা দেশটার নাম হল মুক্তোনগর। কেন জানিস? সে দেশের আকাশে জাদুর মেঘ উড়ে বেড়ায়। যখন মেঘগুলো সব ছোট্ট শিশু থাকে, এই তোর মতো পুচকে, তখন ওরা কতরকম রঙের হয়! লাল, নীল, হলুদ, কমলা, সবুজ। আর যখন ওরা হাসে তখন সারা আকাশজুড়ে রামধনু আঁকা হয়ে যায়। আর মজার কথা কী জানিস? যখন ওরা কাঁদে তখন ওদের চোখের জল মুক্তো হয়ে ঝরে। বিভিন্ন রঙের চকচকে গোল গোল উজ্জ্বল মুক্তো।”

“ওরাও বুঝি কাঁদে!”

“কাঁদবে তো বটেই। যখন দুষ্টুমি করে তোর মতো, ওদের মা-বাবারা তো বকে। অমনি ওরা মুক্তো ঝরায়।”

“ওরা কী দুষ্টুমি করে? ওদের কি স্কুল আছে? নাকি পার্ক আছে? না বাড়ি আছে, যেখানে দুষ্টুমি করবে?”

“ওদের স্কুল আছে বৈকি! সূয্যিমামা ওদের স্কুলের হেডমাস্টারমশাই। ভারি রাগী। তারপর চাঁদমামা আছে। সে অবশ্য একদম বকাঝকা করে না মোট্টে।”

“হি হি হি হি!”

“কী হল? হাসছিস কেন, পাগলছেলে?”

“তুমি ঠিক সূয্যিমামা আর বাবা হল চাঁদমামা।”

“তবে রে, দুষ্টু! আমি রাগী? আর তোকে যে এত্ত এত্ত গল্প শোনাই, তার বেলা? যা, আর গল্প বলব না।”

“ও মা! মা গো। আমি তো মজা করছিলাম। তুমি প্লিজ প্লিজ বলো বাকিটা। মেঘেদের ছানাগুলো কী করত সেটা বলো।”

“হুমমম! মেঘেদের ছানারা তো তারাদের আড়ালে সারাদিন লুকোচুরি খেলে বেড়ায়। কখনও খিলখিলিয়ে রামধনু ছড়িয়ে হাসে। কখনও আবার বকুনি খেয়ে মুক্তো ঝরায় টপাটপ। আর সেই রঙবেরঙের মুক্তোগুলো তো সব সূর্যের কিরণ আর চাঁদের আলোর সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে আসে পৃথিবীর বুকে। ঠিক মুক্তোনগর দেশটার মাটিতে, আর কোথাও না। দেশের রাজা-প্রজা সকলে সেই মুক্তো কুড়িয়ে জমা করে। তাই দিয়ে অন্যদেশের সাথে সওদা করে। দেশের সবারই অবস্থা ভালো। কারোর ঘরেই অভাব নেই।”

“ব্যস,হয়ে গেল? এ কেমন গল্প! যুদ্ধ নেই, রাক্ষস নেই, পরি নেই।”

“তুই শোন না আগে পুরোটা। কারোর ঘরে পয়সার আর সুখের অভাব না থাকলেও রাজামশাইয়ের মনে মোটেও সুখ ছিল না। রাজামশাই খালি ভাবতেন,

‘মুক্তো রাজার ঘরে
মুক্তো প্রজারও ঘরে,
রাজায়-প্রজায় তফাতটা
হবে কেমন করে!’

“ইস্, কী হিংসুটে পচা রাজাটা, মা।”

“বটেই তো। হিংসুটে রাজামশাই আর মন্ত্রীমশাই মিলে ডেকে পাঠালেন রাজ্যের সেরা কারিগরকে। চুপিচুপি ষড়যন্ত্র হল অনেক।”

“ষড়যন... সেটা কী গো, মা?”

“ষড়যন্ত্র? সেটা হল গিয়ে শলা-পরামর্শ। এই যেমন তুই আর তোর বাবা আমায় লুকিয়ে লুকিয়ে সব দুষ্টু প্ল্যান বানাস, অনেকটা সেরকম। তা সেইমতো বুদ্ধি খাটিয়ে কারিগর পাক্কা একমাস এগারো দিন ধরে ইয়াব্বড় একটা যন্ত্র বানাল।”

“গ্যাজেট? ডোরেমনের মতো?”

“সেরকমই। এই গ্যাজেটটা অনেকটা ওই তোর দমকলের খেলনাগাড়িটাতে যেমন ভাঁজ করা সিঁড়ি আছে, সেরকম। সবক’টা ভাঁজ খুলে দিলে আকাশছোঁয়া বিশাল লম্বা একটা আঁকশি তৈরি হয়ে যায়। আর সেই আঁকশির মাথায় একটা বড়ো লোহার সাঁড়াশি।”

“এ আবার কেমন যন্ত্র, মা? যেমন সেই আমরা গ্রামের বাড়িতে লম্বা লাঠি দিয়ে পেয়ারা পাড়ি গাছ থেকে, তেমন?”

“হুম। এই যন্ত্রটা দিয়েই তো রাজার সৈন্যরা সবাই মিলে আকাশ থেকে ছোট্ট রঙিন সবক’টা মেঘ ধরে আনল। যখন অমাবস্যার রাত্রে আকাশে চাঁদমামাও নেই, টিমটিম তারারা, মেঘেদের বাবা-মায়েরা সবাই গভীর ঘুমে, ঠিক তখনই। ধরে এনে তাদের দিল অন্ধকূপে বন্দি করে। কাকপক্ষীও টের পেল না।”

“কিন্তু কেন, মা? আমার খুব কান্না পাচ্ছে যে।”

“রাজা তো চায় না যে মুক্তোগুলো প্রজারা কেউ পাক। শুধু নিজের জন্যই লুকিয়ে রাখতে চায়। লোভী, হিংসুটে রাজা তো। কারোর সাথে ভাগ করে নেবে না সেই সম্পদ। দিনের পর দিন অন্ধকারে বন্দি করে রাখে মেঘবালক-মেঘবালিকাদের। তাদের ভয় দেখায়, কষ্ট দেয় যাতে তারা বেশি করে কাঁদে আর মুক্তো ঝরে অনেক অনেক। কিন্তু তারা সবাই তো গুম হয়ে চুপটি করে বসে থাকে। কথা কয় না, হাসে না, কাঁদে না। এভাবেই দিন কাটে, মাস কাটে, বছর ঘোরে। মেঘের বাবা-মায়েরা দিনরাত্রি কাঁদে। ভাবে, কোথায় গেল ওদের ছানাগুলো। ওদের কান্না তো আর মুক্তো হয় না। ওরা যে বড়ো হয়ে ধূসর বর্ষার মেঘ হয়ে গেছে। তাই শুধু জলই ঝরে অঝোর ধারায়। মুক্তোনগরের আকাশ শুধু কালো মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। সূর্যকিরণ চমকায় না, রাত্রে চাঁদের আলো ছড়ায় না। চারদিকে শুধু জল আর জল। প্রজারা ভারি কষ্টে, অভাবে দিন কাটায়।”

“মা, আমি সকলের সাথে শেয়ার করব সবকিছু। ওই পচা রাজাটার মতো কিছুতেই হব না।”

“তুমি তো আমার লক্ষ্মী বাবুসোনাটা। তারপর কী হল জানিস? একদিন এক রাখালছেলে রাজার কারাগারের পেছনের মাঠে বাঁশি বাজাচ্ছিল। তাই শুনে মেঘছানারা আস্তে আস্তে কয়েদঘরের স্যাঁতস্যাঁতে ঠান্ডা মেঝে থেকে ভেসে উঠল। ওপরের একচিলতে লোহার গরাদ লাগানো জানালায় চোখ রাখল সবাই। গানের সুরে তাদের মন ভালো হয় একটু। তারা রাখালছেলেকে ডেকে বলে,

“বন্দি মোরা এই কারাতে
এবার যাবেই বুঝি প্রাণ,
রাখালছেলে বিদায়বেলায়
শোনাও তোমার গান।”

“মেঘেদের দুঃখের কথা শুনে রাখালছেলে তার অন্যসব খেলুড়ে বন্ধুদের ডেকে আনল। সবাই মিলে হেসে গেয়ে মেঘেদের খুশি করার চেষ্টা করে। ওরা খুশি হলে হয়তো আবার সূর্যের আলো ছোঁবে এই মুক্তোনগরের মাটিকে। কিন্তু সেই গানের সুর যেই না দুষ্টু রাজার কানে গেল, সে অমনি পাঠাল তার সৈন্যদল। হুপ-হাপ, ধুপ-ধাপ করে সৈন্যরা এসে তো ধরতে লাগল রাখালছেলে আর তার বন্ধুদের। তাদের শক্ত করে দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধতে লাগল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল অবোধ শিশুগুলো।”

“মা গো! ওদের মা কই? আমার ব্যথা লাগলে তো তুমি চুমু দিয়ে দাও, ব্যথা সেরে যায়। ওদের মা-বাবারা পাজি সৈন্যগুলোকে গুলি করে মারছে না কেন?”

“ওদের মা-বাবারা তো গরিব। কাজের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় সারাদিন। তাই ওরা জানেই না এরকম ঘটনা ঘটছে বলে। আর সৈন্যগুলো তো হুকুমের দাস রে, বাবু। ঠিক তোর ওই রিমোট কন্ট্রোলওয়ালা রোবটটার মতো। রিমোটটা টিপছে তো দুষ্টু রাজাই।”

“তারপর কী হল, মা?”

“শিশুগুলোর আর্তনাদে মেঘের দল তো বদ্ধ গরাদের ওই পার থেকে অসহায়ের মতো ছটফট করতে থাকে। বার বার মিনতি করতে থাকে সৈন্যদের কাছে, শিশুগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কেউ সেই কাকুতিতে কর্ণপাত করে না। অসহায় মেঘের দল এবার ফুঁসতে শুরুকরে। রাগে ফুলে ফুলে ওঠে ওদের ধূসর মেঘের শরীর।”

“মা, ওরা তো রঙিন ছিল। তাই না?”

“হুম। তাই ছিল তো, যখন ওদের বন্দি করা হয়েছিল। তারপর এইভাবে দিনের পর দিন কারারুদ্ধ হয়ে থাকতে থাকতে ওরা কবে যেন বড়ো হয়ে গেছে। ওদের শিশুসুলভ আনন্দ, খুনসুটি সব হারিয়ে গেছে। হাসি আর কান্নার বদলে শুধু আছে রাগ। সেই রাগ বিদ্যুৎ হয়ে ঝিলিক দিতে থাকে ওদের শরীরজুড়ে। ওদের শরীর থেকে ছিটকে আসা তীব্র বজ্রবিদ্যুৎ টুকরো টুকরো করে দেয় কারাগারের দেওয়াল।”

“মা, ওরা আগে কেন তাহলে বেরিয়ে আসেনি?”

“ওরা তো ওই অন্ধকূপে বন্দি থাকতে থাকতে বুঝতেই পারেনি যে কবে বড়ো হয়ে গেছে, কবে ওদের এত ক্ষমতা হয়েছে। ওদের ওই রূপ দেখে তো সৈন্যর দল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে পালাল। মেঘের দল সবাই ভাঙা কারাগার থেকে বেরিয়ে গিয়ে জমা হল রাজপ্রাসাদের মাথায়। মুষলধারে নামল বৃষ্টি। শয়তান রাজা, তার পাজি মন্ত্রী, দুষ্টু সৈন্যর দল সকলে সেই জলের বন্যায় ভেসে একদম দেশের বাইরে বিদেয় হল। মেঘের ছানারা, রাখাল-ছেলেমেয়েরা, সব্বাই ভারি খুশি হয়ে তা-ধিনতা-ধিন করে নাচতে লাগল।

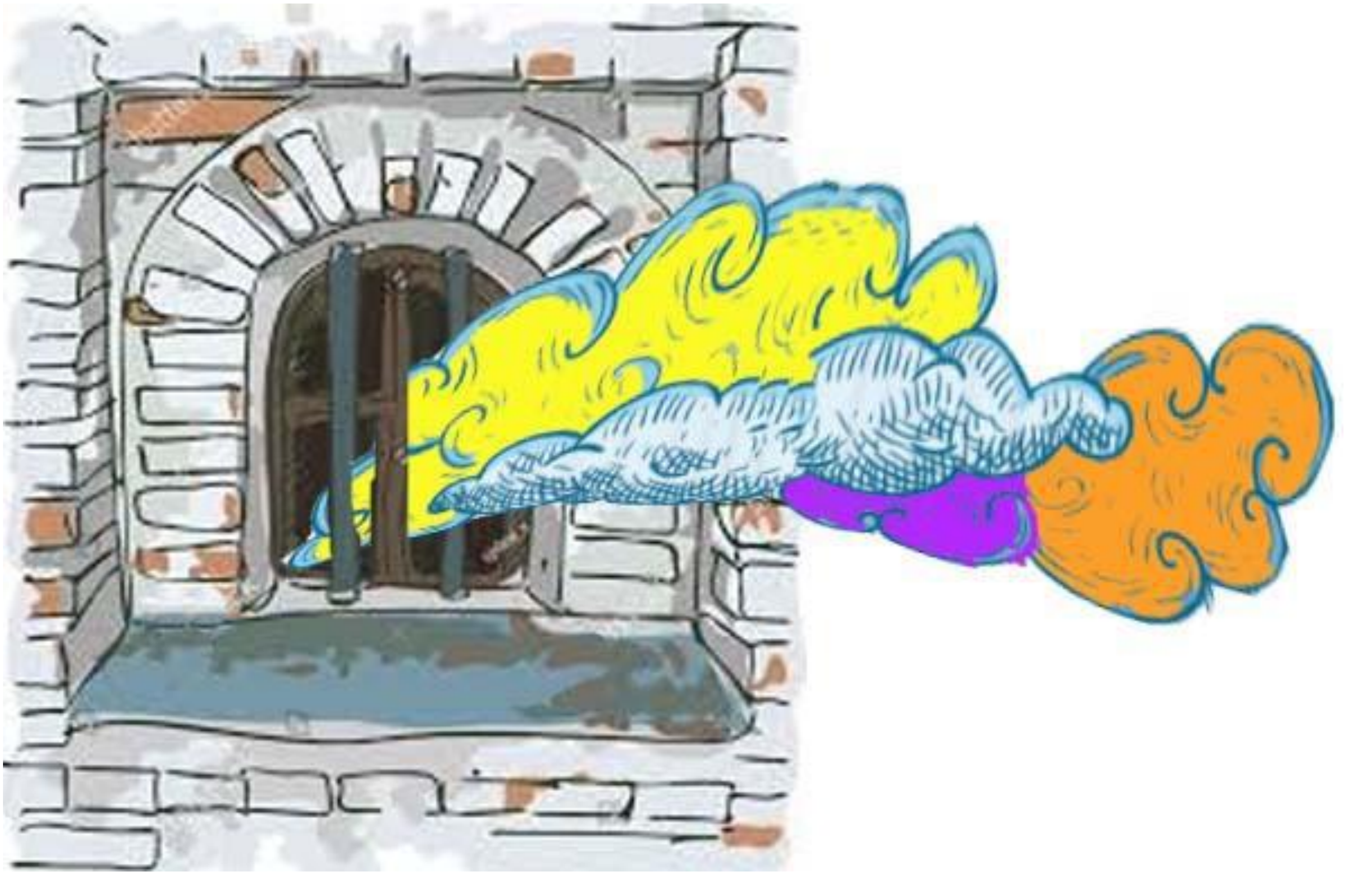

“রামধনু আর মুক্তো ঝরাই
আমরা মেঘের ছানা,
নাচব আজি গাইব আজি
কেউ কোরো না মানা।”

“আমরা বাঁধি গান, আর
বাজাই মনের সুখে বাঁশি,
রাখালশিশুর দল মোরা
ছড়াই খুশি রাশি রাশি।”

“কী সুন্দর গান! কী সুন্দর গান!”

“ওদের নাচগান শুনে রাখালশিশুদের মা-বাবারা ছুটে এল। আর এল কারা বল তো? মেঘছানাদের মা-বাবারা। তারা তো কতদিন দেখেনি তাদের ছেলেমেয়েদের। সে কী আনন্দ তাদের সব্বার! কিন্তু কেউ মোট্টেও কাঁদল না। কাঁদলেই তো বন্যা আসবে আবার।”

“আর মা, ওরা যে বড়ো হয়ে গেল, তাহলে আর মুক্তোও ঝরবে না, রামধনুও উঠবে না যে!”

“হ্যাঁ, বাবুসোনা। বড়ো তো একদিন সবাইকেই হতে হয়। তখন চারপাশটা এত রঙিন, এত সুন্দর থাকে না। তখন শক্ত হতে হয়, বুঝলি? গর্জে উঠতে হয় ওই মেঘের ছানাদের মতোই। তবেই তো দুষ্টুলোকেরা বিদায় নেবে। রামধনু এমনিই উঠবে, মুক্তোও এমনি ঝরবে। মানুষ তো ধনরত্নের চেয়ে ভালোবাসাই পেতে চায় বেশি। আর রাখালছেলেমেয়েরা কী বলল, জানিস?

“চাই না মণি, চাই না মুক্তো
থাকো তোমরা আকাশজুড়ে,
নাচব সবাই, গাইব সবাই
মেঘের ডানায় বেড়াব উড়ে।”

“কী দারুণ গল্প, মা! কী দারুণ! আরেকটা বলো।”

“তবে রে! এবার ঘুমো দেখি। আয় আমি গান গেয়ে ঘুম পাড়াই তোকে। আমার কথাটি ফুরোল... নটেগাছটি মুড়োল...”

গ্রাফিক্স্ ইন্দ্রশেখর

বিটকেল

কিগান (সাফিন আলি)

ঝিচকে আলোয় সকালটা থম মেরে বসে। সূর্য ওঠেনি, আবছা অন্ধকার। পুরো পাড়াটা যেন ঘুমিয়ে কাদা। শুধু পাশের পাড়া থেকে আসলামের কোরান পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। সারারাতের গুমোট গরমে হাঁসফাঁসের পর এই ভোরবেলায় একটু আরামের ঘুম হয়। তবে মাস্টারমশাইয়ের নিয়মে শীত-গ্রীষ্মের বালাই নেই।

বিপিনবিহারী চক্কত্তি। মাস্টারমশাই বলেই চেনে সবাই। ষাটের কাছাকাছি এসেও ছিপছিপে শরীরটায় ভালোই যৌবনের রেশ রয়ে গেছে। চোখে দেখতে এখনও অসুবিধে হয় না। সকাল সকাল উঠেই সাদা পাঞ্জাবি আর সাদা ধুতি পরে, সাদা চুলে ভরা মাথায় পরিপাটি করে চিরুনি বুলিয়ে নেন। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটা দেন কাশেদের চা-দোকানের দিকে। এই ভোরে শুধু এই চা-দোকানটাই খোলে। ফজরের নামাজ পড়ে মসজিদ ফেরত অনেকেই এখানে বসে চা খায়। সকাল সকাল কাজে বেরোনোর আগে মইবুব-ঝন্টুরাও চা-বিস্কুট খেয়ে যায় এখান থেকে। তবে মাস্টারমশাই এলেই কেউ না কেউ বেঞ্চে জায়গা ছেড়ে দেয়। গ্রামে একখানিই তো প্রাইমারি স্কুল। বেশিরভাগই ওঁর ছাত্র।

গ্রামটা খুব বড়ো নয়। আশি-নব্বইখানা বাড়ি হবে হয়তো। বেশিরভাগই ঘাসের ছাওয়া মাটির দেয়ালের বাড়ি। যারা একটু বিত্তশালী তারা পাকাবাড়ি তুলেছে। আজকাল বিদেশবিভুঁইয়ে নানান কাজ করে হাতে অনেকের টাকা হচ্ছে। তারা কেউ কেউ পাকা একতলা কিংবা টিন-অ্যাসবেস্টসের চাল করছে।

কাপড়ের তৈরি ঝোলাব্যাগটি ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মাস্টারমশাই। চা খেয়ে সোজা স্কুল যাবেন। গরমে মর্নিং স্কুল হচ্ছে ক'দিন। ব্যাগখানা কিনেছিলেন চার-পাঁচ বছর আগে পৌষমেলায় ঘুরতে গিয়ে। খুব পছন্দ হয়ে গেছিল ব্যাগটা। হালকা করে হাতের কাজ করা বড়োরকমের হওয়ায় কাগজপত্র বইতেও সুবিধে হয়। যৌবন থেকেই ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, তাই পূজো-অর্চনা করেন না। ভোর ভোর উঠে স্নান সেরে যোগ-ব্যায়াম করতে করতেই ভোর চারটে থেকে সকাল পাঁচটা বেজে যায়।

চা দোকানের দিকে আস্তে আস্তে পা বাড়ালেন। লাল মোরামের পথ। দু'পাশে ফাঁকা খেত কিংবা গেরস্থের কাঁটার বেড়া। মাঝে মাঝে দু'পাশের বড়ো বড়ো গাছগুলো রাস্তা অন্ধকার করে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন ভূতের দল ওদের মাথার জটায় দলা পাকিয়ে বসে। কা কা স্বরে কাকগুলো বাসা ছেড়ে উড়তে শুরু করেছে দূর কোনও বাজারের দিকে। নিশাচর পাখিগুলোও ডানা ঝাপটে বাসায় ফিরছে। এক-দুটো ছুঁচো 'কুঁই কুঁই' আওয়াজ করে রাস্তার এপার ওপার করে গেল বার কয়েক। হালকা আলোয় ওদের চোখে ধাঁধা পড়ে গেছে বোধহয়।

বামুনপাড়ার শেষের বাঁকে এসেছেন। তিনদিক থেকে রাস্তা মিশেছে এখানে। পুবদিক থেকে টং-টং-ঝন-ঝন করে আওয়াজ ছুটে আসছে। অপটু হাতে লজঝড়ে পুরনো সাইকেল লাগামহীনভাবে ছুটছে মনে হয়। রাস্তার ছোটোবড়ো পাথরের গায়ে ঠোক্কর খাচ্ছে ঠন ঠন করে। মুহূর্তে আছড়ে পড়ল কিছু ঠিক করে বোঝার আগেই। জোরে মোড়ের বাঁক ঘুরতে গিয়ে আলগা মোরামে পিছলে গেছে সাইকেলখানা। ঘষটে গেল পাশের সাধনের বাঁশের কাঁটাবেড়ার দিকে। চোখের পলকে ঘটে গেল পুরোটা। বিপিনবাবু তড়িঘড়ি করে এগিয়ে গেলেন পড়ে যাওয়া মানুষটাকে তুলতে। এ কী! এত্ত সকাল সকাল পিকলু!

হ্যাঁ, পিকলুই। ভালো নাম দিলীপ দাস। এই নামটা মাস্টারমশাই আর ওর বাবা-মা ছাড়া আর কেউ জানে না বোধহয়। পিকলু নামেই সবাই অতিষ্ঠ। বছর সাত-আটকের রোগপটকা চেহারা। হাফপ্যান্ট দড়ি দিয়ে বেঁধে পরে, না হলে যেকোনও সময় গলে যাবে। নতুন জামা না হলে জামার কারুকার্য বদলে যায়। ডুমুর থেকে কাঁচা আম, সবার কষের দাগ পাওয়া যাবে। সারাদিন শেষে এত মারামারির অভিযোগ আসে যে ওর বাবা সবসময় ভয়ে থাকে। মাস্টারমশাইকে এসে ধরে, "একটু মানুষ করে দিন, স্যার।"

এই সুদীপও বিপিনবাবুর ছাত্র। বেশিদূর পড়াশোনা করেনি। প্রাইমারির গন্ডি ছাড়িয়ে পাশের গ্রামের হাইস্কুলে গেছিল কয়েকবছর। কত ক্লাস পড়ল কে জানে। বোধহয় দু-তিনবার চেষ্টা করেও এইটের গন্ডি টপকাতে পারেনি। তারপর থেকেই কাঠের কাজে ঢুকেছে। তবে পিকলুর জন্য কোনও ত্রুটি সে রাখতে চায় না।

হাত ধরে তুললেন টেনে। গরম পড়েছে বলে মাথা নেড়া। উঠেই তড়িৎগতিতে হাত-পা ঝাড়তে থাকে। মাস্টারমশাইকে পাত্তাই দিল না। ধরে রাখা বামহাতের কনুই ছড়ে একটু রক্ত বেরিয়েছে। কিছু করার আগেই ফার্স্ট এইডও সারা। ডানহাতের চেটোতে থুতু নিয়ে মালিশ করে নিল কনুইয়ে। একটুর জন্য হলেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন বিপিনবাবু। অবাক চোখে দেখেন, এত জোরে পড়ার পরও ছেলেটির কাজ-কারবার। পেটানো অনেক খাওয়ার পরও কাউকে রেয়াত করে না সে। নিজের খেয়ালে থাকে। তবে মাস্টারমশাই খুব তারিয়ে তারিয়ে এই দুষ্টুমিগুলো উপভোগ করেন। খুব মজা লাগে। নিজেও তো ছোটোবেলায় কম ছিলেন না।

ঘোর কাটল ক্ষণিকেই। হেঁচকা টান দিয়ে রাগত স্বরে বললেন, "এত্ত সকাল সকাল কোনদিকে যাবি রে, ছোঁড়া?"

পায়ের ময়লা চামড়া উঠে গেছে খানিকটা। মোরামে লাল হয়ে গেছে পাটা। পায়ের মোরাম ঝাড়তে ঝাড়তেই উত্তেজিতভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "স্যার, মো-মো-মোকে উরা দরজার পাশে বুসতে দেয় না। মোকে মারে।"

হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে আরও অনেক অভিযোগ করে যায়। বুঝে গেছেন মাস্টারমশাই। ক্লাস থ্রির রুমটা ঠিক মাঠের পাশেই। খুব বাতাস দেয়। টিফিন বা ছুটির সময় আগে ছুটে গিয়ে গাছটাও ধরা যায় অন্যদের থেকে আগে। ছুটে আগে গিয়ে আমগাছ জড়িয়ে এক হাত তুলে এক বা দু'চক্কর দিয়ে দেয়। ততক্ষণে এসে পড়ে বাকিরা। চলে ছোঁয়াছুঁয়ি বা বুড়ি বুড়ি খেলা। সবার আগে এসে গাছ ছোঁয়ার মধ্যেই ওদের এভারেস্ট জয়ের আনন্দ। তাই আগে থেকে গিয়ে দরজার পশে বসে থাকবে। দরজা খুললেই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়বে সবাই। পিঠের ব্যাগটাতেও খুব যত্নের চিহ্ন। সবক'টা চেনই কাটা। হাঁ করে খোলা। বড়ো চেনটার মুখে ওর মা সেফটি পিন লাগিয়েছে।

ইতিমধ্যে কোথা থেকে বলাই এসে হাতের গাড়ুটা রাস্তায় নামিয়ে সাইকেল তুলল। লুঙ্গিটা হাঁটু অবধি তুলে অন্ধকার থাকতেই খোলা আকাশের তলে কাজ সেরে ফিরছে। মুখের নিমের দাঁতনটা একপাশে চালান করে ভুরু কুঁচকে তেড়ে এল।

"দেড় ফুটিয়া, বাপের সাইকেল নিয়ে বেরিছু সকাল সকাল?"

পিকলু মাথা তুলে করুণ মুখে তাকায় বলাই আর মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে। অপরাধী সে মুখে এক শিশুসুলভ সারল্য মাখা। দেখলে মনটা কেমন নরম হয়ে যায়। যেই না বলাইবাবুর হাত একটু আলগা হয়েছে, এক ঝাঁকে হাত ছাড়িয়ে পাঁই পাঁই করে ছুট। বলাই ওই ওই করে চিৎকার করে ওঠে, হাত বাড়িয়ে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা। বিপিনবাবু ধাক্কাটা সামলে ভ্যাবলার মতো ফেলে যাওয়া অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সাইকেল ধরে বলাই বিরস মুখে বলে, "আচ্ছা বিটকেল তু। মোর ঘাড়ে চাপিয়ে পগারপার।"

মাস্টারমশাই সাইকেলটা ওর বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলে হাসতে হাসতে মাথা নাড়ান, "সত্যি বিটকেল বটে।"

গ্রাফিক্সঃ ইন্দ্রশেখর

সৌম্য ব্যানার্জী

"বোনজোরনো সিনিওরে, কোসা পোসসু ফারে পের লেই?"

"বোন জোর নাকে বয়, বাট আই নো অনলি দিস মাচ অফ ইটালিয়ান। আই অ্যাম নীরদ মুখার্জী, ফ্রম ইন্ডিয়া।"

"সরি স্যার, লেট মি প্লিজ অ্যালাও টু চেক দ্য রেজিস্টার..."

রিসেপশনিস্ট রেজিস্টার চেক করে নির্দিষ্ট রুমের চাবিটা প্রফেসর মুখার্জীকে দেওয়ার সাথে সাথে একটা মাঝারি সাইজের প্যাকেটও এগিয়ে দিলেন ওঁর দিকে। কেউ একজন নাকি এটা ওঁকে দিতে বলে গেছে। প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে থাকা নিজের হাতটাকে অনেক চেষ্টায় নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখলেন নীরদ মুখার্জী। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার অভিনয় করতে করতেই নিজের রুমে পৌঁছে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর নীরদ মুখার্জী বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ। ইতালিতে একটি বিজ্ঞান-সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট হোটেলে চেক ইন করেন, রুমে যান। তারপর হঠাৎ করেই তাঁর আর কোনও খোঁজ নেই। মানুষটা পুরো কর্পূরের মতো উবে গেছে। টাকা পয়সা, জামা, জুতো সব ঠিকই আছে কিন্তু মানুষটাই নেই। খুব ক'দিন হইচই হল। পুলিশ অনেক তদন্তের পরে এই সিদ্ধান্ত নিল যে ওঁকে নিশ্চিতভাবেই কেউ কিডন্যাপ করেছে।

কিডন্যাপাররা কিন্তু কোনও মুক্তিপণ দাবি করল না। কারুর কাছে কোনও ফোন আসেনি। তাহলে কি কোনও জঙ্গিগোষ্ঠী? তাই হবে।

প্রফেসর মুখার্জী অবিবাহিত ছিলেন। ওঁর খোঁজ নেওয়ার মতো কোনও আত্মীয়ও না থাকায় ব্যাপারটা ধীরে ধীরে সবার স্মৃতির বাইরে চলে গেল। না, সবাই নয়। অচিন্ত্য, প্রফেসর মুখার্জীর ছাত্র এবং সহকারী অচিন্ত্য ভুলতে পারেনি তার স্যারের হারিয়ে যাওয়া। সবচেয়ে অদ্ভুত, স্যারের অন্য কোনও কিছু খোয়া না গেলেও স্যারের ডায়েরিটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। নাহ্, পুলিশ তা নিয়ে খুব একটা মাথাও ঘামায়নি। কিন্তু অচিন্ত্যর মনে একটা খটকা থেকেই গেছে।

আসলে খটকার কারণটা অচিন্ত্যর নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়। শেষ যেদিন অচিন্ত্যর সাথে প্রফেসর মুখার্জীর কথোপকথন হয়, সেইদিন স্যার অচিন্ত্যকে হঠাৎই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেন।

"অচিন্ত্য, তুমি ভাগ্যে বিশ্বাস কর? কিংবা ভগবানে?"

একজন ঘোষিত নাস্তিক প্রফেসরের মুখে এই প্রশ্ন শুনে একটু চমকেই গেছিল সে। একটু থতমত খেয়েই বলেছিল, "না স্যার, করি না। কিন্তু কেন?"

সরাসরি উত্তর না দিয়ে প্রফেসর মুখার্জী পালটা প্রশ্ন করেন, “জড় আর জীবের পার্থক্য কী?”

অচিন্ত্য এবার হেসে ফেলে, “স্যার, এটা তো আমার ক্লাস টুতে পড়া ভাইপোও বলতে পারবে।”

“হুম, তা পারবে। কিন্তু সত্যিই কি পারবে?” প্রফেসর মুখার্জীর গলায় একটা অদ্ভুত উদাস ছোঁয়া। যেন উনি গভীরভাবে কিছু ভাবছেন। কোনও একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েও যেন পুরো সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। অচিন্ত্য তার স্যারের এই অবস্থাটা চেনে।

“স্যার, একটু খুলে বলবেন, আপনি কী ভাবছেন?”

“ধর অচিন্ত্য, তুমি কোনও এক নতুন গ্রহে গেলে। সেখানে তোমায় কেউ চিনিয়ে দেওয়ার নেই যে কোনটা জীব, কোনটা জড়। নানা আকৃতির নানান বস্তু সেখানে রয়েছে। কোনওটা বাড়ছে, কোনওটা ছুটছে, কোনওটা এক জায়গাতেই রয়ে গেছে। তুমি কী করে সিদ্ধান্ত নেবে কোনটা জীব আর কোনটাই বা জড়?”

“কেন? এ তো খুব সোজা। যার বৃদ্ধি আছে, যে উত্তেজনায় সাড়া দেয়...”

“আহ্, অচিন্ত্য! তুমি কি তোমার ভাইপোর বই মুখস্ত করে এসে আমায় পড়া দিচ্ছ? আই ওয়ান্ট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফিচার্স অফ লাইফ।”

“স্যার, কিন্তু সেইরকম এক্সক্লুসিভ কিছু তো হয় না। জীবনের সংজ্ঞা নির্ধারণ তাহলে তো সহজ হয়ে যেত। তা তো নয়। তার জন্যই তো অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যকে একসাথে নিয়ে আমরা জীবন বলে নাম দিই।”

“তোমার কথা আমি মানছি। কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে নির্দিষ্ট একটা বৈশিষ্ট্য শুনতে চাইছি। এমন কিছু একটা, যা ছাড়া জীব বলে ভাবাই যায় না। সেরকম কিছু মনে পড়ছে না?”

“ওহ্, বুঝেছি, আপনি কি প্রজননের কথা বলতে চাইছেন?”

“ইয়েস, পাওয়ার টু রিজেনারেট, প্রজনন। এখন বল তো সেই জীবেদের মধ্যে কী করে বুঝবে কোনটা ইন্টেলিজেন্ট আর কোনটা নয়?”

“পাওয়ার টু চুজ? একাধিক অপশন থেকে সঠিকটা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা।”

“ব্রিলিয়ান্ট! এক্সাক্টলি সো! বাট মে নট বি! তুমি ব্রিটিশ অঙ্কবিদ জন হর্টন কনওয়্যে, এঁর নাম শুনেছ?”

“এই রে! না মানে, আমি অংক ব্যাপারটা এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করি।”

“উফ্! তাতে কী হয়েছে? আমি তোমায় অংক করাব না, চিন্তা নেই। গল্পটা শোন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ অঙ্কবিদ জন হর্টন কনওয়্যে একটি মজার খেলা উদ্ভাবন করেন। খেলাটা গেম অফ লাইফ বা শুধুই লাইফ বলে পরিচিত। উনি গবেষণা করছিলেন এমন কোনও যন্ত্র বানানো যায় কি না যা নিজেই নিজেকে কপি করতে পারবে।

“প্রজনন!”

“হুম, কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে। সেই নিয়ে ভাবতে গিয়েই উনি এই জিরো প্লেয়ার গেমটি আবিষ্কার করেন। জিরো প্লেয়ার গেম। কারণ, খেলা শুরুর আগে শুধু কিছু শর্ত বা লজিক সেট করে দিতে হয়, তারপর খেলোয়াড়ের আর কিছুই করার থাকে না। বাকিটা খেলার আপন নিয়মেই ঘটে চলে। ওই খেলাতে ধরে নেওয়া হয় একটা অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত ছককাটা ঘর আছে। ঠিক যেন একটা অসীম মাপের গ্রাফ পেপার। ধরে নাও, সেই গ্রাফ পেপারে আবার দাবার ছকের মতো সাদা কালো ছক করা। সাদা আর কালো এখানে জীবন আর মৃত্যুর প্রতীক। দাবার ছকের সাথে এর আরেকটা পার্থক্য হল এই যে, ওই ছকগুলো দাবার বোর্ডের মতো পাশাপাশি একদম নিয়ম মেনে নেই, বরং একটু অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়, এই ঘরগুলোর সাদাটা কালো এবং কালোটা সাদায় পরিণত হওয়ার ক্ষমতা ধরে। একদম প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা যাক পুরো বোর্ডটাই শুধুমাত্র কালো ছকে ভর্তি, কয়েকটা সাদা ঘর এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকা বাদ রেখে। এবার সেই গ্রাফ পেপারের কোন ঘরটা কালো থাকবে আর কোন ঘরটা সাদা তার জন্য সেই গ্রাফ পেপারের চৌখুপিগুলোকে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের বাঁধনে বেঁধে দেওয়া হল। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা এইরকম হতে থাকবে যে কখনও কিছু সাদা ঘর কালো হবে আবার কখনও কিছু কালো ঘর সাদা। এর ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই কিছু জায়গায় সাদা বা কালো ঘরের জটলা তৈরি হবে এবং এদের এই সাদা কালো রঙ বদলানোর খেলায় এগুলোকে আপাতভাবে জীবন্ত বলে মনে হবে। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু প্যাটার্নের জটলা থেকে আবার নতুন করে একই ধরনের প্যাটার্ন তৈরি হতে থাকবে।”

“ঠিক যেন প্রজনন!”

“এক্স্যাক্টলি সো। এইবার ভাবো, যদি কেউ এই খেলার প্রাথমিকভাবে তৈরি নিয়মগুলো আগাম না জানে তবে তার কি মনে হতে পারে না যে এটা একটা টু ডাইমেনশনাল জীবনচক্র?”

“হুম, তা পারে।”

“আর যদি উল্টোটা হয়?”

“মানে?”

“মানে আমাদের জীবন যদি ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রের একটা গেম অফ লাইফ হয়ে থাকে! আর এই ক্ষেত্রের আসল নিয়মগুলো আমাদের জানা নেই বলেই আমরা জীবন জীবন বলে লাফাচ্ছি!”

সেইদিন এইটুকু বলেই প্রফেসর মুখার্জী চুপ করে যান। কী যেন একটা মনে পড়ে গেছে ভাব করে অচিন্ত্যর সামনে থেকে উঠে গিয়ে নিজের ডায়েরিটায় লিখতে শুরু করেন। এই ডায়েরিটা স্যারের প্রাণ ছিল। স্যারের রোজনামচার ডায়েরি। কাউকে কোনওদিন দেখতে দেননি। অবশ্য অন্যের ডায়েরি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা যে শিষ্টাচারবিরোধী সেটাও ঠিক। তবুও স্যারের সেই সর্বক্ষণের সঙ্গী ডায়েরিটার কোনও খোঁজ না থাকায় অচিন্ত্যর মাঝে মাঝে মনে হয়, তবে কি স্যার নিজেই কোথাও আত্মগোপন করে আছেন?

স্যার নেই, স্যারের কোনও আত্মীয়স্বজনও নেই। আত্মভোলা, জ্ঞানপিপাসু এই বিজ্ঞানীটির ব্যক্তিজীবনে কিছু থিসিস পেপার আর নিজের ছাত্ররা ছাড়া আর কোনওকিছুর মনে হয় জায়গাও ছিল না। কিন্তু সেই ছাত্ররাও আজ তাদের নিজের জীবনের প্রফেশনাল আর পার্সোনাল লাইফের ঘূর্ণিপাকে ব্যস্ত। একমাত্র অচিন্ত্যই বুঝি ব্যতিক্রম। তার মনে হয়, আজই বুঝি স্যার ফিরে আসবেন।

প্রায় মাস ছয়েক বাদে হঠাৎ ও একদিন মেল চেক করতে গিয়ে দেখল প্রফেসর মুখার্জীর একটা মেল। ও তাড়াতাড়ি মেলটা খুলে পড়তে শুরু করল।

‘অচিন্ত্য, এই মেলটা তুমি পড়ছ মানে ইহজগতে আমি আর নেই। খুব সম্ভব আর কোথাওই আমার অস্তিত্ব নেই। এই মেলটার সাথে যে পিডিএফ অ্যাটাচমেন্টটা আছে সেটা পড়বে কি পড়বে না তোমার সিদ্ধান্ত। এই পিডিএফটা হল আমার ডায়েরির স্ক্যানড কপি। আমার ডায়েরিটা আমি নষ্ট করে দিতে বাধ্য হলাম। এতে যা লেখা আছে তা কোনও অবিমৃষ্যকারীর হাতে পড়লে মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তবুও পুরোপুরি নষ্ট করে দেওয়ার আগে স্ক্যান করে তোমায় মেল করে রাখলাম। তবে মেলটা প্রোগ্রাম করা থাকল আজ থেকে ছয়মাস বাদে তোমার কাছে সেন্ড হওয়ার জন্য। ডায়েরিটার লেখা বুঝতে হলে তোমায় সামান্য কিছু কথা জেনে নিতে হবে। সেটুকুই বলে রাখি।

‘প্রথমেই বলি, আমি সারাজীবনে যত ছাত্র পড়িয়েছি তাদের মধ্যে তুমিই আমার সেরা ছাত্র। সবদিক দিয়ে। তাই তোমাকেই এটা পাঠালাম।

‘এখন আসল কথা। কিছুদিন আগেই তোমায় গেম অফ লাইফ সম্পর্কে বলেছিলাম। আমার ডায়েরি বুঝতে হলে সেটা নিয়েই তোমায় পড়াশুনো করতে হবে। তুমি পারবে। আসলে জীবন নিয়ে গবেষণা করতে করতে আজ একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। তার শেষ এক্সপেরিমেন্ট করতে চলেছি আজকে। ইতালির একটা হোটেলে বসে এখানকার একটা কোম্পানিতে তৈরি একটি যন্ত্রাংশ ছাড়া আমার এক্সপেরিমেন্ট সম্ভব হত না। সমস্ত ডিটেইল লেখা থাকল আমার ডায়েরিতে।

‘এই প্রকৃতি আসলে একটা ভার্চুয়াল অবস্থা। ধরে নিতে পার, ঠিক যেন কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম (প্রাচীন দার্শনিক ঋষিরা কি একেই ‘মায়া’ বলতেন? জানি না।) আর আমি, তুমি আমরা সবাই আদতে এক একটা প্রোগ্রাম। আর এই প্রোগ্রামের কোড ভেদ করতে পারলেই আমরা বুঝতে পারব জীবনের প্রকৃত রহস্য। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কোনও প্রোগ্রাম নিজেই যদি এই কোড ভেদ করে ফেলতে পারে সাথে সাথে এই জগতের অপারেটিং সিস্টেম আনস্টেবল হয়ে যাবে। ঠিক যেরকম কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকলে কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেক অপারেটিং সিস্টেমের নির্দিষ্ট অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়ার যেমন ভাইরাসগুলোকে ডিলিট করে, সেইরকম এই প্রকৃতি নামক অপারেটিং সিস্টেমেও নিশ্চিত কোনও অ্যান্টিভাইরাস থাকবে। থাকতেই হবে। ফলে সে তার ডিফল্ট প্রসেসেই সেই বিগড়ে যাওয়া প্রোগ্রামকে মানে এক্ষেত্রে হয়তো আমার ত্রিমাত্রিক অস্তিত্বকে ডিলিট করে দেবে। এই প্রোগ্রামের নিয়ন্ত্রক নিশ্চিতভাবেই আমাদের চিন্তা-জগতের বাইরের, হয়তো বা আমাদের এই ত্রিমাত্রিক জগতের বাইরের অন্য কোনও মাত্রার। জানি না। আমার এই এক্সপেরিমেন্ট সেই জগতে পৌঁছানোর চেষ্টাতেই...

‘হাতে সময় বেশি নেই। এর থেকে বেশি জানতে হলে আমার ডায়েরিটা পড়ে নিও। কিন্তু সাবধান। আমি জানি না আমার পরিণতি কী হতে চলেছে। আমার এই এক্সপেরিমেন্টের রাস্তায় কতটা বিপদ আসতে পারে তা আমার অজানা। সেক্ষেত্রে তোমার পরিণতিও আমার মতোই হতে পারে। এখন তোমার সিদ্ধান্ত, তুমি তোমার বর্তমান জীবন বাছবে না সত্য!

‘ভাল থেকো।’

মেলটা পড়া শেষ করে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল অচিন্ত্য। এটা স্যারেরই মেল তো? নাকি কেউ মজা করছে ওর সাথে! চিরকাল নাস্তিক মানুষটা আজ এইরকম নিয়তিবাদীর মতো কথা বলছেন? নাকি সত্যিই নিয়তি বলে কিছু আছে? আমরা আসলে ভাগ্যের হাতের পুতুল মাত্র। কোনটা ঠিক?

আবার নিয়তির হাতে বাঁধা প্রোগ্রামই যদি আমরা হই তবে প্রফেসর মুখার্জী নামক প্রোগ্রাম নিজের প্রোগ্রামিংকে ছাপিয়ে গেলেন কোন শক্তিতে? একটু দোনামনা করে মেলের অ্যাটাচমেন্টটা ওপেন করার জন্য ক্লিক করল অচিন্ত্য।

* * *

চতুর্থ মাত্রায় একটা যন্ত্র, যা আমাদের হিসেবে কম্পিউটার গোত্রীয়, তাতে বেশ কিছ হরফ ফুটে উঠল। এই হরফগুলোর খুব কাছাকাছি অনুবাদ হবে –

‘আরেকটি প্রোগ্রামেও ত্রুটি দেখা দিতে চলেছে। সেটিকে মুছে দিতে ‘হ্যাঁ’ টিপুন, প্রোগ্রাম চালিয়ে যেতে ‘না’ টিপুন...’

কোণার্কের দেবতা

মনজিৎ গাইন

দোলনরা এবার পুরীতে বেড়াতে এসে খুব ঘুরছে। সমুদ্রে চান করতে দোলনের খুব মজা। দুদিন ধরে ওরা শুধু পুরীতেই থাকল। আর কোথাও গেল না। আর অনেক অনেক ঝিনুক কুড়ুলো দোলন আর টুবলু।
সেদিন বিকেলে বাবা বলল, "কালকে আমরা পুরীর আশেপাশে ঘুরে দেখব।"
দোলনের তাই শুনে জিজ্ঞাসা, "আমরা কোথায় কোথায় ঘুরব বাবা?"
"এই নন্দন কানন, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি আর অবশ্যই কোণার্ক।"
"বাঃ কোণার্ক সেখানে যেতে যে আমার খুব ভালো লাগবে, ওহ্ কত বড়ো সূর্য মন্দির!"
"হ্যাঁ কোণার্কের সূর্যমন্দির খুব খুব বড়ো।"
ওরা সেদিনকে একটু আগে আগেই শুয়ে পড়ল। পরদিন ভোর ভোর উঠে বেরোতে হবে। ঠিক সময়ে যেতে না পারলে বাস আর ওদের জন্যে দাঁড়াবে না, ছেড়ে দেবে।
খুব ভোরেই দোলনের ঘুম ভেঙে গেল মায়ের ডাকে, "অ্যাই দোলন ওঠ দেখছিস না বেলা হয়ে গিয়েছে।"
মায়ের ডাকে দোলন ধড়ফড় করে উঠে পড়ে ভাইকে ডাকতে থাকে। টুবলু তখনও ভালোই ঘুমোচ্ছে ও দোলনকে বলে দিদি এত সকালে ডাকছিস কেন, আমায় একটু ঘুমোতে দেনা।"
"অ্যাই টুবলু তুই নন্দন কাননে যাবি না?"
নন্দনকাননের কথা শুনে টুবলু কি আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে? সেও সোজা ধড়ফড় করে উঠে পড়ল। ওর আবার পুরীতে আসার মূল আনন্দ হচ্ছে নন্দনকাননের সাদা বাঘ আর অন্য জীবজন্তুদের দেখা।
মা সমানে তাড়া দিচ্ছে, "তোদের এই দিদি ভাইয়ের জন্যেই সব জায়গায় দেরি হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি কর নাহলে কিন্তু বাস আমাদের না নিয়েই চলে যাবে।"

ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল। বাসে হইহই করে দুজনে উঠে পড়ল। নন্দনকাননে গিয়ে টুবলুর কী মজা। ও অনেক আনন্দ করল, দোলনেরও নন্দনকাননে গিয়ে খুব মজা কিন্তু ওর অপেক্ষা কখন কোণার্ক আসবে। সূর্য মন্দির কখন আসবে। আগেরবার যখন এসেছিল তখন দোলন অনেক ছোটো কিন্তু তখনকার কথা ওর এখনও ভালোই মনে আছে।

বাসে এবার যে গাইড ছিল সে ঘোষণা করল, "এবারে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে কোণার্ক। ওখানে আমরা বিখ্যাত সান টেম্পল বা সূর্য মন্দির দেখব।"

তারপর গাইড আরো নানা কথা বলে যেতে থাকে ওই সূর্য মন্দির নিয়ে। দোলনের অবশ্য সেইসব কথা মাথায় ঢোকে না। ওর চোখের সামনে তখন ভেসে উঠেছে ওই বিখ্যাত সূর্য মন্দির।

দোলেনের এইসব ভাবার মধ্যেই কখন যে সূর্যমন্দির চলে এসেছে তা তো খেয়ালই করেনি।

হঠাৎ গাইড ঘোষনা করল, "আমরা এবার কোণার্কের সূর্য মন্দিরের খুব কাছে চলে এসেছি, আপনারা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেই সূর্য মন্দির দেখতে পাবেন।"

সেইমতো সবাই জানলা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে, হ্যাঁ ওই তো সেই বিখ্যাত সূর্য মন্দির। দোলন তক্ষুনি বাস থেকে নামতে যায়। গাইডের বারণ " না না এক্ষুনি নেমো না, এখনও সূর্য মন্দির আরেকটু দূর আছে, বাস আরেকটু যাবে।"

দোলনের আর অপেক্ষা করতে ভালো লাগছে না। ওর ইচ্ছা করছে ও ছুটে গিয়ে ওই সূর্যমন্দিরের কাছে চলে যায়। কিন্তু এখন যাওয়া যাবে না বাসটা চলছে। আরেকটু দূরে গিয়ে বাসটা থামল।

দোলন সোজা ছুট লাগাল সূর্য মন্দিরের দিকে। ওর বাবা-মা দুজনেই চ্যাঁচাচ্ছে, "অ্যাই দোলন ছুটিস না, দেখছিস না আমরা সবাই একসঙ্গে যাচ্ছি।"

দোলন আর কী করে মায়ের বারণ, ও না শুনে পারে না, ওরা চারজনে একসঙ্গে আস্তে আস্তে সূর্য মন্দিরের দিকে গেল। দোলন আর টুবলু সূর্য মন্দিরের চারপাশে অনেক ছবি তুলল। মন ভরে ওরা সূর্য মন্দির দেখছে। ওরা দেখছে ওখানে ছবি তোলার জন্যে অনেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা দোলনদের শুধু বলছে, "আপনাদের একটা ছবি তুলে দিই, খুব ভালো করে তুলে দেব।"

বাবা তাই শুনে বলল, "না না আমাদের নিজেদের ক্যামেরা আছে তোমাদের আর ছবি তুলতে হবে না।"

"তবুও আমাদের ক্যামেরায় একটা ছবি তুলুন, দেখবেন খুব ভালো হবে।"

"না বললাম তো আমাদের ছবি তোমাদের তুলে দেওয়ার কোন দরকার নেই।"

"তাহলে স্যার আপনাদের ক্যামেরায় আপনাদের সবার একটা ছবি তুলে দেই, আপনি শুধু দশটাকা আমায় দেবেন।"

"না বললাম তো আমাদের ছবি তোলার কোনো দরকার নেই।"

এবারে বাবার কথাটা বেশ একটু জোরেই বলেছিল আর এতে ছিল স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ। ছেলেটা মুখ কাঁচুমাচু করে ওদের পাশ থেকে সরে গেল।

দোলনের আবার মনে হচ্ছে বাবা একটা ছবি ওই ছেলেটাকে দিয়ে তোলালেই পারত। বেশি তো আর চাইছিল না, ওর দাবি ছিল মাত্র দশ টাকা। মনে হয় খুব গরীবই হবে। এরপরেও ওরা কোণার্কের মন্দিরে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখছে শুধু ছেলেটা ওদের দেখলে দূরে চলে যাচ্ছে।

বেশ খানিক্ষন পরে হঠাৎ বাবা বলে, "আমার শরীরটা কীরকম যেন করছে..."

এইটা বলতে বলতে বাবা বুকের বাঁদিকে হাত দিয়ে বসে পড়ে। দোলনরা বুঝে উঠতে পারে না কি করবে। দোলন খুব জোরে জোরে "হেল্প হেল্প" বলে চ্যাঁচাচ্ছে কিন্তু সবাই বাবার ওই অবস্থা দেখে দূরে সরে যাচ্ছে। অনেকে একটু জিজ্ঞেস করছে ব্যাস তারপরেই চলে যাচ্ছে।

দোলন সত্যি কী করবে এই অজানা অচেনা জায়গায় বুঝতে পারে না। ওর মা আর টুবলু দুজনেই খুব কাঁদছে। হঠাৎ দেখে সেই ছেলেটা যে ওদের ছবি তুলে দিতে চেয়েছিল সে ছুটে আসে আর তাকে জিজ্ঞাসা করে "কী হয়েছে এনার?"

দোলনই বলে, “দেখুন না বাবার হঠাৎ শরীরটা কীরকম করছে। বলছে বুকে ব্যাথা হচ্ছে।”
“তাই বুকে ব্যাথা হচ্ছে তাহলে তো ওনাকে এক্ষুনি হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে একটুখানি দাঁড়ান আমি সব ব্যবস্থা করছি।”
এই বলে ওই ছেলেটা আরো কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে এসে দোলনের বাবাকে একটা গাড়িতে তুলল ধরাধরি করে তারপর সোজা হসপিটাল্। দোলনরাও ওই গাড়িতে উঠে গিয়েছে।
হসপিটালের ডাক্তাররা বাবাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসা শুরু করে দিল। দোলনরা বাইরে বসে আছে। ওদের মনে খুব চিন্তা বাবার কী হয়, সেই ছেলেটাও বসে আছে।
বেশ খানিক্ষন পরে ডাক্তার বেরিয়ে এসে বলল, “ওনার বেশ ভালোমতো একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, ঠিক সময়েই হসপিটালে আনা হয়েছে না হলে বিপদ হতে পারত।”
দোলন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে, “ডাক্তারবাবু বাবা কেমন আছে?”
“এখন ভলো আউট অফ্ ডেঞ্জার।”
“আমি কি এখন বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারি।”
“হ্যাঁ যাও বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারো কিন্তু একদম কথা বলবে না শুধু দেখেই চলে আসবে।”
“ঠিক আছে ডাক্তারবাবু আমি শুধু দেখেই চলে আসব।”
এই বলে দোলন সোজা ছুটে বেডের কাছে চলে গেল। বাবা তখনও চোখে বুজিয়ে। বাবাকে একবার ভালো করে দেখে ও যখন বেড়োচ্ছে তখন দেখে সেই ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়েছে। দোলনের মা ওর হাতে কিছু টাকা তুলে দিতে চাইছে কিন্তু সেই ছেলেটা কিছুতেই টাকা নেবে না। ও শুধু একটা কথাই বলছে, “এই টাকা আমি নিতে পারবনা ম্যাডাম, এটা যে আমাদের কর্তব্য আপনারা টুরিস্ট। আপনাদের কেউ বিপদে পড়লে এই অজানা অচেনা দেশে আর কে দেখবে...”
ছেলেটা এইসব কথা বলে চলে কিন্তু দোলনের মনে তখন বাসের গাইডের কথা, “কোণার্কের এই সূর্য মন্দিরে কোনো দেবতার প্রতিমা নেই কারণ......”
কিন্তু গাইডের কথা সত্যি নয়, কোণার্কের মন্দিরে দেবতা নেই কে বলল? এই ছেলেটা যে একজন অচেনা, অজানা মানুষকে বিপদের থেকে বাঁচানো নিজের কর্তব্য বলে ভাবে সে দেবতা না হয়ে কিছুতেই যায় না, অথচ এই ছেলেটাকে দশ টাকা দিতে হবে বলে বাবা কীরকম ভাবে বলেছিল।
দোলনের চোখে কৃতজ্ঞতার জল ভরে আসে, ও চোখ মুছতে মুছতে বলতে চায়, “দাদা আপনি আমাদের একটা কেন অনেক অনেক ছবি তুলুন , যত পারেন। কোণার্কের দেবতার ক্যামেরায় ছবি তোমার সৌভাগ্য আর ক”জনের হয়।”

গ্রাফিক্স্ঃ ইন্দ্রশেখর

ঝিনুকনদীর চর

মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ

একসময় সত্যিই এর নাম ছিল ঝিনুকনদী।

ছিল জল থৈ-থৈ এক আদিগন্ত স্রোত। ছিল বুক ভর্তি ঝিনুক। আর ঝিনুক খুললেই রাশি-রাশি মুক্তো! যেমন ঝিকমিক-ঝিকমিক, তেমনই মূল্যবান। পাড়ার লোকজন জাল ফেলে যেমন মাছ ধরত হরেক রকমের, সঙ্গে ঝিনুকও তুলত অনেক। আর ঝিনুক মানেই মুক্তো। আর মুক্তো মানেই পেটজুড়ানোর রসদ। বেঁচে থাকার শ্বাসবায়ু, অক্সিজেন...

কিন্তু সেও অনেককাল আগেকার কথা। সেদিনের সেই ঝিনুকনদী আর নেই। নেই ওর বুকভর্তি ঝিনুকও। আর ঝিনুকই যদি না থাকে তো মুক্তো আসবে কোত্থেকে? তাইতো নদীটার মতনই ঝিনুকপাড়াটাও আজ বড়ো মনমরা হয়ে দিন কাটাচ্ছে। একরত্তি হাসিখুশিও নেই ওপাড়ার কারো মুখে। নেই আগেকার দিনের পাড়ামাতানো সেই আমোদ আহ্লাদও। রোজ সন্ধে নামার আগে আগেই কখন গোটা পাড়াটা জুড়ে দীর্ঘশ্বাসের মতন এক অন্ধকারের ছায়া নেমে আসে। ভারী বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে তখন গোটা তল্লাটটা, সে আর চোখে দেখার মতো নয়।

ঝিনুকনদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় পাড়াটারও নাম হয়ে কখন হয়ে গিয়েছিল ঝিনুকপাড়া। খুব বড়ো না, নেহাতই ছোট্টো এই ঝিনুকপাড়ায় বাস করত সাকুল্যে শ'খানেক পরিবার। আর সব পরিবার মিলিয়ে লোকও বড়োজোর শ'চার-পাঁচেক। চাকরিবাকরি করত না এখানকার কেউই। নদীর জলে পুষ্ট উর্বর জমি-জমাগুলোতে চাষবাস করেই চলত সবার। আর ওই যে বললাম, কারো চলত সেই কাকভোরে উঠে ঝিনুকনদীর বুকে জাল ছড়িয়ে দিয়ে মাছ ধরে, নয় ঝিনুক কুড়িয়ে। কিন্তু হাতে সোনার ডিম পাড়া অমন হাঁসটিকে পেয়েও একবার মর্ম বুঝল না এপাড়ার লোকজন? এমন নির্বোধও হয় বুঝি কখনো মানুষ!

নদীর কান্না প্রথম শুনতে পেয়েছিল বড়ো মাছরাঙা। সে-ই একদিন ছোঁ মেরে তুলতে গিয়ে ওই মায়াকান্নার সুর শুনে থমকে গিয়েছিল। ঠোঁটে চিপে মাছ তুলবে কী, কাণ্ড দেখে তো ও আকাশ থেকেই পড়ল ও। আশ্চর্য, অমন বেহাগ-বাগেশ্রীর সুর ছড়িয়ে কাঁদছেটা কে? ভুল শুনছে না তো? ছোঁ মেরে ধরতে যাওয়া মাছটির কথা বেমালুম ভুলে অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল খালি। আর অমনি একজন সমব্যথী বন্ধুর সন্ধান পেয়েছি ভেবে আরো ডুকরে কেঁদে উঠল ঝিনুকনদী।

দেখে-শুনে বড়ো মাছরাঙাও যারপরনাই বিস্মিত। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, সে কী কথা, নদী আবার কাঁদে কোন দুঃখে? ওর-ও আবার সুখ-দুঃখ হয় নাকি? ভারী আশ্চর্যের কথা! বড়ো-বড়ো চোখ করে আরো একবার ফিরে তাকাল বড়ো মাছরাঙা ঝিনুকনদীর দিকে। তারপর একে একে জিজ্ঞেস করতে লাগল আরো নানা প্রশ্ন।

কাঁদছ কেন ঝিনুকনদী? তোমার আবার দুঃখ কী? এ তো বড়ো ভালো কথা নয়!

চোখ পিটপিট করে অমনি তাকাল ঝিনুকনদী বড়ো মাছরাঙার দিকে। কেমন লোক হে তুমি, দেখেও আমায় বুঝতে পারছো না কেন কাঁদছি? তোমার দৃষ্টিশক্তি তো সবার চাইতে ভালো বলেই জানি।

শুনে চমকে উঠল বড়ো মাছরাঙা। খানিক লজ্জাও পেল। চোখ রগড়ে নিয়ে বলল, কিছু মনে কোরো না গো ঝিনুক নদী, সত্যিই বুঝে উঠতে পারছি না যে কিছু। একটু খুলেই বল যদি-

বেশ, তবে তুমিই বলো, এই তো কত্ত কাল দেখছো আমায়? আর শুধু তুমিই বা কেন, তোমার বাপ-মা-ঠাকুদ্দার কাছেও শুনে এসেছ আমার কথা?

ঘাড় নাড়ল বড়ো মাছরাঙা। তা ঠিক। কিন্তু একথা বলছো কেন? এমন কী ঘটলো যে-

বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঝিনুকনদী। সেই কথাই বলছিলাম রাঙাভাই, আদ্যিকালের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, বছর দশ আগেও কি আমায় এমনটি দেখেছো বলো? এমন রুক্ষ-শুক্ষু। মনমরা, এমন পিনপিনে হাড্ডিসার? সেদিনের সেই আমিটি রইলাম আমি আর বলো?

অমনি নদীর মনের কথা সব বুঝতে পেরে মাথা দোলাল বড়ো মাছরাঙা। তারপর মুখ ব্যাজার করে বলল, ও এই কথা তবে? সে তো ঠিকই বলেছ ঝিনুকনদী। এখন যে তোমার দৈন্যদশা বড়ো। কলকল সেই জলস্রোতই বলো, আর মাছ-ঝিনুকই বলো, নাঃ, কিচ্ছুটি নেই তেমনটি আর তোমার বুকে। তেমনি নেই তোমার দুইপাড় জুড়ে থরে-থরে সাজানো সবুজ গাছপালাও। নেই আমাদের মতন জন্য হেথা- হোথা থেকে উড়ে আসা রঙবেরঙের পাখিরাও। অথচ কী আশ্চর্যের কথা, যাদের জন্য তোমার এই মরণদশা, তাদের যে ভ্রুক্ষেপ বলতে নেই। মাছ আর মুক্তোর কথা ছাড়ান দাও, তোমার জল না পেলে কদিন বাদে চাষ-আবাদই বা করবে কী দিয়ে, সেই চিন্তাও যে নেই ব্যাটাদের! এ যে নিজের পায়েই কষিয়ে কুড়ুল মারা গো! নিজের ভালোমন্দ বলতে কবে আর বুঝবে এই চরের মানুষজন?

ঝিনুকনদীর কান্নার কথাটা দিনে-দিনে চাউর হয়ে গেল সব পশু-পাখিদের মধ্যে। বড়ো মাছরাঙা প্রথমে বেশ আক্ষেপের সঙ্গে বলল ওর বউমাছরাঙা আর তার ছানাদুটিকে। তা শুনল কাঠঠোকরা, কাঠবেড়ালিরা, শুনল রোজ-রোজ মুখ ডুবিয়ে জল খেতে আসা হরিণ, শেয়াল, বুনো মোষ, বাঘ-ভালুকেরাও। শুনে ভারী মন খারাপ সকলের, কিন্তু করবেই বা কী ওরা? যত সর্বনাশের গোড়া তো ওই ঝিনুকনদীর চরের মানুষজনেরা। ওদের বোঝাবে কে? কে ফরমান জারি করে বলবে যে, সাবধান! নিজেরা বাঁচতে চাইলে এমন অপকর্মটি এবারে বন্ধ করো। বিবেকের চোখদুটি খোলো এবারে। নয় যে, নিজেদের খোঁড়া গর্তেই চাপা পড়বে একদিন!

শেষে কাজের কাজটি করল ওই বড়ো মাছরাঙা আর কাঠঠোকরাই। করল কী, ললিতাবতী ঢাউস এক ময়লার প্যাকেট হাতে নিয়ে নদীরপাড়ে এসে দাঁড়াতেই, গাছের মগডাল থেকে উড়ে এল ওরা তেড়েফুঁড়ে। তারপর কটাস কটাস করে মারতে লাগল ললিতাবতীর হাতে-মাথায় একের পর এক ঠোক্কর। মুখে কিছু বলবে কী, বা তেড়ে আসবে কী, এমন অভূতপূর্ব কাণ্ড দেখে ললিতাবতীও এক্কেবারে থ। চোখ বড়ো বড়ো করে হাত পা নেড়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল খানিক। তারপর শাড়ির আঁচল গুটিয়ে যাকে বলে দে-দৌড়, দে-দৌড়...

রমনীমাধব তখন কাব্য করছিলেন মনের খেয়ালে। কিন্তু লেখা সাঙ্গ হবার আগেই ঘটল বিভ্রাট। মানে বউ ললিতাবতী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হুমড়ি খেলেন তার পড়ার ঘরেই। অমনি কলম গুটিয়ে বউ-এর দিকে অবাক চোখে তাকালেন কবি। চোখদুটি গোলা পাকিয়ে বললেন, একী! আবার ঘটল এই সক্কালবেলা? গেলে তো নদীতে জল আনতে, আনোনি?

বড়ো-বড়ো শ্বাস ফেলে কথা বলে উঠল ললিতাবতী। শোনো, বড়ো আশ্চর্যের এক ঘটনা ঘটল আজ নদীতে। আমি তো পড়ি-মরি করেই একপ্রকার ছুটে এসে প্রাণে বাঁচলাম।

সে আবার কী কথা? সেখানে আবার কী বিপদ হল? কুমির-টুমির কিছু...

আরে না গো না। কুমির-টুমির কিছু নয়, কটি মাছরাঙা আর কাঠঠোকরা।

মাছারাঙা আর কাঠঠোকরা? কেন, ওরা আবার কী করল?

আবারও চোখ বড়ো বড়ো করল ললিতাবতী। আরে বাবা, সে কথাই তো বলছি। কিন্তু আজ যে ওরা আমার পিছু নিল। যেমন খুশি ঠোকরাল, কামড়াল! বলে হাত-মাথা-পা সব উল্টে পাল্টে দেখাল ললিতাবতী। রমণীমাধবও যারপরনাই অবাক। এ আবার কী কথা! কাঠঠোকরারা কাঠ ঠোকরায় সবাই জানে, মানুষও ঠোকরায়, এমনটি কেউ কখনো শোনেনি! সঙ্গে মাছরাঙাও?

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল ললিতাবতী, দ্যাখোই না, নোংরা-আবর্জনার প্যাকেটটা যেমন নিয়ে গেছি, তেমনই নিয়ে পালিয়েছি আবার। ফেলতেই পারলাম না যে ওটি নদীতে। এমন ধরল এসে সবকটা একসঙ্গে...

রমণীমাধব বারান্দায় রাখা ঢাউস ময়লার প্যাকেটটার দিকে তাকাল। তারপর গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। এমনকি বিকেল হতে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে উঠল একবার নদীর চরে গিয়েও। আর অমনি সব রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়ে গেল নিমেষে।

মস্ত সেই ময়লার ঝোলা হাতে কবিকে দেখে গাছ থেকে বনবন করে উড়ে এল মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, আরো রাজ্যের পাখিরা, আর বন থেকে তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে এল যত জন্তু-জানোয়ারও। এরা সবাই ঝিনুকনদীর বন্ধুবান্ধব। সকলকে একসঙ্গে এমন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দেখে খানিক ভড়কেই গেল রমণীমাধব। খানিক ভয় ভয় বুকে থমকেও দাঁড়াল সে। অমনি সামনে এসে দাঁড়াল বড়ো মাছরাঙা। তারপর মাথা দুলিয়ে বলল, এই যে, ভালোই হয়েছে তুমি এয়েচো। তুমি ছাড়া আমাদের এই দুঃখ কষ্টে কতা বুজবেই বা কে? পাড়ার সবকটাই তো আকাট মুখ্যু আর স্বার্থপরের দল।

রমণীমাধব খানিক ভ্যাবাচ্যাকাই খেল বটে এমনটি দেখে। প্রায় ভিরমি খাবার জোগাড়। অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগল, এরা আবার কথা বলা শিখল কবে? শুনিনি তো আগে কোনোদিনও!

কবির মনের কথা কেমন করে জানতে পারল কাঠঠোকরা। অমনি কটাস করে উত্তর দিল, ওহে, কথা বুঝি তোমরাই বলতে পারো শুধু? আমরা বুঝি পারিনে? শুনে রাখো, কথা আমরাও কইতে জানি। বলিও, তেমন লোক পেলে। যেমন বড়ো বড়ো মানুষেরা মানেই দুষ্টু-পাজি-খারাপ, কিন্তু তোমাদের ছানাগুলো তো তা নয়। তাই সময় সুযোগ মিললেই ওদের সঙ্গে আমরা কথা কই। খেলি। মজা করি।

রমণীমাধবের তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। ভাবতে যাচ্ছিল বোধ হয়, তবে আমার সঙ্গেই বা কেন? আমি তো বড়োমানুষ। দুষ্টু। ছানাপোনা তো নই।

আমনি পাশ থেকে বউমাছরাঙা বলে উঠল, না গো, তোমায় আবার খারাপ কে বলে। তুমি তো কবি। কবিরা কখনো খারাপ হয়? কবিদের তো ফুলের মতন মন। যেমন কোমল, তেমনই পবিত্র। তাই তো তোমার কাছে ছুটে আসা। সব কথা জানাতে আসা।

ঠোঁটে মৃদু হাসে মাখিয়ে রমণীমাধব বলল, বেশ তো, বলো কী কথা তোমাদের?

অমনি আসল কথাটা পাড়ল বাঘমামা। বেশ জলদগম্ভীর স্বরে। বলি, দিনরাত তো কাব্যি করে বেড়াও। খোঁজ রাখো না কিচুরই। ওদিকে পাড়ার লোকজন রোজই এসে এখানে জাল মারে আর মাছ ঝিনুকে চুবড়ি ভর্তি করে বাড়ি ফেরে। বুঝি বা সংসারও চলে তোমাদের ওতে?

মাথা নাড়ল রমণীমাধব।

তো একবারও ভেবে দেখেছো কবিবর, এই ঝিনুকনদীই যদি না থাকে আর তবে ভবিষ্যতে খাবে কী তোমরা? কোথায় পাবে মাছ, কোথায় পাবে মুক্তো, ঝিনুক?

না-থাকবে কেন ঝিনুকনদী? এই নদীই যে আমাদের মা। যুগ যুগ ধরে। অবাক হয়ে বলল রমণীমাধব।

তাই যদি হবে, তবে হাতে ওটি কেন কবি?

বাঘমামার কথায় চোখ পিটপিট করে হাতের দিকে তাকাল রমণীমাধব। একটু অবাক হওয়ার ভঙ্গিতেই বলল, এ তো কিছু নয়। একটু নোংরা আবর্জনা...

সে কথাই তো বলছি কবি। সবাই যদি রোজ রোজ এমন কাঁড়ি কাঁড়ি ময়লা এনে ফেলো নদীটার বুকে, তবে সে আর বাঁচে কেমন করে? তুমিই বলো, এমনটি কি ছিল আগে তোমাদের এই ঝিনুকনদীটি? টইটুম্বুর জল, কলকল স্রোত, আর দু'পার জুড়ে সবুজগাছের সার, কোথায় বলো এখন! আছে আর কিছু?

নাঃ, আর কিচ্ছু বলতে হয়নি কবি রমণীমাধবকে। সেদিন সেও নদীর একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজের কানে ঝিনুকনদীর কান্না শুনতে পেয়েছিল। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, পাড়ায় গিয়ে আজই বসতে হবে সবাইকে নিয়ে। বুঝিয়ে বলতে হবে ভাবী সর্বনাশের কথা। আমরা যে নিজেরাই নিজেদের হনন করার কাজে এগিয়ে চলেছি দিবারাত্র। এমন চললে যে পাড়াটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একদিন। যেমন করে হোক, নদীটিকে বাঁচিয়ে রাখা যে আমাদের সকলেরই কর্তব্য।

ব্যাস ওতেই কাজ হল। পাড়ার একমাত্র শিক্ষিত, কবি মানুষ রমণীমাধবের কথা কেউই আমান্য করল না। ওর কথায় সম্মতি জানিয়ে সকলেই মাথা দোলাল যেমন, তেমনই দুশ্চিন্তায় কপাল ভাঁজ করল। ভীষ্মের এক প্রতিজ্ঞাও করল সবাই অমনি- না, এমন ভুল আর একবারের জন্যও নয়।

শুধু কি তাই? পরদিনই সবাই দলবেঁধে ছুটল ঝিনুকনদীর দিকে। সকলেরই হাতে শাবল, কোদাল, গাঁইতি, এইসব। গিয়ে একে একে নামল সবাই ঝিনুকনদীর বুকে। আর থরে থরে টেনে তুলতে লাগল ওর বুকে জমে ওঠা ময়লা আবর্জনার স্তূপ। বুক যত হালকা হতে লাগল, ততই কলকল করে হেসে উঠতে লাগল ঝিনুকনদীও। এই হাসিটা কেবলমাত্র কবি নন, শুনতে পেল আর সকলেও। শুনে সবার মনেও অপূর্ব এক আনন্দের অনুভূতি হতে লাগল...

গাছের ডালে ডালে আর বনের আশেপাশে দর্শকরূপে হাজির থাকা পাখি, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, কাঠবেড়ালি, বা বুনো জন্তু-জানোয়াররাও এমন অপরূপ এক দৃশ্য দেখ তে পেরে বড্ড খুশি!

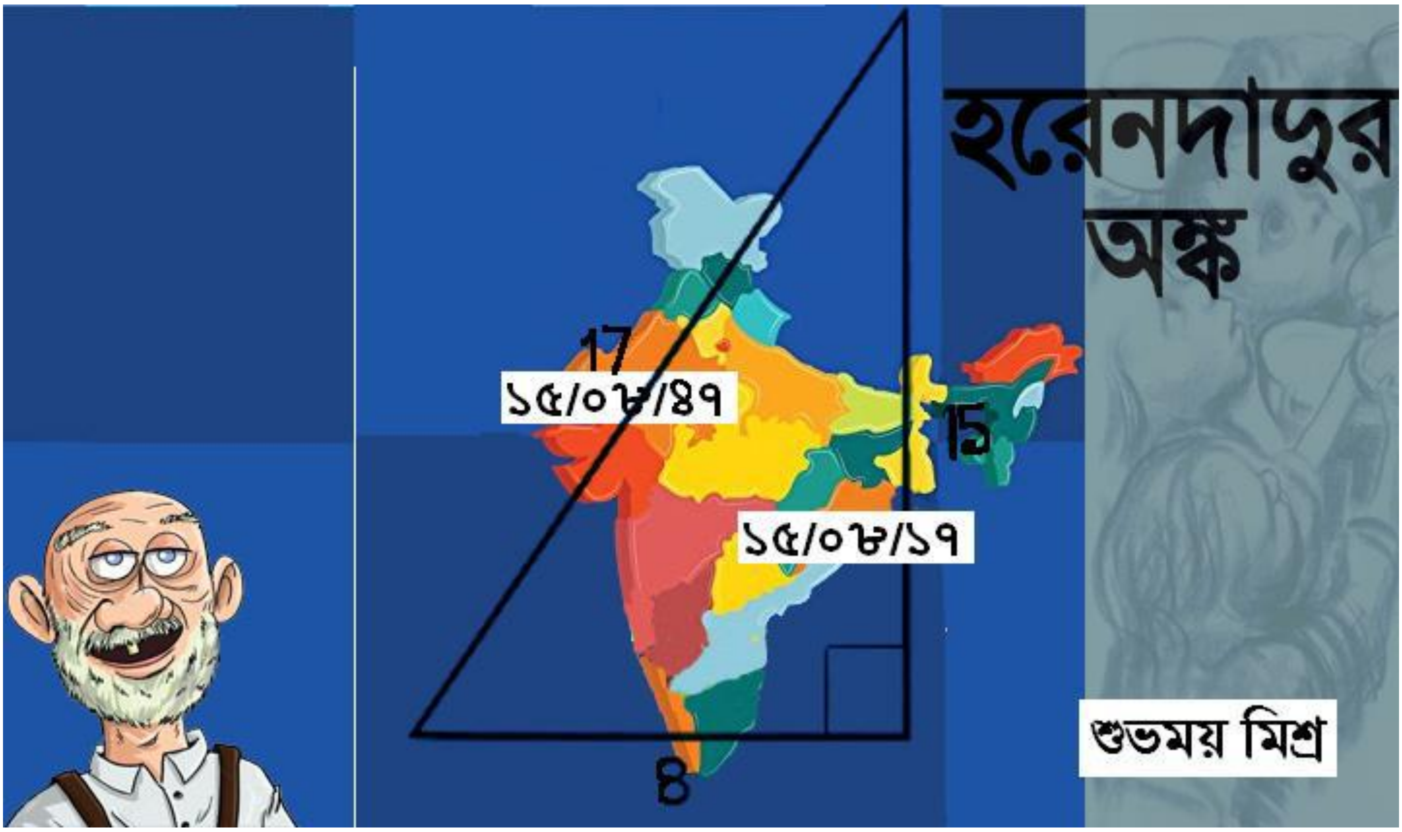

“বসে বসে এত কী ভাবছ, দাদু?”

বাড়ি থেকে বেরোতে গিয়ে রুনু দেখল, দাদু রোয়াকে অন্যমনস্ক হয়ে চুপচাপ বসে আছেন। নতুন চাকরির চাপে অন্যদিন ভালো করে কথা বলাই দায়। আজ ছুটি বলে রুনু একটু গল্প করার জন্য দাঁড়িয়ে গেল।

“কিছুই নয়, হাবিজাবি এইসব,” নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বললেন হরেনবাবু।

নব্বই ছুঁই ছুঁই হরেনবাবু চাকরি জীবনে অঙ্ক পড়াতেন। নিয়মমাফিক অবসর নেওয়ার পরেও পড়াশুনো নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, সঙ্গে ছিল সমাজসেবা। ইদানিং শারীরিক কারণে ছোটাছুটি একেবারেই বন্ধ, কিন্তু ভাবনাচিন্তার পরিধিতে অঙ্ক, দেশ, শিক্ষা, সমাজ সব আছে। বরাবর বিশ্বাস করে এসেছেন সে আমলের দুটো বিখ্যাত কথায় – ‘শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ’ আর ‘শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড’। সেই বিশ্বাস ঘিরেই হরেনবাবুর বেড়ে ওঠা থেকে বুড়ো হওয়া; অনেক আশার শুরু, অনেক আশাভঙ্গ। তাই তো স্বাধীনতা দিবসে সকাল সকাল বাড়ির রোয়াকে এসে বসেছেন। সামনের রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন স্কুলের প্রসেশনগুলো যাবে, উৎসাহে ভরপুর ছাত্রছাত্রীরা ‘দেশ’ নামের ধারণাটার শরিক হচ্ছে - এ তিনি দু’চোখ ভরে দেখবেন।

কিন্তু একটা চিন্তা হরেনবাবুকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অনেকদিন আগে তাঁর মতো কিছু লোকের উদ্যোগে শুরু হওয়া বস্তির বাচ্চাদের একটা স্কুল এখন বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। যতদিন পেরেছেন নিজে তদ্বির-তদারক করেছেন; তারপরেও খবরাখবর রাখতেন। শেষ খবর পেয়েছেন, টাকাপয়সার সংস্থান হচ্ছে না, হাল ধরারও কেউ নেই। স্বাধীনতা দিবসে বেশি করে মনে পড়ছে বাচ্চাগুলোর মুখ, আর নিরুপায় হয়ে আরেকটা আশাভঙ্গের যন্ত্রণা সইছেন তিনি। দীর্ঘ জীবনে হরেনবাবু বারবার লক্ষ করেছেন, ভেঙে যাওয়া আশার মধ্যে থেকেই নতুন স্বপ্ন জন্ম নেয় ফিনিক্স পাখির মতো। তাই আশার একটা ক্ষীণ আলো নিয়ে এখনও তিনি নাড়াচাড়া করছেন মনের মধ্যে।

“বসে বসে এত ভাবার কী আছে! আজ তোমার কষার মতো অঙ্ক নেই নাকি!” রুনু জানে দাদুর সঙ্গে অঙ্ক নিয়ে কথা শুরু করাটাই ভালো।

টোপটা কাজে লেগে গেল।

“অঙ্কই তো করছিলাম। আমাদের স্বাধীনতা দিবসের ভেতর কত অঙ্ক আছে, ভেবেছিস কখনও?”

“সে তো রাজনীতির অঙ্ক, আমাদের অঙ্কের বাইরে।”

“দূর বোকা, অঙ্কের বাইরে কিছু হয় নাকি! আচ্ছা, এক এক করে বল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় কবে?”

“সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট।”

“সাতচল্লিশ সংখ্যাটা শুনে কী মাথায় আসে তোর?”

“একটা প্রাইম নাম্বার। ওকে অন্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না।”

“তার মানে ভারতকেও ভাগ করা যাবে না। স্রেফ প্রাইম?”

“সেফ প্রাইম। কারণ তেইশের দু’গুণ করে এক যোগ করলে সাতচল্লিশ হয়, তেইশও প্রাইম নাম্বার।”

“তাই হাজারটা সমস্যার মধ্যেও দেশটা ‘সেফলি’ এগোচ্ছে। আর বল।”

“সাতচল্লিশ লুকাস সিরিজে আছে।”

“লুকাস মানে কী?”

“গ্রীক ভাষায় লুকাস মানে যে সৌন্দর্য, আলো আর ভালোবাসা নিয়ে আসে।”

“ভারতও দুনিয়াকে আলো দেখাবে, দেখিস। সাতচল্লিশ ক্যারল নাম্বারও বটে। ক্যারল মানে আনন্দে ভরা, বন্ধুত্বে ভরা। বুঝে দেখ বছরটার মহিমা!”

“বুঝলাম।”

“তোদের ধৈর্য্য এত কম কেন বুঝি না! শুরুতেই শুধু সাল থেকে সব বুঝে গেলি! দিনটা দেখলি না, পনেরো তারিখ!”

“বল, তুমি তো না বলে ছাড়বে না!”

কথায় বিরক্তি দেখালেও রুনু আলোচনাটা চালিয়ে যেতে চায়। দাদুর সঙ্গে আড্ডাতেও অনেক শেখার জিনিস থাকে।

হরেনবাবুও ছদ্মরাগ দেখিয়ে বলেন, “এই বুড়োটা বকবক করবে আর তুই মজা লুটবি! তোকেই বলতে হবে।”

“কে বকবক করছে, তা দেখাই যাচ্ছে।”

“বকবকানি দেখা যায় না, শুনতে হয়।”

“ঠিক আছে, বলছি। পনেরো ট্রায়াঙ্গুলার নাম্বার। একটা লাইনে পাঁচটা ফুটকি দিয়ে শুরু করে তার ওপরে চারটে, তারপর তিনটে, দুটো একেবারে মাথায় একটা, মোট পনেরোটা ফুটকি দিয়ে একটা সমবাহু ত্রিভুজ তৈরি হবে।”

“তার মানে তিল তিল করে গড়ে ওঠা দেশে রোটি, কপড়া আর মকানে সবার সমান অধিকার।”

“মুন সাইন থিওরি মেনে পনেরো একটা সুপার সিঙ্গুলার প্রাইম নাম্বার, সাতচল্লিশও তাই ছিল।”

“তবে দেখ, সাল তারিখ সবই সুপার সিঙ্গুলার। ভারতের একমেবাদ্বিতীয়ম হওয়া আটকায় সাধ্যি কার!

“তা বটে। কিন্তু চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধতা বা শান্তি কই? হানাহানি তো লেগেই আছে।”

“আহ্, সুপার সিঙ্গুলার হতে গেলে স্পোরাডিক গ্রুপ, মনস্টার গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে তো! তাই একটু আধটু ওসব হবে।”

“ভালো, সব ভালো! এরপরে বলবে ফসফরাসের অ্যাটমিক নাম্বার পনেরো, তাই ভারত অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করবে।”

“তোর সন্দেহ আছে? কেমিস্ট্রির কথা যখন তুললি, পিরিয়ডিক টেবিলে গ্রুপ ফিফটিন কী বল তো?”

“নাইট্রোজেন।”

“বাতাসে সবথেকে বেশি থাকে। একদিন ভারতের গরিমাও সবচেয়ে বেশি হবে।”

“বুঝেছি, পনেরো আর সাতচল্লিশে ভর করে ভারতবর্ষ আকাশ ছোঁবে!”

“মাঝের আটটাকে বাদ দিচ্ছিস কেন?”

“বাদ দিলে তুমি ছাড়বে? ওটা একটা পারফেক্ট পাওয়ার নাম্বার, কম্পোজিট নাম্বারও বটে।”

“বুঝলি তো, ভারত অনেকরকম জাতিধর্মের কম্পোজিশানের মধ্যেও পারফেক্ট পাওয়ার হবে।”

“রক্ষে কর, অনেক হয়েছে।”

“আগের বার কেমিস্ট্রির কথা তুই তুলেছিলি। এবার আমি বলি, কার্বনের আটটা ন্যাচারাল অ্যালোট্রোপ আছে। ভারতেরও বহুরকম রূপ থাকবে কিন্ত ভেতরে ভেতরে সব এক।”

“উফ্!”

“হাঁফিয়ে গেলি? একটু অক্সিজেন নে। অক্সিজেনের অ্যাটমিক নাম্বার আট। ভারত দুনিয়াকে অক্সিজেন, মানে বাঁচার রসদ যোগাবে।”

“আমার তো আট বললে মাকড়সা বা অক্টোপাসের কথা মনে পড়ে। অষ্টচরণ ষোলো হাঁটু নিয়ে দেশটা জেরবার হয়ে যাচ্ছে; সমস্যার শুঁড় চারদিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। আচ্ছা মেনে নিলাম, পনেরো-আট-সাতচল্লিশ-এ স্বাধীনতা পেয়েছে বলে ‘ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে’। কিন্তু কবে?”

“এই এক মস্ত দোষ তোদের। ভালো জিনিস ছেড়ে খারাপটা আগে দেখিস।”

“সাদা চোখে প্রতিদিন যা দেখছি, তাই বলছি।”

“দেখারও চোখ লাগে রে! একটু অপেক্ষা কর, এইবার সব হবে।”

“সত্তর বছর পেরিয়ে গেল, আরও কতদিন লাগবে?”

হরেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ থেকে মনে মনে কী অঙ্ক করলেন কে জানে। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন, “আজকের তারিখ কত?”

“পনেরোই আগস্ট।”

“পুরোটা বল।”

“পনেরো-আট-সতেরো।”

“সংখ্যা তিনটে একটা পিথাগোরিয়ান ট্রিপল কি না?”

আটের স্কোয়ার আর পনেরোর স্কোয়ার যোগ করলে সতেরোর স্কোয়ারই হয় বটে। এই হিসেবটা বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে প্রথম হিসেব করেছে জানা নেই, কিন্তু তাঁর উদ্দেশে হ্যাটস অফ করেছে রুনু।

“সংখ্যা তিনটে একেবারে প্রিমিটিভ পিথাগোরিয়ান ট্রিপল, খেয়াল করেছিস?”

“তাই দেশটাও প্রিমিটিভ এজে রয়ে গেল।”

বলল বটে, কিন্তু অবাক হল রুনু। সত্যিই তো আট, পনেরো আর সতেরোর কোনও কমন ফ্যাক্টর নেই। বিস্ময়ে রুনুর মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেছিল বোধহয়।

“মুখ বন্ধ কর। প্রিমিটিভ কথাটার কি একটাই মানে? প্রিমিটিভ মানে প্রাচীনও হয়, মৌলিকও হয়। দেশটার মধ্যে কতরকম মৌলিকতা আছে বল তো।”

“শেষ হল তোমার অঙ্কের প্যাঁচ?”

“একটু বাকি। এই ট্রিপলের সবচেয়ে ছোটো সংখ্যা আট একটা জোড় সংখ্যা। তার মানে এই ট্রিপলেটটা প্লেটোনিক সিকোয়েন্সে আছে। ভারত প্লেটোনিক ভালোবাসায় বিশ্বাসী।”

“মানেটা কী দাঁড়াল?”

“মানে এই তোদের মতো হতাশাবাদীদের হতাশ করে ভারতবর্ষ হু হু করে এগোবে। এত অঙ্কযোগ আগে কখনও হয়নি।”

“সত্তর বছরটা কম সময় নয় দাদু। এতদিন কিছুই হল না, আজ হঠাৎ করে সব বদলে যাবে?”

“নয় তো কী! এই পিথাগোরিয়ান ট্রিপল নিয়ে ফার্মা’স লাস্ট থিওরেম-এর সমাধান হতে কতদিন লেগেছে! বইয়ের মার্জিনে ফার্মার লেখা ছোট্ট একটা মন্তব্য অঙ্কের দুনিয়াকে সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে নাকানি-চোবানি খাইয়েছে। বহুবার সমস্যাটার সমাধান পাওয়া গেছে বলে হৈচৈ হয়েছে। কিন্তু সে সমাধানের মধ্যেকার গোলমাল কিছুদিন পরেই ধরা পড়েছে।

“মিলেনিয়াম প্রবলেম কি আর সাধে বলে!”

“তাই বলছি, একটু অপেক্ষা কর। তোদেরও এই ‘হল না, হচ্ছে না’ ভুল প্রমাণ হবে একদিন। লাস্ট থিওরেম-এর সমাধান খুঁজতে গিয়ে অঙ্ক নতুন করে অনেক ডালপালা ছড়িয়েছে। ভারতের ভালোমন্দ খুঁজতে গিয়ে অনেক নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেশটাকে দেখতে পাবি।”

“তুমি এবার চুপ করবে! আমাকে বাজার যেতে দাও।”

“চুপ করব, যদি তুই আমার একটা কাজ করে দিস। রবির দোকানে বলা আছে, কেক, লাড্ডু, ডিমসেদ্ধ দিয়ে পঞ্চাশটা ঠোঙা বানিয়ে রাখবে। ঠোঙাগুলো তুই তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিবি আজাদ কলোনির বাচ্চাদের স্কুলে।”

“দেখছি।”

“দেখছি নয়, তোকে করতেই হবে। বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো বস্তির বাচ্চাগুলো স্বাধীনতা দিবসের নাম করে একদিন তো একটু আনন্দ করুক! এই সামান্য জিনিসের জন্য বাচ্চাগুলোর মুখের হাসিটা দেখবি শুধু। ওদের ওই বিশাল আনন্দকে ছোট্ট হাসি দিয়ে বুঝতে গেলে লগারিদম ছাড়া উপায় নেই রে, দাদুভাই।”

তারপরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আপনমনে বিড়বিড় করে বললেন, “আর বোধহয় স্কুলটা চলবে না। বাচ্চাগুলো একটু পড়াশুনোর সুযোগও হারাবে। হয়তো এদেরই কেউ বড়ো হয়ে একটা পেট ভরানোর কল বানাত বা যুদ্ধ বন্ধ করার উপায় বার করত।”

রুনু দাদুকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, “তোমাকে ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। স্কুলের জন্য টাকাপয়সার জোগাড়ের চেষ্টা আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে করছি, কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। আর শুনে রাখো, আজ রাত্রে ওখানে বাচ্চাদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাত, ডাল, মাংস, চাটনি, রসগোল্লা - এই হল মেনু।”

শুনে আনন্দ হলেও বাস্তব অঙ্কটা ভেবে প্রশ্ন করলেন হরেনবাবু, “এত খরচ, পয়সা আসছে কোথা থেকে?”

“চাকরি পাওয়ার আনন্দে খরচ আমি দিচ্ছি। তোমারই নাতি তো।”

ভালো কিছু করার আনন্দ প্রকাশ হয়ে পড়ল রুনুর কথায়। বলছি বলব করেও দাদুকে বলা হয়ে ওঠেনি এতদিন। একটা রিক্সা করে দাদুকে আজাদ কলোনি থেকে ঘুরিয়ে আনার কথাও ভাবল রুনু।

বলিরেখায় ভর্তি হরেনবাবুর মুখটা চকচক করে উঠল খুশিতে। অনেক ভাঙাগড়া দেখতে অভ্যস্ত ঘোলাটে চোখদুটো ঝিকিয়ে উঠল। ব্যাটা চুপে চুপে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো অভ্যেস করে ফেলেছে! কী বলবেন ঠিক করে উঠতে না পেরে চুপ করে বসে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন, ভালো কাজগুলো সব ডিসক্রিট ফাংশন। ঠিক মতো ইন্টিগ্রেট করতে পারলে দেশের একমেবাদ্বিতীয়ম হওয়া আটকাবে না। আর নতুন করে আবার বুঝলেন, আশা একটা পজিটিভ কন্টিনিউয়াস ফাংশন, কখনও কখনও ট্রেন্ডস টু জিরো হলেও নন রিটার্ন টু জিরো।

অপর্ণা গাঙ্গুলী

এক রাক্ষস। তার মনে ভারী দু:খ। কারণ, তার কোনো বন্ধু নেই। অথচ সে সবার সাথে বন্ধুত্ব করতে ভালবাসে। পারলে, এর ওর দিকে তাকিয়ে হাসে, কথা কয়। কিন্তু বনের সব্বাই মায় বাঘ সিংহগুলো পর্য্যন্ত 'ভাগ ভাগ ওই বুঝি রাক্ষস এলো, ধরল,' বলে ছুটে পালায়।

তা রাক্ষস আর কী করে। মনের দু:খে গাছের ফলমূল পেড়ে খায় আর চুপ করে একটা বড় টিলার উপর বসে বসে গুন গুন করে। দু:খের গান। সেই বনে গাছ কাটা বারণ, তাই গাছের পাতা ডাল যা ভেঙে পড়ে থাকে, তাই কুড়িয়ে নিয়ে যায় কুড়ানির দল। পুরুষ, নারী আর তাদের ছেলেমেয়েরা সব এক সুরে কেমন গান গায়। রাক্ষস একদিন হেঁড়ে গলায় তাদের সাথে গলা মেলাতে চেষ্টা করেছিল। আর তাই শুনে তাদের সে কি হাসি। হা হা হো হো করে হাসতে হাসতে সব্বাই মিলে ছুট লাগিয়েছিল বনের বাইরে হুই সে তিনমুখো পাহাড়ের তলে, যেথায় তাদের ডেরা, সেই দিকেই। লজ্জায় আর রাক্ষস কোনদিন গান গায়নি। তাই তো বলি, কোনভাবেই সুবিধে করতে পারে না

রাক্ষস, বন্ধুত্ব করতে পারে না কারও সাথেই। মনমরা রাক্ষস একটা গুহার ভেতর থাকে, আর গাছের ডাল দিয়ে তৈরী একটা বিকট রকমের বাজনা বাজায়, মন খুব খারাপ হলে।

সেই সব শুনে কাঠবেড়ালিরা লেজ তলে পুটুরপাটুর তাকিয়ে দে হাওয়া। বুলবুলি গুহার সামনের গাছের ডালে দোল খায়, শিস দেয়, তবে যেই রাক্ষস তার সেই ভয়ংকর বাজনা বাজিয়ে বুলবুলিকে খুশি করতে চায়, মনে ভাবে, বুলবুলি খুশি হলেই তার বন্ধু হয়ে যাবে, অমনি বুলবুলি ফুরুত। এমন কি সেই বদমেজাজি লেজ মোটা লাল রঙা শেয়ালটা যে বনের অন্য সমস্ত পশুর সাথে ঝগড়া করে বেড়ায়, সে পর্যন্ত ওই রাক্ষসটার ধারেপাশে আসতে চায় না। কেবল ইয়া বড় জিভ বের করে দূর থেকে দেখে আর লেজ উঁচিয়ে ছুট লাগায় নিজের গর্তের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সবাই যে এত ভয় পায় ওই রাক্ষসকে, রাক্ষস তো কাউকেই ভয় দেখায় না, দেখাতে চায় না। সে শুধু ভালবাসতে চায় ওদের সকলকেই, কাছে টানতে চায়, বন্ধুত্বের বন্ধনে জড়িয়ে ধরতে চায় সব পশু, পক্ষী, মানুষজনকেই।

শুধু গাছদের সাথে এখন বন্ধুতা রাক্ষসটার। কদম গাছ কদম ফুল ফেলে তার গায়ে, হলুদ নরম ফুল রাক্ষস তার কানে, মাথায় গোঁজে, সাজগোজ করে, আর সব্বার হাসির খোরাক হয় বেচারা। আম গাছ জাম গাছ কাছে গেলেই ফল ফেলে দেয় এত্ত, রাক্ষস দু'হাত ভরে খায় আর গাছেদের চুমো দেয়, দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাদের। সেদিন কী হল, একদল গাছ কাটিয়ে এলো ইয়া বড় বড় যন্ত্র নিয়ে গাছ কাটবে বলে। আর রাক্ষস জানতে পেরেই হুমকার দিয়ে এক লাফে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে, 'কে রে, কার এত সাহস, আমার গাছ বন্ধুদের ক্ষতি করে? তোমরা কি জানো না, গাছ কাটা মানা, গাছ কাটলে পৃথিবীর ক্ষতি হয়, গরম বাড়ে, বৃষ্টি পড়ে না একদম? আর তাই থেকে সমস্ত প্রাণীজগতের কি ভীষণ ক্ষতি হয় ?' সেই কথাগুলো রাক্ষস মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে, মেঘের মত গর্জন করে করে বলতে লাগলো সেই গাছ কাঠুরেদের। সব্বাই তার পাহাড়ের মত চেহারা দেখে, যে যার যন্ত্র-টন্ত্র ফেলে দিয়ে কিনা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলে।

আর গাছেরা খুব খুশি হলো। তারা পাতায় পাতায় এ ওকে জানিয়ে দিল দয়ালু বন্ধু রাক্ষসের কথা। বাতাস, খুব আনন্দ করে খেলে গেল গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায়, আর কেমন সঙ্গীত খেলে গেল চারিভিতে। নদীর জলে, ঝর্ণার নুড়ি পাথরে লাগা সঙ্গীতে, পাতার মর্মরে, এখানে, ওখানে, সেখানে। রাক্ষস তো বেজায় খুশি হয়ে 'জিঙ্গা লালা' নাচ করে ফেলল খানিকটা। আর তার সাথে মাথা দোলাতে লাগলো সব গাছগুলো। তাই দেখে জন্তুরা পশু পক্ষিরা আর থাকতে পারে? তারাও বুঝেছে, এই রাক্ষস আমাদের বন্ধু। চেহারা বিকট আর ভীষণ হলে কী হবে, ওর মন, সত্যিই ভালো।
তখন বাঘ সিংহ শেয়াল কুমীর হাতি আরো যত যত বন্ধু আছে সব্বাই এসে হাত মেলাল আর বন্ধু হয়ে গেল সেই রাক্ষসের। আচ্ছা বাকিদের নাম আমি বলছি না। তোমরাই বরং এঁকে ফেল, আর লিখে ফেল তাদের নাম তোমাদের খাতায়, কেমন ? কী কী পাখি এলো বল তো? সব সব। অমনি করে একে একে প্রতিটি পাখির নাম লেখ আর এঁকে ফেল দেখি ; সেই পাখিদের রং দিতে ভুলো না কিন্তু। কারণ রাক্ষসের সাথে বন্ধুত্ব করে তাদের মন কী ভীষণ ভালো, কি ভীষণ রঙিন হয়ে গেল, তোমরা তো জানই। তিনমুখো পাহাড়ের কাছে থাকা মানুষরা তখন বুঝে গেল, কি ভালই না রাক্ষস। তারা সব্বাই এসে ভারী নাচাগানা জুড়ে দিল রাক্ষসকে ঘিরে।

গাছ বাঁচানো যে খুব বড় কাজ, তা কে না জানে? আর সেই রাক্ষসটার আর তার চেহারা নিয়ে কোনো কষ্ট রইলো না। সবাই বুঝল, সক্কলে জানল, চেহারাই সব নয়। ওর মনের ভেতরটা কী যে ভালো আর কত্ত যে সুন্দর! সে অমনি হেসে গেয়ে খেয়ে মেখে সবার সঙ্গে আনন্দে দিন কাটাতে লাগল। আর ঝকঝকে দু পাটি দাঁত মেলে কেবলি হাসতে লাগল।
কই, কেমন সে? আঁকো তো দেখি সেই রাক্ষসকে, যে যেমন পারো!

অলঙ্করণঃ ইন্দ্রশেখর

আর কিছুক্ষণ

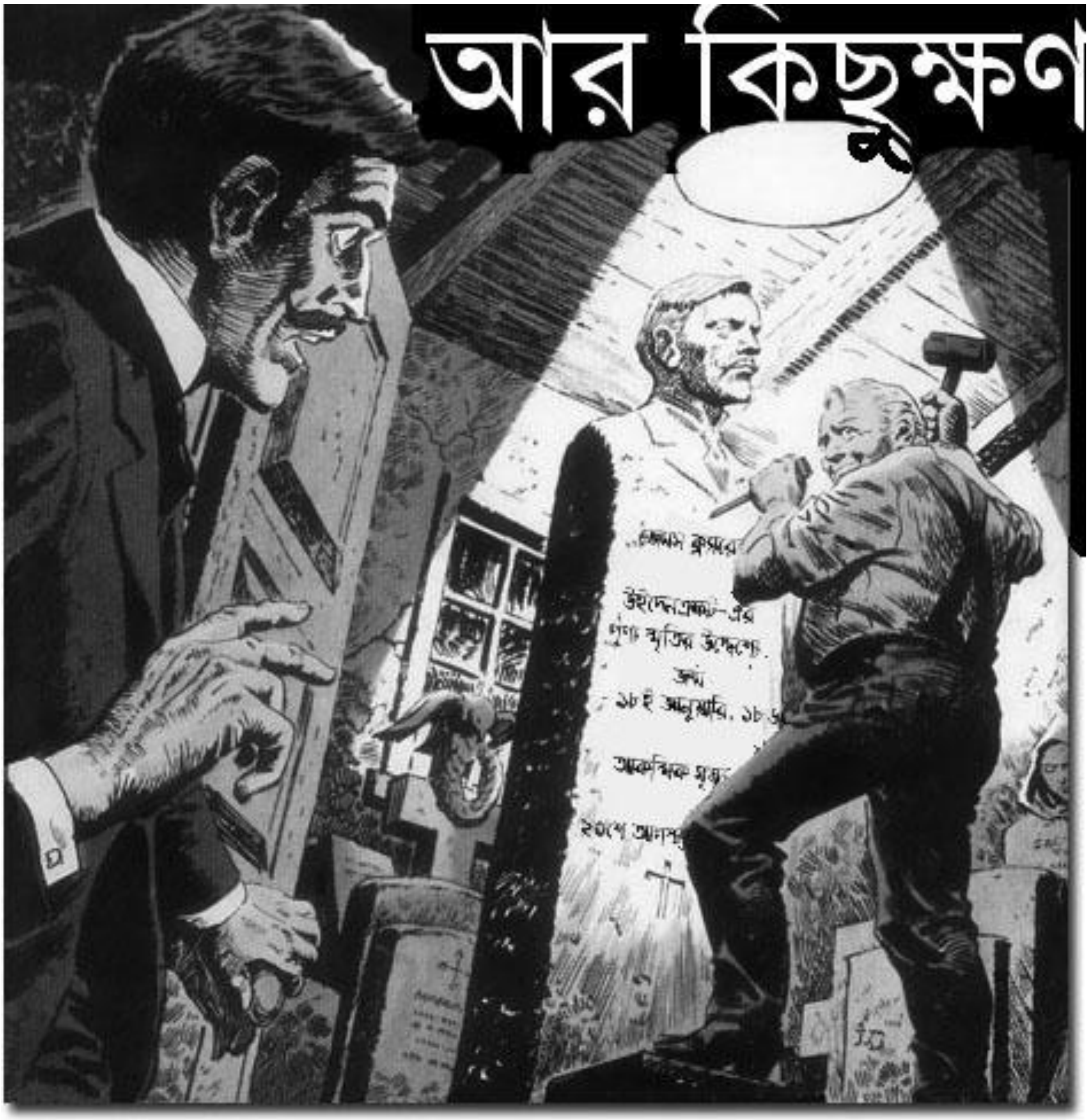

অমিত দেবনাথ

ফেনিস্টন রোড, ক্ল্যাপহাম।
২০ শে আগস্ট, ১৯০-

আজকের দিনটা, আমার মনে হয় আমার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিন। কাজেই সবকিছু ঠিকঠাক মনে থাকতে থাকতেই আমি যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে ব্যাপারটা লিখে রাখতে চাই।

তার আগে বলে নিই, আমার নাম জেমস ক্ল্যারেন্স উইদেনক্রফট, বয়স চল্লিশ বছর, শরীর এতই ভাল যে একদিনের জন্যও অসুস্থ হয়েছি বলে মনে পড়ে না। পেশা ছবি আঁকা। বিরাট কিছু সফল আর্টিস্ট না হলেও যা রোজগার করি, তাতে আমার মোটামুটি চলে যায়।

আমার আত্মীয় বলতে ছিল এক বোন, সে মারা গেছে পাঁচ বছর আগে, কাজেই আমি এখন একা এবং স্বাধীন। আজ সকাল ন'টা নাগাদ আমি ব্রেকফাস্ট করেছি, তারপর খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে পাইপ ধরিয়েছি এই আশা নিয়ে যে এবার খানিকক্ষণ চিন্তাভাবনা করা যাক, যাতে পেনসিল স্কেচের একটা সাবজেক্ট বের করা যায়।

ঘরের জানলা দরজা খোলা থাকলেও প্রচণ্ড গরম লাগছিল। যখন আমি সবে ভাবতে শুরু করেছি যে নাঃ, এইবার বরং কাছাকাছি সুইমিং পুলে গিয়ে ডুব দেওয়া যাক, তখনই মাথায় আইডিয়াটা এল। আমি আঁকতে শুরু করলাম। এতই মগ্ন হয়ে গেছিলাম কাজটায় যে দুপুরের খাবারটাও খাওয়া হয়নি। যখন সেন্ট জুডেসের ঘড়িটায় বিকেল চারটের ঘন্টা বাজছে, তখন কাজ শেষ হল।

কাজটা যদিও পেনসিল স্কেচ, এবং দ্রুতগতিতে করা, তবুও আমার মনে হল যে এটাই বোধহয় আমার সেরা কাজ। এতে দেখা যাচ্ছে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে একজন আসামী, যাকে এক্ষুনি জজসাহেব ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। লোকটা মোটা – খুব মোটা। এতই মোটা যে তার থুতনি থেকে মাংস ঝুলে পড়ছে, ঘাড়ে চর্বির কয়েকটা থাক হয়ে গেছে। পরিষ্কার কামানো মুখ (মানে, আমি বলতে চাইছি যে কয়েকদিন আগেও ওর মুখ পরিষ্কারভাবে কামানোই ছিল) এবং মাথার প্রায় পুরোটাই টাক। লোকটা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, মোটা মোটা আঙুল দিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে এর রেলিঙটাকে, তাকিয়ে আছে সোজা সামনের দিকে। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, সে শুধু ভয়ই পাননি, একেবারে ভেঙে পড়েছে। এই মাংসের পাহাড়কে ধরে রাখতে পারে, এমন কোনও জোরই লোকটার গায়ে আর নেই।

ছবিটা গোল করে পাকিয়ে, কোনও কারণ ছাড়াই আমি সেটা পকেটে রেখে দিলাম।তারপর, কোনও দারুণ ভাল কাজ করে ফেললে যেরকম আনন্দ হয়, যদিও এই অনুভূতিটা খুব কমই আসে, সেই রকম ফুর্তির মেজাজে আমি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে।

আমার ধারণা, আমার তখন বোধহয় মনে মনে ট্রেনটনের সঙ্গে একটু আড্ডা মারার ইচ্ছে জেগে উঠেছিল, কারণ আমি তখন লিটন স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে শুরু করে ডান দিকে ঘুরে গিলক্রিস্ট রোড হয়ে পাহাড়তলিতে চলে এসেছিলাম, যেখানে নতুন ট্রাম লাইন বসানোর কাজ চলছিল।

তারপর যে আমি কী করেছিলাম, মনে নেই। শুধু মনে আছে, মারাত্মক গরম লাগছিল, ধুলো ভরা পিচরাস্তা থেকে এমন গরম উঠছিল যে মনে হচ্ছিল সেই গরমকে ছোঁয়া যাবে। পশ্চিম আকাশে জমে ওঠা ধূসর রঙের মেঘ দেখে আমি ভাবছিলাম কখন বৃষ্টি নামবে।

আমি বোধহয় মাইল পাঁচ-ছয় হেঁটে ফেলেছিলাম, চমক ভাঙাল একটা ছেলে আমার কাছে সময় জিজ্ঞেস করে। ঘড়িতে তখন সাতটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি।

ছেলেটা চলে যাওয়ার পর আমি বুঝতে চাইলাম, আমি কোথায় আছি। দেখলাম, আমি একটা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, ভেতরে উঠোন, শুকনো মাটি, আর অনেক ফুলগাছ – বেগুনি আর লাল জেরানিয়াম ফুটে আছে তাতে। ঢোকার মুখে একটা বোর্ড – তাতে লেখাঃ

চার্লস অ্যাটকিনসন
বিলিতি আর ইতালিয়ান মার্বেলের
স্মারক তৈরি করা হয়

ভেতর থেকে ছেনি হাতুড়ির আওয়াজ ভেসে আসছিল, আর তার সঙ্গে একটা শিস দেওয়ার আওয়াজ।

কেন জানি না, আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম, আমার দিকে পিঠ করে কেউ একজন একটা অদ্ভুত শির তোলা মার্বেল নিয়ে কাজ করছে। আমার আওয়াজ পেয়ে সে ফিরে তাকাল।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এটা সেই লোকটা, যার ছবি আমি এঁকেছিলাম, যার ছবি এখন আমার পকেটে।

বসে আছে লোকটা, বিশাল চেহারা, হাতির মতন, কপাল থেকে গড়িয়ে পড়া ঘাম মুছে নিচ্ছে একটা লাল রুমাল দিয়ে। অবিকল সেই চেহারা, কিন্তু চোখমুখের হাবভাব একেবারে আলাদা।

লোকটা একগাল হেসে হ্যান্ডশেক করল আমার সঙ্গে, যেন আমরা কতকালের বন্ধু।

আমি মার্জনা চাইলাম, বিনা অনুমতিতে ভেতরে ঢোকার জন্য। বললাম, 'বাইরে এমন গরম না! ভেতরটা তো মরুদ্যান মনে হচ্ছে মশাই!'

'মরুদ্যান! সেটা কী জিনিস!' বলল লোকটা, 'তবে সত্যিই আজ গরম পড়েছে। দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না!' লোকটা একটা পাথর দেখিয়ে দিল, গোরস্থানের পাথর, যেটার ওপর বসে সে এতক্ষণ কাজ করছিল। আমি বসলাম।

'যে পাথরটা নিয়ে কাজ করছেন, সেটা কিন্তু দারুণ!' আমি বললাম।

লোকটা মাথা নাড়ল। 'তা বলতে পারেন, তবে একটা পিঠ দারুণ মসৃণ হলেও অন্য দিকটায় বড়সড় খুঁত আছে, আপনি বোধহয় খেয়াল করেননি। এরকম মার্বেল দিয়ে খুব ভাল কাজ করা যায় না। গরমকালে ঠিক আছে। তবে শীতটা আসতে দিন, বরফ পড়লে এই পাথরই কথা বলবে।'

'খুব ভাল কাজ যদি না-ই করা যায়, তবে এখন এটা দিয়ে কি করছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি যদি বলি প্রদর্শনীর জন্য, আপনি বিশ্বাস করবেন না, তবে আসলে কিন্তু তাই। সবাই কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখাতে চায়, সে মুদির দোকানিই হোক, আর মাংসওয়ালা। আর এই পাথরগুলো কবরের ওপরেই বসানো হয়, জানেনই তো।'

তবে দেখলাম, লোকটা মার্বেলের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। গড়গড় করে সে বলে যাচ্ছিল, কোন পাথর ঝড়বৃষ্টি প্রতিরোধ করে, কোন পাথরে কাজ করে আরাম। তারপর বলা শুরু করল তার বাগান আর নতুন কেনা ফুলের গাছ নিয়ে। প্রতি কথার শেষেই সে হাতের ছেনিটা ঠুকছিল, ঘাম মুছছিল কপাল থেকে আর গাল পাড়ছিল এই অসহ্য গরমকে।

আমি যদিও কথা বলছিলাম খুব কমই। আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। এই লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়াটাই কেমন ভূতুড়ে ব্যাপার মনে হচ্ছিল। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে এর সঙ্গে কোনও না কোনওখানে আমার নির্ঘাত দেখা হয়েছিল, এমন কোথাও, যে আমি মনে করতে পারছি না, কিন্তু আমি এটাও বুঝতে পারছিলাম মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, এ লোকটাকে আমি কোনদিনও দেখিনি।

শেষ পর্যন্ত মিঃ অ্যাটকিনসন তাঁর কাজ শেষ করলেন, মাটিতে থুতু ফেলে উঠে দাঁড়ালেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

'দেখুন দেখি কেমন হল!' বললেন তিনি, গলায় একটা গর্বের সুর। এতক্ষনে আমি পুরো খোদাই করা লেখাটা দেখতে পেলাম –

জেমস ক্ল্যারেন্স উইদেনক্রফট
-এর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে
জন্ম–১৮ই জানুয়ারি, ১৮৬০
আকস্মিক মৃত্যু-২০শে আগস্ট,
১৯০-

'জীবনটা এই রকমই মশাই, যখন বেঁচে থাকার কথা, তখনই চলে যেতে হয়!'

বেশ কিছুক্ষণ আমি কথা বলতে পারি নি। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে যাচ্ছিল আমার। তারপর আমি লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে নামটা কোথায় পেয়েছে।

'কোথায়ই না', বললেন মিঃ অ্যাটকিনসন। 'আমার একটা নাম দরকার ছিল, মাথায় প্রথমেই যেটা এসেছে, বসিয়ে দিয়েছি। কেন বলুন তো?'

'ওটা আমার নাম।'

লোকটা বিস্ময়ে শিস দিয়ে উঠল।

'কাকতালীয় ব্যাপার, তাই না?' আমি বললাম।

'কাকতালীয় ব্যাপার! তা হবে! কিন্তু তারিখটা?'

'আমি একটা তারিখ সম্বন্ধেই বলতে পারি, ওটা সঠিক।'

'এরকম অদ্ভুত ব্যাপার আমি আর দেখিনি!' বলল লোকটা।

দেখার অবশ্য অনেক বাকি ছিল লোকটার। আমি তাকে সকালে আঁকা ছবিটার কথা বললাম এবং সেটা পকেট থেকে বার করে দেখালাম। দেখলাম, দেখতে দেখতেই লোকটার মুখের ভাব বদলে সেই ছবির লোকটার মত হয়ে যাচ্ছে।

'কি কান্ড! আর আমি গত পরশুই মারিয়াকে বললাম যে ভূত বলে কিছু নেই!' বলে উঠল লোকটা। আমাদের দুজনের কেউই অবশ্য ভূত দেখিনি, কিন্তু ও কি বলতে চাইছে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না।

'আপনি নিশ্চয়ই আমার নাম কোথাও শুনেছেন', আমি বললাম।

'আর আপনিও নিশ্চয়ই আমাকে কোথাও দেখেছিলেন, এখন আর মনে করতে পারছেন না! আচ্ছা, গত জুলাইতে কি আপনি ক্ল্যাকটন-অন-সি – তে গেছিলেন?'

ব্যাপার হল, আমি জীবনেও কখনও ক্ল্যাকটন-অন-সি – তে যাইনি। তারপর আমরা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। আমরা দুজনেই একই জিনিস দেখছিলাম, পাথরের ওপর খোদাই করা তারিখ দুটো, যার একটা সঠিক।

'ভেতরে চলুন, রাত্তিরের খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক', বললেন মিঃ অ্যাটকিনসন।

মিঃ অ্যাটকিনসনের স্ত্রী বেশ হাসিখুশি মহিলা, ছোটখাটো চেহারা, গালদুটো লাল, গ্রামদেশে থাকলে যেরকম হয়। মিঃ অ্যাটকিনসন আমাকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করালেন তাঁর একজন চিত্রকর বন্ধু হিসেবে। এর ফলটা অবশ্য বিশেষ সুবিধের হল না, কারণ স্যালাড সহযোগে সারডিন মাছ দিয়ে খাওয়া- দাওয়া সারার পরই ভদ্রমহিলা নিয়ে এলেন একখানা ডোরে বাইবেল, আর আমাকে এরপর প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে মাথা নেড়ে নেড়ে বোঝাতে হল আমার ভক্তিশ্রদ্ধার বহরটা। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, অ্যাটকিনসন সেই পাথরটার ওপর বসে বসে ধূমপান করছে। আমাদের কথাবার্তা আবার ফিরে গেল সেই জায়গায়, যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম।

'মাপ করবেন', আমি বললাম, 'কিন্তু এরকম কোনও ঘটনা কি ঘটেছে, যাতে আপনাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়?'

সে ঘাড় নাড়ল। 'না। আমি দেউলিয়া নই। আমি যা রোজগার করি, তাতে আমার ভালোই চলে যায়। বছরতিনেক আগে আমার কিছু গুরুজনকে বড়দিনে টার্কি দিয়েছিলাম। যাই হোক, আমি তো এমন কিছুই মনে করতে পারছি না।'

সে উঠে দাঁড়িয়ে একটা পাত্র নিয়ে গাছে জল দেওয়া শুরু করল। 'এই গরমে দিনে দুবার গাছে জল না দিলে চলে না। এই গরমে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা বেশ ভাল কাজ দেয়, তবে এটা আবার ফার্নগুলো সহ্য করতে পারে না। যাকগে, আপনার বাড়ি কোথায়?'

আমি ঠিকানা বললাম। এখান থেকে জোরে হাঁটলেও ঘন্টাখানেক লাগবে পৌঁছতে।

'হুম! আসুন, ব্যাপারটা ভেবে দেখা যাক', সে বলল, 'যদি আজ রাতে আপনি বাড়ি ফিরে যেতে চান, রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। একটা গাড়ি এসে দুম করে আপনাকে ধাক্কা মারল, কলার খোসা কি কমলালেবুর খোসায় পা হড়কে গেলেন, হয়ত একটা মই এসে উল্টে পড়ল মাথায়, তাই না?'

এমন অসম্ভব সম্ভাবনার কথা লোকটা বলে যাচ্ছিল সিরিয়াস মুখে, যে ঘন্টা ছয়েক আগে হলেও আমি হয়ত প্রবল হাসতাম, কিন্তু এখন আমার হাসি পেল না।

'সবচেয়ে ভাল যেটা, সেটা আপনাকে বলি', লোকটা বলল, 'আপনি রাত বারোটা অবধি এখানে থাকুন। আমরা ওপরতলায় চলে যাই, সেখানে ধূমপানও করা যাবে, আর ও জায়গাটা অনেকটা ঠান্ডাও বটে। কী, যাবেন?'

খুবই আশ্চর্যের কথা, আমি রাজি হয়ে গেলাম।

***

আমরা এখন ওপরে, ঘরের ছাঁচের নিচের একটা লম্বা নিচু ঘরে বসে আছি। অ্যাটকিনসন তার স্ত্রীকে ঘুমোতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে নিজে আমার দেওয়া একটা চুরুট খেতে খেতে একটা ছেনিতে শান দিচ্ছে। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। দেখে মনে হচ্ছে যে কোনও মুহূর্তে ঝড় উঠবে। আমি জানলার ধারের একটা নড়বড়ে টেবিলের সামনে বসে বসে এই বিবৃতি লিখছি।

পা কাঁপছে আমার। আর অ্যাটকিনসন, যাকে দেখে মনে হয়েছিল বেশ শক্তপোক্ত মানুষ, সে এমন জোরে জোরে ছেনি ঘষছে, যে মনে হচ্ছে যেন যত তাড়াতাড়ি এ ব্যাপারটা চুকে যায়, ততই মঙ্গল।

এগারোটা বেজে গেছে। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমাকে চলে যেতে হবে।

কিন্তু এই গরমটা অসহ্য লাগছে।

এটা যে কোনও লোককে পাগল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

ডব্লিউ এফ হারভে (W.F.Harvey) রচিত ‘আগস্ট হিট’ (August Heat) অবলম্বনে। প্রথম প্রকাশঃ মিডনাইট হাউস অ্যান্ড আদার টেলস (Midnight House and Other Tales), ১৯১০।

নিঁখুত অন্তর্দৃষ্টি

সোনালী ঘোষাল

জাপানের এক শান্ত, নিরুপদ্রব গ্রামে মাইকো, কিকো আর ইউরিকো নামে তিন বন্ধু বাস করত। তারা প্রায়ই একসঙ্গে চায়ের মজলিসে যোগ দিত। একদিন চা খেতে খেতে তারা তিনজনে কথাবার্তা বলছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে মাইকো জানাল, "জানো তো, আমি পাখিদের কলকাকলি শুনতে খুব ভালবাসি।" কিকো বলল, "আমি ছোট নদীর কুলকুল রবে বয়ে যাওয়ার সুরেলাধ্বনি শুনতে পছন্দ করি।" ইউরিকো শুধোল, "তোমরা কাল রাতে বাজ পড়ার হুড়মুড় শব্দ শুনতে পেয়েছিলে কী? শব্দটা ভারী চমৎকার।"

আসলে তাদের দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ ছিল বলে তারা কানে যা শুনত তাই ভালোবাসত।

মাঝে মাঝে তাদের দৃষ্টিশক্তি নিয়েও তারা আলোচনায় মেতে উঠত। একদিন মাইকো বলল, "ইদানিং আমার দৃষ্টিশক্তির অনেক উন্নতি হয়েছে।"

কিকোর সকৌতুক প্রশ্ন, "মাইকো তুমি একথা কী করে বুঝলে?"

"গতকাল সন্ধ্যায় আমি আকাশে তারা দেখেছিলাম।"

"ওহো তাই নাকি? সত্যি সত্যি দেখতে পেয়েছিলে? ঐ দূরের পাইন গাছে মা পাখি কীভাবে তার ছোট্ট ছানাকে খাবার খাওয়াচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছ?"

ইউরিকো এতক্ষণ ওদের সব কথা মনযোগ দিয়ে শুনছিল। সে বলে উঠল, কিকো! তুমি বড়াই করছ! আর মাইকো, তুমিও বড্ড বেশি বড় বড় কথা বলছ।"

"না- না কক্ষণো না!" দুজনেই একযোগে বলে উঠল।

ইউরিকো সর্বদাই তার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তার জন্য গর্ব অনুভব করত। তাই সে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, এস, বাজি ধরে দেখা যাক্ কার দৃষ্টিশক্তি সবচেয়ে তীক্ষ্ণ।"

কিকো আর মাইকো দুজনেই পণ রাখতে রাজি হল। "কিন্তু বাজিটা কী হবে?" তারা জিজ্ঞাসা করল।

“আগামীকাল খুব ভোরে পুরোহিত মহাশয় মন্দিরের প্রবেশপথে একটা খোদাই করা ফলক স্থাপন করবেন। তোমাদের মধ্যে যে সেই খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারবে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন পুরুষ বলে বিবেচিত হবে।”

মাঝরাতে সহসা দরজায় করাঘাত শুনে পুরোহিত জানতে চাইলেন “এত রাত্রে মন্দিরের পুরোহিতের কাছে কার কী প্রয়োজন?”

সেখানে উপস্থিত মাইকো বলল, “শ্রদ্ধেয় পুরোহিত, কাল উষালগ্নে আপনি দরজার সামনে যে ফলকটা স্থাপন করবেন তার উপর কী লেখা থাকবে আমাকে কী সেটা অনুগ্রহ করে জানাবেন।”

যদি তোমার এরূপ অভিপ্রায় থেকে থাকে তাহলে শোন,...... “ওহে চক্ষুদ্বয়, যা তোমার গোচরে আসবে তাই তোমার দেখা উচিত, ওহে দৃষ্টিহীন, হতাশ হয়ো না...”

“অসংখ্য ধন্যবাদ।”

অদ্ভুত ব্যাপার তো! সে আমায় পুরোটা শেষ করতেই দিল না।

ঠিক সেই সময়েই-

কেউ অনুমতি প্রার্থনা করে বলল, আমি কী ভেতরে আসতে পারি?”

“আরে কিকো এসো এসো এসো। আমি কীভাবে তোমায় সাহায্য করতে পারি?”

কিকো মাইকোর মতো একই অনুরোধ জানাল। তাই পুরোহিত পড়তে শুরু করলেন...... হতাশ হয়ো না। ঘুঘু পাখির মিষ্ট কলতানে মনযোগ দিয়ে শুনবে। নিজের ভেতরে দেখ, সেখানেই তার দেখা মিলবে,” নীলপাথরের উপরে সাদা অক্ষরে সেটাই খোদাই করা আছে।

পুরোহিতকে ধন্যবাদ ও শুভরাত্রি জানিয়ে কিকো বিদায় নিল।

“এই ছেলেটা অন্তত পুরো কবিতাটা শুনল। এবার আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি।” পুরোহিত মনে মনে ভাবল।

কিন্তু যেই সে শুতে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিক তখনই দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

উঃ না, না, আর পারা যায় না... আজকের রাতে কীসব নিয়মবিরূদ্ধ উল্টো পাল্টা ঘটনাই না ঘটছে?”

নিঃসন্দেহে সে ছিল ইউরিকো। কবিতাটা শোনার পর সে জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা! পাথরটার ওপরে আরও কিছু খোদাই করা আছে কী?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক... ঠিক... শব্দগুলোর উপর একটা শ্বেতবর্ণের ঘুঘুপাখির ছবি খোদাই করা আছে।”

পরদিন খুব ভোর ভোর তিনবন্ধু মন্দিরে উপস্থিত হল। মাইকো বলল, “দেখো, দেখো ফলকটা স্থাপন করা রয়েছে।”

“হ্যাঁ, নীলরঙের পাথরটা কী সুন্দর, তাই না?” কিকো জানাল।

ইউরিকো বলল, “তোমরা কেবল রঙটাই দেখেছ। কবিতার উপরে সুন্দর শ্বেতবর্ণের ঘুঘু পাখিটার সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছ?”

“কবিতাটা নিজেই খুব সুন্দর। আবার বোল না যেন যে আমি সেটা পড়তেই পারিনি,” কথাটা মাইকো জানাল।

খোদাই করা ফলকটা নিয়ে তিনবন্ধু তুমুল তর্কাতর্কি শুরু করে দিল। পুরোহিতমশাই দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলল, “হুঁ............ মাফ করবেন।”

মাইকো বলল, “হতাশ হয়ো না।”

কিকো বলল, “এটাই কিন্তু সবটা নয়। আমি বাকি অংশটাও পড়তে পারি।”

“কী ব্যাপার, ভদ্রমহোদয়গন?” পুরোহিত জিজ্ঞাসা করল।

“ওঃ! ফাদার!”

তারা তিনজনে পুরো ঘটনাটা বিশদে ব্যাখ্যা দেবার পরে- পুরোহিতমশাই বিনয়ের সঙ্গে জানাল, “আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তোমরা প্রত্যেকেই একটা মারাত্মক ভুল করেছ।”

“কী কী কী?” সকলে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

“তোমরা একটু বেশি সকাল সকাল এসে পড়েছে। আমি ফলকটা এখনও স্থাপন করতে পারিনি।”

তিনবন্ধু বিষন্ন বদনে কিন্তু বিচক্ষণতার সঙ্গে বাড়ির দিকে রওনা দিল।
এখন থেকে চায়ের আসরে তারা তাদের প্রকৃত শিক্ষার পাঠ নিয়ে বলতে লাগল, “ওহে চক্ষুদ্বয়! যা দেখা উচিত তাই দেখ……”

“ওহে, দৃষ্টিহীন, হতাশায় ভুগো না…”

“পাখির কলকাকলি মনপ্রান দিয়ে শ্রবণ কর। নিজের অন্তরে দিকে তাকাও সেখানে আমাকেই প্রত্যক্ষ করবে।”

বন্ধু-জাতক

নন্দিনী দাস চট্টোপাধ্যায়

সে জন্মে বুদ্ধদেব ছিলেন সিংহ।একটা বিশাল হ্রদের উত্তর দিকে ঘাসজমির মধ্যে তিনি থাকতেন।হ্রদের ঠিক উল্টো পাড়ে ছিল একটা ছেলে চিলের আস্তানা।আরেকটা মেয়ে চিল ও ছিল, তবে সে থাকত হ্রদের পশ্চিম দিকের জঙ্গলে। একদিন ছেলেটার ভারী সাধ হল মেয়েটাকে বিয়ে করে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। সে সটান মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমায় বিয়ে করবে?'

মেয়েটা মুখ ঝামটে উঠল, 'উহ্! শখ কত? তোমাকে বিয়ে করে মরি আর কি?'

'কেন? কেন? আমি কারো চেয়ে কম কীসে?' উত্তেজনায় বেচারার চোখ গোল গোল হয়ে উঠল।

'কম তো বলিনি। তবে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে।'

'কী পরীক্ষা বলো'--চিল ঘাড় ফুলিয়ে বললো।

'পরীক্ষা সে'রকম কিছু না। কাল ভোরবেলায় তুমি আমার সাথে উড়বে।'

পরদিন সুয্যিমামা আকাশের কোণায় উঁকি দিয়েছে কি দেয়নি চিল এসে ডাক দিলো চিলনীকে, 'কই গো?আমি কিন্তু এসে গেছি।'

সূর্যের নরম আলো গায়ে মেখে চিল আর চিলনী উড়ে গেলো। দেখতে দেখতে অনেক উপরে উঠে গেছে দুজনে। হ্রদ পেরিয়ে চলে এসেছে অনেক দূর। চিলনী চিলকে বলল, 'নীচে কী দেখছ?'

চিল নীচে তাকিয়ে বলতে লাগলো,'একটা ছোটো নদী,তার পাশে একটা গ্রাম বসেছে দেখছি। কিন্তু এখানে কোনো গ্রাম তো ছিল না!'

'আরো ভালো করে দেখ।'

'গ্রামে অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরিব্বাস!প্রায় সবারই সঙ্গে তির-ধনুক রয়েছে দেখছি!'

'দেখ দেখ ঐ গাছতলাটায়-'

গাছতলায় অনেক মানুষের জটলার মধ্যে চিল ঠিক দেখতে পেয়েছে আনেকখানি কাঁচামাংসের স্তূপ।চিলের চোখ চকচক করে উঠল।

'রোসো, আসছি' বলেই হঠাৎ সাঁ করে সে নেমে গেল নীচে। একটুকরো মাংস ঠোঁটে নিয়েই তাড়াতাড়ি উড়ে এলো অনেক উপরে। ইশারায় চিলনীকে বললো আরো উপরে উঠতে। কারণ গ্রামের লোকেরা তির ছুঁড়ছে। দু-একটা তো একেবারে পাখনা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত নিরাপদে হ্রদ পেরিয়ে এপারে এসে দুজনে হাঁফ ছাড়ল।

এবারে চিলনী জানাল সে চিলকে বিয়ে করতে পারে তবে তার আগে কাছাকাছি যারা থাকে তাদের সাথে ভাব করতে হবে।

চিলের কথাটা ঠিক পছন্দ হল না। এ আবার কী আবদার? বিয়ে তো করবে তারা দুজন, তার মধ্যে অন্যদের সঙ্গে ভাব করার কথা আসছে কেন?

'আরে বাবা, বন্ধু না থাকলে বিপদে আপদে আমাদের তো কেউই সাহায্য করবে না। আর বিয়েতেই বা কে আনন্দ করবে?'

অগত্যা.......

****

চিল-চিলনী এখন বেশ সুখেই আছে।হ্রদের ওই পাড়ে থাকা সিংহ,পুবদিকের লম্বা তালগাছে বাসা বেঁধে থাকা বাজপাখি--এদের সাথে চিল-চিলনীর ভারী বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।আর হ্যাঁ, আরেকজন বন্ধুও জুটেছে এদের।

হ্রদের ঠিক মাঝখানে একটা ছোটো দ্বীপ আছে।একটা কচ্ছপ মাঝে মাঝেই সেখানে রোদ পোয়াতে ওঠে।তার সঙ্গেও সবার বন্ধুত্ব হযে গেছে।এই পাঁচজন এখন দিব্যি আছে। চিল আর চিলনী এই দ্বীপেই একটা ঝাঁকড়া উঁচু কদম গাছে বাসা বেঁধেছে।

এই ভাবে দিন যায়।

একদিন চিলনী দুটো ডিম পাড়ল। অতি যত্নে তা' দিয়ে একদিন ডিম ফুটে ছোট্ট দুটো ছানা বেরোল। চিল আর চিলনী সবসময় ছানাদের পাহারা দেয়। চোখ না ফোটা ছোট্ট ছানা-যতদিন না নিজেরা উড়তে পারছে ততদিন এদের ভীষণভাবে আগলে রাখতে হয়।না হলে পদে পদে বিপদ।

****

একদিন সন্ধ্যেবেলায় চিল আর চিলনী সবে বাচ্চা দুটোকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে এমন সময় ধোঁয়ায় যেন দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগল। বাচ্চাদুটো ঘুম ভেঙে চিল-চিৎকার জুড়ে দিল। কী ব্যাপার? গাছের নীচে কি আগুন লেগেছে?

নীচে তাকিয়ে চিলজুটির তো আক্কেল গুড়ুম! দুজন লোক গাছের নীচে শুকনো পাতা জোগাড় করে আগুন জ্বালিয়েছে। চিলছানাদের চিৎকার শুনে নিচের লোকদুটোর সে কী আনন্দ!দুজনে আগুনটাকে গিরে রীতিমত নাচ শুরু করে দিয়েছে,'আজ পাখির ছানার মাংস খাব।'

আসলে হয়েছে কী, এরা গ্রাম থেকে জঙ্গলে এসেছিল শিকারের খোঁজে। অথচ এরা এখনো শিকারে তত পটু হয়ে ওঠেনি। কাজেই সারাদিন জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করেও না পশুপাখি, না মাছ কিছুই জোটেনি। এদিকে রাত হয়ে গেছে। অন্ধকারে জঙ্গল পেরিয়ে গ্রামে ফেরাও মুশকিল।সারাদিন শিকার জোটেনি তাই খাওয়াও হয়নি সেরকম। হ্রদের মধ্যিখানে এই দ্বীপে রাতটা কোনোমতে কাটিয়ে সকালে আবার শিকারের খোঁজে বেরোন যাবে এরকমই মতলব এঁটে দুজনে গাছের নীচে আগুন জ্বালিয়েছে।পাখির ছানার সাড়া পেয়ে তাই দুজনের ভারী স্ফূর্তি হয়েছে।

মশাল জ্বেলে বড় পাখিদুটোকে তাড়িয়ে দিলেই আর পায় কে? সেইমত ওরা চটপট মশাল বানাতে বসে গেল।এদিকে সব দেখেশুনে চিল-চিলনীর তো চিন্তায় মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়।এখন উপায়? চিলনী চিলকে তাড়াতাড়ি পাঠালো বাজের কাছে। চিল উড়ল হ্রদ পেরিয়ে পুবদিকের লম্বা তালগাছের দিকে।

এই অসময়ে চিলকে দেখে বাজ তো অবাক, 'এমন অসময়ে তুমি এখানে?'

'শিগগির চলো দাদা, আমাদের ভারী বিপদ!'

সব শুনে বাজ উড়লো চিলের সাথে।

ইতিমধ্যে সেই লোক দুজন মশাল জ্বালিয়ে গাছে ওঠা শুরু করেছে।বাজ হ্রদের জলে ডানা ভিজিয়ে সাঁ করে চলে এলো জ্বলন্ত মশালের ঠিক উপরে।তার ডানার ঝাপটানিতে বৃষ্টির মতো জল পড়ে মশাল নিভে গেল। যতবারই এরা মশাল জ্বালাতে যায়, ততবারই বাজ এইভাবে মশাল নিভিয়ে দেয়। চিলনী খেয়াল করল আগুনের তাপে বাজের বুকের দিকটা ঝলসে গেছে। ক্লান্ত হলেও বাজের কর্তব্যে কিন্তু কোনো খামতি নেই।

বাজের অবস্থা দেখে চিল-চিলনীর ভারী কষ্ট হল। বলল, 'তুমি এবার একটু বসো দাদা।'

'না,না চিন্তা কোরো না, আমি ঠিক আছি,' -এই বলে বাজ আবার হ্রদের দিকে উড়ল জল আনতে।

চিল এবার চললো কচ্ছপের আস্তানায়। অসময়ে চিলকে দেখে কচ্ছপ তো অবাক!

'এমন অসময়ে তুমি এখানে?'

'শিগগির চলো দাদা, আমাদের ভারী বিপদ!'

সব শুনে কচ্ছপের ছেলের রক্ত রাগে গরম হযে উঠল। সে বলল, 'বাবা, আমি যাচ্ছি বদমাশ লোকদুটোকে শায়েস্তা করতে।'

'না রে, তোর দেহটা এখনো ছোট্টোখাট্টো। ওখানে গেলে তোর বিপদ হবে। আমার এই বিশাল বপু দিয়ে ওদের কেমন হেনস্থা করি দেখ না!' বলে কচ্ছপ চলল চিলের সঙ্গে।

এদিকে লোকদুটোও ততক্ষণে হয়রান হয়ে পড়েছিল। সারাদিন না খাওয়া, না দাওয়া; তারপর যদিবা একটা সহজ শিকারেরে সন্ধান পাওয়া গেল তো বাদ সেধেছে পাজি বাজটা। কচ্ছপকে দেখে দুজনে ভাবলো এটাকেই ধরে নিয়ে গ্রামে ফেরা যাক। তাহলে মাংসও অনেকটা জুটবে আর ভালো শিকারী হিসাবে নামডাকও হবে।এই না ভেবে ওরা জংলী গাছের শিকড়-বাকড় ,লতাপাতা দিয়ে শক্ত করে দড়ি বানাল। তাই দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে

বাঁধলো কচ্ছপকে। ব্যাস,এবার গ্রামের দিকে ফিরলেই হয়।হ্রদ পেরিয়ে একবার ওপারে পৌঁছতে পারলে আর পায় কে!গাঁয়ের লোক এ খবর পেলে সবাই মিলে কচ্ছপকে টেনে হিঁচড়ে গাঁয়ে নিয়ে তুলবে।

হ্রদে নামার পর কিন্তু ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেল।লোকদুটো একসময় টের পেল ওরা কচ্ছপকে টানছে না, বরং প্রবল হ্যাঁচকা টানে কচ্ছপমশাইই ওদের নিয়ে যাচ্ছে জলের গভীরে। নাকানি-চোবানি খেয়ে কোনোমতে দুজনে ভেসে উঠলো মাঝগাঙে।পরণের কাপড়-চোপড় সব ভিজে ঢোল। কী আর করা। আবার দুজনে সাঁতরে চলে এলো সেই কদম গাছের নীচে।এদেরও রোখ চেপে গেছে।এই পাখিগুলোর জন্যই এত হেনস্থা। আজ যে করেই হোক এদের সাবাড় করে মাংস খেলে তবে শান্তি।

বেগতিক দেখে চিল উড়ল সিংহের আস্তানার দিকে। চিলকে দেখে সিংহ অবাক।

'এমন অসময়ে তুমি এখানে?'

'শিগগির চলো দাদা, আমাদের ভারী বিপদ!'

সব শুনে সিংহ বলল, 'তুমি যাও, সইকে বলো চিন্তা না করতে। আমি আসছি।'

তার স্বভাবসিদ্ধ সিংহনাদ ছেড়ে সিংহ হ্রদের জলে নামল। সেই আওয়াজে গোটা বনভূমি কেঁপে উঠলো থরথর করে।চাঁদের আবছা আলোয় হ্রদের জলে সিংহকে সাঁতরাতে দেখে লোকদুটোর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়!পড়িমড়ি ছুট লাগালো উল্টোদিকে।

'দরকার নেই বাবা,পাখির ছানা খাওয়ার।এখন প্রাণটা থাকলে হয়।'

'ঠিক বলেছ।কী সাংঘাতিক পাখি!' বলতে বলতে ছুট--ছুট--ছুট--একেবারে দ্বীপের ওপারে গিয়ে সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠে তবে শান্তি। সোজা ছুট এবার গ্রামের দিকে।

এদিকে সিংহ চিলেদের আস্তানার কাছে এসে দেখে বাজ, কচ্ছপ সবাই হাজির। কিন্তু কোনো মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। চিল-চিলনী এতক্ষণে হাঁফ ছাড়ল। বাছাদের ফাঁড়া তাহলে কাটল শেষ পর্যন্ত!আনন্দে তাদের চোখে জল, 'ভাগ্যিস তোমরা ছিলে, নইলে যে আজ কী হত!'

সিংহ বলল, 'আসলে আলাদা করে আমরা কেউই কিছু না। বন্ধুত্বই আমাদের আসল জোর।'

সবাই মাথা দুলিয়ে সিংহের কথায় সায় দিলো।

ছবিঃ তিতিল

ছড়ার পাতা	
মঙ্গনজেরি আর	টি এস এলিয়ট। অনুবাদ
কাঁকড়াবিছে	রোয়াল্ড ডাহ্‌ল্‌ অনুবাদ
বলছিলাম কি ইশে	অমিতাভ প্রামাণিক
তোকেই দিলাম	সৌমেশ গোবিন্দ সেন
ছেলেবেলার ফলগুলি	জয়তী অধিকারী
শৈশব চুরি	সনত কুমার ঘোষ
বাঘ মেরে দোস্ত	কবিরুল ইসলাম কঙ্ক
টাকলামাকান	কৌশিক ভাদুড়ি
রাত ফুরানোর শেষে	নুরজামান শাহ
শীতের শহর	রওশন মতীন
ট্রাফিক পুলিশ	রুচিস্মিতা ঘোষ
আনন্দে ইদ আসুক	আহাদ আলি মোল্লা
প্যারডি	
আমি বাংলাকে ভালোবাসি	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
পানগান	অমিতাভ প্রামাণিক
আজ জ্যোৎস্না রাতে	প্রকল্প ভট্টাচার্য
আমি রিক্সা করে	আশুতোষ ভট্টাচার্য

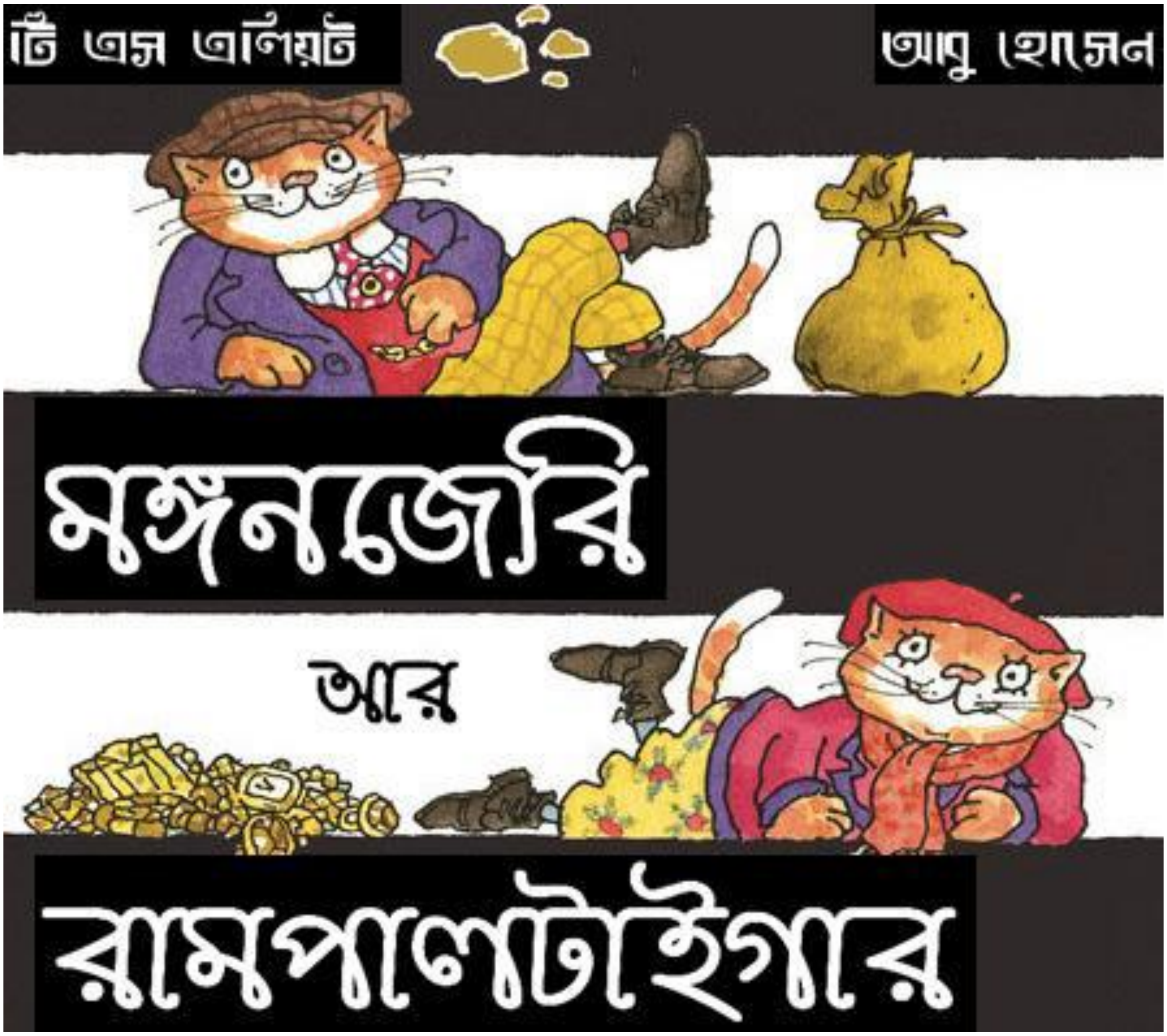

মঙ্গনজেরি আর রামপালটাইগার ছিল দুই কুখ্যাত বিল্লি
দড়িহাঁটা জিমন্যাস্ট সার্কাসি দুটি ভাঁড় ম্যাও সুরে করে কত খিল্লি
দুটোই বদের ধাড়ি, গড়েছিল তারা বাড়ি গাছে ঢাকা ভিকটোরি পার্কে
তবে সেই ঠিকানায় তারা শুধু চিঠি পায়। ঘরে থাকা? ধারে তার ধার কে?
লনসেস্টন প্লেস-এ, কনওয়াল এলাকায়, কেনসিংটনে যারা থাকত
দুই বেড়ালের ভয়ে জানালায় দরজায় দিনরাত খিল এঁটে রাখত

তবু যদি জানালাটা খুলে যেত রাত্রে
তছনচ খেলা হত রান্নার পাত্রে
ছাদে যদি টালিগুলো একদুটি সরত
ফাঁক বেয়ে ঘরময় বৃষ্টিরা ঝরত
টেবিলের ড্রয়ারেরা নিজেনিজে খুলত
আলনার মোটা কোট কার্নিশে ঝুলত
রাত্রের খাওয়া শেষে যদি মিস বুল্টি
হাঁক দিত খোয়া গেছে মুক্তোর দুলটি
ফ্রিজ থেকে উবে যেত মাছ রাখা ভাণ্ড,
“সবই সেই বজ্জাত বেড়ালের কাণ্ড”

এই বলে সকলেই খুঁজে যেত দোষ কার?
মঙ্গনজেরি আর রামপালটাইগার?

মঙ্গনজেরি আর রামপালটাইগার জাদুকরী সুরে তারা গাইত
থাবা মেরে ভেঙেচুরে তার ছিঁড়ে জাল ফুঁড়ে যা পেত তা মুখে নিয়ে ধাইত
ভিকটোরি পার্কের এক কোণে ছিল বাসা ঘুরেফিরে থাকে মহা রঙ্গে
কখনো সুযোগ পেলে ল্যাজ তুলে গোঁফ মেলে কথা বলে পুলিশের সঙ্গে

রবিবারের রাত্রে যখন সবাই মিলে ডিনার খায়
মাংস কখন আসবে বলে কিচেনমুখো জুজুল চায়
তখন হঠাৎ কাজের ছোঁড়া মুখটা করে করুণ তার
বলবে এসে আজ আলু খান মাংস হবে কালকে সার
উনুন থেকে কাবাবগাঁথা শিকগুলো সব উধাও আজ
অমনি সবাই হাঁকার দিত, "চারপেয়ে সেই পাজির কাজ"

মঙ্গনজেরি আর রামপালটাইগার জোট বেঁধে কাজ করে কী দারুণ
কখনো কপালজোর কখনো থাবার জোর যদিও সদাই ফল নিদারুণ
ম্যাঁও সুরে গায় ধুন ধায় যেন টাইফুন থাবা মেরে উবে যায় পলকে
মঙ্গনজেরি নাকি রামপালটাইগার চিনে নেবে তাকে তুমি বল কে?

ঝনঝন রবে যদি কেঁপে ওঠে বাড়িটা
রান্নার ঘরে ভাঙে মাছ রাখা হাঁড়িটা
পড়বার ঘরে যদি ভাঙে এইমাত্র
লাল রঙা মহাদামি মিংযুগী পাত্র
অমনি সবাই মিলে খুঁজে যাবে দোষ কার?
মঙ্গনজেরি নাকি রামপালটাইগার?
দুজনার একটার কাজ হতে বাধ্য
কিন্তু সে কোনজন বোঝে কার সাধ্য?

কাঁকড়াবিছে

Roald Dahl-এর লেখা The Scorpion ছড়া অবলম্বনে কৌশিক ভট্টাচার্য

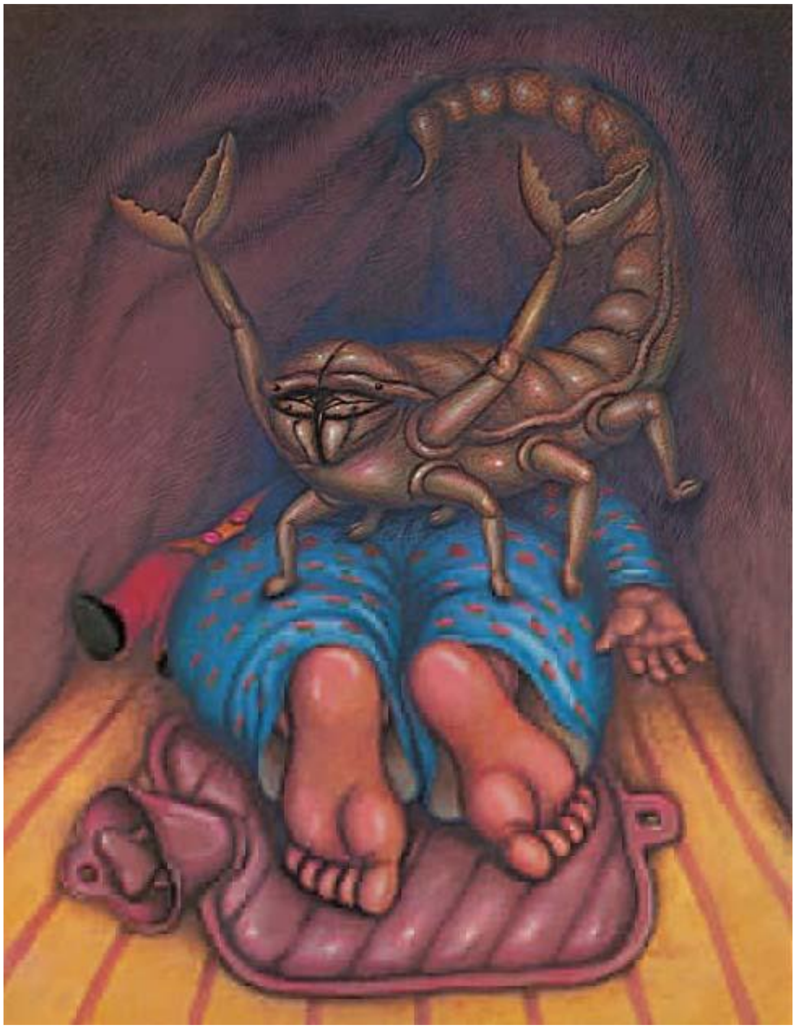

মার্জারপুরুষেরা দিতে পারে খেঁচিয়ে
"হুলো" বলে পথেঘাটে ডাকো যদি চেঁচিয়ে।
হুল নেই, তবু কেন "হুলো" বলে খোঁচানো?
"হুলো" নাম তারই সাজে হুল যার ওঁচানো,
হাজারো প্রাণীর মাঝে সেরা হুলখানি যার।
কাঁকড়াবিছেরই তাই হুলো নামে অধিকার।

বাস তার ফাটলেতে, দেয়ালের খাঁজেতে
ঘোরাফেরা করে না সে শহরের মাঝেতে।
সাবধান! গ্রামে বাড়ি? মেটে ঘর? পাকা নয়?
দেখে চলো, বিছে ঘোরে বিছানাতে, বাড়িময়!
দুঃখ পেলে কি ভেবে "কাছে কেন এলো না?"
বন্ধু সে নয় কারো, ভালোবেসে ফেলো না!

দেখেছো কি চেহারাটা? যত হোক পুঁচকে,
খুনে-রাঙা চোখদুটো, জোড়াভুরু কুঁচকে,
মিশকালো রং -- যেন কালি শুষে তৈরী
বিছেদের রাজা তিনি, মানুষের বৈরী!
মারামারি? হানাহানি? এক ডাকে খাড়া সে!
লম্বাটে ল্যাজ যদি করে শুরু নাড়া সে,
ভাগো! ভাগো! কেটে পড়ো! লাফ দাও
পালিয়ে
যত পারো দূরে সরো বেগে দু'পা চালিয়ে।
কেন জানো? ল্যাজে থাকা হুল যদি নড়েছে
মনে রেখো, এক শুধু ধান্ধা সে করেছে --
গাম্বু লাফেতে উড়ে শমনের বেশেতে
হুলটি বিঁধোবে কারো পশ্চাদ্দেশেতে!

*****

"কি হয়েছে বাবুসোনা? মুখ দেখি শুকিয়ে,
ভয় কেন? বলো, কেন চেপে রাখো লুকিয়ে?"
"ও মা, শোনো, গুটিপায়ে কেউ যেন আসছে
চাদরের নীচে ঢুকে হি হি হি হি হাসছে!
পায়ে লাগে সুড়সুড়ি -- এসেছে না-জানি-কি!
পৃথিবীতে নামা কোনো ভিনগ্রহী প্রাণী কি?"
"এই শোন, মাঝরাতে ফের শুরু ঠাট্টা?

শুয়ে পড় তাড়াতাড়ি! দেব দুই গাঁট্টা!”
“না না না না, ঠাট্টা না, গেছে হাঁটু ছাড়িয়ে,
না না, আরো উপরেতে, কোমরেতে দাঁড়িয়ে।
গুঁড়ি মেরে চুপিচুপি বসেছে সে পাছাতে।
গেছি! গেছি! প্রাণে গেছি! এসো কেউ বাঁচাতে!!”
শূল হয়ে নামে ঐ বড় হুল-টা
ওরে বাবা!   ওরে বাবা! ওঃ! উঃ! আঃ!

বলছিলাম কী, ইসে-

অমিতাভ প্রামাণিক

গ্রীসে
গেছিল মোর
পিসে।
অনবদ্য সে দেশটা, তবু পায়নি খুঁজে
ঘি সে।
মুশকিল তাই, ভাজবে লুচি
কীসে?
বৈশাখের পঁ-
চিশে
জলসা হবে কোন গলিতে, পায় না খুঁজে
দিশে।
এক একটা লোক, চেহারা এমন, ডাকাত যেন
বিশে।
বোঝাই যায় না, ডাক্তার নাকি, চাইলে দেবে
ফী সে?
এসব দেখে ধরলো মাথা, ওজন যেন
সীসে।

সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেল একদিন প্যা-
রিসে।
ফ্রান্স তুলনায় বরং ভালো, পায় শুতে বা-
লিশে।
কিন্তু দু'দিন যেতেই পিসের সব হয়ে যায়
ক্লিশে,
মিস করে ই-
লিশে।
এমন করে থাকতে পারে
কি সে?
তার করেছে, আসছে ফিরে এই মাসেরই
ত্রিশে।

তোকেই দিলাম

সৌমেশগোবিন্দ সেন

তেপান্তরের মাঠটা দিলাম তোকে
পার হতেই হাঁফিয়ে যায় লোকে

ওপার যাবি? এই নে পক্ষীরাজ
আজ আমার মনটা খুব দরাজ

পথ হারালি? গভীর বনভুমি?
এই নে দিলাম ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী

বনের শেষে, রাক্ষসদের পুরী
একলা বসে জট বিচুটি বুড়ি

এই নে আরো, সোনা রূপার কাঠি-
মায়া তলোয়ার, দীঘির তলের মাটি-

রাজকন্যা, এই বার চুপ কথা
দিয়েছি দেখ, গোটা এক রূপকথা।

ছেলেবেলার ফলগুলি

জয়তী অধিকারী

গরমেতে হাঁসফাঁস
জলভরা তালশাঁস
গপাগপ খাই তাই
দেরি করে কাজ নাই।

আমের গন্ধে মাতোয়ারা
বাছতে গিয়ে দিশেহারা
হিমসাগর আর আম্রপালি
এক নিমেষেই করব খালি।

লিচুর গায়ে বোলাই হাত
রঙের ছটায় কুপোকাত
মিষ্টি নরম শাঁসেই সুখ
ফুরিয়ে গেলেই বেজায় দুখ।

পেয়ারাগুলো ঢিলের ঘায়ে
স্থান পেয়েছে গাছতলায়
নবীনকাকা আসছে ছুটে
তার আগে চল নিই লুটে।

ছোট্টবেলায় যাচ্ছি ফিরে
স্বপ্নজালের দোলায় চড়ে
বন্ধুদেরও আনব ডেকে
খেলব গায়ে মাটি মেখে।

চোখ খুলতে লাগছে ভয়
আবার যদি হারিয়ে যায়
ছেলেবেলার সেদিনগুলো
চোখের পাতা ভিজিয়ে দিল।

শৈশব চুরি

সনত কুমার ঘোষ

কাকভোরে ঘুম ভাঙা, ঘুম চোখে টুথব্রাশ,
নাকে মুখে গিলে নেওয়া, তাড়া দেয় স্কুলবাস।
জাঙ্কফুড লাঞ্চবক্স, তাড়াতাড়ি জুতো জামা,
এভাবেই শুরু হয় ছোটোদের রোজনামা।

ওজনেতে বেঁকে যাওয়া, পিঠে ওঠে বড়ো ছালা,
দেখে তার হোম টাস্ক, ম্যাম দেয় কানমলা।
বাড়ি ফিরে রেস্ট নাই, আসে কত পিসি-কাকা,
কারও কাছে গান শেখা, কারও কাছে শুধু আঁকা।

তারপর লেখাপড়া, মাঠে যাওয়া হয় না,
মাঠে যাওয়া মা'র চোখে, অহেতুক বায়না।
মাঠে খেলে ছোটোলোক, নোংরা ও ন্যাস্টি
ছেলে গেলে বখে যাবে, মায়েদের দৃষ্টি।

সন্ধ্যার পর আসে গণিতের যদুস্যার,
ভুল হলে অঙ্কেতে বকাঝকা আর মার।
বাড়িতেই মার খাওয়া, বাবা কিছু বলে না,
ইংরেজি ম্যাম বলে, ছেলে কিছু লেখে না।

এক্সাম ফল পেলে বাবা-মা নয় খুশি,
নব্বই পেলে বলে, ওর ছেলে পাঁচ বেশি।
ফল দেখে বাবা-মায়, লেগে যায় দ্বন্দ্ব
মানুষ হতে হলে কার্টুন দেখা বন্ধ।

জেলখানা বাক্সবাড়ির নাই কোনও জানালা খোলা,
ছোটো সুখী পরিবারে নাই ঠাম্মাদিদা গল্পবলা।
সারাদিনই বন্দি থাকে রুটিনেরই কঠিন ফাঁদে,
মানুষ হওয়ার আতঙ্কেতে তার শৈশব নিত্য কাঁদে।

বাঘ মেরে দোস্ত

কবিরুল ইসলাম কঙ্ক

এই বাঘ, মৎ ডাক
চুপ করে থাক,
বেড়ে যদি যায় রাগ
দেব ভেঙে নাক।

এই বাঘ, মাস মাঘ
জ্বরে কাঁপে গা,
যা খাবি তাই খা
যাস নাকো গাঁ।

গাঁয়ে সব করে রব
কই বাঘ, কই?
কত সব মস্তানি
বাঘ মারবই।

এই বাঘ, মৎ ডাক
ডাকে তুই চোস্ত,
পাবে নাকো খুঁজে কেউ
তুই মেরে দোস্ত।

টাকলামাকান

কৌশিক ভাদুড়ি

টাকলামাকান ঊষর ভূমি
অনেক নাকি হোতায় জমি!
মকান আমি বানাই টাকে
বালি আনতে ওখান থেকে
পাঠিয়েছি পাঁচশো ট্রাক
পথে টিবেট সৈন্য ব্যারাক
আটকে দিল বালির লরি
ডিউটি চাইল, বলিহারি!
বালির কি রে হয় রে মালিক?
চড়ুই কিংবা গঙ্গাশালিখ
যায় না তো তাই তোর মুলুকে
কায়রোতে ভাই খাচ্ছে সুখে
অঢেল বালি নীল নদীতে
গিফট র‍্যাপ আর রঙিন ফিতে
তাই দিয়ে প্যাক থো'য়া মাঠে
সাহারাতে থরেও বটে।
টাকলামাকান একলা থাক
চাই না ওটার বালির ভাগ।

রাত ফুরানোর শেষে

নুরজামান শাহ

কালকে রাতে মেঘরা নেমে চিলেকোঠার ঘরে,
ইলিম ঢিলিম স্বপ্নাবেশে নৃত্য তারা করে।
রাত নিঝঝুম নেই চোখে ঘুম জেগে আকাশ পানে,
তাকিয়ে দেখি মেঘবাহাদুর নাচছে মিঠেল গানে।
স্বপ্নপুরের নীল সীমানায় শূন্য তেপান্তরে,
রূপকথা আর চুপকথারা নাচগান সব করে।
লালপরি ও নীলপরিরাও নাচছে আপন মনে,
বনপলাশের সুবাস মেখে মিষ্টিমধুর ক্ষণে।
ইচ্ছে মনে খুশির গাঙে তুলছে নদী ঢেউ,
সাতসমুদ্দুর তেরো নদী নেই তো থেমে কেউ।
তখন দেখি সাতরঙা ঢেউ মেঘের কাছে এসে,
বলল, আমি রঙ ছড়াব রাত ফুরানোর শেষে।

শীতের শহরে

রওশন মতিন

হিম কুয়াশার শহর খিলানে
ঘুমের চাদরে রাত,
কুণ্ডলী দিয়ে রাস্তার পাশে
টোকাইয়েরা চিৎপাত।

বিলাসী দালান বুক উঁচু কত
স্বপ্নিল কারুকাজে,
কান্নারা জমে শিশিরের মতো
তাদের বুকের ভাঁজে।

শহর ঘুমায় শান্তির নীড়ে
খুলে রেখে তার তাজ,
চাঁদ উঁকি দেয় কুয়াশার ভিড়ে
একা বাউলের মতো সাজ।

শীতের রাখাল দরজায় কড়া নাড়ে
জ্যোৎস্না ছড়ানো মায়াবী উঠোন,
স্মৃতিরা ছোটে তেপান্তরে
কোথায় হারায় আনমনা মন।

আড়মোড়া ভাঙা সূর্যের রথে
রোদ্দুর, পাখি সকালের সুরে
ব্যস্ত জীবন চলে পথে পথে
পায়ে পায়ে যায় দূর, বহুদূরে।

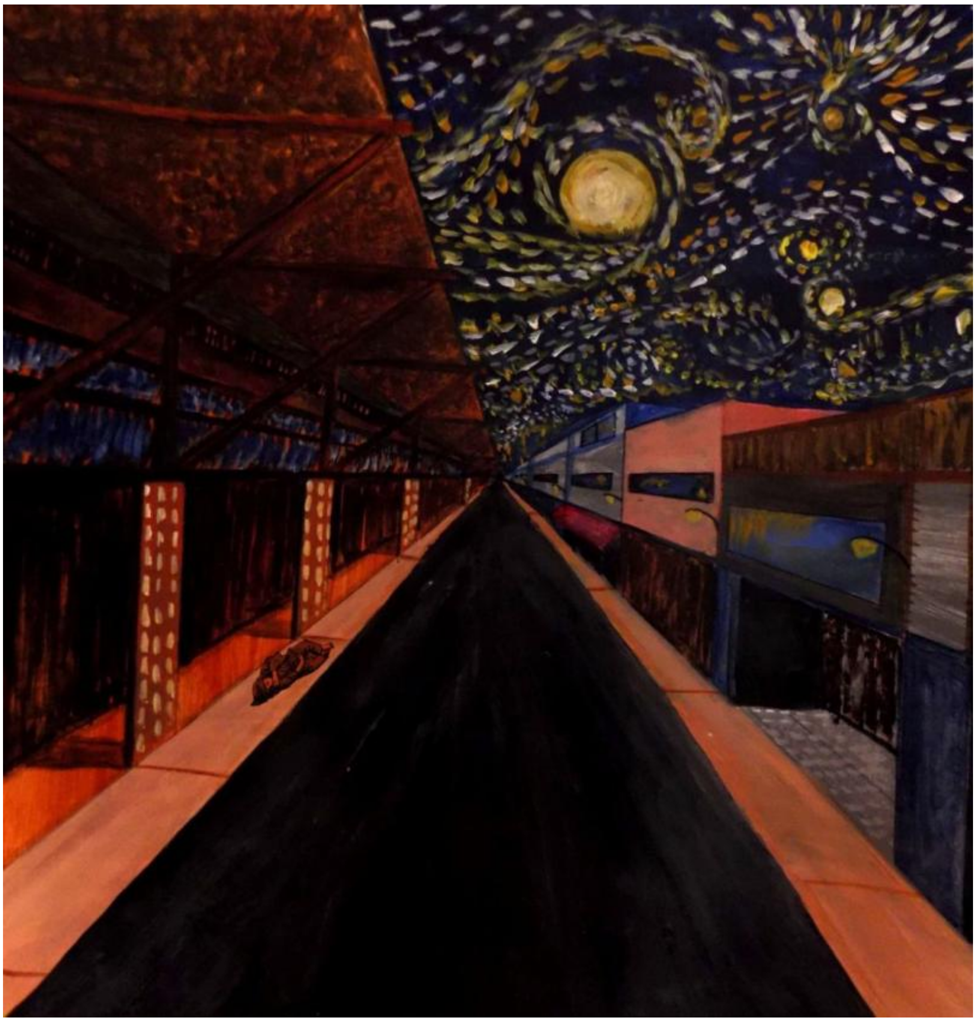

ছবিঃ তিতিল

ট্রাফিক পুলিশ

রুচিস্মিতা ঘোষ

পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি নাড়াই আমার হাত,
ডাইনে বাঁয়ে অবিরত, সকাল দুপুর রাত।
সরল পথে দেখছ কত, ছুটছে জটিল যান,
চালাই ওদের, থামাই ওদের, ওরাই আমার প্রাণ।
রোদ্দুরেতে ঘামে ভিজি, বর্ষাকালে জলে,
শীতে কাঁপি হি-হি করে, এমনভাবেই চলে।
ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি বলে সারা গায়ে ব্যথা,
ভাবছে কে আর আমার কথা, লিখবে আমার গাথা!
তোমরা সবাই ছুটছ শুধু যে যার নিজের কাজে,
আমার কথা একটু ভেবো, বলা কি আর সাজে?
যানবাহনের মালিকরা সব, তবুও শোনো ভাই
ট্রাফিক পুলিশ নামটি আমার, পথই আমার ঠাঁই।
খাচ্ছি ধোঁয়া, খাচ্ছি ধুলো, জমছে বুকের মাঝে
পেটের দায়েই করছি এসব, দুঃখ বুকে বাজে।
চলতে চলতে একটু হেসে আমার দিকে দেখো,
হাসিটুকুই পাথেয় যে, এইটি মনে রেখো।

ছবি তিতিল

আনন্দে ঈদ আসুক

আহাদ আলী মোল্লা

ঈদের খুশি যাক ছড়িয়ে
সব ভেদাভেদ সরুক,
এক কাতারে শামিল হয়ে
আহ্লাদে বুক ভরুক।

পাপ কালিমার আঁধার কেটে
উল্লাসে মন দুলুক,
শান্তি-সুখের পরশ পেয়ে
নাচুক তামাম মুলুক।

ভেদাভেদের শেকল ভেঙে
সবাই মেতে উঠুক,
তাবত লোকের মুখে মুখে
ফুলের হাসি ফুটুক।

শাওয়াল মাসের চাঁদ আকাশে
সারা বছর হাসুক,
ধনী-গরিব সবার ঘরে
আনন্দে ঈদ আসুক।

আমি লাবড়ার দেখি স্বপ্ন

আমি খেজুরে খুঁজেছি গুড়

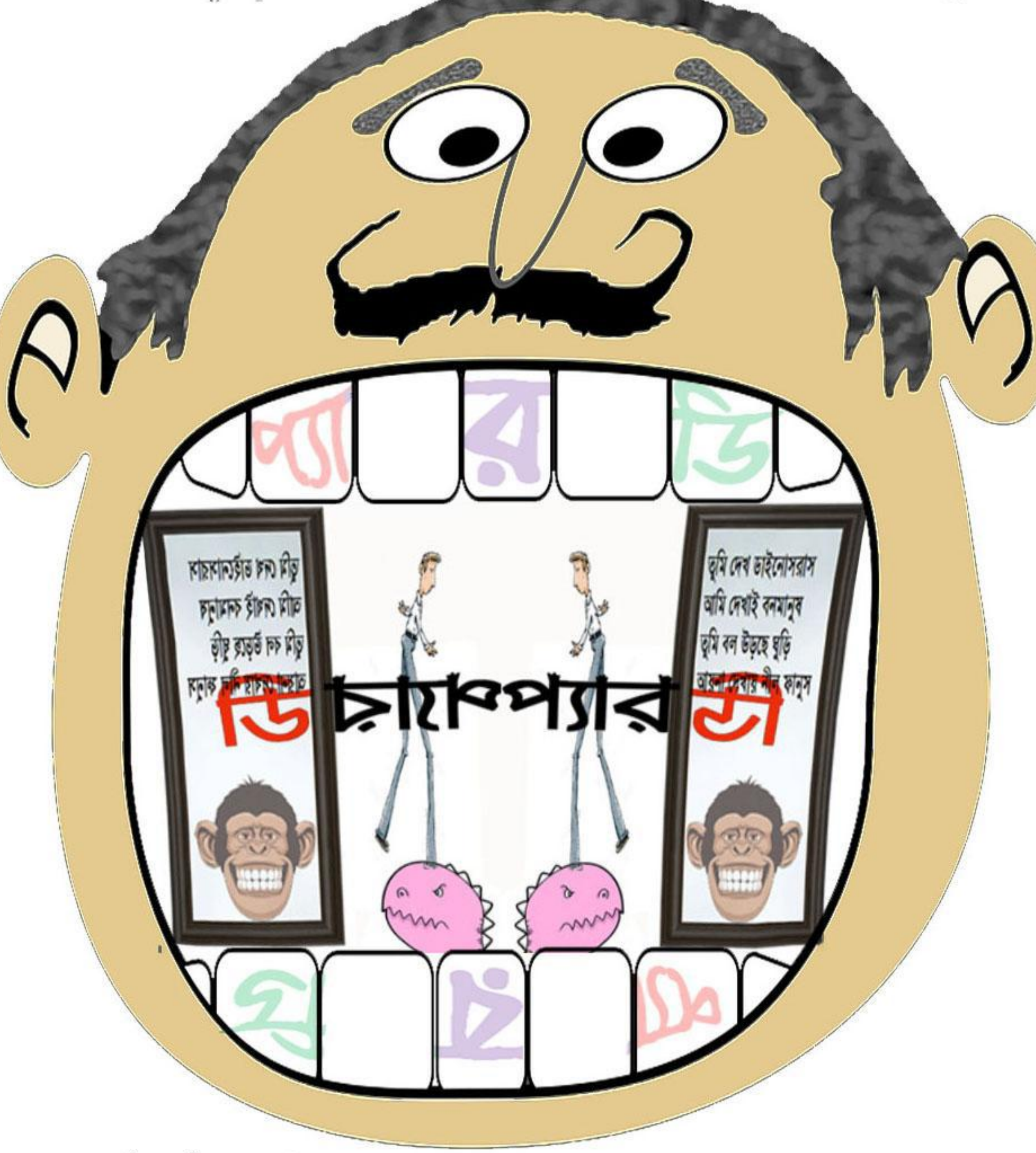

তোমার শুঁড়ে শুঁড় বেঁধেছি

আলু আমার আলু ওগো আলু ভুবনভরা

আমি বাংলাকে ভালোবাসি

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

খাব বাংলার তেলকই
বড় ভালবাসি তেলকই
আমি আরো ভালবাসি সর্ষে ইলিশ
মুড়কি মুড়ি ও খই।
আমি লাবড়ার দেখি স্বপ্ন
আমি খেজুরে খুঁজেছি গুড়
আমি ডাল ভাত আলুচচ্চড়ি খেতে
যেতে পারি বহুদূর।
বাংলা আমার গরমে শুক্তো
শিশিভরা আমচুর
আমি বসে শেষপাতে মেখে নিই ভাতে
পাকাকলা ভেলিগুড়।
আমি চমচম ভালোবাসি
আমি ঝাল কম ভালোবাসি
আমি মোচার ঘন্ট খেতে পেলে চিতা
ছেড়ে সোজা উঠে আসি।
পাঁঠার কালিয়া স্বর্গ আমার
মুইঠ্যা প্রাণের সুখ
আমি একবার চাখি বারবার চাখি
ভাজা চিকেনের বুক।
আমি শেষপাতে চাখি দই
খাঁটি মিঠে লালসাদা দই
আমি লাউচিংড়িতে চাপড়ঘন্টে
দিবানিশি মজে রই
খেয়ে ডিমের ডেভিল,মোগলাই
খেয়ে বৌদির বিরিয়ানি
আমি ভেলপুরি চাট ফুচকার জলে
ধরায় স্বর্গ মানি
পটল পোস্ত জীবন আমার
ঘন্ট প্রাণের সুখ
আমি একবার চাখি বারবার চাখি
ভাজা চিকেনের বুক

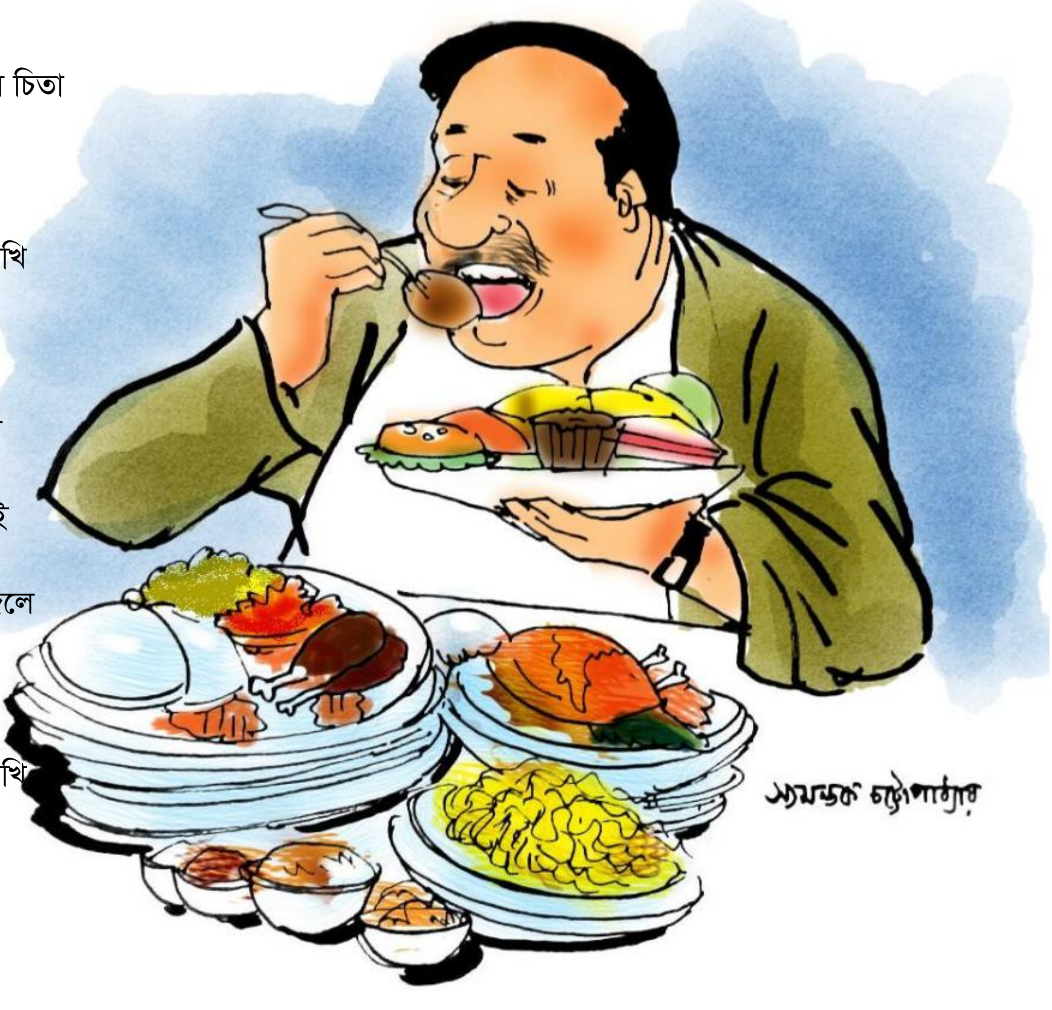

পানগান

অমিতাভ প্রামাণিক

চুন ভরিয়ে জর্দা দিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও পান।
মম জীবনে মম যাপনে
মোরে আরো আরো আরো দাও ফান।।

আরো আলু, আরো আলু
খেয়ে হোক পেট আলুথালু।
ভেলিগুড়ে মধু পুরে
মুখে ফেলে আরো হই আনচান।।

আরো বেদানা, আরো বেদানা।
প্রভু দাও মোরে কাবুলিচানা।
ধার মিটায়ে কুলো পিটায়ে
করি আহ্বান, করি কাকস্নান।

আরো থেমে আরো ঘেমে
খেয়ে ছবি হয়ে যাই ফ্রেমে
সুধাসুখে আমি মুখে
ফেলি আরো আরো ডিম আরো নান।।

আজ জ্যোৎস্না রাতে--

প্রকল্প ভট্টাচার্য

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই দ্যাখে খেলা
বসন্তের এই মাতাল ভুভুজেলা॥

বাজারে আজ যাব না যে,
রইনু পড়ে ঘরের মাঝে
এই নিরালায় টিভি আগে চালা।
কোন চ্যানেলে দেখাচ্ছে আজ খেলা॥

টিভির চ্যানেল বহু যতন করে
কেউ না ঘুরায়, দেখতে হবে মোরে।
চোখদুটো আজ খোলাই রবে,
কী জানি গোল কখন হবে
হাইলাইটস দেখাবে সকালবেলা
বসন্তের এই মাতাল ভুভুজেলা॥

আমি রিক্সা করে ফিরতেছিলাম

আশুতোষ ভট্টাচার্য

আমি রিক্সা করে ফিরতেছিলাম নিঝুম নিশীথ রাতে
তুমি তখন গামছা শুকোও জ্যোৎস্না বারান্দাতে।
সবাই বলে দিচ্ছে প্রোমো লুচির সাথে আলুর দমও
ঘিয়ে ভাজা ফুলকো লুচি কী অপূর্ব স্বাদ!
আমি হঠাৎ প্রশ্ন করি, মাংস কেন বাদ?

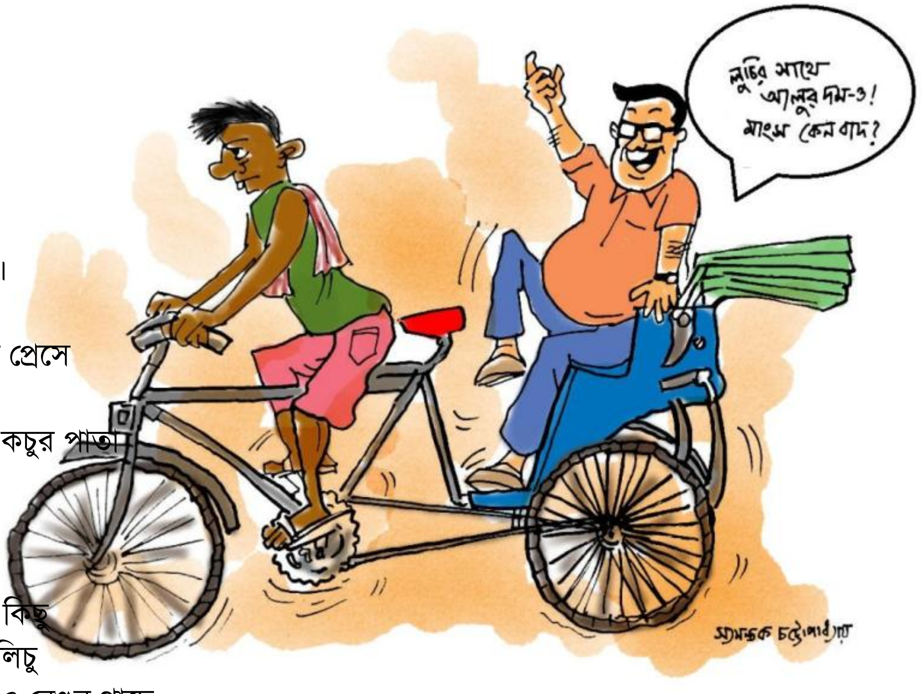

আজি এতক্ষণে সময় হল আনন্দ উৎসবে,
লক্ষ্মী পুজো ঘরে ঘরে খিচুড়ি ভোগ হবে;
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে কোজাগরী পূর্ণিমাতে
খুচরো কিছু যৎসামান্য বড় রাস্তার ধারে
বাস অটোতে খুচরো লাগে শনি মঙ্গলবারে।।

দেখি কোত্থেকে সব খবর পেল মিডিয়া আর প্রেসে
বলল নিয়ম কানুন বুঝি পাল্টে গেছে দেশে
চায়না থেকে আসছে ছাতা কোথায় তোমার কচুর পাতা
টিচার সে তো ভীষণ রাগী বলেন তৎক্ষণাৎ
‘ক’ লিখতে কলম ভাঙে অন্নরে কয় ভাত।।

মরি সাবমেরিন না যুদ্ধ জাহাজ কমন পড়ল কিছু
ব্রেকফাস্টে ব্রেড অমলেট আর সঙ্গে কাঁঠাল লিচু
তোমার তো স্যার স্বভাব আছে ঢ্যাঁড়শ ফলাও বেগুন গাছে
হিসেব নিকেশ প্রফিট লসে হাজার টাকা দেনা।
ত্রৈরাশিক আর ভগ্নাংশের কিচ্ছুই মিলছে না।।

যবে ব্যাগ দুখানি লোকাল ট্রেনে রাখতে গেছি, সে কী!
হকারদাদা গামছা শসা বিক্রি করে দেখি;
ব্যাগ হারাল লোকের ভিড়ে গোলমরিচ আর পোস্ত জিরে
তখন ভাবি শপিং মলে নিতাম দু ব্যাগ ভরে,
অনলাইনে বাজার এখন পকেট শূন্য করে।।

অলঙ্করণঃ স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	
অঙ্কের বিচিত্র জগৎ	বৈজ্ঞানিক
মাথা মে ট্রিক্স্-এমনও হয়!	সুর্যনাথ ভট্টাচার্য
মহাবিশ্বে মহাকাশে-চান্দ্রপথ (আশ্বিনী থেকে রেবতী) - (১)	কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
পাহাড় চুড়ায় আতঙ্ক	ঋজু গাঙ্গুলী
টেকনো টুকটাক-লিখিব পড়িব	কিশোর ঘোষাল
প্রতিবেশী গাছ-গাঁদা	অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়
আবিষ্কারের খোঁজখবর	রাজীব কুমার সাহা
ক্লোরোফিল চোর	সৌম্যকান্তি জানা
বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক-টাইকো ব্রাহে	অরূপ ব্যানার্জি
সহজ বিজ্ঞান-একটি প্যাঁচালো ব্যাপার	রবি সোম

এই সংখ্যার লেখা পড়বার আগে আগের সংখ্যার লেখাটা একবার একটু ঝালিয়ে নিলে সুবিধে হবে।

কেমন করে ‘জ্যা’ শব্দটা ভারত থেকে আরব হয়ে বিলেত যাবার রাস্তায় ‘সাইন’ এ বদলে গেল সেইটে বোঝবার আগে সাইন কাকে বলে সেটা জেনে নেয়া যাক।

আগের সংখ্যায় পৃথিবী থেকে চাঁদের গতি মাপবার জন্যে আর্যভট্টের ব্যবহার করা যে ছবি দিয়েছিলাম তার একখানা ফের এইখানে দিচ্ছিঃ

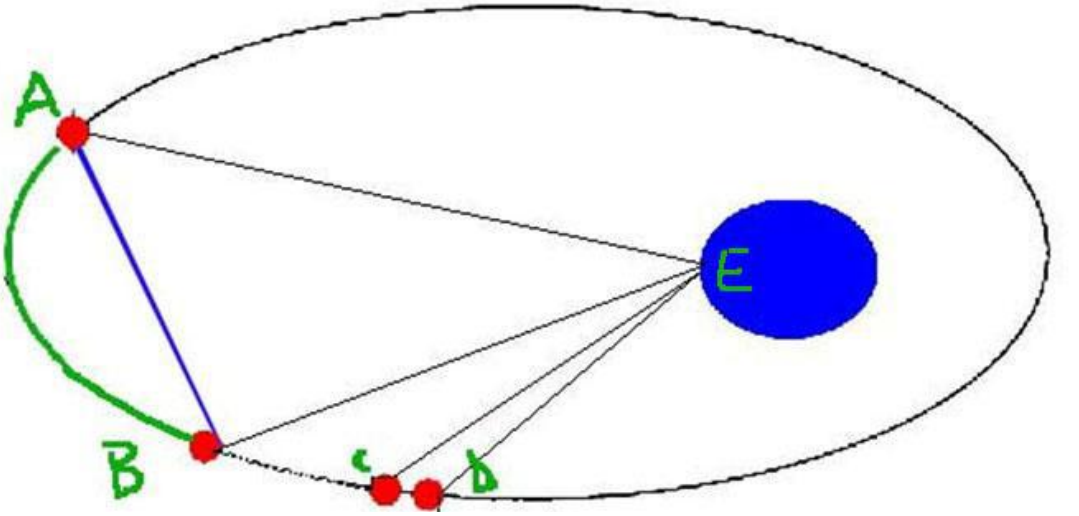

বিজ্ঞানি বসে আছেন E বিন্দুতে। চাঁদ A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে এল। তিনি খড়ি পেতে মাটিতে AEB এই কোণটাকে মেপে ফেললেন। এখন পৃথিবী থেকে চাঁদ কতটা দূরে আছে (মানে AE) তার একটা আন্দাজ যদি থাকে, তাহলে চাঁদ কৌণিক সরণ AEBর জন্য কতটা দূরত্ব রৈখিকভাবে সরলো, মানে AB দূরত্বটা কতটা সেটা কীভাবে বের করা যায়?

আগেই বলেছি বিন্দুদুটোর মধ্যে দূরত্ব যত কম হবে ততই A ও Bর মধ্যেকার রৈখিক দূরত্ব (নীল দাগ) ও আসল দূরত্ব (বৃত্তের জ্যা (Chord) টুকু। সবুজ দাগ) সমান হয়ে আসবে। ধরা যাক A ও Bর মধ্যেকার দূরত্ব খুব কাছাকাছি। সেক্ষেত্রে AEB এই কোণটা আর AE বাহুটার সম্পর্ক থেকে AB , মানে ওই জ্যাটুকুর মান বের করবার কৌশল করতে হবে।

দেখা গেল, ABE যদি সমকোণ হয় AEB কোণটা যদি একই থাকে তাহলে ত্রিভূজটা যত বড়ই হোক না কেন, তার AB আর AE বাহুদুটোর অনুপাত সবসময় ধ্রুব থাকবে। নিচের ছবিটা দেখঃ

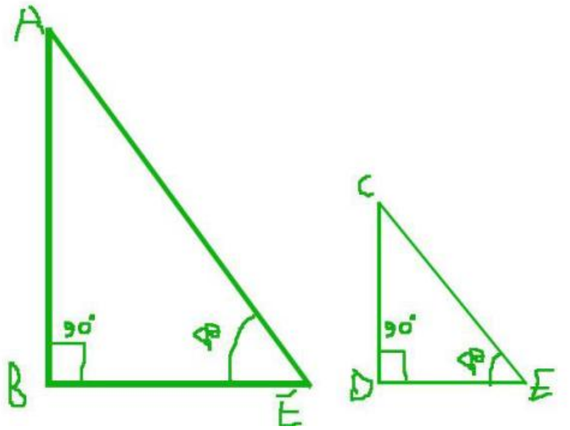

পাশের সমকোণী ত্রিভূজদুটোর ক্ষেত্রে কোণটার মান একই আছে। সেক্ষেত্রে AB/AE এবংCD/CEর মান সবসময় এক হবে।

“ক” কোনটার বিভিন্ন মান হলে, এই অনুপাতটারও বিভিন্ন মান হয়।

তাহলে মাটিতে ছোটো ত্রিভূজটা এঁকে তার “ক” কোণটার বিভিন্ন মানের জন্য যদি উল্লম্ব আর অতিভূজের অনুপাতের বিভিন্ন মান বের করে নেয়া যায় তাহলে, লক্ষলক্ষ মাইল লম্বা চওড়া বড়ো ত্রিভূজটার ক্ষেত্রেও অতিভূজটাকে জানলে, আর কৌণিক সরণটাকে মাপতে সে অনুপাতটা দিয়ে তার সরনের মাপ বা ওই জ্যা ABর মাপ বের করে ফেলা যাবে।

“ক” এর নির্দিষ্ট কোন মানের জন্য, উল্লম্ব আর অতিভূজের অনুপাতের ধ্রুব মানকে আর্যভট্ট বললেন সে কোণের জ্যা।

এবারে মাটিতে ছবি এঁকে এঁকে “ক” এর বিভিন্ন মানের জন্য উল্লম্ব আর অতিভূজের বিভিন্ন অনুপাতগুলোকে কষে কষে তিনি কোণটার বিভিন্ন জ্যা-এর একটা তালিকা বানিয়েছিলেন। এর বিভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে একটা ছিল, রাতের আকাশের তারার অবস্থান মেপে সমুদ্রগামী জাহাজের অবস্থান নির্ণয়। শূন্য ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি অবধি এলাকাটার মধ্যে চব্বিশটা সমদূরত্বের কোণের জন্য এই জ্যায়ের মান নির্ধারণ করে সে তালকাকে একটা সংস্কৃত কবিতা বানিয়ে লিখে ফেলেছিলেন তিনি। বেজায় নিখুঁত মাপজোক।

বেজায় চাহিদা ছিল আর্যভটের জ্যায়ের তালিকার , সে সময়কার জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জ্যোতিষী, নাবিক, পুরুৎ সবার মধ্যে। ধর্ম, বিজ্ঞান যাতায়াত এই তিন ক্ষেত্রেই গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁদের সবার কাছেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল এই জ্যা-এর তালিকা।

আরব বিজ্ঞানি মহম্মদ ইবন মুসা খারিজমি নবমশতকে আর্যভটের পুঁথির আরবিক অনুবাদ করেন তখন তিনি, জ্যা-এর বদলে ‘জিভা’ শব্দটাকে ব্যবহার করেছিলেন। সেই আরবিক বই আবার দ্বাদশ শতকে ইউরোপে গিয়ে লাতিন ভাষায় অনুবাদ হল। করলেন ক্রেমোনা-র জেরার্ড।তিনি ভাবলেন খারিজমি বুঝি ভুল করে আরবিক শব্দ ‘জেব’ (মানে পকেট) লিখতে গিয়ে জিভা লিখে ফেলেছিলেন। অতএব তিনি সযত্নে সেই ‘ভুল’টি ঠিক করে ফেললেন নিজের পুঁথিতে। তাঁর বইতে তা হয়ে দাঁড়াল পকেট, বা কাপড় ভাঁজ করে তৈরি গর্ত,বা লাতিনে “সাইনাস”। ইংরেজরা তাদের অঙ্ক বইতে সমকোণী ত্রিভূজের যেকোন নির্দিষ্ট কোণের জন্য ত্রিভূজের উল্লম্ব আর অতিভূজের অনুপাতের এই মানটাকে সেই কোণের সাইন বলে লিখে দিল। আমরা পেলাম আজকের ত্রিকোণমিতির

s i n θ কে (ওই কোণের মান, যাকে আমরা “ক” লিখেছি, সাহেবি অঙ্কে তাকে লাতিন বর্ণ θ, α, β এইসব দিয়ে দেখানো হয়।)

ভাবো কাণ্ড! ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল।

সাইন এর মানের তালিকা বা সাইন টেবিল বানিয়েই আর্যভট্ট ক্ষ্যান্ত দেননি কিন্তু। একটা জিনিস তিনি বুঝেছিলেন। শূন্য থেকে নব্বই ডিগ্রির মধ্যে অসংখ্য কোন হতে পারে। (নব্বই কেন, শূন্য থেকে এক ডিগ্রির মধ্যেও তো ভগ্নাংশ ধরলে অজস্র কোণ হতে পারে, যথা শূন্য শূন্য দশমিক এক ডিগ্রি, শূন্য দশমিক দুই ডিগ্রি, শূন্য দশমিক শূন্য এক ডিগ্রি, তাই না?) তিনি তো শূন্য ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রির মধ্যে মাত্র চব্বিশটা কোণের সাইন বের করেছেন অনেক মাথা খাটিয়ে। আর কেউ হয়ত খেটেখুটে আটচল্লিশটা বেরকরল, কিন্তু সবগুলোকণের মান তো কেউ কখনো বের করতে পারবে না। তাহলে ধরো কুড়ি ডিগ্রির সাইনবের হয়েছে, একুশ ডিগ্রির সাইন বের হয়েছে। অথচ কেউ কোন গ্রহের দৌড়োদৌড়ি মাপতে গিয়ে পেয়েছে সাড়ে কুড়ি ডিগ্রি। তখন কী হবে? ভেবেচিন্তে এর একটা সমাধান বের হল। সেটা হল ঐকিক নিয়ম।

ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম। ধরো তুমি দশ ডিগ্রি আর বারো ডিগ্রির সাইনের মান জানো।(দশমিক সতের আর দশমিক একুশ) এই দু ডিগ্রি কোণ বাড়লে সাইনের মান বাড়ে দশমিক শূন্য চার। তাহলে ঐকিক নিয়ম খাটিয়ে এক ডিগ্রি বাড়লে সাইনের মান কত বাড়বে তার একটা আন্দাজ পেতে পারো।(দশমিক উনিশ)

অতএব আর্যভট্ট এরপর হাত দেন সাইনের মানের হ্রাসবৃদ্ধির টেবিল বানানোতে, যাতে ওই কায়দা খাটিয়ে টেবিলে নেই এমন কোণের সাইনের মোটামুটি মান বের করবার উপায় হাতে আসে। আর ওইটেই ছিল ক্যালকুলাস বা কলনবিদ্যার সূচনা।

এরপর সেই গল্প।

ক্রমশ

ম্যাথেমেট্রিক্স

এমনও হয়!

সূর্যনাথ ভট্টাচার্য

নীচে দুই স্তম্ভে– প্রত্যেকটিতে ৩টি করে– মোট ৬টি সংখ্যা দেওয়া আছে।–

।১।	।২।
১২৩৭৮৯	২৪২৮৬৮
৫৬১৯৪৫	৩২৩৭৮৭
৬৪২৮৬৪	৭৬১৯৪৩

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পরস্পর অসম্পর্কিত কয়েকটা র‍্যান্ডম সংখ্যা। প্রথমটায় বোঝা না গেলেও সংখ্যাগুলো কিন্তু সাধারণ নয়। সংখ্যাগুলোর মধ্যে কিছু অদ্ভুত সম্বন্ধ আছে। দেখা যাক–

১। প্রথম স্তম্ভের সংখ্যাগুলির বর্গের সমষ্টি দ্বিতীয় স্তম্ভের বর্গের সমষ্টির সমান!–

$১২৩৭৮৯^{২}+৫৬১৯৪৫^{২}+৬৪২৮৬৪^{২} = ২৪২৮৬৮^{২}+৩২৩৭৮৭^{২}+৭৬১৯৪৩^{২}$ ।

যিনি এই সম্বন্ধটি খুঁজে বার করেছেন তাঁর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করে পারা যায় না। ছ'অঙ্কের এই ছ'টি সংখ্যার বর্গ যে এমন সম্পর্কযুক্ত তা কি বেশ আশ্চর্য নয়?

২। তাও না হয় হল। এরপর আছে আরও বিস্ময়। সংখ্যাগুলির বাঁদিকের একটি করে অঙ্ক বাদ দিলে যে সংখ্যাগুলি পড়ে থাকে সেগুলোর মধ্যেও একই সম্পর্ক বিদ্যমান!–

$২৩৭৮৯^{২}+৬১৯৪৫^{২}+৪২৮৬৪^{২} = ৪২৮৬৮^{২}+২৩৭৮৭^{২}+৬১৯৪৩^{২}$ ।

৩। এবার বিস্ময়ের বিস্ময়! এইরকম করে বাঁদিকে একটা একটা করে সংখ্যা বাদ দিতে থাকলে প্রতি স্তরেই সম্পর্কটি বজায় থাকে!–

$৩৭৮৯^{২}+১৯৪৫^{২}+২৮৬৪^{২} = ২৮৬৮^{২}+৩৭৮৭^{২}+১৯৪৩^{২}$ ।

$৭৮৯^{২}+৯৪৫^{২}+৮৬৪^{২} = ৮৬৮^{২}+৭৮৭^{২}+৯৪৩২$ ।

$৮৯^{২}+৪৫^{২}+৬৪^{২} = ৬৮^{২}+৮৭^{২}+৪৩^{২}$ ।

$৯^{২}+৫^{২}+৪^{২} = ৮^{২}+৭^{২}+৩^{২}$ ।

৪। এতেই কিন্তু শেষ নয়। এবার যা বলব তা কল্পনাও করা দুঃসাধ্য। সংখ্যাগুলির ডানদিক থেকে একটা একটা করে অঙ্ক বাদ দিতে থাকলেও প্রতি স্তরে একই ঘটনা ঘটবে! দেখো–

$১২৩৭৮^{২}+৫৬১৯৪^{২}+৬৪২৮৬^{২} = ২৪২৬৮^{২}+৩২৩৭৮^{২}+৭৬১৯৪^{২}$ ।

$১২৩৭^{২}+৫৬১৯^{২}+৬৪২৮^{২} = ২৪২৮^{২}+৩২৩৭^{২}+৭৬১৯^{২}$ ।

$১২৩^{২}+৫৬১^{২}+৬৪২^{২} = ২৪২^{২}+৩২৩^{২}+৭৬১^{২}$ ।

$১২^{২}+৫৬^{২}+৬৪^{২} = ২৪^{২}+৩২^{২}+৭৬^{২}$ ।

$১^{২}+৫^{২}+৬^{২} = ২^{২}+৩^{২}+৭^{২}$ ।

৫। অবিশ্বাস্য লাগছে, তাই না? কিন্তু আরও একটু আছে। একই প্রক্রিয়া যদি একসঙ্গে করা হয়, অর্থাৎ বাঁদিক ও ডানদিক থেকে একযোগে একটা করে সংখ্যা বাদ দিতে থাকলেও বর্গসমষ্টি সমান থাকবে!–

$২৩৭৮^{২}+৬১৯৪^{২}+৪২৮৬^{২} = ৪২৮৬^{২}+২৩৭৮^{২}+৬১৯৪^{২}$ ।

$৩৭^{২}+১৯^{২}+২৮^{২} = ২৮^{২}+৩৭^{২}+১৯^{২}$ ।

পুরো ব্যাপারটাই ভারি রহস্যময়, নয় কি? (৫) নং ক্ষেত্রে রহস্য খুব জটিল নয়। দেখো সমীকরণের দুই দিকের সংখ্যাগুলো সমানই আছে, শুধু তাদের ক্রম পরিবর্তিত। তাই তাদের সমষ্টি তো সমান হবেই। কিন্তু আগের (১–৪)-র রহস্য সত্যিই জটিল।

কোনও সূত্র আছে কী? আমি তো খুঁজে এইগুলো পাচ্ছি–

(১) মূল সংখ্যাগুলোর প্রতিটার অঙ্কসমষ্টি ৩০।

(২) ছ'টা সংখ্যার প্রত্যেকটির জোড়া জোড়া অঙ্কের সমষ্টি ১০।

(৩) সংখ্যাগুলোর মাঝখানের চার অঙ্ক দেখলে সমীকরণের দুই দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই তিনটি সংখ্যা থাকছে।

এইগুলো থেকে কি কোনও সংকেত পাওয়া যাচ্ছে? আমি এখনও ভাবছি। তোমরাও দেখবে নাকি?

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশে চান্দ্রপথ অবলম্বনে (অশ্বিনী থেকে রেবতী পর্যন্ত) চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত যে সাতাশটি নক্ষত্রের (সমব্যাবধানে অবস্থিত) কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা বা মৃগশীর্ষ, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বআষাঢ়া, উত্তরআষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্রপদা এবং রেবতী।

ভারতীয় ভাবনায় তারকামণ্ডল নক্ষত্র নামে পরিচিত। নক্ষত্র শব্দ এসেছে 'নক্ত' ও 'ত্রৈ' ধাতু মিলিয়ে। নক্ত শব্দের মানে রাত্রি এবং ত্রৈ ধাতুর অর্থ পালন করা। দুয়ের মিলিত অর্থ রাত্রিকে যে পালন করে। অর্থাৎ, নক্ষত্রের আলোয় দূরীভূত হয় রাতের বিভীষিকা। নক্ষত্র নামের পিছনে এ জাতীয় একটি ধারণার প্রচলন ছিল বলে অনেকে মনে করেন। মৎস্যপুরাণে নক্ষত্র শব্দ সম্বন্ধে বলা আছে, "ন ক্ষীয়তে যতস্তানি তস্মান্নক্ষত্রতা স্মৃতা"। অর্থাৎ নক্ষত্রসমূহের ক্ষয় নেই, তাই এর নাম নক্ষত্র। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নক্ষত্রের নামকরণ সম্পর্কে একই কথা বলা হয়েছে– যা ক্ষত্র হয় না তা নক্ষত্র। এই প্রসঙ্গে শ্রী অরূপরতন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থে বলেছেনঃ

"আমার মনে হয় নক্ষত্র নামকরণের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি, রাত্রির নিমিত্ত আবাস। নক্ বা নক্ত শব্দটির অর্থ রাত্রি এবং সত্র অর্থ আবাস, উভয় যোগে রাত্রির জন্য আবাস। ভারতীয় তিথি বিভাগের অনুরূপ চৈনিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে সিউ (Si eu) এবং আরবদের যে মঞ্জিলের প্রচলন তার অর্থ আবাস। নক্ষত্র সকল চন্দ্রের আবাসস্থল। ঋগ্বেদেও নক্ষত্র সোমের গৃহ।

ভারতবর্ষে প্রাচীনতম মহাকাশ চিন্তায় তারকা এবং নক্ষত্র শব্দ দুটির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। পরে নক্ষত্র অর্থে চান্দ্রপথের উপরে অবস্থিত কয়েকটি তারকামণ্ডল বোঝাত।"

আগেই বলেছি চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত সাতাশটি নক্ষত্র সমব্যাবধানে অবস্থিত। প্রত্যেকটি নক্ষত্র পৃথিবীর আকাশে ১৩°২০' অংশ ঘিরে অবস্থান করছে। স্বাভাবিকভাবেই কোনো একটি নক্ষত্র বা তারার পক্ষে আকাশের এতটা স্থান (১৩°২০') দখল করে অবস্থান করা সম্ভব নয়। তাই নক্ষত্র বলতে একাধিক তারার সমাবেশ অর্থাৎ তারকামণ্ডল বা তারকাপুঞ্জকে বোঝানো হচ্ছে। এই প্রবন্ধেও 'নক্ষত্র' শব্দটি চন্দ্রের আবাসস্থল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

অশ্বিনী বা অশ্বিদ্বয়ঃ

চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত নক্ষত্রচক্রের প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনী। এতে রয়েছে দুটি তারা। এই তারা দুটিকে একত্রে বলা হয় অশ্বিদ্বয়। এদের নাম নাসত্য ও দস্র। বৈদিক যুগে অশ্বিদ্বয় সূর্যোদয়ের পূর্বে উদিত হয়ে শীতকালের সূচনা করত। বর্ষাঋতুর সূচনাকালে এটি উদিত হত সূর্যাস্তের পরে। এ বিষয়ে ঋগ্বেদে অনেক শ্লোক আছে। সঠিক ঋতু নির্ণয়ের জন্য এরা নাসত্য। আবার বর্ষা ও শীত উভয় ঋতুর আগমন বার্তা দেওয়া জন্য এরা দস্র (বিস্ময়কর)। অশ্বিনী নক্ষত্রের অধিপতি অশ্বি। বেদে সূর্যের রশ্মির নাম অশ্বি।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের কাছে প্রথম দিকে অশ্বিনীর আকৃতি অশ্ববদন সদৃশ ছিল না। সে সময় দুটি জ্যোতি অর্থে অশ্বিনী পরিচিত ছিল। পরে আরেকটি তারা যুক্ত করে অশ্বমুখের কল্পনা করা হয়। (শ্রীপতি ভট্টের জ্যোতিষ রত্নমালায় অশ্বিনী নক্ষত্রে তিনটি তারকার উল্লেখ আছে) অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রধান তারকাদ্বয় যুগ্মতারা (Binary Star)। মেষরাশি (Aries) মণ্ডলে তিনটি তারা দ্বারা গঠিত অশ্বিনী নক্ষত্রের মাঝের তারাটি যোগতারা। শ্রী অরূপরতন ভট্টাচার্য তাঁর প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান বইতে যোগতারা সম্পর্কে বলেছেন, "চন্দ্রের আবাসস্থল সংক্রান্ত ২৭টি তারকাপুঞ্জের উজ্জ্বলতম বা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তারকাকে তাঁরা (প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদেরা) যোগতারা বলতেন এবং সমগ্র পুঞ্জটিকে নক্ষত্র নামে অভিহিত করতেন। ওই যোগতারা প্রতি বিভাগের আদি প্রান্ত সূচনা করত। এইভাবে প্রতিটি বিভাগে চন্দ্রের অবস্থান থেকে কাল নির্ণয় এবং তিথি গণনা হত।"
আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে শেরাতন (বিটা অ্যারিয়েটিস) এই নক্ষত্রের যোগতারা এবং অন্য তারা মেসার্থিম (গামা অ্যারিয়েটিস)।

এই তারা দুটির মধ্যে শেরাতনের ঔজ্জ্বল্য কিছুটা বেশি হলেও দুটি তারাই পঞ্চম মাত্রার তারকা। পৌষ মাসে সান্ধ্য আকাশে এই নক্ষত্রটিকে (তারা দুটিকে) মধ্যাকাশে দেখা যায়। তবে অশ্বমুখ কল্পনার জন্য যে তৃতীয় তারাটিকে যুক্ত করা হয়েছে সেটি দ্বিতীয় মাত্রার তারা হওয়ায় এদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল।

ঋগ্বেদে অশ্বিদ্বয় প্রসঙ্গে যে শ্লোকগুলি আছে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকে এদের দেবতার আসনে বসিয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুলিতে এদের সর্বরোগহর স্বর্গবৈদ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সত্যিই কি এরা স্বর্গবৈদ্য? আগেই বলেছি রাশিচক্রের প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনী বা অশ্বিদ্বয় এবং শেষ নক্ষত্র রেবতী। এদের মাঝখানে আছে বৃত্রের নমুচি নামক গণ্ড। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বৃত্র হল নীহারিকা (আমাদের সৌরবিশ্ব যে নীহারিকায় তার ঋগ্বেদীয় রূপক হল বৃত্র)। এই নীহারিকার অনুন্মোচিত আবরণ বা নমুচি উন্মোচিত হয়ে নক্ষত্রের সৃষ্টি। বেদে নীহারিকার আরও কয়েকটি নাম পাওয়া যায়, যেমন সমুদ্র, বৈতরণী, স্বর্গগঙ্গা ইত্যাদি। নীহারিকার পারমাণবিক পদার্থকে প্রাচীন ঋষিরা সমুদ্রের ফেনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁদের ভাষায় দস্র ও নাসত্য নামের যুগ্মতারা দুটি নীহারিকার পারমাণবিক পদার্থের অপসারণ করে মেশরাশির তারাগুলিকে উন্মোচিত করেছে। তাই আধুনিক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বলা যায় অশ্বিদ্বয় দেবতা নন, দেব-বৈদ্যও নন। এরা অশ্বিনী নক্ষত্রের দুটি যুগ্মতারা।

তথ্য সূত্রঃ
১) অরূপরতন ভট্টাচার্য– প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, কলকাতা, ২০০৬

২) রমেশচন্দ্র দত্ত– ঋগ্বেদ-সংহিতা, কলিকাতা, ১২৯২
৩) সুকুমাররঞ্জন দাশ– হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৫৩

****

পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক?

ঋজু গাঙ্গুলী

অন্ধকার হল। সামনে পর্দা জুড়ে ধু-ধু বরফ। তার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে উজ্জ্বল লাল জ্যাকেট পরা এক অভিযাত্রী। হঠাৎ সে একটা গর্জন শুনতে পেল।

পেছনে তাকিয়ে কিছু একটা দেখে নিঃসীম আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল সে। প্রাণভয়ে পিছিয়ে যেতে গিয়ে অসহায় ভাবে বরফের ওপর পড়ে গিয়ে সে অপেক্ষা করতে থাকল এক যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর জন্য।

কিন্তু কিচ্ছু হল না!

অভিযাত্রী চোখ মেলে, চারদিকে খুঁজেও কাউকে দেখতে পেল না।

আমরাও পেলাম না। শুধু তখন নয়, পরের সোয়া দু'ঘন্টা জুড়েই!

হল থেকে গম্ভীর মুখে বেরোবার সময়েই বুঝতে পেরেছিলাম, শনিচক্রের 'ইয়েতি অভিযান' সুখের হয়নি।

প্রিয়া সিনেমা হলের সামনে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ দিয়ে তখন উন্মত্ত জনস্রোত ধেয়ে চলেছে কালীঘাট মেট্রো থেকে গড়িয়াহাটের দিকে। দেশপ্রিয় পার্ক-এর চারপাশে পা রাখার জায়গা নেই।

কিন্তু তার মধ্যেই, হল থেকে বেরিয়ে অনেক কষ্টে পুলিশি ব্যারিকেড আর ভিড় সামলে বাড়ির দিকে যখন এগোচ্ছি, তখন জামার হাতায় টান পড়ল। বিরক্ত মুখে টানের উৎসের দিকে তাকিয়েই একটা ভীষণ সহজ, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের সামনে পড়ে গেলাম।

"বাবা", মেঘনা জিজ্ঞেস করল, "ইয়েতি কি সত্যিই আছে?"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘামতে-ঘামতে উত্তরটা দেওয়া সম্ভব ছিল না। প্রসেনজিৎ-আরিয়ান-যিশু-ফিরদৌস-বিদ্যা সমৃদ্ধ সিনেমাটা আমার সঙ্গে পা মেলানো মানুষদের অধিকাংশকেই বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, এবং অনেকাংশে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে, সেটা আশেপাশের সবার মুখেই স্পষ্ট ছিল। ইয়েতি আছে কি নেই, সেই প্রশ্নের উত্তরটাও যে অধিকাংশের কাছে অস্পষ্ট, সেটাও বুঝতে পারছিলাম।

ফ্ল্যাটে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে এসেই বুঝলাম, শুধু মেয়ে নয়, অনুমিতা, মধুরিমা, তোশালি, এমনকি বাড়ির প্রবল প্রতাপান্বিত অভিভাবক, সবার মনেই প্রশ্নটা জেগেছে। চটজলদি ডিনারের আশা ছেড়ে সোফায় বসেই অতঃপর ইয়েতির ইতিবৃত্ত শুরু করতে হল।

"বছরটা ১৯২১", আমি শুরু করি, "ব্রিটিশ মাউন্ট এভারেস্ট রিকনেইস্যান্স এক্সপিডিশন-এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল চার্লস হাওয়ার্ড-বারি। সমুদ্রতল থেকে ২১,০০০ ফুট, মানে প্রায় ৬৪০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত লাখপা-লে এলাকা পার হওয়ার সময় বরফে কিছু পায়ের ছাপ দেখেন হাওয়ার্ড-বারি ও তাঁর সঙ্গীরা।

হাওয়ার্ড-বারি'র প্রাথমিকভাবে ধারণা হয়েছিল, হিমালয়ান গ্রে উলফ বা ওই জাতীয় কোনো প্রাণীর চলার ফলে ওই দাগগুলো তৈরি হয়েছে। কিন্তু জীবজগৎ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ছিল বলেই পায়ের ছাপগুলো দেখে পরে তিনি কোনো চতুষ্পদ প্রাণীর বদলে দ্বিপদের, বিশেষত খালি পায়ে চলা বড়োসড়ো মানুষের কথাই ভেবেছিলেন।

তাঁর সঙ্গে যে শেরপারা ছিল, তারা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বলে যে এই পায়ের ছাপ 'ওয়াইল্ড ম্যান অফ দ্য স্নোজ' বা মিতোহ-কাংমির। তিব্বতি ভাষায় মিতোহ মানে হল মানুষ-ভালুক, আর কাংমি মানে বরফের মানুষ। এই metoh-kangmi ১৯৩৮ সালে বিল টিলম্যান-এর লেখা 'মাউন্ট এভারেস্ট' নামক বইয়ে ভুলভাবে metch-kangmi হয়ে ছাপা হলে প্রচুর সংশয় তৈরি হয়।

কিন্তু ওই প্রাণীটির বদনামের জন্য দায়ী দ্য স্টেটসম্যান-এর সাংবাদিক হেনরি নিউম্যান। 'এভারেস্ট রিকনেইস্যান্স এক্সপিডিশন' সেরে দার্জিলিং-এ ফিরে আসা পোর্টারদের সাক্ষাৎকার নিয়ে 'কিম' ছদ্মনামে সেটা প্রকাশ করার সময় তিনি 'মিতোহ' শব্দের মানে করেন 'নোংরা'। এর ফলে প্রাণীটি শেষ অবধি জঘন্য তুষারমানব বা অ্যাবোমিনেবল স্নোম্যান নামেই পাশ্চাত্যের কাছে পৌঁছয়।

আর তার পরেই শুরু হয় ইয়েতির সন্ধান"।

"কিন্তু", প্রশ্নটা করার জন্য তোশালি অনেকক্ষণ ধরে উশখুশ করছিল, "এর আগে কি ওই প্রাণীর ব্যাপারে কেউ কিছুই জানত না?"

"কেন জানবে না?", আমি প্রতিবাদ জানাই, "এইচ. স্লিগার তাঁর 'হিমালয়ান অ্যানথ্রোপলজি: দ্য ইন্দো-টিবেটান ইনটারফেস' বইয়ে জানিয়েছেন যে লেপচা-সহ বহু হিমালয়বাসী উপজাতির প্রাক-বৌদ্ধ চিন্তাভাবনায় হিমবাহের বাসিন্দা এক প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যাকে শিকারের দেবতা বলে মনে করা হত।

১৮৩২ সালে জেমস প্রিন্সেপের সম্পাদনায় 'জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'-এ বিখ্যাত ট্রেকার বি.এইচ. হডসনের উত্তর নেপাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়। হডসন লিখেছিলেন, তাঁর সঙ্গী গাইডদের সামনে পড়ে একটি লম্বা, দু'পেয়ে, লোমশ প্রাণী ভয়ে পালিয়ে গেছিল, যাকে দেখে তাঁর ওরাং-ওটাং বলে মনে হয়েছিল।

১৮৯৯ সালে লরেন্স অস্টিন ওয়াডেল-এর 'অ্যামং দ্য হিমালয়াস'-এ প্রথমবার প্রাণীটির পায়ের ছাপের বিবরণ নথিভুক্ত হয়। ওয়াডেল-এর গাইডরা একে পাহাড়ের বাসিন্দা দু'পেয়ে বনমানুষের পায়ের ছাপ বলে দাবি করলেও সত্যিকারের একটিও প্রত্যক্ষদর্শী না পেয়ে ওয়াডেল সিদ্ধান্ত নেন যে এগুলো কোনো ভালুকের পায়ের ছাপ।

১৯২৫ সালে রয়েল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি-র সদস্য ও ফোটোগ্রাফার এন.এ. টমবাজি উত্তর সিকিমের জেমু গ্লেসিয়ারের কাছে, প্রায় ১৫,০০০ ফুট বা ৪৬০০ মিটার উচ্চতায়, মোটামুটি আড়াইশো মিটার দূরত্ব থেকে, একটি বিশেষ প্রাণীকে দেখেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, প্রাণীটি ছিল বাহ্যিকভাবে মানুষের মতোই, তবে তার গায়ে কোনো পোশাক ছিল না, ছিল শুধু গাঢ় রঙের লোম। দু'পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকা প্রাণীটি মাঝেমধ্যে নিচু হয়ে ছোটো গাছ-গাছড়া তুলে খাচ্ছিল। প্রাণীটি চলে যাওয়ার পর টমবাজি ও তাঁর গাইডরা জায়গাটায় গিয়ে তার পায়ের ছাপ দেখতে পান, যা ছিল মানুষের মতোই, শুধু ছ'-সাত ইঞ্চি লম্বা আর চার ইঞ্চি চওড়া!

১৯৪৮ সালে, ওই একই জায়গায়, রয়েল এয়ার ফোর্সের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে পাহাড় চড়তে যাওয়া পিটার বিয়ার্ন পায়ের ছাপ দেখেন।

তবে আসল বিস্ফোরণটা হয় এরপর।"

"কী হয়েছিল?", সমস্বরে প্রশ্নটা ভেসে আসায় আরো একবার সৃজিত অ্যান্ড কোং-এর সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করার কথাটা মনে হয় আমার। মাথা ঝাঁকিয়ে

কথায় ফিরে আসি আমি।

“১৯৫১ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ পর্বতারোহী এরিক শিপটন মাউন্ট এভারেস্ট অভিযান করেন। প্রায় ২০,০০০ ফুট বা ৬০০০ মিটার উচ্চতায় তিনি বরফের বুকে এক সারি স্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখতে পান। তিনি সেগুলোর ফটো তোলেন, এবং লোকালয়ে ফিরে এসে সেগুলো লোকের কাছে পেশ করেন।

১৯৫৩ সালে স্যার এডমন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগে যখন তাঁদের অভিযান চালান, তখন তাঁরাও এমন বেশ কিছু ছাপ দেখেছিলেন। হিলারি প্রথম থেকেই ইয়েতি-র অস্তিত্বে সন্দিহান ছিলেন। তেনজিং প্রথমে পায়ের ছাপগুলো ইয়েতির বলে মনে করলেও পরে মত বদলান।

কিন্তু এইসব দেখেশুনে বিদেশে ইয়েতির সুলুক-সন্ধান চেয়ে হাহাকার পড়ে যায়। ফলে মাঠে নামে ডেইলি মেল পত্রিকা। ১৯৫৪ সালে তারা ইয়েতির সন্ধানে এক বিশাল অভিযান চালায়।

এই অভিযানে পর্বতারোহীদের নেতা জন এঞ্জেলো জ্যাকসন এভারেস্ট থেকে কাঞ্চনজংঘা অবধি ট্রেক করার সময় তেংবোচে গুমফায় ইয়েতির বেশ কিছু আঁকা ছবি দেখতে পান। কৌতূহলী হয়ে তার আশেপাশে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে তিনি বরফে বেশ কিছু পায়ের ছাপ দেখতে পান, ও ফটো তুলে আনেন। পরে এই ফটোর মধ্যে অধিকাংশ পায়ের ছাপকেই কোনো-না-কোনো প্রাণীর বলে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা গেছে। কিন্তু কয়েকটা ছাপ চেনাজানা প্রাণীদের সঙ্গে মেলানো যায়নি।

এই অভিযান চালাতে গিয়ে পাংবোচে মনাস্ট্রি থেকে পাওয়া একটা জিনিসকে ইয়েতির চুল লেগে থাকা মাথার চামড়া, বা স্ক্যাল্প, বলে দাবি করে একটা লেখাও প্রকাশ করে ডেইলি মেল। তবে তুলনামূলক দেহতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ফ্রেডরিক উড জোনস সেটা খুঁটিয়ে দেখে স্পষ্টভাবেই বলেন যে মানুষের মতো কোনো প্রাণী বা অ্যানথ্রপয়েড এপ থেকে ওই চুল বা লোম ও চামড়া পাওয়া যায়নি।

যথারীতি, এই রসকষহীন উত্তরটা অধিকাংশ মানুষের পছন্দ হয়নি। তার ওপর ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত বই ‘দ্য লং ওয়াক’-এ অভিযাত্রী স্লায়োওমির রাউইকজ দাবি করেন, ১৯৪০-এর শীতে হিমালয় পেরোবার সময় তিনি ও তাঁর সহযাত্রীরা প্রায় দু’ঘন্টা আটকে থাকেন, কারণ তাঁদের পথের ওপর দুটি লোমশ বিশালদেহী প্রাণী উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটাহাঁটি করছিল।

১৯৬০ সালে হিলারি ইয়েতির সন্ধানে একটি অভিযান চালান। খুমিয়াং মনাস্ট্রি থেকে আরেকটি কথিত ইয়েতির স্ক্যাল্প তিনি সংগ্রহ করেন, যা পরীক্ষা করে জানা যায় যে সেটি এক ধরনের হিমালয়ান অ্যান্টিলোপের চামড়া ও লোম দিয়ে বানানো।

তবে হ্যাঁ, ভুটানে ইয়েতি নিয়ে কিংবদন্তী এবং গল্প এতই জনপ্রিয় ছিল যে ১৯৬৬ সালে ‘ফোকটেলস অফ ভুটান’ সিরিজে ইয়েতি নিয়ে একটা ডাকটিকিট-ই বের করে ফেলে ভুটান পোস্ট!

১৯৭০ সালে ব্রিটিশ পর্বতারোহী ডন হুইল্যান্স অন্নপূর্ণা অভিযানের সময় কোনো প্রাণীর চিৎকার শুনতে পান, যেটা তাঁর সঙ্গী শেরপাদের মতে ছিল ইয়েতির ডাক। রাতে, তাঁদের ক্যাম্পের কাছে গাঢ় রঙের লোমে ঢাকা একটি দু’পেয়ে লম্বা প্রাণীকে দেখেন হুইল্যান্স নিজেই।

১৯৭২ সালে পৃথিবীর গভীরতম উপত্যকা, নেপালের বারুন ভ্যালিতে ক্রোনিন ও ম্যাকনিলি-র নেতৃত্বে অভিযান চালানো হলে সেখানে অজ্ঞাত কোনো দু’পেয়ে লম্বা প্রাণীর পায়ের ছাপ পাওয়া যায়। ওই উপত্যকায় ইয়েতির অস্তিত্ব আছে কি নেই, সেটা নিশ্চিতভাবে জানার জন্য হিমালয়ান কনসার্ভেশনিস্ট ড্যানিয়েল সি টেইলর,

এবং ন্যাচারাল হিস্টোরিয়ান রবার্ট এল ফ্লেমিং জুনিয়র ১৯৮৩ সালে বারুন ভ্যালিতে খুব খুঁটিয়ে খোঁজাখুঁজি করেন।

এই অভিযানে এমন কিছু পায়ের ছাপ ওই উপত্যকায় পাওয়া যায়, যাতে হেলাক্স, অর্থাৎ পায়ের বুড়ো আঙুলের উপস্থিতি, এবং দু'পেয়ে চলন দেখে প্রায় নিশ্চিতভাবেই ওটা কোনো হোমিনয়েড-এর বলে মনে হয়"।

"হোমিনয়েড মানে কী?", অনুমিতার প্রশ্নটা আমাকে থামিয়ে দিল। বাকিদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি থেকে বুঝলাম, প্রশ্নটা সবার। অতঃপর আমাকে মেয়ের ড্রইং খাতার একটা পাতায় দাগ কেটে-কেটে ব্যাপারটা বোঝাতে হল।

"স্তন্যপায়ী প্রাণী, বা ম্যামেলস-এর মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের প্রাণীদের বলা হয় প্রাইমেটস। এদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা দিয়ে সহজেই এদের অন্য স্তন্যপায়ীদের থেকে আলাদা করা যায়, আর সেই বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

- কাঁধের জয়েন্ট বা সন্ধিস্থলটা নমনীয়,
- আঙুলের ডগা শুধুই ধারালো নখ বা খুর ধরে রাখার জন্য নয়, বরং সেই জায়গাটা দিয়ে কিছু অনুভব করা যায়,
- হাত শরীরের দুপাশে ঝোলাতে পারে, ও তাই দিয়ে খাবার নাড়াচাড়া করতে পারে, এবং
- চোখজোড়া মাথার সামনের দিকে থাকায় বাইনোকিউলর ভিশন-এর সুবিধা পায়, যাতে ওভারল্যাপিং-এর মাধ্যমে দৃষ্ট বস্তু স্রেফ দ্বিমাত্রিক না থেকে তাতে গভীরতার অনুভূতিও আসে।

এই প্রাইমেটসদের দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, (১) প্রোসিমিয়ানস, (২) অ্যানথ্রোপয়েডস।

প্রোসিমিয়ানস-দের মধ্যে আছে লেমুরিফর্মস, যাদের মধ্যে পড়ে যাবতীয় লেমুর ও লরিস জাতীয় বাঁদর, এবং টারসিফর্মস, যাদের মধ্যে এখন টিঁকে আছে শুধু ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জ ও তার কাছাকাছি দ্বীপে থাকা টারসিয়ার নামের, বড়ো চোখের, একধরনের ছোটোখাটো প্রাণী। এদের ওয়েট-নোজড প্রাইমেটস-ও বলা হয়। অ্যানথ্রোপয়েডস বর্গের প্রাণী, তথা ড্রাই-নোজড প্রাইমেটদের আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) প্ল্যাটিরিনি, যাদের মধ্যে পড়ে মেক্সিকো, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দা যাবতীয় নিউ ওয়ার্ল্ড মাংকি, অর্থাৎ মার্মোসেট, স্কুইরেল মাংকি, হাউলার মাংকি, ইত্যাদি।

(২) ক্যাটারিনি, যাদের মধ্যেও দুটো বড়ো গ্রুপ পাওয়া যায়:

(ক) ওল্ড ওয়ার্ল্ড মাংকিজ, অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা সহ বাকি এলাকার বাসিন্দা যাবতীয় বাঁদর।

(খ) হোমিনয়েডস, মানে একটু আগে যার কথা বলা হল। মাংকিজ-দের থেকে এদের আলাদা করে দেয় বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য, যাদের মধ্যে আছে,

- ✓ তুলনামূলকভাবে বড়ো চেহারা;
- ✓ লেজের অনুপস্থিতি;
- ✓ ট্রাংক, মানে মুখের সামনে উঁচু হয়ে থাকা অংশটা ছোটো হওয়া;
- ✓ স্বভাবগত জটিলতা;
- ✓ মস্তিষ্কের আকার ও জটিলতা দুই-ই বেশি হওয়া;
- ✓ শৈশবের সময়কাল, এবং নির্ভরশীলতা, দুই-ই বেশি হওয়া।

এই হোমিনয়েডস-দের আবার তিনটে বড়ো শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

১] হাইলোব্যাটিডস, বা লেসার এপস, যাদের মধ্যে আছে মূলত গিবন ও সিয়ামাং জাতীয় প্রাণী।

২] পংগিডস, বা গ্রেট এপস, যাদের মধ্যে আছে ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জি, আর গরিলা।

৩] হোমিনিডস, অর্থাৎ বিবর্তনের ধারায় মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছে বা থেকেছে যারা, সেইসব প্রাণী। এদের মধ্যে সবচেয়ে আগে আসে অস্ট্রালোপিথিচিনস, যারা আজ নিশ্চিহ্ন। তার পরে আসে 'হোমো' জেনাস-ভুক্ত বিভিন্ন প্রাণী, যাদের মধ্যে হোমো সেপিয়েন্স ছাড়া সবাই নিশ্চিহ্ন।

"মানে," এতক্ষণে দম ফেলার সুযোগ পাই আমি, "বারুন ভ্যালিতে যাদের পায়ের ছাপ দেখা গেছিল, তাদের কোনো-না-কোনো এপ বা মানুষ হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়"।

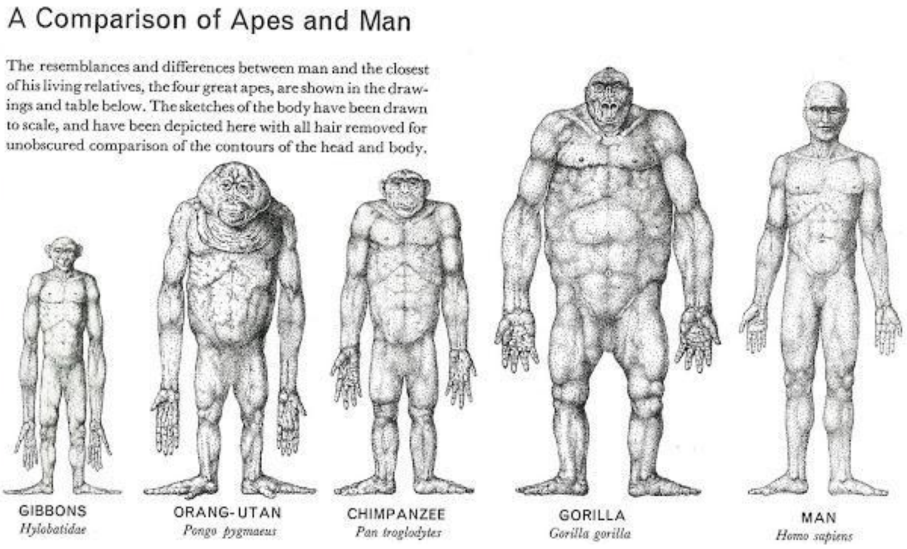

“এরা সাইজে কতটা বড়ো হয়?”, জানতে চায় মধুরিমা।

উত্তর হিসেবে আমার হাতে আঁকা পচা ছবির বদলে এই স্কেচটা পেশ করছি।

“আচ্ছা বাবা”, এবার মেঘনা প্রশ্ন তোলে, “ম্যান আর মাংকিজ-রা কি একইসঙ্গে ইভলভ করেছে, না কি আলাদা-আলাদা সময়ে?”
“বিবর্তন বা ইভলিউশন একটা নদীর মতো,” আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি, “যাতে এক-একটা সময়ে এক-একটা শাখা তৈরি হয়েছে।
ব্যাপারটা বোঝার জন্য আর দুটো ছবি তুলে ধরা যাক।

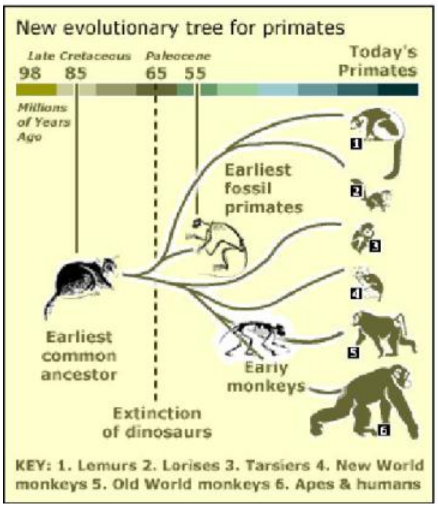

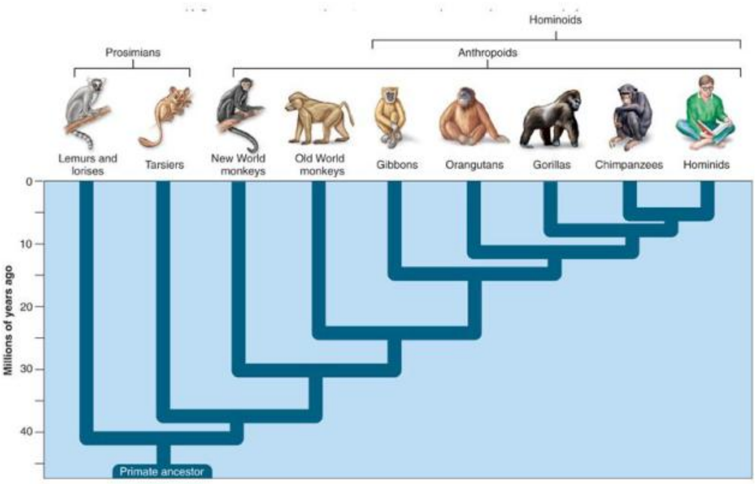

“কিন্তু,” বিবর্তন থেকে আমি আবার হিমালয়ে ফিরে আসতে সচেষ্ট হই, “বারুন ভ্যালিতে অভিযান চালাতে গিয়ে টেলর-ফ্লেমিং এক্সপিডিশন আরো কিছু জিনিস জানতে পারে। তারা গাছের মধ্যে কিছু ইন্টারেস্টিং বাসা বা নেস্ট পায়, এবং পায় একটু ছোটো আকারের ৭০ কিলো ওজনের ‘রুখ বালু’ বা ট্রি-বিয়ার ও বড়ো, হিংস্র, ১৮০ কিলো ওজনের ‘ভুই বালু’ বা গ্রাউন্ড-বিয়ার সম্বন্ধে প্রচুর রিপোর্ট। কয়েকটি খুলিও সংগৃহীত হয় ওই অভিযানে, যাদের সঙ্গে স্মিথসনিয়ান, অ্যামেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি, ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা নানা খুলির সঙ্গে তুলনা করে একটিই নতুন প্রজাতির ভালুকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ওই উপত্যকায়”।

“তার মানে”, কথাটা শ্রীমতী বললেও ঘরের সবার লম্বা মুখগুলো দেখে বুঝি যে অনুভূতিটা সবার, “ইয়েতি বলে কিছু নেই?”

“মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসটা ঠিক সরলরৈখিক নয়”, গম্ভীর হয়ে বলি আমি, “পাঠ্য বইয়ে যে ছবিটা থাকে, সেটা এরকম:

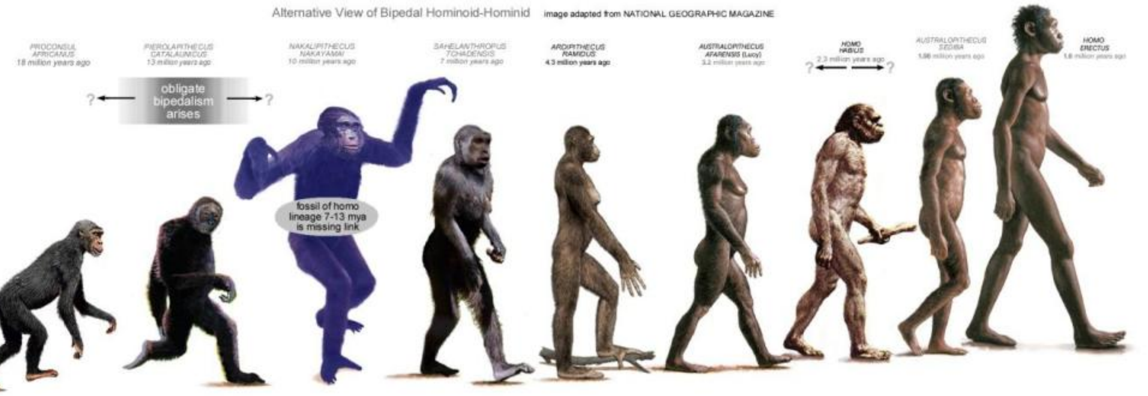

“কিন্তু হোমো ইরেক্টাস নামের মধ্যে গুঁজে দেওয়া হয়েছে আরো বেশ কিছু প্রজাতি, যাদের মধ্যে একটি হল হোমো হাইডেলবার্গেনসিস। আজ থেকে প্রায় আঠেরো থেকে ছয় লক্ষ বছর আগে এদের অস্তিত্বের যেসব চিহ্ন পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে এরা ধারালো অস্ত্রের ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। হাড়, বিশেষত মাথার খুলির পর্যবেক্ষণ করে বোঝা গেছে যে আধুনিক হোমো সেপিয়েন্স-এর মস্তিষ্কের আয়তনের প্রায় ৯৩% ছিল এর মস্তিষ্কের আয়তন, যেখানে হোমো ইরেক্টাস-এর ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ৭৪%।

অনুমান করা হয় যে এই হোমো হাইডেলবার্গেনসিস থেকেই, আজ থেকে মোটামুটি পাঁচ লক্ষ বছর আগে, নিয়ানডারথাল এবং ডেনিসোভান প্রজাতি আলাদা হয়ে যায়।

ইথিওপিয়ার ওমো নদীর ধারে পাওয়া ফসিল থেকে বোঝা যায় যে প্রায় দু’লক্ষ বছর আগে দেহতত্ত্বের দিক দিয়ে আধুনিক মানব বা হোমো সেপিয়েন্স আত্মপ্রকাশ করে।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, এরপর হোমো সেপিয়েন্স নানা রূপান্তর ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের অন্য ভাই-বেরাদরদের চেয়ে এগিয়ে গেলেও, আজ থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার বছর আগে অবধিও নিয়ানডারথালরা টিঁকে ছিল। কিন্তু তারপর, তীর-ধনুক-আগুন নিয়ে আক্রমণ চালানো মানুষদের সামনে তারা বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু তার পরেও, দীর্ঘ দিন ধরে অজস্র উপকথায় তাদের অস্তিত্ব থেকে গেছে। আজও জঙ্গল বা গুহার বাসিন্দা আদিম মানব বা এপ-দের যেসব প্রবাদ ও কিংবদন্তী শোনা যায়, তাদের মধ্যে অনেকগুলোরই উৎস হল আমাদের সেই প্রাচীন আত্মীয়রা, অর্থাৎ নিয়ানডারথাল।

“২০০৩ সালে এশিয়া হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় হোমো সেপিয়েন্স কীভাবে পৌঁছেছিল, সেই নিয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ খুঁজে পাওয়ার আশায় একটা ইন্দোনেশীয়-অস্ট্রেলীয় টিম ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেন্স দ্বীপে অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। সেখানকার লিয়াং বুয়া গুহায় তারা একটা প্রায় সম্পূর্ণ, এবং সাতটা আংশিক কঙ্কাল খুঁজে পায়। মোটামুটি ৯৫,০০০ থেকে ১৩,০০০ হাজার বছর পুরোনো এই কঙ্কালগুলো উচ্চতায় ছিল সাড়ে তিন ফুটের কাছাকাছি, আর ক্রেনিয়াল ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ মগজের আয়তন ছিল হোমো সেপিয়েন্সের তুলনায় কম। এছাড়া হোমো ইরেক্টাস তো বটেই, এমনকি হোমো সেপিয়েন্সের সঙ্গে তাদের দারুণ সাদৃশ্য দেখে বিজ্ঞানীরা রীতিমতো দ্বিধায় পড়েন, যে এরা একটা নতুন প্রজাতি, নাকি হোমো সেপিয়েন্স-এরই একটা রোগগ্রস্ত বা প্যাথলজিক্যাল চেহারা।

অবশেষে, তিন ফুট উচ্চতার মানবের পক্ষেই মানানসই এমন বেশ কিছু পাথরের জিনিস পাওয়ার পর, এবং হোমো সেপিয়েন্সের ওই অঞ্চলে ৫০,০০০ বছর আগে পদার্পণের ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার পর বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করেন যে এটি একটি আলাদা প্রজাতি। হোমো ইরেক্টাস এই অঞ্চলে এসে পৌঁছনোর পর সম্ভবত খাবারের অভাবেই তারা ‘ইনসুলার ডোয়ার্ফিজম’ নামক এক ধরনের বামনত্বের শিকার হয়। এতেই তাদের দৈর্ঘ্য, এবং মস্তিষ্কের আয়তন কমে যায়। এই প্রজাতিকে, আবিষ্কারের স্থানের ভিত্তিতে, হোমো ফ্লোরেসিয়েনসিস বলা হয়।

বিজ্ঞানীরা এই নতুন প্রজাতির আবিষ্কারে আরো বেশি করে উত্তেজিত হন, কারণ ইন্দোনেশিয়ার ওই অঞ্চলে ‘এবু গোগো’ নামে একধরনের ছোটো আকারের মানুষের প্রবাদ ও গল্প দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আছে। এই ছোটো মানুষেরা নাকি আগুনের ব্যবহার জানে না। তাই কাছাকাছি মানুষের সমাজ থেকে তারা ছোটো

ছেলে-মেয়েদের চুরি করে নিয়ে যেত তাদের দিয়ে রান্না করাবে বলে। অবশ্য এই ছেলেমেয়েরা তাদের বোকা বানিয়ে পালিয়েও আসত।

এরা ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া-তে 'ওরাং পেন্ডেক' নামে এক ধরনের ছোটো চেহারার, মানে ৮০ থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার উচ্চতার লোমশ দ্বিপদের অস্তিত্বের কথা চালু আছে সুমাত্রায়।

এইসব প্রবাদ, এবং হোমো ফ্লোরেসিয়েনসিস-এর মাত্র বারো-তেরো জাহার বছর আগে অবধিও আধুনিক মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানের নিশ্চিত প্রমাণ দেখে বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকার সম্পাদক হেনরি গি ২০০৪ সালে বলেন, ইয়েতির প্রবাদ ও কিংবদন্তীর পেছনেও এমন কোনো, এখনও খুঁজে না পাওয়া মানুষের জ্ঞাতি প্রজাতির অস্তিত্ব থাকতেই পারে"।

"তাহলে এর পরেও কি ইয়েতি নিয়ে খোঁজাখুঁজি হয়েছিল?", জানতে চায় তোশালি।

"তোমরা কেউ জায়গান্টোপিথিকাস-এর নাম শুনেছ?", আমি প্রতিপ্রশ্ন করি।

সবার মুন্ডুগুলো এত জোরে এদিক-ওদিক হতে লাগল, যে আমি ভয়ই পেয়ে গেলাম, পাছে সামনে বসা জনতা কবন্ধ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি আবার কথা শুরু করলাম আমি।

"আজ থেকে প্রায় ন'লক্ষ বছর আগে থেকে শুরু করে লাখখানেক বছর আগে অবধিও ভারত, চিন, এবং ভিয়েতনামে অস্তিত্ব ছিল মানুষের এই জ্ঞাতি ভাইয়ের।

চিনে নানা রকম পুরোনো হাড় বা ফসিল 'ড্রাগন বোনস' হিসেবে বিক্রি হয়। সেগুলো গুঁড়ো করে ওষুধ হিসেবে খাওয়ার জন্য, আর তাতে গরম শিক চেপে ধরলে যেসব ফাটল তৈরি হয় তার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ গণনার জন্য কাজে লাগে"।

সমস্বরে "ইয়াক!" ধ্বনি শুনে বুঝি, ব্যাপারগুলো আধুনিকাদের মোটেই পছন্দ হয়নি। আমি কথা চালিয়ে যাই।

"১৯৩৫ সালে অ্যানথ্রোপলজিস্ট র‍্যালফ ভন কোয়েনিগসওয়াল্ড চিনের এমনই এক ওষুধের দোকানে, এই প্রজাতির হাড় আবিষ্কার করেন। নিজের বন্ধু ও সহকর্মী ডেভিডসন ব্ল্যাকের সম্মানার্থে তিনি এই প্রজাতির নামকরণ করেন জায়গান্টোপিথিকাস ব্ল্যাকি।

ফসিল থেকে মনে হয় যে এই প্রজাতির প্রাণীরা লম্বায় প্রায় তিন মিটার বা ৯.৮ ফুট, এবং ওজনে ৫৪০ থেকে ৬০০ কিলো অবধি হত। তবে হ্যাঁ, বাস্তবে হয়তো এমন দৈর্ঘ্যের জায়গান্টোপিথিকাস কমই ছিল। মোটামুটি সাড়ে ছ'ফুট উচ্চতার, আর দু'শো কিলোর কাছাকাছি ওজনের হত এই প্রজাতির প্রাণীরা, এমনটাই এখন ভাবা হচ্ছে।

অস্ট্রালোপিথিকাস-এর বংশধর, এবং ওরাং-ওটাং-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এই প্রাণীরা এখনও হিমালয়ের বরফ আর দুর্গম অরণ্যে লুকিয়ে আছে, আর তাদের নিয়েই ইয়েতি-র প্রবাদ লোকমুখে ছড়িয়েছে, এমন দাবি কেউ-কেউ করেছেন ঠিকই।

কিন্তু..."

"কিন্তু?", জানতে চাইল অনুমিতা।

"কিন্তু ওই বিশালকায় প্রাণীটির পক্ষে দু'পায়ে হাঁটা প্রায় অসম্ভব। তার বদলে গোরিলার মতো চার পায়ে হাঁটলেই তার পক্ষে স্বাভাবিক চলাফেরা করা সম্ভব। অথচ ইয়েতি সম্বন্ধে যা জানা গেছে তাতে এটা নিশ্চিত যে সে দু'পেয়ে।

তাছাড়া এই প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে চিনের জায়েন্ট পান্ডাদের বিলুপ্ত পূর্বপুরুষদের জায়গাতেই, অর্থাৎ এরা মূলত বাঁশ, এবং বিভিন্ন ফল ও শক্ত ডাঁটা খেয়ে বাঁচত। হিমালয়ের ওই উচ্চতায় এদের খাবার আসবে কোত্থেকে? ইন ফ্যাক্ট, প্লিসটোসিন যুগে আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে এদের পরিবেশ ও আবহাওয়া বদলে যাওয়ার পর তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরেই তো এরা বিলুপ্ত হয়। তাই ইয়েতি আমাদের কোনো ভুলে-বিছড়ে আত্মীয়, এটা ঠিক মেনে নেওয়া যাচ্ছে না"।

ঘরে সবাই চুপ-চাপ হয়ে গেছে দেখে আমি আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

"ডিসেম্বর ২০০৭-এ অ্যামেরিকান টেলিভিশন প্রেজেন্টার জোশুয়া গেটস তাঁর 'ডেস্টিনেশন ট্রুথ' নামক টিমের সঙ্গে এভারেস্ট এলাকায় পৌঁছন। তিনি পরে দাবি করেন যে তাঁরা এমন বেশ কিছু পায়ের ছাপ

দেখেছেন, যেগুলো লম্বায় ৩৩ সেন্টিমিটার বা ১৩ ইঞ্চি, আর পাঁচটা আঙুল নিয়ে চওড়ায় প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার বা ৯.৮ ইঞ্চি। সেই ছাপগুলোর কাস্ট পর্যবেক্ষণ করে ইডাহো স্টেট ইউনিভার্সিটির অ্যানথ্রোপলজিস্ট ও অ্যানাটমিস্ট ডক্টর জেফ্রি মেলড্রাম প্রথমে ছাপগুলোকে 'আসল' বললেও পরে মত বদলান। পরে গেটস ২০০৯-এ আবার এভারেস্ট অভিযানে গিয়ে কিছু লোম সংগ্রহ করেন, যেগুলোর জিনগত বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে সেটা এখনও অজানা তথা ডেটাবেসে রেকর্ড নেই এমন কোনো প্রাণীর।

এরপর আরো বেশ কিছু এক্সপিডিশন হয়েছে নানা জায়গায়। কখনও ভুটানের পাহাড়ে, কখনও চিনের হুবেই প্রদেশের শেনংজিয়া জঙ্গলে, কখনও বা মেঘালয়ের গারো পাহাড়ে! কিন্তু ইয়েতির মুখোমুখি হওয়া শুধু রোমহর্ষক গল্প-উপন্যাসের বিষয় হয়েই রয়ে গেছে"।

একদম চুপচাপ হয়ে গেছিল ঘরটা। বাইরে কলকাতা ভিড়ে হয়রান। প্রিয়া থেকে অ্যাক্রোপলিস, সব হল থেকে তখন দর্শকেরা যাবতীয় লেনদেন ফুরোনোর পর আনন্দ বা হতাশা বুকে নিয়ে, বাড়ি বা নিকটতম পুজোপ্যান্ডেলের দিকে এগোচ্ছেন।

কিন্তু আমাদের ইয়েতি অভিযান তখনও "শেষ হয়ে হইল না শেষ" অবস্থায় রয়েছে, এটা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম।

এবং ঠিক সেটাই হল। নীরবতা ভেঙে এবার তোশালি রীতিমতো প্রতিবাদ করল, "তাহলে তুমি সেদিন যে গল্পটার কথা বলছিলে, সেগুলো কি সব বানানো?"

বিপন্ন হয়ে শ্রীমতীর দিকে তাকালাম এই আশায়, যে 'খাবারগুলো গরম করতে হবে' বলে তাগাদা দিয়ে সে হয়তো আসরটা ভাঙতে সাহায্য করবে। কিন্তু দেখলাম সেই জ্যাগারিতে স্রেফ স্যান্ড হয়ে গেল, মানে তিনিও এবার গলায় বিদ্রোহ ফুটিয়ে বললেন, "তাহলে ছোটোবেলা থেকে পড়া ওই লেখাগুলো কী নিয়ে ছিল?"

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর কাকাবাবু-সন্তু অ্যাডভেঞ্চার "পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক", শেখর বসু-র রুদ্ধশ্বাস সাসপেন্সে ভরা "ইয়েতির মুখোমুখি", এবং একেবারে সম্প্রতি হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত-র লেখা ক্রিপ্টোজুলজিস্ট জুটি হেরম্যান-সুদীপ্তর কাহিনি "বরফদেশের ছায়ামানুষ", আনন্দমেলার পাতায় পড়া এই রোমাঞ্চকর উপন্যাসগুলো আমাদের নিয়ে গেছে কলকাতার এই ভ্যাপসা গরম থেকে অনেক দূরে, শীতল মৃত্যু আর অজানা বিপদে ভরা এক প্রান্তরে, বারবার। শুধু হাওয়ায় ভর দিয়ে লেখা হয়েছে এইসব কাহিনি, এটা মানা কি সহজ?

"ইয়েতি নিয়ে বিভিন্ন অভিযান চালানোর সময় থেকেই বারবার বলা হয়েছে", একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার কথা শুরু করি আমি, "যে, এই কিংবদন্তীগুলোর উৎস হল এই এলাকার কোনো-না-কোনো ভালুক, যাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত রেকর্ড বিজ্ঞানী ও অভিযাত্রীদের কাছে নেই। কখনও ভাবা হয়েছে যে সে হল হিমালয়ান ব্রাউন বিয়ার (Ursus Arctos Isabellinus), কখনও বা তাকে গোলানো হয়েছে টিবেটান ব্লুবিয়ার (Ursus Arctos Pruinosus)-এর সঙ্গে।

ইয়েতির সন্ধানে ১৯৮৩ সালে বারুন ভ্যালিতে চালানো অভিযানের পর টেইলর, ফ্লেমিং, জন ক্রেইগহেড ও তীর্থ শ্রেষ্ঠ একটা থিওরি দেন। নেপালের মাকালু-বারুন ন্যাশনাল পার্ক এবং তিব্বতের চোমোলংমা ন্যাশনাল পার্ক এলাকায় গবেষণা চালিয়ে এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ার (Ursus Thibetanus), যার গায়ের লোমগুলো আসলে বাদামি, সম্বন্ধে প্রথমবার বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু জানতে পারেন।

এই ভালুকেরা জন্মের পর থেকে প্রথম দু'বছর, মাটিতে হেঁটে বেড়ানো হিংস্র বিশালদেহী পূর্ণবয়স্ক তথা গ্রাউন্ড-বিয়ারদের হাত থেকে বাঁচার জন্য, গাছের ওপরে থাকে, তাই তাদের স্থানীয় অধিবাসীরা ট্রি-বিয়ার বলে। এই সময়ে তারা তাদের হাতের নখগুলো ভেতর দিকে বেঁকে আসার বদলে বাইরের দিকে নিয়ে আসতে শেখে, যাতে গাছে ঝোলার জন্য প্রয়োজনীয় অপোজিবল গ্রিপ তাদের আয়ত্ত হয়।

এরাই যখন বড়ো হয়ে মাটিতে, বা বরফে হাঁটে, তখন পেছনের পা বা থাবা ঠিক সামনের পা'র দাগের ওপরেই পড়ে। এর ফলে একে তো একটি চতুষ্পদের চলন দ্বিপদের মতো মনে হয়, তার ওপর বরফে পায়ের ছাপের আঙুলের জায়গাটা গভীর হয়ে বাইরের দিকে ছড়িয়ে যায়, বিশেষত ভালুকটি যদি তখন ওপর দিকে ওঠার অবস্থায় থাকে। ফলে আদতে খুব বেশি হলে ১৯০ সেন্টিমিটার উচ্চতার আর ১০০ সেন্টিমিটার কাঁধের

একটা ভালুকের পায়ের ছাপ এমনভাবে বরফের বুকে তৈরি হয় যে প্রথম দর্শনে মনে হতে বাধ্য যে এটা কোনো, বুড়ো আঙুল বিশিষ্ট, হেলেদুলে দু'পায়ে হাঁটা হোমিনয়েডের পায়ের ছাপ!"

"তার মানে", শুকনো গলায় বলল মধুরিমা, "আসলে ইয়েতি বলে কিছু নেই? সবটাই ভালুক-কে নিয়ে ভুলভাল ভাবনা?"
"হ্যাঁ", একটু দুঃখিত গলাতেই বলতে বাধ্য হলাম আমি, "এই গবেষণা, এবং ইয়েতি নিয়ে প্রচলিত যাবতীয় কিংবদন্তী, মায় তার বিভিন্ন নামের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে ড্যানিয়েল সি টেইলর 'ইয়েতি: দ্য ইকোলজি অফ আ মিস্ট্রি' বইয়ে সন্দেহাতীত ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ইয়েতি বলে আসলে কিচ্ছু নেই, সবটাই ওই ভালুকীয় ব্যাপার।
১৯৯২ সালে মালদ্বীপের ডাক বিভাগ ইয়েতি-কে মহাবিশ্বের রহস্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটা ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল।
[ফটো০৭]
কিন্তু মে ২০১৬-তে কিরঘিজ রিপাবলিকের পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রক একজোড়া স্ট্যাম্প প্রকাশ করে, যাদের দেখলেই বোঝা যায় যে ইয়েতি আজ প্রতিষ্ঠানের নজরে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে।
[ফটো০৮]

[ফটো০৯]

[ফটো১০]

"তার মানে এভারেস্ট নামক পাহাড় চূড়ায় আর আতঙ্কের কিছু নেই, তাই তো?", সোফা ছেড়ে উঠে রান্নাঘর-মুখো হতে-হতে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেন শ্রীমতী।
"মোটেই নয়", জোর গলায় বলে উঠি আমি।
বাকিরাও একটু থমকে যায়। গল্পের আশায় ক্লান্ত চোখগুলো আবার চকচকিয়ে ওঠে।

"১৯৫৩ সালে স্যার এডমন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগে-র সেই ঐতিহাসিক শৃঙ্গবিজয়ের পর থেকে এখনও অবধি, শুধু সরকারি স্ট্যাটিস্টিকস অনুসারেই মাউন্ট এভারেস্টের মাথায় পা পড়েছে চার হাজারেরো বেশি অভিযাত্রীর। এখন, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, এবং উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে প্রতি বছর দেড়শোর বেশি অভিযাত্রী এভারেস্ট উঠতে চেষ্টা করেন।
এর ফলে দুটো স্ট্যান্ডার্ড রুট, মানে তিব্বতের দিকে নর্থ-ইস্ট রিজ ও নেপালের দিকে সাউথ-ইস্ট রিজ, বিপজ্জনক রকম ভিড়ে প্রায় জ্যামজমাট হয়ে পড়েছে।
তবে তার থেকেও বড়ো কথা হল দূষণ।
যেহেতু এভারেস্টে চড়ার সময় একটা স্তরের পর নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছাড়া কোনো জিনিস বহন করাই বিপজ্জনক ও ব্যয়সাপেক্ষ, তাই নিরুপায় হয়েই পর্বতারোহীরা ৮০০০ মিটার বা ২৬,০০০ ফুট উচ্চতার 'এক্সট্রিম অল্টিট্যুড' জোনে পৌঁছে অক্সিজেনের খালি সিলিন্ডার, খাবারের প্যাকেট, অকেজো জিনিসপত্র, এবং অন্য নানা জৈব ও অজৈব বর্জ্য ফেলে আসতে বাধ্য হন। এর ফলে পাহাড়ের পরিবেশ এতটাই বিঘ্নিত হতে থাকে যে নেপাল সরকার ২০১১ সালে শেরপাদের সংগঠন 'এভারেস্ট সামিটিয়ার্স অরগানাইজেশন'-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এভারেস্ট এলাকা থেকে প্রায় দেড় টন আবর্জনা সরিয়ে কাঠমান্ডুতে পাঠায় ট্রিটমেন্টের জন্য। পর্বতারোহীদের ওপর চার হাজার ডলার অবধি ফাইন-ও চাপানো হয়, যদি তারা নিজেদের বর্জ্য নিজেদের সঙ্গে ফিরিয়ে না আনে।
তিব্বতের দিকে রাস্তা কঠিন বলে পর্বতারোহীর সংখ্যা কম। সেই তুলনায় তিব্বতের এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে বিদেশি ট্যুরিস্টরা আসে গাড়িতে চেপে, এভারেস্টের দৃশ্য উপভোগ করতে। তাই সেই দিকে দূষণের চরিত্র

একেবারে আলাদা। তাতেও চোমোলংমা ন্যাশনাল নেচার রিজার্ভ-এর কর্মীদের সম্প্রতি চারশো ব্যাগ আবর্জনা সরাতে হয়েছে ওদিক থেকে!
হ্যাঁ, একথা ঠিক যে এখন মানুষের সচেতনতাও বাড়ছে। ফলে অভিযাত্রীদের পথের গ্রামগুলোতেও এখন সৌরশক্তির ব্যবহার হচ্ছে, বিস্তীর্ণ এলাকায় প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে।
কিন্তু বিপদ আছেই। তাছাড়া চিন সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণে রেলপথ নিয়ে আসছে হিমালয়ের কাছে, আরো কাছে। তার দূষণ মাউন্ট এভারেস্টে পৌঁছনো ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ওটা ঠেকাতে না পারলে ওই এলাকার পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি ঠেকানো যাবে না”।

“তাই”, অবশেষে নিজের সিট ছেড়ে ডাইনিং টেবিল-মুখী হয়ে আমি বলি, “ইয়েতি হোক বা অন্য কোনো প্রাণী, যেই ওখানে থাকুক, তারা সবাই আপাতত মানুষের কীর্তির ঠেলাতেই সন্ত্রস্ত হয়ে আছে”।
“তাহলে মানুষই কি এখন পাহাড় চূড়ার আতঙ্ক?”, জানতে চায় মেঘনা।
বারান্দার বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে নজরটা পিছলে যায় আমার, আর চলে যায় দূরে, অনেক দূরে, ধূ-ধূ বরফের বুকে, যেখানে...
যেখানে একদল দুপেয়ে তার ঘরবাড়ি নোংরা করে চলেছে দেখে রেগে আগুন হয়ে উঠেছে ধূসর আর গাঢ় রঙের লোমে ঢাকা একটি লম্বা, বলশালী প্রাণী।
আর গর্জন তুলে ছুটে আসছে নিচে পিঁপড়ের মতো করে হেঁটে যাওয়া সার বাঁধা পর্বতারোহীদের দিকে।
তারপর...
“কী গো?”, বিরক্তি আর উদ্বেগ মেশানো গলায় জিজ্ঞেস করেন শ্রীমতী, “খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে যে!”
চটকা ভাঙে আমার। কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারি না দৃশ্যটা।

আজও এই পৃথিবীর বুকে তো কত রহস্যই আছে। তেমনভাবেই যদি কেউ, বা কিছু থেকে যায় ওই পাথর, বরফ, আর আকাশের দেশে...
তাহলে ক্ষতি কী?

কিশোর ঘোষাল

১

বিজ্ঞানের উন্নতি প্রসঙ্গে আমরা কম্পিউটার, টিভি, মোবাইল, এরোপ্লেন কিংবা মহাকাশচারী রকেট - এইসবের কথাই বলি। কিন্তু জরুরি কিছু মৌলিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত না হলে এই সব আবিষ্কার যে হতেই পারত না, সে কথা আমরা মনেও করি না। এই পর্বের আগের কয়েকটি পর্বে, এই ধরনের কিছু আবিষ্কারের কথা তোমাদের বলেছি, তার মধ্যে আছে আগুনের ব্যবহার, চাকা আবিষ্কার, মুদ্রা বা টাকার ব্যবহার, ঘরবাড়ি বানানো, রাস্তাঘাট বানানো ইত্যাদি। এবারে বিজ্ঞানের যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবো, সেই লিপি বা হরফ আবিষ্কার না হলে, আমার এই লেখা, তোমরা পড়তেই পারতে না। আমাদের স্কুলে কলেজে বই পড়ে শেখা, কিংবা পরীক্ষার খাতায় লিখে সে পড়ার পরীক্ষা দেওয়া, কিছুই হতো না। তোমাদের বাবা-মা, দাদা-দিদি, কাকু-কাকিমা, মামা-মামিমা, সারাদিন স্মার্টফোনের পর্দায় চোখ রেখে নানান মেসেজ লিখে চলেছেন, কিংবা পড়ে চলেছেন, সে লেখাপড়াও কী করে হত, লিপি বা হরফ আবিষ্কার না হলে?

মানুষের জীবনে আগুনের ব্যবহার শিখে ফেলাকে সব থেকে বড়ো আবিষ্কার বললে, এতটুকুও বাড়িয়ে বলা হয় না। আগুনের নিরাপদ ব্যবহার মানুষের হাতে এনে দিয়েছিল বেশ কিছুটা অবসর সময়। যে সময়ে তারা নতুন কিছু করার এবং নতুন ভাবনার সুযোগ পেয়েছিল। গুহার মধ্যে নিরাপদ এবং অনেকটা নিশ্চিন্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে উঠতে, মানুষ বুঝতে পারছিল, শুধুমাত্র কথা বলে, ইশারা-ইঙ্গিত করে, একে অন্যকে সব কথা ঠিকঠাক বোঝানো যাচ্ছে না। মনের কথা এবং মনের ভাব কথা ছাড়াও, কীভাবে বর্ণনা করা যায়, সেটা যেন আচমকাই ঘটে গেল আজ থেকে প্রায় ৩০,০০০ বছর আগে।

আদিম মানবের বড়ো একটা দল এই যে গুহায় রয়েছে, তারা রোজ ভোর থাকতে জঙ্গলে যায় শিকার করতে। ছোট ছোট কয়েকটা দলে তারা ভাগ হয়ে যায়। সব্বাই মিলে একদিকে যাওয়ার থেকে চার পাঁচটা দল, চারদিকে ছড়িয়ে গেলে, শিকার পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কারণ গুহা থেকে কতদূরে, কোন জঙ্গলে সুবিধে মতো জন্তু শিকার করা যাবে, সে তো আর আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। গুহায় থাকে শুধু অসুস্থ মানুষেরা, বুড়ো-বুড়ি আর শিশুরা।

গতকালও তারা একইভাবে বেরিয়েছিল। চারদলের মধ্যে একটাই দল ফিরেছিল বেশ কিছু শিকার করা নিহত জন্তু নিয়ে। দুটো দল সারাদিন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত, কিন্তু তেমন কিছুই যোগাড় করতে পারেনি। আর শেষের দলটা ফিরেছিল সন্ধেরও বেশ কিছুটা পরে, পুরোপুরি বিধ্বস্ত। সে দলের বেশ কয়েকজন

মারাত্মক জখম। ওরা ফেরার পর থেকেই সকলে ভয়ার্ত আর উদ্বিগ্ন। এরকম জখমে অনেক সময়েই বেশ কিছু মানুষ মারা যায়, কিছু করার থাকে না। দলের নেত্রী এক প্রৌঢ়া শক্তিমতী মহিলা। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা মতো কিছু পাতা, শিকড়, লতা পাথরে থেঁৎলে-বেঁটে জখমের জায়গায় প্রলেপ দিয়েছেন। কিছুটা উপশম হয়তো হয়েছে, কিন্তু কয়েকদিন না গেলে বোঝা যাবে না। আহত মানুষগুলো গুহার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে, সেবা ও চিকিৎসার পর, একসময় অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

শিকারে গেলে দু একজনের ছোটখাটো চোট আঘাত লেগেই থাকে, সেটা তেমন কেউ গায়ে মাখে না। কিন্তু আজকের আঘাত ব্যাপক। চারপাঁচজন মহাশক্তিশালী যুবক সাংঘাতিক আহত। এদের কিছু হয়ে গেলে, দলের শক্তি অনেকটাই কমে যাবে। দলনেত্রী ভীষণ উদ্বিগ্ন, তিনি চিন্তিত মুখে, অবসন্ন মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর ছোট ছেলেকে জিগ্যেস করলেন,

‘ঠিক কী হয়েছিল, বল তো? কী করে এমন হল?’

দলনেত্রীর যুবক ছোট ছেলেও ওই দলে ছিল। তার কোন বিপদ হয়নি। বাবা, কাকা, অন্য ভাইদের মতো সে তেমন সাহসী শক্তিশালী নয়। দলের সকলেই সমান বীর এমন তো হতে পারে না। যারা একটু দুর্বল, তারাও শিকারের দলে নানান কাজ করে। তারা নিঃশব্দে পশুদলের পিছনে চলে যায়, তারপর সমস্বরে আওয়াজ দিয়ে বিভ্রান্ত কিছু পশুকে জঙ্গলের ফাঁকা জায়গায় তাড়িয়ে আনে। সেখানে দু একটা দলছুট পশুকে সবাই ঘিরে ধরে, তার দিকে তির ছোঁড়ে, ধারালো পাথর ছোঁড়ে। আহত পশু মাটিতে পড়ে গেলে, তাকে মেরে ফেলার জন্যে সবাই মিলে বারবার আঘাত করে। সফল শিকারের পর, গাছের মোটা ডাল কেটে, শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে মৃত সেই পশুকে বয়ে আনার যোগাড় করে। দলের সামনে না থাকলেও, খুব কাছে থেকে সে দেখেছে ভয়ংকর ঘটনাটা। তার চোখে মুখে এখনো আতংক। মায়ের প্রশ্নে সে বলল,

‘আমাদের তাড়া খেয়ে জানোয়ারগুলো দৌড়তে লাগল। অন্যদিন একদিকেই দৌড়োয়, আমরা পাশ থেকে আক্রমণ করি। আজ কেন কে জানে, অনেকগুলো জানোয়ার ঘুরে এসে আমাদের দিকেই যেন দৌড়ে এল’। পিছনে বসে দলনেত্রীর বৃদ্ধ কাকা সব দেখছিলেন, সব কথা শুনছিলেন। তিনি জিগ্যেস করলেন,

‘ওরা কী জানোয়ারের পালিয়ে যাওয়ার রাস্তাতেই দাঁড়িয়েছিল’?

‘না একদম রাস্তাতেই নয়, তবে কাছাকাছি’।

‘বুঝেছি’। গুহার মুখে জ্বলতে থাকা আধপোড়া কাঠের একটা টুকরো তুলে নিয়ে, গুহার সমতল দেয়ালে আঁকতে লাগলেন, একদল পশু আর কিছু মানুষের অবয়ব। দেওয়ালে কাঠকয়লার কালো আঁচড় টেনে, বৃদ্ধ বুঝিয়ে দিতে লাগলেন, পশুদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পথের কোথায় দাঁড়ানো উচিৎ শিকারীদের। কীভাবে দাঁড়ানো উচিৎ।

‘তোরা কী এভাবে দাঁড়িয়েছিলি’?

‘না দাদু। আমরা ছিলাম পিছনে, ওরা সামনের দিকে’।

দেওয়ালে আবার তিনি এঁকে তুললেন কিছু অবয়ব। কিছু পশু এসে আক্রমণ করছে শিকারীদের। আঁকতে

আঁকতে জিগ্যেস করলেন,

‘এভাবে কী?’

‘হ্যাঁ দাদু। ওই ভাবে’।

‘ভুল, ভুল। মারাত্মক ভুল হয়েছে। তারই মাশুল দিতে হচ্ছে আমাদের। এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তার জন্যে সকলকেই বলছি। শুধু শক্তির ভরসাতে সফল হওয়া যায় না, বরং তাতে প্রায়ই বিপদ আসে। শক্তির সঙ্গে জানতে হয় পদ্ধতি। এতগুলি শক্তিধর প্রাণ আজ বিপন্ন, কারণ তারা সঠিক উপায় জানত না’।

পাথরের পাত্রে রাখা, পশুচর্বিতে জ্বলা দীপের ম্লান আলোয়, সকলেই যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে চলা পশুদের, আর তাদের নিজেদের অবস্থান। বহুদিনের শিকারে অভিজ্ঞ সেই বৃদ্ধ শুধুমাত্র কথা দিয়ে তাদের সঠিক বোঝাতে পারতেন কী? পারতেন না। গুহার দেওয়ালে ছবি এঁকে, তিনি খুব সহজে তাঁর দলের যুবকদের শিকার করার পদ্ধতির যেমন পাঠ দিলেন, তেমনি সমস্ত মানব সভ্যতাকে ঠেলে দিলেন অভিনব এক সম্ভাবনার দিকে।

২

গুহাচিত্র (cave painting) বলতে সাধারণতঃ গুহার দেওয়ালে কিংবা ভিতরের ছাদে (ceiling) আঁকা ছবিকে বোঝায়। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগেকার আঁকা এই সব গুহাচিত্র পৃথিবীর বহু দেশেই পাওয়া গেছে। এই গুহাগুলির বৈশিষ্ট্য হল, এগুলির অবস্থান খুব দুর্গম, ঘন জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে। আর এই গুহাগুলিতে মানুষেরা খুব দীর্ঘদিন বাস করত এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। পণ্ডিতেরা বলেন, এই চিত্রগুলি নিছক গুহা সাজানোর জন্যে দেখতে সুন্দর হবে বলে আঁকা হয়েছিল, মোটেই নয়। নিজের দলের মধ্যে, এমনকি অন্য দলের মানুষদের কোন বার্তা বা নির্দেশ দেওয়ার জন্যেই, এই চিত্রগুলি আঁকা হয়েছিল।

সবথেকে প্রাচীন গুহাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, ইন্দোনেশিয়ার মারোস জেলার একটি গুহায়। পণ্ডিতেরা বলেন প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বছরের পুরোন। এছাড়া ইওরোপের ফ্রান্স, স্পেন, রোমানিয়াতেও যে সব গুহাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলি ত্রিশ থেকে বত্রিশ হাজার বছর আগেকার। ফ্রান্স এবং স্পেনে এরকম প্রায় ৩৪০টি গুহা পাওয়া গেছে, যেখানে প্রচুর গুহাচিত্র দেখা যায়। স্পেনের কুয়েভা ডি লা মনেদা (Cueva de las Monedas) এর মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত।

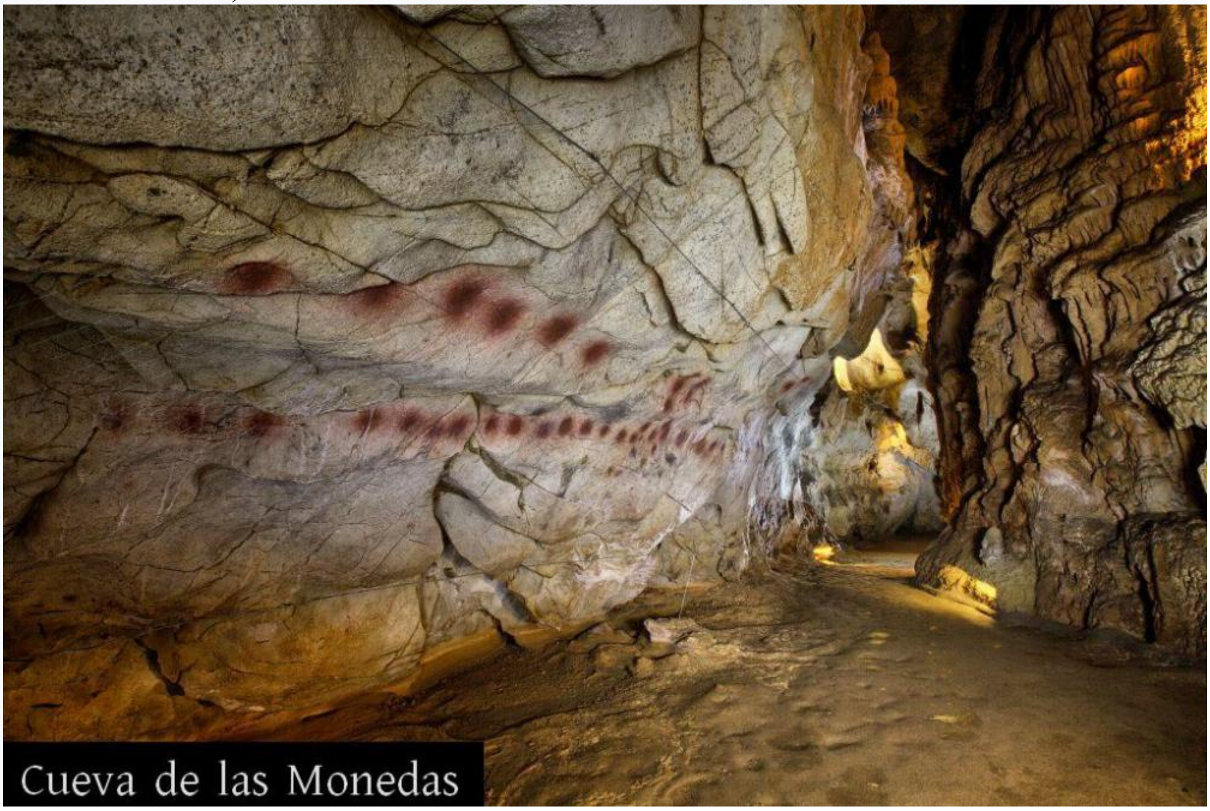
Cueva de las Monedas

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গুহাচিত্রগুলির প্রধান বিষয় হল শিকার কাহিনী। নানান ধরনের হরিণ, বাইসন, ঘোড়ার দল যেন ছুটে চলেছে। মানুষের ছবি কম, থাকলেও সেগুলি যেন প্রতীকি। জন্তুদের ছবিগুলি যেমন জীবন্ত, মানুষের ছবিগুলি সেভাবে আঁকা হত না। তার একটা কারণ হতে পারে, সেই সময়ের মানুষেরা মনে করতো, যে কোন প্রাণীর ছবি আঁকলে, তার আয়ু কম হয়ে যায়। কাজেই নিজের দলের মানুষদের ছবি এঁকে, তাদের আয়ু কম করতে কে আর চাইবে? বরং জন্তুদের জীবন্ত ছবি আঁকলে, তাদের আয়ু যদি কম হয়ে যায়, তাতে শিকারী দলের সুবিধে। শিকারের ঝক্কি যেন কিছুটা কম হয়ে যায়!

প্রথম দিকে কাঠকয়লার (charcoal) কালো রঙ দিয়ে শুরু হলেও, পরের দিকে লাল, হলুদ রংয়ের গুঁড়ো দিয়েও ছবি আঁকত সেই যুগের মানুষেরা। লাল রংয়ের জন্যে লাল মাটি হিমাটাইট (hematite), হলুদের জন্যে একধরনের হলুদ মাটি (অকার, ochre) ব্যবহার করত।

ভারতবর্ষে মধ্যপ্রদেশের ভিমবেটকা গুহাতেও এমন সব গুহাচিত্র আবিষ্কার হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই গুহাগুলির কয়েকটিতে আদিম মানুষের বসবাস ছিল প্রায় একলাখ বছর! আর সব থেকে প্রাচীন যে গুহাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার বয়েস তিরিশ হাজার বছরের কম নয়। এই গুহাচিত্রগুলির প্রধান রঙ লাল আর সাদা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সবুজ এবং হলুদও দেখা যায়। এই গুহাচিত্রগুলির বিষয় শিকারের দৃশ্য যেমন আছে, তেমনি আছে সমসাময়িক সামাজিক নানান অনুষ্ঠানের ছবিও!

ভিমবেটকা গুহায় এমন ছবি অনেক দেখা যায়।

৩

দেখা যাচ্ছে সারা বিশ্বেই মোটামুটি একই সময়কালে গুহাচিত্রগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। যে চিত্রগুলি আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেগুলি রঙদার দক্ষ চিত্রকরের আঁকা। কিন্তু তারও আগে আমাদের দলের সেই বৃদ্ধ লোকের আঁকা সাধারণ কাঠকয়লার স্কেচ কবেই মুছে গিয়েছে কালের নিয়মে। কিন্তু তাঁর সেই বার্তাটি রয়ে গেল তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের মনে, আর সেই বার্তা হল, ছবি এঁকে বা লিখে একজনের কথা অনেকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। এমনকি যিনি আঁকছেন বা লিখছেন, তাঁর মৃত্যুর বহুযুগ পরেও সেই বার্তা রয়ে যাচ্ছে গুহার গায়ে। মানুষ গুহা ছেড়ে যখন সমতলে নেমে এসে নদীর ধারে চাষবাস শুরু করল, পশুপালন শুরু করল, গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে বসবাস শুরু করল, তখন আরো জরুরি হয়ে উঠল এই বার্তা দেওয়া ও নেওয়ার পদ্ধতি ।

অতএব আদিম জীবন থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এসে গেল চিত্রলিপি বা পিক্টোগ্রাফ (pictograph)। এই চিত্রলিপির উদ্দেশ্য ছিল সমাজে সকলের মধ্যে কিছু বিধি-নিষেধ, ধর্মীয় নিয়ম-কানুন প্রচার করা এবং ব্যক্তিগত নাম ও তার অধিকারে থাকা ধনসম্পদের রেকর্ড নথিভুক্ত করা। বুঝতেই পারছো, শিকারের সহজ গল্প বলা সরল ছবির থেকে, জটিল বিষয়ের জন্যে অনেক জটিল হয়ে উঠতে লাগল চিত্রলিপি। বিশ্বের প্রাচীনতম চিত্রলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে, দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার সুমের সভ্যতায়। পণ্ডিতদের মতে, মোটামুটি ৩৫০০ বিসিতে (যিশুখ্রিষ্টের জন্মের ৩৫০০ বছর আগে) সুমের সভ্যতায় এই লিপির বহুল প্রচলন ছিল। এরই কাছাকাছি সময়ে মোটামুটি ৩২০০ বিসিতে মিশর সভ্যতায় যে চিত্রলিপির ব্যবহার পাওয়া যায় তার নাম হিয়েরোগ্লিফ। মিশরের পিরামিড, মন্দির এবং প্রাচীন প্রাসাদের গায়ে এই লিপির অজস্র নমুনা আজও দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে সিন্ধু সভ্যতারও বেশ কিছু লিপির (মোটামুটি ২৬০০ বিসি) নমুনা পাওয়া গেছে, যেগুলিকে চিত্রলিপি বলে মনে করা হয়। কিন্তু এখনো সিন্ধু সভ্যতার এই

লিপি পড়ে ওঠা যায়নি বলে, কোন কোন পণ্ডিত এগুলিকে লিপি বলতে নারাজ, তাঁদের মতে এগুলি সাধারণ কিছু চিত্র সংকেত।

সুমেরিয় সভ্যতায় লাইমস্টোনের কিশ (Kish) ট্যাবলেটে পাওয়া চিত্রলিপি

মিশরের, কারনাক(Karnak)-এ “গ্রেট হাইপোস্টাইল হল”এ হিয়েরোগ্লিফের নমুনা

সিন্ধুসভ্যতায় পাওয়া চিত্রলিপি সহ সিল

চলবে

গাঁদা ফুল গাছ

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

গাঁদা একটি সুগন্ধযুক্ত বাহারি ফুল যা গৃহসজ্জায়, পূজার কাজে এবং ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গাঁদা ফুল বিভিন্ন বর্ণের হয়। তবে সাধারণত উজ্জ্বল হলুদ এবং কমলা রংয়ের ফুলের চাষ ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন ও গৃহসজ্জায় এই ফুলের অধিক ব্যবহার হচ্ছে।

গাঁদা গাছের আদি বাসস্থান উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা। কয়েকটি প্রজাতির গাছ বর্তমানে সারা বিশ্ব জুড়ে চাষ হচ্ছে। গাঁদা গাছ সাধারণত ৩ - ৪ ফুট লম্বা হয়। পাতার রং গাঢ় সবুজ। ফুলের ব্যাস দেড় থেকে তিন ইঞ্চি। রং মূলত স্বর্ণালী, কমলা, হলুদ। এছাড়া সাদা, মেরুন ইত্যাদি রংয়ের ফুল দেখা যায়।

এদেশে প্রধানত দুই ধরণের গাঁদা ফুল গাছ দেখতে পাওয়া যায়ঃ

১) ফরাসী গাঁদা

এই গাছ ক্ষুদ্রাকৃতি; ফুলের রং কমলা-হলুদ। পাপড়ির গোঁড়ায় কালো ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরণের গাঁদা গাছকে রক্তগাঁদাও বলে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গাছের জাতের নাম যথাক্রমে হারমনি, মেরিয়েটা, লিজিওন অফ অনার, ইত্যাদি।

২) আফ্রিকান গাঁদা

এই জাতের গাঁদা গাছ বেশ বড় হয়। ফুলের রং উজ্জ্বল হলুদ। এই গাছের বিজ্ঞান সম্মত নাম **Tagetes erecta** । এই প্রজাতির গাছকে মেক্সিকান গাঁদা বা অ্যাজটেক গাঁদা বলে। যদিও এই গাছের আদি বাসস্থান আমেরিকা কিন্তু এই গাছ আফ্রিকান গাঁদা নামে পরিচিত। কয়েকটি জাতের নাম যথাক্রমে ম্যান ইন দি মুন, গিনি গোল্ড, ইনকা, ইয়ালো সুপ্রিম, ইত্যাদি।

গাঁদা ফুলের ব্যবহার

১) মশা সহ ছোটো ছোটো পোকা তাড়ানোর জন্য (রিপেলেন্ট হিসাবে) ব্যবহার করা হয়।
২) রোদে পোড়া ত্বকে গাঁদা ফুলের রস লাগালে কিছুক্ষণের মধ্যে জ্বালা ভাব কেটে যায়।
৩) গাঁদা ফুল অ্যান্টিসেপটিক।

৪) কেটে গেলে কিম্বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে ত্বকের উপর গাঁদা ফুল বা পাতার রস লাগালে রক্ত পোড়া বন্ধ হয় এবং ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি সেরে যায়।
৫) গাঁদা ফুলের পাপড়ি শুকিয়ে জাফরানের বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬) এই ফুলের নির্যাস মাউথ ওয়াস হিসাবে ব্যবহার করে যায়।
৭) গাঁদা ফুলের চা ভেষজ হিসাবে ব্যবহার যোগ্য।

আফ্রিকান গাঁদা কয়েকটি ব্যবহার নীচে লেখা হল -

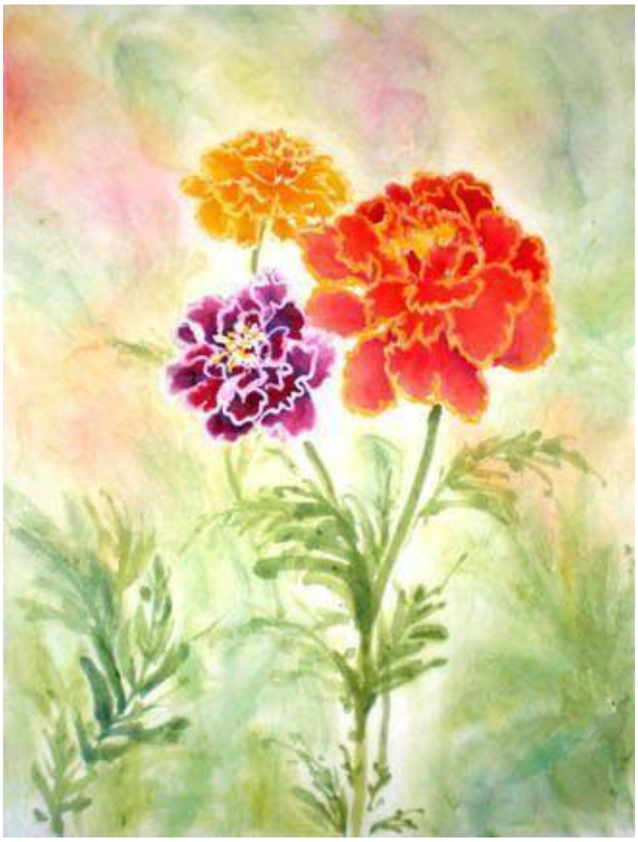

- এই ফুলের নির্যাস জলের সঙ্গে মিশিয়ে মৃতদেহ ধোয়ার রীতি রয়েছে হন্ডুরাসে।
- উত্তর আমেরিকার আদি বাসিন্দারা এই ফুলের নির্যাস দিয়ে স্নান করে এবং ফুলের পাপড়ি থেকে প্রাপ্ত হলুদ বর্ণের তরল রং হিসাবে ব্যবহার করে।
- কয়েকটি চাষযোগ্য গাছকে ক্ষতিকারক ক্রিমির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জমিতে গাঁদা গাছ লাগানো হয়।
- বর্ণ ও গন্ধের জন্য লেটুস সালাডে এই ফুলের পাপড়ি মেশান হয়।
- গাঁদা ফুলের তেল সুগন্ধির সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়।
- গাঁদা গাছের এসেন্সিয়াল অয়েলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে।
- এই ফুল থেকে প্রাপ্ত লিউটিন খাবারের রং (হলুদ বা কমলা) হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

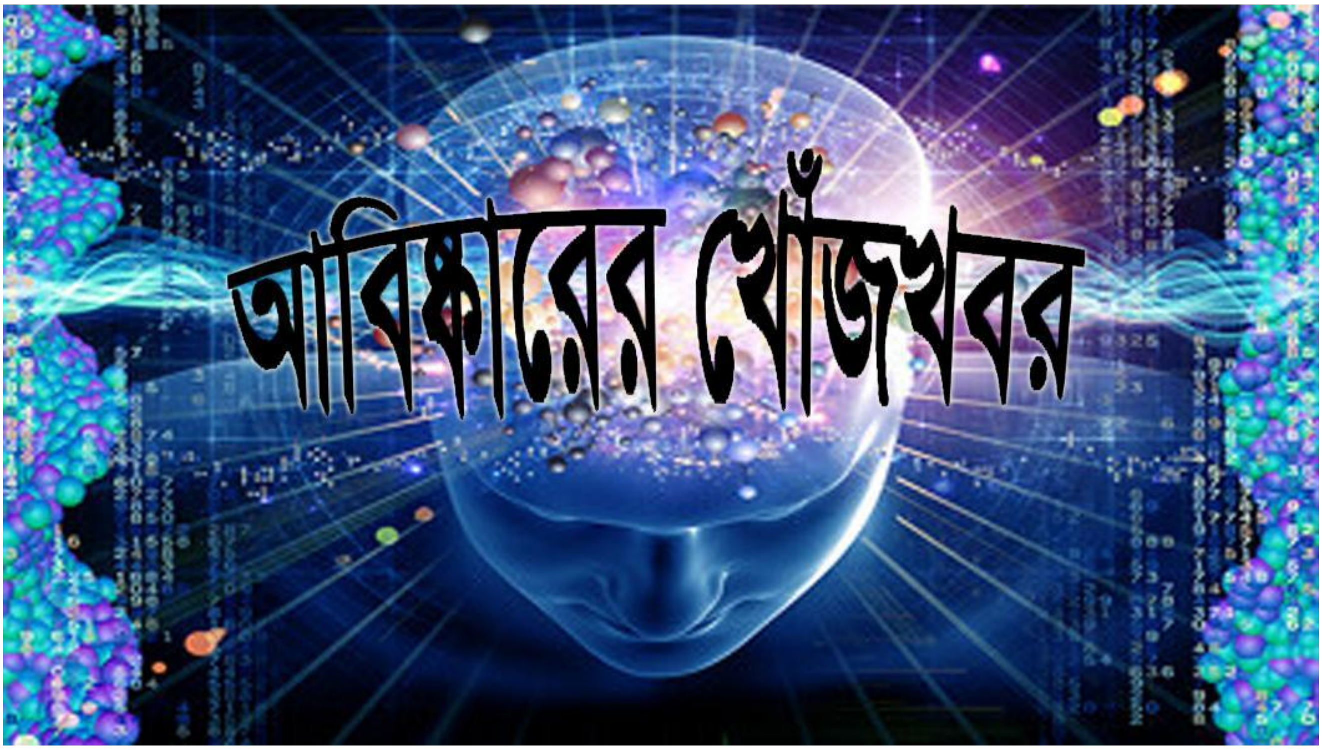

রাজীবকুমার সাহা

এই নীলগ্রহের জন্মলগ্ন থেকেই ঘটে চলেছে কতই না আজব কাণ্ডকীর্তি। বিশেষত মানুষ বা তার পূর্ব-প্রজাতির সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন আবিষ্কার। আদিযুগ থেকে বিভিন্ন খোঁজ আর আবিষ্কারের যথাসম্ভব তথ্য ক্রমানুসারে নথিভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই বিভাগে।

পর্ব – ৭

চুল্লি (Ov e n) (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০)

তন্দুরি টিক্কা বা তন্দুরি নান খেতে কেমন? দারুণ তো? তৈরি করতে প্রথমেই কী দরকার? না, একটা চুলো। এই চুলোটাই মানুষ আবিষ্কার করেছিল আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে। এক ফলমূল বাদে তখন মানুষের খাবারদাবার প্রায় সবই তন্দুরি। ২০14 সালে পৃথিবীর প্রাচীনতম চুল্লি আবিষ্কৃত হয় ক্রোয়েশিয়ায়। সেকালে মাটিতে অগভীর গর্ত করে তাতে জ্বলন্ত কয়লা ফেলে ছাইচাপা দিয়ে রাখা হত। তারপর খাদ্যবস্তু ছোটোবড়ো আকারের পাতায় মুড়ে চুল্লিতে রেখে ওপরে মাটিচাপা দিয়ে রাখা হত। আনুমানিক সময়জ্ঞানের ভিত্তিতে তারপর পাতামোড়া পুঁটুলি তুলে নিয়ে এলেই খাবার তৈরি। পরবর্তীকালে সময় আর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জন্ম নিল ইটনির্মিত চুলো, যা আজও বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতায়ও এধরনের চুল্লির প্রমাণ মেলে। মহেঞ্জোদারোতে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সময়কার চুল্লির হদিশ মিলেছে।

তবে প্রাচীন চুল্লি থেকে অত্যাধুনিক চুল্লির এই বিবর্তনের মূল কারিগর কিন্তু গ্রিকরা। তারা সাধারণ রুটিকে আরও সুন্দর রূপ দিতে চেয়েছিল। তখন দরকার হয়ে পড়েছিল সাধারণ চুল্লির উন্নতিকরণ। আর অচিরেই তারা সেঁকা খাদ্য প্রস্তুতিকে (বেকারি) একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হল। কারণ, ততদিনে তারা আটা-ময়দার সঙ্গে ব্যবহার করতে শিখে গেছিল এক যুগান্তকারী উপাদান - ইস্ট।

মাড়াইযন্ত্র (Flail) (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০)

গাঁয়ে-গঞ্জে পিচের ড্রাম বা কাঠের টুলের ওপর আছড়ে আছড়ে গাছ থেকে পাকা ধানের ছড়া আলাদা করতে দেখেছ নিশ্চয়ই? শস্য মাড়াইয়ের এই ধারণা কিন্তু আজকের নয়। কালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছুটা রূপ পরিবর্তন করেছে মাত্র। মানুষের কৃষিসভ্যতার আদিমতম যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে এই মাড়াইযন্ত্র একটি। প্রায় হাজার পাঁচেক বছর আগে প্রাচীন মিশরীয়রা একটা ধাতব দন্ডের একপ্রান্তে চামড়ার সরু ফিতে বেঁধে শস্যের আঁটিতে পিটিয়ে পিটিয়ে মাড়াই করত। তারপর শস্য আলাদা হয়ে গেলে ঠিক একই পদ্ধতিতেই শস্যের খোসা ছাড়াত।

পরবর্তীকালে এই যন্ত্রটাই খানিকটা রূপ বদলে রাজকীয় শাসনদণ্ডে রূপান্তরিত হয় প্রাচীন মিশরে। ততদিনে অবশ্য ধাতুবিদ্যার দারুণ উন্নতি হয়। ধাতবদণ্ডে শেকল আটকে তার আগায় মোটা কাঁটাওয়ালা ধাতব পিণ্ড যুক্ত করে এককালের সাধারণ মাড়াইযন্ত্র রাজার হাতে উঠে আসে শাসনদণ্ড রূপে। ফ্যারাও তুতনখামেনের সমাধির মধ্যেও এই অস্ত্রের সন্ধান মেলে।

ঘণ্টা (Bell) (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০)

প্রাচীন চিনারা সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। ৩৯৫০ এবং ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বের মধ্যবর্তী সময়ে ইয়াং-শাও অঞ্চলের বাসিন্দারা রঙিন ছবি অঙ্কিত মৃৎশিল্পে দারুণ দক্ষতা অর্জন করেছিল। অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পাশাপাশি তারা মাটির ঢেলার মতো একধরনের সঙ্গীতযন্ত্র তৈরি করে ফেলল যেটা কায়দা করে নাড়াচাড়া করলেই দারুণ মিষ্টি এক আওয়াজ বের হত। এই জিনিসটাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘণ্টা হিসেবে গণ্য করা হয়। মধ্য চিনের হেনান প্রদেশে খননকার্য চালিয়ে ছোটো লাল রঙের এধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়।

মোমবাতি (Candle) (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০)

এটা অনুমান করা নিশ্চয়ই ভুল হবে না যে প্রাচীনকালে মানুষ জীবজন্তুর চর্বিপিন্ডে আগুন জ্বালিয়েই হয়তো প্রথম মোমবাতির প্রচলন করেছিল। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলে যে গ্রীক এবং মিশরীয়রাই সর্বপ্রথম সলতেযুক্ত মোমবাতির স্রষ্টা। ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বেই মানুষ মৌমাছির বাসা থেকে মোম সংগ্রহ করে তা সলতের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মোমবাতি জ্বেলেছিল। এর অনেক পরে মধ্যযুগে প্রায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১৮৩০ সাল) বাণিজ্যিক রূপে প্যারাফিন ঢুকে পড়ে ঘরে

ঘরে।

চিমটে (P l i e r s) (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০)

চিমটে জিনিসটা মানুষ ঠিক কখন আবিষ্কার করেছিল তা নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেননি। তবে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তারা দৃঢ় ধারণা পোষণ করেন যে প্রায় ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্ব সময়কালেই মানুষ জিনিসটার ব্যবহার করতে শিখে গিয়েছিল নিতান্ত প্রয়োজনের নিরিখেই। সে সময় নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করতে জ্বলন্ত অঙ্গার, কাঠকুটো ইত্যাদি নাড়াচাড়া করার প্রয়োজনে মানুষ চিমটে ব্যবহার করত। কামারশালায় জ্বলন্ত লোহা পিটিয়ে সে সময়ই মানুষ চিমটে তৈরি করে নিয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

ঢালাই (C a s t i n g) (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০)

বিশ্বের ধাতুশিল্পের ইতিহাসে প্রাচীনতম কৌশলের মধ্যে একটি হচ্ছে এই ঢালাই। প্রাচীন মিশরীয় এবং মেসোপটেমীয় সভ্যতায় মানুষ প্রথমে ছাঁচ তৈরি করে তাতে গলিত ধাতু ঢেলে দিয়ে ছোটো ছোটো পুতুল, অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করতে শিখল। সময়ের সঙ্গে দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ একদিন তাক লাগানোর মতো জটিল ধাঁচের বিভিন্ন জিনিসপত্রও তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠল।

৩০০০ খ্রিস্টপূর্বেই মানুষ প্রথমে মৌমাছি-মোম দিয়ে প্রয়োজনীয় ছাঁচ তৈরি করে তাতে তাপ শোষক হিসেবে কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে রাখত। তারপর এতে গলিত ধাতু ঢেলে জলে চুবিয়ে ঠাণ্ডা করে মোমের ছাঁচ ভেঙে ফেলে ঢালাইয়ের কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি বের করে নিত।

এই কৌশলের পরবর্তী ধাপের নিদর্শন হিসেবে বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত হরপ্পা সভ্যতায় বিভিন্ন পুতুল, মিশরের তুতনখামেনের সমাধিতে, আফ্রিকার অ্যাজটেক, মায়া ও বেনিন সভ্যতায় তামা, ব্রোঞ্জ ও সোনার বিভিন্ন শিল্পকর্মের সন্ধান মেলে।

বোতাম (Button) (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০)

একবার যদি ভাবি যে কাউকে একটা বোতামহীন জামা পরতে দেওয়া হলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? প্রাচীনই বলি আর আধুনিকই বলি, পোশাকআশাকের ক্ষেত্রে বোতামের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই বোতাম কিন্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই হাজার পাঁচেক বছর আগে, প্রায় ৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ। জীবজন্তুর হাড়, শিং আর কাঠের টুকরো মাপমতো কেটে নিয়ে গ্রীকরা প্রথম তার দড়িবাঁধা পরিচ্ছদে বোতামের ব্যবহার শিখল। জামাতে সুতোর লুপ তৈরি করে তাতে বোতাম আটকে দিল।

বোতামের স্রষ্টা মূলত গ্রীকদের ভাবা হলেও প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতায় ঝিনুক থেকে তৈরি বেশ কিছু ছিদ্রযুক্ত বোতামের সন্ধান মেলে যেগুলোতে অনায়াসেই সুতো গলিয়ে পোশাকের সঙ্গে এঁটে দেওয়া যেত। ১৯৯০ সালে ইয়ান ম্যাক নীল উক্তি করেন, "প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার মহেঞ্জোদারোতে জিনিসটা শুধুমাত্র বোতামের চেয়ে অলঙ্কার হিসেবেই বহুল প্রচলিত ছিল। তদানীন্তন সময়ে ঝিনুকের বাঁকা অংশ কাজে লাগিয়ে মানুষ বোতাম তৈরি করত এবং সেগুলোর বয়স প্রায় ৫০০০ বছর।"

শিরস্ত্রাণ (Helmet) (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০)

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সময়কালে মেসোপটেমীয় সভ্যতার যুগে মানুষ শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছিল। প্রাচীন এই শিরস্ত্রাণ মূলত ব্রোঞ্জনির্মিত হলেও লোহা বা শিংওয়ালা বিভিন্ন বন্যজন্তুর করোটি দ্বারাও তৈরি করা হত। এর অনেককাল পরে প্রায় ৯০০ খ্রিস্টপূর্বে অ্যাসিরীয় সৈনিকরা সর্বপ্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে মাথায় শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতে শুরু করে। আর এই ধারা বর্তমানকালের বিভিন্ন নির্মাণকর্মী, বাইক আরোহী আর খেলোয়াড়দের মাধ্যমে বয়ে চলেছে।

স্কি (Ski) (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০)

বরফদেশের বাসিন্দাদের প্রায়শই অত্যধিক তুষারপাতের ফলে আটকে পড়ে তীব্র খাদ্যসঙ্কটে পড়তে হত। কারণ, সেদেশে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়। সংরক্ষণ তো দূরের কথা। খাদ্য হিসেবে নির্ভর করতে হত বন্যজন্তুর মাংসের ওপর। অথচ পুরু বরফ ঠেঙিয়ে তাড়া করে শিকার করা এককথায় প্রায় অসম্ভব ছিল। দরকার পড়ল এমন একটা কিছুর, যাতে ভর করে অনায়াসে জীবজন্তু ধাওয়া করে শিকার করে আনা যায়। উদ্ভাবনী শক্তি ধরা দিল পাতের মতো দু'টুকরো পাতলা কাঠের আকারে। আবিষ্কৃত হল স্কি।

৩০০০ খ্রিস্টপূর্বে স্কি আবিষ্কার নিঃসন্দেহে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যাপার ছিল। বর্তমানকালের নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড আর রাশিয়া অঞ্চলের সে যুগের অধিবাসীরা স্কিতে চড়ে সহজেই পশুশিকার করতে শুরু করল। ১৯২৪ সালে সুইডেনের কাল্ভত্রাস্ক নামক স্থানে সরলগাছের কাঠের তৈরি পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন স্কিয়ের সন্ধান মেলে যার বয়স প্রায় ৫০০০ বছর। জিনিসটি ৮০ ইঞ্চি (২০৪ সেমি) লম্বা এবং ৬ ইঞ্চি (১৫.৫ সেমি) প্রশস্ত, যা আধুনিক স্কিয়ের তুলনায় সামান্য বড়ো।

আইস স্কেইট (I c e S k a t e) (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০)

প্রাচীন বরফদেশবাসীদের আইস স্কেইটিং ছিল দারুণ এক বিনোদনের উপায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সময়কালের একজোড়া সর্বপ্রাচীন আইস স্কেইট খুঁজে পাওয়া যায় সুইডেনের এক জলাশয়ের তলায়। প্রত্যেক প্রান্তে ছিদ্রযুক্ত এই স্কেইটজোড়া অতিকায় কোনও জন্তুর পায়ের লম্বা লম্বা হাড় যোগাড় করে তৈরি করা হয়েছিল। আর পায়ের পাতার সঙ্গে বাঁধার জন্যে চামড়ার ফিতেও ব্যবহৃত হয়েছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ধারণা করেন।

এরপর আগামী সংখ্যায়

ক্লোরোফিল চোর

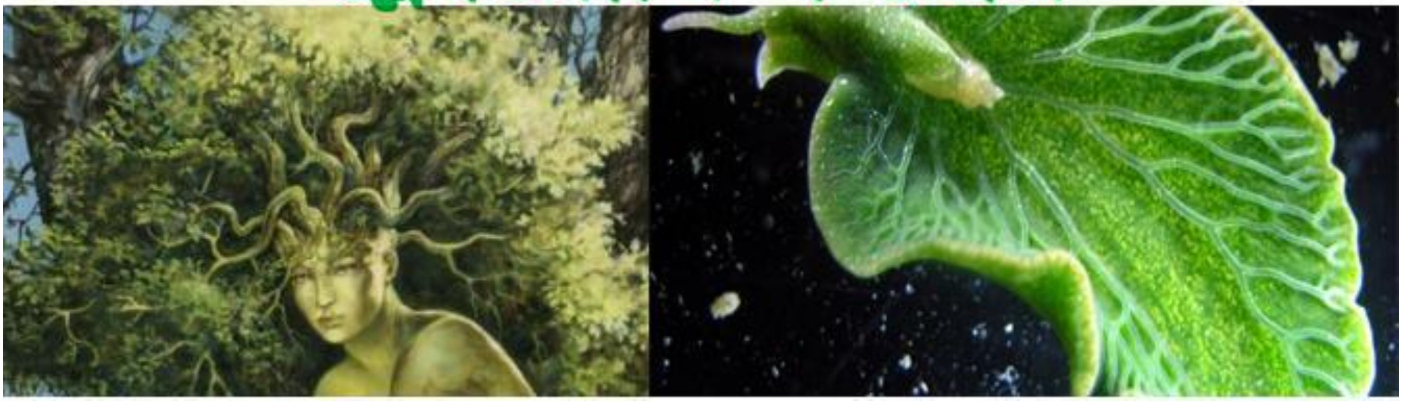

সৌম্যকান্তি জানা

পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্নালোকিত রাত। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এক সন্ন্যাসী হেঁটে চলেছেন। হঠাৎ রাস্তার ওপর পায়ে কিছু একটা জিনিস লেগে তিনি হোঁচট খেলেন। নীচু হয়ে দেখেন একটা মাথার খুলি। এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে নরমুন্ড এলো কোথা থেকে? এখানে কী তাহলে একসময় জঙ্গল ছিল না? না কি কেউ খুন করে এই জঙ্গলে দেহ পুঁতে দিয়েছিল? কিন্তু তা কেন হবে? এখন তো খুন-খারাবি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ মানুষের খাওয়ার চিন্তাটাই নেই। বাঁচতে গেলে চাই শক্তি। আর শক্তি আসে খাবার থেকে। এখন তো খাবার নিয়ে কাউকে কিছু ভাবতেই হয় না! আর তাই মানুষে-মানুষে লড়াই ব্যাপারটা নেই বললেই চলে! তাহলে? সন্ন্যাসী বড়ো চিন্তায় পড়লেন। আচ্ছা, মাথার খুলির মালিককে নতুন জীবন দিলে কেমন হয়? সন্ন্যাসী মৃত মানুষকে পুণর্জীবন দেওয়ার বিদ্যা জানেন। কিন্তু গুরুর নির্দেশে সে-বিদ্যা কখনও প্রয়োগ করেননি। সন্ন্যাসীর সেই বিদ্যা ওই খুলির ওপর প্রয়োগ করার প্রবল ইচ্ছা হল। তিনি খুলিটার সামনে বসে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলেন! ধীরে ধীরে সেই খুলির ভেতর থেকে বেরতে শুরু করল ধোঁয়ার কুন্ডলী। আর আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ থেকে যেমন বেরিয়ে আসত দৈত্য ঠিক তেমনই খুলি থেকে বেরিয়ে এল আস একটা মানুষ! তার গা খালি। পরণে একটা গামছা।

নবজন্ম পেয়ে লোকটা তো অবাক! সে বলে, "আমি জঙ্গলে এলুম কী করে? আমি তো মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিলুম রাস্তা দিয়ে। পথে ডাকাতেরা আমার সব লুঠ করে নিল। তারপর আমার মাথায় কী একটা সজোরে এসে পড়ল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।"

সন্ন্যাসী বুঝলেন লোকটি বহু যুগ আগের কথা বলছে। তখন চোর-ডাকাত ছিল। এখন ওসবের উপদ্রব নেই। কিন্তু সন্ন্যাসী কী করে তাকে বোঝাবে যে সে তার পুণর্জন্ম দিয়েছে? লোকটি সন্ন্যাসীকে জাপটে ধরে বলে উঠল, "তুমিই ডাকাত। আমার সব লুঠ করে নিয়েছো। সব এক্ষুনি ফেরৎ দাও। আমি মেয়ের বাড়ি যাব!"

সন্ন্যাসী পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। অনেক বোঝালেন। কিন্তু লোকটি মানতে নারাজ যে তার পুণর্জন্ম হয়েছে। তার ধারণা সন্ন্যাসী মিথ্যে বলছে। নাচার সন্ন্যাসী বাধ্য হয়েই বললেন, "ঠিক আছে। তুমি চলো আমার সাথে। আমি তোমার যা যা লুঠ হয়ে গেছে সব ফিরিয়ে দেব, আর তোমার মেয়ের বাড়িতেও তোমাকে পৌঁছে দেব।"

সন্ন্যাসীর সাথে লোকটি হাঁটতে লাগল। জঙ্গল পার হয়ে তারা এসে পড়ল গ্রামে। বাড়ি ঘর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ কী! সবই তো পাকা বাড়ি! একটাও মাটির বাড়ি নেই! চারিদিকে প্রচুর গাছ-গাছালিতে ঘেরা। পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত দিগ্বিদিক। কোথায় গেল ধানের ক্ষেত? একটাও সবজি বাগান নেই! হঠাৎ লোকটির নজরে আদুড় গায়ে কিছু ছেলে রাস্তায় খেলছে। একী! ওদের সবার গায়ের রঙ সবুজ কেন? সবুজ আবির মেখেছে? এতক্ষণ সে সন্ন্যাসীর মুখ ভালো করে লক্ষ্য করেনি। সন্ন্যাসীর মুখ-হাত-পা সবই তো সবুজ! কিন্তু মানুষের সবুজ রঙ তো কখনও হয় বলে সে জানে না! ফর্সা, কালো, শ্যামলা হয় জানে। কিন্তু সবুজ! গ্রাম ছাড়িয়ে ক্রমশঃ তারা পৌঁছে গেল একটা বাজারে। এ কী! বাজারের সব পুরুষ ও মহিলার রঙ সবুজ! আরও অবাক কান্ড! বাজারে একটাও খাবারের দোকান নেই! অথচ তার খিদেতে পেটে আগুন জ্বলছে। সে সন্ন্যাসীকে বলল, "আমাকে এক্ষুনি একটা খাবারের দোকানে নিয়ে চল, আমি খাবো।"

সন্ন্যাসী হাসলেন, "তা কোথায় পাবে? খাবার তো মানুষ নিজেরাই তৈরি করে নেয় তার দেহে। শুধু একটু রোদ পেলেই হল। দেখছো না, সব লোক সকাল হতেই রোদে ঘোরাঘুরি করছে। আমাদের চামড়ায় আছে ক্লোরোফিল নামে একটা কণা, যার সাহায্যে আমরা আমাদের খাবার নিজেরাই তৈরি করে নিই।" লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সন্ন্যাসী বলে কী! এও কী সম্ভব! সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই তাকে ভেলকি দেখাচ্ছে! ক্ষেপে গিয়ে লোকটি সন্ন্যাসীর গলা টিপে ধরল, "এক্ষুনি আমাকে খাবার দে, নইলে তোকে আজ আমি মেরেই ফেলবো। মিথ্যুক!"

ঘুমটা ভেঙে গেল তুতানের। নিজের বাম হাতটা কীভাবে গলার উপর এসে পড়েছে। ওঃ এতক্ষণ তাহলে সে স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নে তুতান নিজে হয়ে গিয়েছিল সন্ন্যাসী। কিন্তু সবুজ-রঙা মানুষ ব্যাপারটা কী? তুতান কিছুক্ষণ চোখ কচলে স্বপ্নটা আবার ভাবার চেষ্টা করল। সবুজ মানুষ। তারা উদ্ভিদের মতো আলোর উপস্থিতিতে খাবার তৈরি করতে পারে। আর তাই চাষবাস বন্ধ। বাজারে খাবারের দোকানও নেই। আচ্ছা, এমন আজব স্বপ্ন সে দেখল কেন? ওঃ হো, তুতানের মনে পড়ল কয়েকদিন আগেই তার স্কুলে জীবনবিজ্ঞানের স্যার একটা অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণীর কথা বলেছিলেন যে নাকি সত্যি উদ্ভিদের মতো নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে নিতে পারে। তার রঙ সবুজ ও তার দেহে ক্লোরোফিল উপস্থিত। বিজ্ঞানীরা কিছুদিন হল শামুকজাতীয় ওই প্রাণীটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পূর্ব উপকূলের অগভীর জলে আবিষ্কার করেছেন। স্যার ক্লাসে ওই শামুক নিয়ে অনেক গল্প করেছিলেন। বাড়ি ফিতে তুতান সেই সব কথা বার বার ভাবছিল ও বিস্মিত হচ্ছিল। আর তাই তুতান এমন সবুজ মানুষের স্বপ্ন দেখেছে।

তুতানের স্কুলের স্যার ওই অদ্ভুত শামুক নিয়ে ক্লাসে কী বলেছিলেন এবার একটু জেনে নেওয়া যাক। এই শামুকটির রঙ এক্কেবারে সবুজ। দেহ ইঞ্চিখানেকের মতো লম্বা হবে। এর গমন অঙ্গের নাম প্যারাপোডিয়া। প্যারাপোডিয়াকে দেহের দুপাশে প্রসারিত করে একটু একটু করে নাড়াতে নাড়াতে জলের মধ্যে দিয়ে সে যখন যায় তখন দেখে মনে হয় যেন একটা সবুজ পাতা জলের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছে। পাতায় যেমন শিরা-উপশিরা থাকে, ঠিক তেমনই এর প্যারাপোডিয়াতেও শিরা-উপশিরা থাকে। শামুকটির কোনও খোলক নেই। খোলকহীন শামুককে ইংরেজিতে বলে স্লাগ (Slug)। এই স্লাগের বিজ্ঞানসম্মত নাম এলিসিয়া ক্লোরোটিকা (*Elysia chlorotica*)। ক্লোরোফিলের উপস্থিতির জন্যই এর প্রজাতিগত নাম দেওয়া হয়েছে ক্লোরোটিকা। শামুকটি কেবল এক প্রকার সামুদ্রিক উদ্ভিদকেই খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। সেই উদ্ভিদ হল এক প্রকার শ্যাওলা। নাম ভাউকেরিয়া লিটোরিয়া (*Vaucheria litorea*)। ভাউকেরিয়া হল সবুজ শ্যাওলা এবং সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরি করতে পারে।

এলিসিয়া জন্মের সময় আদৌ সবুজ রঙের হয় না। তখন তার রঙ থাকে বাদামি, আর তার উপর লাল রঙের ফুটকি। জন্মের পর এলিসিয়া খেতে শুরু করে ভাউকেরিয়া। যে কোনও সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষকারী কোশে থাকে একপ্রকার অঙ্গাণু যার নাম ক্লোরোপ্লাস্ট। এই ক্লোরোপ্লাস্ট হল সালোকসংশ্লেষের আসল যন্ত্র। ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকে ক্লোরোফিল নামক সবুজ কণা। এই কণাগুলোর কাজ হল সূর্যালোকের আলোকশক্তিকে সংগ্রহ করা। ওই শক্তি পরে উৎপাদিত খাদ্যের মধ্যে আটকা পড়ে। পুরো কর্মকান্ড ঘটে ওই ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে। ভাউকেরিয়ার কোশে তাই ক্লোরোপ্লাস্ট আছে। কিন্তু কোনও বহুকোশী প্রাণীর দেহকোশে যেমন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না, তেমনই জন্মের পর এলিসিয়ার দেহকোশেও ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না। কিন্তু যেই না শিশু এলিসিয়া ভাউকেরিয়া খাওয়া শুরু করে অমনি তার দেহের রঙ সবুজ হয়ে যেতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন, পরিণত এলিসিয়ার দেহকোশে ক্লোরোপ্লাস্ট উপস্থিত। সুতরাং আর কোনও সন্দেহ থাকে না যে ভাউকেরিয়ার ক্লোরোফিলসহ ক্লোরোপ্লাস্ট এলিসিয়ার কোশে গিয়ে ঢুকেছে। একে ক্লোরোফিল চুরি ছাড়া আর কীই বা বলা যায়!

কিন্তু কীভাবে একটা উদ্ভিদের একটা কোশ অঙ্গাণু এক্কেবারে অক্ষত অবস্থায় খাদক প্রাণীর কোশে গিয়ে ঢুকে যায়, আর সেখানে গিয়ে সে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে থাকে? এ পর্যন্ত বলতে বা শুনতে ব্যাপারটা যতটা সহজ বলে মনে হচ্ছে তা কিন্তু আদৌ নয়। পুরো প্রক্রিয়াটি জানতে বিজ্ঞানীদের বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, আর সত্য উদ্ভাবনের পর বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়েছে। এলিসিয়ার পরিপাকনালির একটা ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য এর জন্য দায়ী। আমরা যেমন খাবার খেলে সেই খাবার আমাদের পরিপাকনালিতে গিয়ে বিভিন্ন উৎসেচকের ক্রিয়ায় ভেঙে গিয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয় এবং শেষে সেই সরল উপাদান অন্ত্রের আবরণী কোশ দ্বারা শোষিত হয়ে রক্তে গিয়ে মেশে, এলিসিয়ার ক্ষেত্রে তেমনটা পুরোপুরি ঘটে না। ওদের অন্ত্রে ভাউকেরিয়ার ক্লোরোপ্লাস্ট পরিপাক হয় না। আর অন্ত্রের আবরণীতে এমন একপ্রকার কোশ আছে যারা ওই ক্লোরোপ্লাস্টকে সরাসরি অক্ষত অবস্থায় গিলে নেয়। এলিসিয়ার অন্ত্র প্রচুর শাখাযুক্ত হয়। ওইসব শাখা অন্ত্র থেকে প্যারাপোডিয়াতে বিস্তৃত হয়। ফলে ক্লোরোপ্লাস্ট প্যারাপোডিয়ার কোশেও প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। তখন এলিসিয়ার রঙ হয়ে ওঠে সবুজ। আর তখন সে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাবার তৈরি করতে শুরু করে দেয়।

তবে বিজ্ঞানীরা এটুকু জেনে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তার কারণ দুটো। প্রথমতঃ, পরীক্ষায় দেখা গেল কোনও ভাউকেরিয়া না খেয়েও এলিসিয়া দিব্যি ন'মাস পর্যন্ত বহাল তবিয়তে থাকতে পারে। আর এই সময় সে রীতিমত ক্লোরোফিল সংশ্লেষ করে সালোকসংশ্লেষ চালায়। এটা কী করে সম্ভব? আর দ্বিতীয়তঃ, ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে একটা ছোটো চক্রাকার ডি এন এ থাকে। ওই ডি এন এ-তে কিছু জিনও থাকে। জীবদেহের যে কোনও ক্রিয়া জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় একথা সবাই জানি। সালোকসংশ্লেষের ক্ষেত্রেও সে-কথা প্রযোজ্য। ভাউকেরিয়ার ক্ষেত্রে সালোকসংশ্লেষের জন্য দায়ী জিনগুলির বেশ কিছু জিন অবস্থান করে কোশের নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকা ডি এন এ-তে। তাহলে এলিসিয়ার কোশে ভাউকেরিয়ার কেবল ক্লোরোপ্লাস্ট এসে প্রবেশ করলে সালোকসংশ্লেষ কীভাবে সম্ভব? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিজ্ঞানীরা এবার এলিসিয়া আর ভাউকেরিয়ার ডি এন এ-তে অবস্থিত জিনের বিশ্লেষণ করা শুরু করলেন। আর উত্তর পেয়েও গেলেন। অবাক কান্ড! ভাউকেরিয়ার কোশে সালোকসংশ্লেষের জন্য দায়ী কিছু জিন যা তার নিউক্লিয়াসের ডি এন এ-তে রয়েছে সেগুলো এলিসিয়ার কোশের নিউক্লিয়াসের ডি এন এ-তেও উপস্থিত! তার মানে শুধু ক্লোরোপ্লাস্ট নয়, ভাউকেরিয়ার নিউক্লিয়াসের ডি এন এ-তে অবস্থিত কিছু জিনকেও

এলিসিয়া কোনও এক সময়ে নিজের প্রয়োজনে নিজের ডি এন এ-র মধ্যে অঙ্গীভূত করে নিতে সক্ষম হয়েছে! এমন তাজ্জব ঘটনা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে নজিরবিহীন না হলেও বহুকোশী উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ক্ষেত্রে একেবারেই নজিরবিহীন। এমন জিন স্থানান্তরকে পরিভাষায় বলা হয় অনুভূমিক জিন স্থানান্তর বা হরাইজোন্টাল জিন ট্রান্সফার (HGT)।

ব্যাকটেরিয়ারা পরস্পরের মধ্যে এমন জিন স্থানান্তর (HGT) করতে পারে বলেই একটা ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন অন্য ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তরিত হতে পারে। কিন্তু তা বলে একটা বহুকোশী উদ্ভিদ ও একটা বহুকোশী প্রাণীতে এমন জিন স্থানান্তরের ঘটনা আগে কখনো দেখা যায়নি। নিউক্লিয়াসের জিন যেহেতু পিতামাতার দেহ থেকে সন্তান পেয়ে থাকে, তাই শিশু এলিসিয়া বংশানুক্রমিকভাবে ওই জিনগুলি পেয়ে যায়। অপেক্ষা থাকে শুধু ক্লোরোপ্লাস্ট আসার জন্য। এলেই শুরু হয়ে যায় সালোকসংশ্লেষ। তৈরি হতে থাকে খাদ্য গ্লুকোজ। সে গ্লুকোজ কোশের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে এলিসিয়াকে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়।

তুতান তো বটেই, ক্লাসের সবাই স্যারের মুখে এসব অবাক করা কথা মন্ত্রমুগ্ধের মত গিলে নিয়েছিল। বন্ধুরা ছুটির পর এ নিয়ে আলোচনাও করছিল, “ইস, আমাদের ত্বকে যদি ক্লোরোফিল থাকত কী ভালোই না হত!” সৌম্যদীপ মজা করে বলেছিল, “আমাকে আর তাহলে খাওয়ার জন্য মায়ের কাছে প্রতিদিন বকুনি শুনতে হত না।” অর্ক বলে উঠেছিল, “অনাহার, অপুষ্টি, দারিদ্র্য কথাগুলো আর থাকতো না, দুর্ভিক্ষ হত না, মানুষকে পেটের কথা চিন্তা করতে হত না। কী ভালো হত এমন হলে!” তুতান বলেছিল, “ কে বলতে পারে, এমন ঘটনা একদিন হবে না! কয়েক লক্ষ বা কোটি বছর পরে প্রাণীজগতের সব প্রাণী হয়তো এমন বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে। হয়তো মানুষও!” সবাই মাথা নাড়িয়ে তুতানের কথায় সায় দিয়েছিল।

এমন বিস্ময়কর ঘটনা শুনতে গল্প বলে মনে হলেও এখন বাস্তব। প্রকৃতির রঙ্গালয় ছাড়া এমন বিস্ময়কর ঘটনা আর কোথায় ঘটবে! প্রকৃতি যেমন নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা, তেমনই নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটায় সেই প্রকৃতিই। বিজ্ঞানীরা শুধু তা খুঁজে বেড়ান।

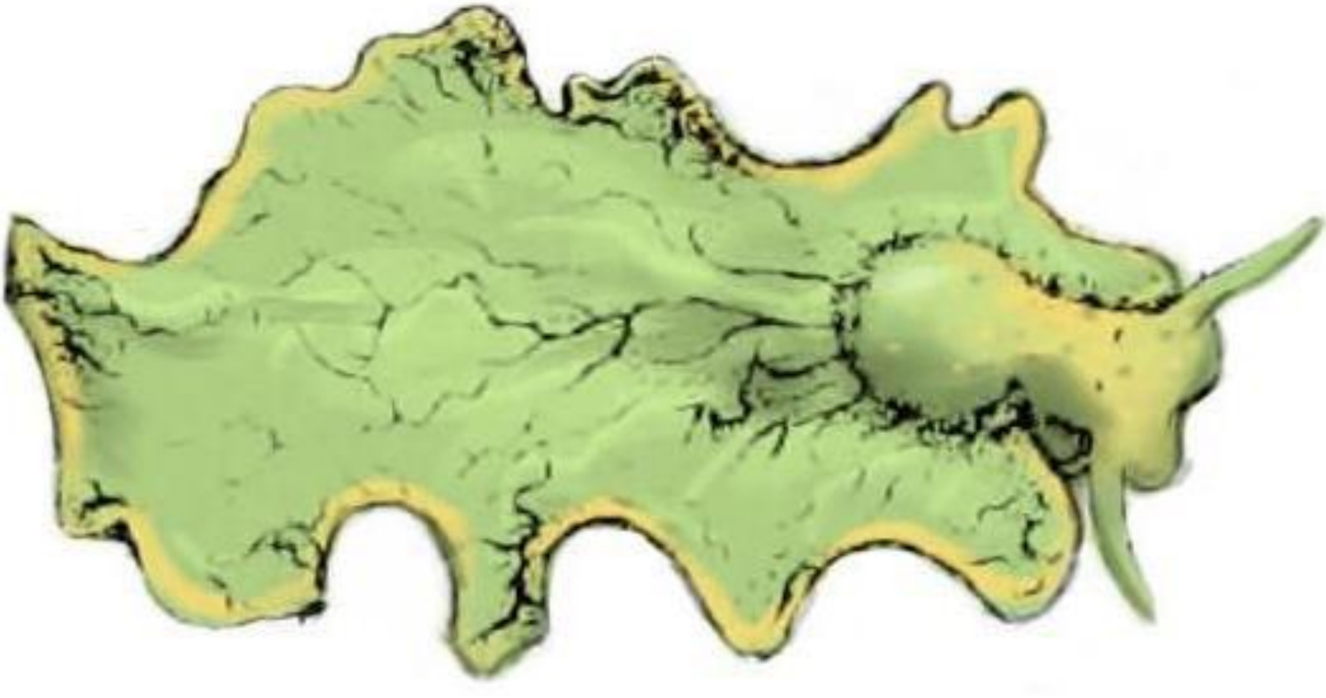

বিঃদ্রঃ – নিবন্ধটির শুরুতে দেওয়া কাহিনিটিতে লু সুন-এর লেখা ‘মৃতজনে প্রাণ’ (রূপান্তর- অমল রায়) নাটকের ছায়া অনুসরণ করেছি।

বিতর্কিত জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে

অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও গ্যালিলি একটি বহুল চর্চিত নাম। পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, সে কথা প্রমাণ করার চেষ্টা তিনিই সর্ব প্রথম করেন। তখন মানুষ মনে করত পৃথিবী এক স্থানে স্থির আর মহা প্রতাপশালী সূর্য তার চারিদিকে পাক খাচ্ছে। চার্চও সে কথাই প্রচার করত।
পোপের বিরুদ্ধে মতামত দিয়ে গ্যালিলিওকে অপিরিসীম কষ্টও স্বীকার করতে হয়। এ সব কথাই আমাদের অল্পবিস্তর জানা আছে। কিন্তু গ্যালিলিওর পূর্বসূরি টাইকো ব্রাহে কোনও অংশে কম ছিলেন না। জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহের জন্ম হয় ডেনমার্কে ১৫৪৬ খ্রিষ্টাব্দে। ডেনমার্কে সেই সময় দুই ধরনের মানুষ ছিল। এক শ্রেণী রাজার পৃষ্ঠ পোষক, কাজেই তারা ছিল ধনী, আর এক শ্রেণী ছিল অত্যন্ত গরীব। টাইকো ছিলেন প্রথম শ্রেণীর। টাইকো তার ধনী বাবা মায়ের প্রথম সন্তান। তাঁর কাকা জোরগেন ব্রাহের কোনও সন্তান না হওয়ায় টাইকোকে তিনি দত্তক নিতে চান। টাইকোর বাবা-মা সে প্রস্তাবে সম্মতি দেননা। জোরগেন ছিলেন ডেনমার্কের রাজার সামরিক বাহিনীর এক প্রথম সারির সেনাপ্রধান। তিনি বেজায় চটে গিয়ে টাইকোকে অপহরণ করেন। টাইকোর একটি ভাই জন্মালে, ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যায়। টাইকো তাঁর কাকার কাছে মানুষ হতে থাকেন। কাকার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তাধিকার হন টাইকো।

কাকা জোরগেনের ইচ্ছানুযায়ী টাইকোর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় আইন বিষয় নিয়ে। যদি তিনি আইনের পথে হাঁটতেন তাহলে এক অসামান্য জ্যোতির্বিদের বিচিত্র আবিষ্কার থেকে বিজ্ঞান বঞ্চিত হতো। কিন্তু সহসা তাঁর

জীবনের মোড় ঘুরে গেলো। তার বয়স যখন চোদ্দ, তখন তিনি সূর্য গ্রহণ দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হন। স্থির করেন গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি জানবার কাজেই আত্মনিয়োগ করবেন। আর যেমন ভাবা তেমনই কাজ। একটু বড় হয়ে আইন বিষয়ে পড়তে গেলেন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাথায় ওদিকে ঘুরে চলেছে গ্রহ নক্ষত্রের বিচিত্র জগত নিয়ে বিস্ময়ের পোকা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর মুল্যবান সব বই কিনে ফেললেন। টলেমী আর কোপার্নিকাসের কাজ তন্ন তন্ন করে পড়ে ফেললেন। কিছু গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ যন্ত্রও কিনে ফেললেন। লেগে পড়লেন পুরনো মানযন্ত্রগুলো নিজের মতো করে গড়ে তোলার কাজে। সাথে চলল অঙ্ক কষে গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা। আইন আর কলা বিষয়ে পড়াশুনোও করতে হচ্ছে তখন। নিজের পরিবর্তিত মান যন্ত্র গুলো সবার চোখের আড়ালে রেখে দিয়ে রাত জেগে গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ হল তাঁর শখ।

টাইকোর কাকা, সেনাপ্রধান জোরগেন ব্রাহে, রাজা ফ্রেড্রিক-২ এর পরম বন্ধু ছিলেন। একবার জাহাজে রাজার সাথে ভ্রমণের সময় রাজাকে সমুদ্রে পড়ে যাবার থেকে বাঁচিয়ে দেন জোরগেন। কৃতজ্ঞতা হিসাবে জোরগেনকে আস্ত একটা দ্বীপই উপহার দিয়ে দেন রাজা। সুইডেন আর ডেনমার্কের মাঝে অবস্থিত সেই দ্বীপের নাম ছিল হ্যাভেন। জোরগেন মারা যাবার পর টাইকো ব্রাহে হ্যাভেন দ্বীপে ইউনানিবর্গ প্রাসাদ গড়ে তোলেন।

ইউনানিবর্গ দ্বীপে ব্রাহের প্রাসাদ

বিবিধ মানযন্ত্র বানিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণে অত্মনিয়োগ করলেন সম্পূর্ণভাবে। এই সময় তার তৈরি উল্লেখযোগ্য তিনটি যন্ত্র হল- দ্বিগংশিক বলয় (Azimuthal Quadrant), ভূগোলক (Celestial Sphere) এবং আরমিলারি গোলক (Armillary Sphere). দ্বিগংশিক বলয় ব্যবহার করে ধূমকেতুর গতিপথ নির্ণয় করা হয়েছিল। ভূগোলক, মহাকাশে নক্ষত্র সমূহের আবস্থান চিহ্নিত করার জন্য নির্মাণ করা হয়। আরমিলারি গোলকের সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। ডেনমার্কের রাজা ফ্রেড্রিক ২ ব্রাহের বৈজ্ঞানিক মেধা এবং কাজে খুশি হয়ে তার কাজের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

দ্বিগংশিক বলয়

ভূগোলক

আরমিলারি গোলক

একবার বেশ মজার এক কাণ্ড ঘটে। টাইকোর বয়স তখন বছর কুড়ি। অঙ্কের এক জটিল ফর্মুলা নিয়ে তার সাথে তর্ক বাধে আর এক জ্যোতির্বিদের। কেউ কারো চাইতে কম যায় না। তাই দুজনে ঠিক করেন ডুয়েল লড়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে। দেখাই যাক, কে ঠিক আর কেই বা বেঠিক। ডুয়েল লড়তে গিয়ে টাইকোর লম্বা নাক গেল উড়ে। তারপর থেকে উনি তামা, সোনা আর রুপোর তৈরি তিনটি নাক তৈরি করেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই নাক পরে পার্টিতে জেতেন।

সাধে কি আর বলে, বিজ্ঞানীরা একটু ছিটিয়াল হয়! আবার ছিটিয়াল না হলে কে টাইকোর মতো প্রায় ১০০০ নক্ষত্রের এক মহামূল্যবান তথ্য ভাণ্ডার দিয়ে যেতে পারত মানব জাতির জন্য? টাইকো তার তথ্যাবলী আজীবন কাউকে হাত লাগাতে দেননি। কেবল মারা যাওয়ার মাত্র একবছর আগে জ্যোতির্বিদ জোহান্স কেপলারকে তার সহায়ক নিযুক্ত করেন। কেপলার তার মেধার মাধ্যমে টাইকোর মন জয় করে নিতে পেরেছিলেন। টাইকো মারা যাবার পর, টাইকোর সৃষ্ট পাণ্ডুলিপি কেপলারের হাতে আসে। আর তিনিও পরবর্তীকালে পৃথিবী বিখ্যাত হন।

এবার দেখা যাক টাইকোর বর্ণীত সৌরজগত কেমন ছিল। টাইকোর কাজ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার আগে মাথায় রাখার দরকার যে সে সময়ে টেলিস্কোপ আবিষ্কার হয় নি। টেলিস্কোপ তৈরি করার কথা ভাবেন নি টাইকো। প্রথম টেলিস্কোপ তৈরি হয় গ্যালিলিওর হাতে, আরও কিছু বছর কেটে যাবার পর। টাইকোর প্রস্তাবিত সৌরজগতের কেন্দ্রে ছিল পৃথিবী। সূর্য পৃথিবীর চারদিকে পাক খায় বৃত্তাকারে। গ্রহেরা সূর্যেকে প্রদক্ষিণ করে বৃত্তাকার পথেই। টাইকোর সৌরজগতের মডেলে একটাই ভুল ছিল। সেটা হচ্ছে পৃথিবীও যে অন্য একটি সৌরগ্রহ, তা অস্বীকার করা। হয়তো তৎকালীন প্রচলিত চার্চ স্বীকৃত ধারনার বিপক্ষে যাওয়া টাইকোর পক্ষেও সম্ভব হয় নি। টাইকোর

পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে যে চাঁদ পৃথিবীকে চক্রাকারে পরিক্রমা করে চলেছে। কিন্তু চাঁদকেও একটি গ্রহ হিসাবে ধরা হয়। টাইকো ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটোকে খুঁজে পান নি। তাই চাঁদ ও সূর্য সমেত মোট আটটি গ্রহকে স্বীকৃতি দেন। তিনি তার অক্লান্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মঙ্গল (Mars) গ্রহের গতিপথের উপর এক সুবিশাল পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন। সেই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে কেপলার তার গ্রহের গতিপথের তিনটি বিখ্যাত সূত্র আবিষ্কার করেন।

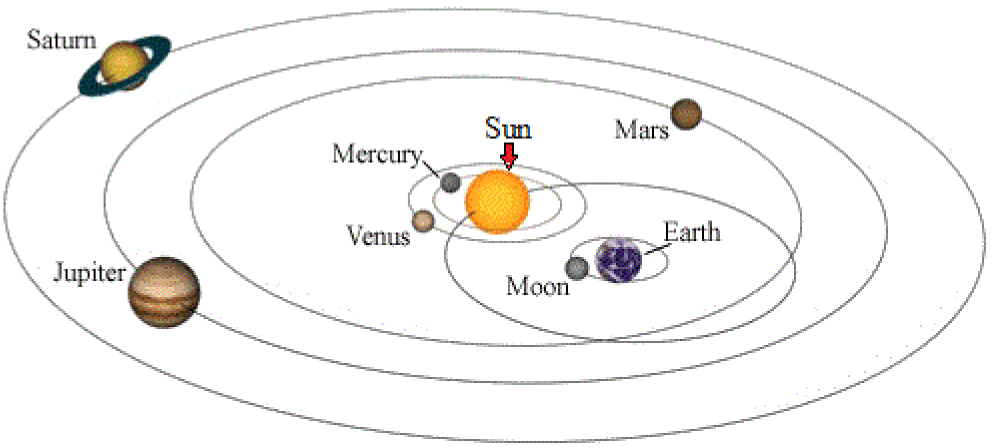

টাইকোর দ্বিতীয় প্রধান কাজ ধূমকেতু নিয়ে। এরিস্টটলের সময় থেকেই মনে করা হত ধূমকেতু পৃথিবী বা চাঁদ থেকে নির্গত কোনও গ্যাসের প্রভাব। প্রচুর পর্যবেক্ষণ করে, অঙ্ক কষে, টাইকো জানান, ধূমকেতু চাঁদের থেকে অনেক দূরে। আর এটা মোটেই পৃথিবী বা চাঁদের কোনও অংশ নয়। ধূমকেতু বস্তুত বরফ আর পাথরের জমাট মিশ্রণ। সূর্যের তাপে তা থেকে গ্যাসের উদ্ভব হয়ে থাকে।

১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর খুব কাছে, এক আশ্চর্য আলোর ছটা সারা আকাশ জুড়ে দেখা যায় অনেকদিন যাবত। এই ঘটনার পিছনে দৈব শক্তির হাত আছে বলে ভাবা হয়। টাইকো তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আর যুক্তি দিয়ে প্রমান করেন যে আলোর ছটার পিছনে আছে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি এসে পড়া একটি মৃত্যু পথযাত্রী নক্ষত্র। আধুনিক বিজ্ঞান এই ঘটনাকে সুপারনোভা বিস্ফোরণ বলে জানে।

টাইকো ব্রাহের আগে পর্যন্ত এরিস্টটলিয় ধারনা ছিল, স্বর্গ অর্থাৎ আকাশ, অপরিবর্তনীয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার অবদান প্রচলিত ধ্যান ধারনাকে আমূল বদলে দিতে শুরু করে, যার প্রভাব কেপলার বা তার উত্তরসূরিদের অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

টাইকো ব্রাহের খ্যাপামি নিয়ে আনেক গল্প শোনা যায়। তার প্রাসাদে তিনি এক বেঁটে মানুষকে নিজের সহচর হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। এমন বিশ্বাস করতেন যে সে যাদুবিদ্যার অধিকারী। তার আর এক সহচর ছিল বাঁকানো শিং ওয়ালা এক জংলী হরিণ। ব্যস্ততার জন্য টাইকো একবার এক নেমন্তন্ন বাড়িতে যেতে না পারায়, সহচর হরিণটিকে নেমন্তন্ন রক্ষা করার জন্য পাঠিয়ে দেন। সেই নেমন্তন্ন বাড়ির ভোজের সাথে পানীয় কিছু বেশি পরিমানে খেয়ে ফেলে হরিণটি ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

জীবনের শেষ পর্যায়ে টাইকো ব্রাহেকে ষড়যন্ত্রের স্বীকার হতে হয়। সাধাসিধা এক বিজ্ঞান সাধকের জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ। ব্রাহের অমানুষিক পরিশ্রমসাধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের মুল্যবান তথ্য চুরি করে প্রাগে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাগে সেই সময় এ্যাডলফ-২ রাজত্ব করতেন। তিনি প্রবল গুণ সম্পন্ন হলেও একটু খ্যাপাটে স্বভাবের ছিলেন। জ্যোতিষ বিদ্যা ও যাদুবিদ্যায় তার বিশেষ আগ্রহ থাকায় ব্রাহের উপর তার নজর পড়ে।

ব্রাহের মৃত্যুও কিছু কম চমকপ্রদ নয়! জানা যায় নেমন্তন্ন বাড়িতে বেশি পরিমাণ বিয়ার খেয়ে ফেলেন তিনি। কিন্তু কিডনির সমস্যার জন্য প্রস্রাব আটকে যাওয়ায় অসুস্থ হয়ে বিছানা নেন। এর কিছুদিন পর ১৬০১ সালে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হন ও মার্কারি বিষ

প্রয়োগে তাকে মেরে ফেলা হয়। সন্দেহের প্রথম তালিকায় ছিলেন তার প্রধান সহায়ক জোহান্স কেপলার। টাইকো ব্রাহে যাকে বিয়ে করেন, তিনি ছিলেন সাধারণ ঘরের। যেহেতু ব্রাহের জন্ম হয় অভিজাত পরিবারে, ডেনমার্কের সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী ব্রাহের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ও সন্তানদের তার সম্পত্তিতে অধিকার ছিলনা। সেই সুযোগে কেপলার ব্রাহের সমস্ত সম্পত্তি এবং বৈজ্ঞানিক দলিলের মালিকানা পেয়ে যান। সে কথা কেপলার নিজে স্বীকারও করেন। কেপলারের প্রতি অভিযোগের আঙুল ওঠে। অন্য এক মতে তদানীন্তন ডেনমার্কের রাজা খ্রিস্টিয়ান-৪, ব্রাহের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে বিষ প্রয়োগে মেরে ফেলবার জন্য ব্রাহের দুঃসম্পর্কের এক ভাইকে নিযুক্ত করেন। কারো কারো মতে সেক্সপিয়ার তার হ্যামলেট নাটকের নাট্য উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন ব্রাহের মৃত্যু রহস্য ঘিরে।

ব্রাহের মৃত্যু রহস্য নিয়ে ডেনমার্ক তোলপাড় হলে ১৯০১ সালে কবর থেকে তার দেহ উদ্ধার করে সুইডেন এবং ডেনমার্কে ফরেনসিক পরীক্ষা করানো হয়। ব্রাহের গোঁফ ও চুল পরীক্ষার ফলাফল বিষ প্রয়োগের অভিযোগ মিথ্যা প্রমানিত করে। ফরেনসিক পরীক্ষায় অনেকেই সন্তুষ্ট হননি। তাই ব্রাহের মৃত্যু এক বিরাট রহস্য হয়েই থেকে যায় জনসমাজে। ২০১০ সালে ডেনমার্কের বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রফেসর জেন্স ভেলেভ, চার্চ ও আদালতে দরখাস্তের মাধ্যমে, আবার ব্রাহের দেহাবশিষ্ট কবর থেকে উদ্ধার করার অনুমতি পান। কিন্তু ফলাফল সেই একই। বিষপ্রয়োগ মিথ্যে প্রমানিত হয়ে রহস্যের অন্ধকারে ডুবে রইল জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহের মৃত্যু।

তথ্যসূত্রঃ

1) Life and Times of Tycho Brahe by Niall Kilkenny.
2) A Chronicle of Mathematical People by A. Robert
3) The lord of Uraniborg: A Biography of Tycho Brahe by Victor E. Thoren.
4) Tycho Brahe : A Picture of Scientific Life and Work in the Sixteenth Century by Dreyer, J. L. E.

একটি প্যাঁচালো ব্যাপার

রবি সোম

কলেজের সময় থেকেই চিনি দর্জিলদাকে। ও ছিল আমাদের এক বছরের সিনিয়র। কলেজের সকলেই দারুণ পছন্দ করত দর্জিল দাসকে। দর্জিলদার বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ কী ছিল সেটা জানানো দরকার। খুঁজলে দর্জিলদার মতো দিলদরিয়া, পরোপকারী ছেলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, কিন্তু মিলবে না দর্জিলদার মতো অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন, বিপুল বুদ্ধিদীপ্ত ও চটজলদি সমস্যা সমাধান-পারঙ্গম ব্যক্তি।

কলেজের পাট চুকিয়ে শুরু হল চাকরি-জীবন। বেঙ্গালুরুতে একই কোম্পানিতে চাকরি পেলাম সহপাঠী সুজিত ও আমি। দর্জিলদা যে বেঙ্গালুরুতে থাকে তা জানতাম। এখানে এসে যোগাযোগ করলাম। আমি ও সুজিত বেঙ্গালুরুতে চাকরি পেয়েছি জেনে দর্জিলদা খুব খুশি হল।

দর্জিলদা থাকায় প্রবাসে আমাদের দিন ভালোই কাটতে থাকল। সাক্ষাতে বা ফোনে দর্জিলদার নির্দেশ বা উপদেশ আমাদের ভরসা যোগায়, বাধাবিঘ্নকে পাশ কাটাতেও সাহায্য করে। দর্জিলদার থেকে কত কিছু যে শিখেছি তা বলে শেষ করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ন্যাটা মানুষের মতো স্ক্রুর গুণা (স্ক্রু থ্রেড) যে বাঁ-হাতি হতে পারে সেটা জেনেছিলাম দর্জিলদার দৌলতেই। স্পষ্ট মনে আছে, বাঁ-হাতি গুণার হালচাল জেনে ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। সেদিনের ঘটনাটা এবার সংক্ষেপে বলি।

বেঙ্গালুরুতে কাছেপিঠে যাতায়াতের জন্য একটা সাইকেল কেনা হয়েছে মাস কয়েক আগে। এখানকার পথঘাট ভালো। পাড়ার ভেতরের খানাখন্দবিহীন সমতল রাস্তায় সাইকেল চালানো বেশ আরামপ্রদ। নিরাপদও। সকালে অফিস যাওয়ার আগে সময় পেলেই সাইকেলে চেপে মিনিট পনেরো চক্কর কেটে আসি। বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের পাশাপাশি হয় শরীরচর্চাও। সুজিতের সাইকেল চড়া কিন্তু নেহাতই প্রয়োজনভিত্তিক। জিনিসপত্র কেনাকাটা, চিঠি ডাকবাক্সে ফেলা, জামাকাপড় ধুতে দেওয়া এসব সাতসতেরো কাজে বাহনটি না হলে ওর চলে না।

নিয়মিত ব্যবহার করলেও দ্বিচক্রযানটির দেখভালের দিকে আমরা কখনও নজর দিইনি। আজ ছুটির দিন তাই নেই কোনও ব্যস্ততা। সাইকেল বের করতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল করলাম কাঠামো, হাতল, চাকা, মাডগার্ড, পেডাল - সবকিছুই ধুলো-ময়লা প্রলেপিত হওয়ায় অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। সাইকেল চালানোর সময় মৃদু ক্যাঁচ-কোচ আওয়াজ পাচ্ছিলাম কিছুদিন থেকে। আজ বোঝা গেল বিয়ারিংয়ে পিচ্ছিলকারী তেলের স্বল্পতাই এর কারণ। এখন সাবধান না হলে ভবিষ্যতে আরও জটিল সমস্যা মাথাচাড়া দেবে।

সুজিতের সাথে জরুরি মিটিং করে সিদ্ধান্ত হল, আর দেরি না করে আজই 'স্বচ্ছ সাইকেল' অভিযানের সূচনা করতে হবে। ধুয়ে মুছে সাফসুতরো করা, বিয়ারিংয়ে তেল দেওয়া এসব কর্মকাণ্ড প্রথমবার সংঘটিত হবে আজ। পরবর্তীতে এই কাজ করা হবে মাসে অন্তত একবার করে।

সাইকেল কেনার সময় বুদ্ধি করে তত্ত্বাবধায়ক যন্ত্রগুচ্ছ (মেইনটিনেন্স টুল কিট) নেওয়া হয়েছিল। অতএব সময় নষ্ট না করে কাজে নামা হল। পেডালগুলোর হাল শোচনীয় হওয়ায় ওগুলোকে সাইকেল থেকে খুলে ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করার পরিকল্পনা করা হল। টুল কিট ঘেঁটে পেডাল রেঞ্চ (pedal wrench) বের করে সুজিত পেডাল খোলার কাজে হাত দিল। ডানদিকের পেডালটি খোলা গেলেও বাঁদিকের পেডাল কিছুতেই খুলতে পারল না সুজিত। ও হাল ছাড়ার পর হাত লাগালাম আমি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ঠ্যাঁটা পেডালটাকে কব্জা করা গেল না। পেডালের টাকু-র (spindle) প্যাঁচগুলো দারুণভাবে সেঁটে গিয়ে যে আমাদের প্যাঁচে ফেলছে সেটা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু কেবল বাঁদিকের প্যাঁচগুলোই যে কেন দুর্ব্যবহার করছে, মাথায় ঢুকছিল না সেটাই।

গোলমেলে পরিস্থিতিতে পড়ে আমাদের যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা, ঠিক তখনই গুমোট গরমে একঝলক দমকা হাওয়ার মতো হাজির হল দর্জিলদা। আমরা যেন হাতে চাঁদ পেলাম! চারপাশে দৃকপাত করে অবস্থাগতিক বুঝে নিতে চৌকস দর্জিলদার অসুবিধে হল না মোটেই। মুচকি হেসে বলল, "লেফট সাইডের পেডালটা খুলছে না বলে ঘাবড়ে গেছিস, তাই তো? আসলে ওটা খুলতে শুধু গায়ের জোর নয়, লাগে কিঞ্চিৎ জ্ঞানও!"

কিছু কিছু প্যাঁচালো স্ক্রু খুলতে জ্ঞান জরুরি জেনে তাজ্জব বনে গেলাম। বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর বিষয়টা বুঝিয়ে বলার জন্য অনুরোধ করলাম দর্জিলদাকে। উত্তরে যা শুনেছিলাম তা যেমন আশ্চর্যজনক তেমনি কৌতূহলপ্রদ। দর্জিলদা বক্তব্যের নির্যাস ছিল এইরকম।

"বস্তুদের জুড়তে হামেশাই নাট-বল্টু, স্ক্রু ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এধরনের জোড়কে গুণাজ জোড় (threaded joint) বলা হয়। দরকার পড়লে এই জোড় সহজেই খুলে ফেলা যায়। মজার কথা, অধিকাংশ মানুষ ডানহাতি হওয়ার প্রভাব পড়েছে গুণার ওপরেও। বেশিরভাগ গুণা তাই ডানহাতি (right-handed)। টাইট করতে হলে ডানহাতি স্ক্রু ডানদিকে আর আলগা করতে হলে বাঁদিকে ঘোরাতে হয়। মনে রাখার জন্য ইংরেজিতে একটা মজার কথা আছে, Righty Tighty, Lefty Loosey! বাঁহাতি স্ক্রুর বেলায় ঠিক উল্টোটা করতে হবে - টাইট করতে বাঁদিকে আর আলগা করতে ডানদিকে ঘোরাতে হবে।

"সাইকেলের বাঁদিকের পেডালের টাকুর প্যাঁচগুলো বাঁহাতি বানাতেই হয়। অন্যথায় পেডাল ঘুরিয়ে সাইকেল চালানোর দরুন বাঁদিকের পেডালটা 'লুজ' হতে হতে অবশেষে খুলে মাটিতে পড়ে যেত।

"বুঝতেই পারছিস, বাঁহাতি প্যাঁচ হওয়ায় বাঁদিকের পেডাল খুলতে হলে রেঞ্চ ডানদিকে ঘোরানোর দরকার। কিন্তু তোরা অভ্যাসবশে বাঁদিকে ঘোরাচ্ছিলি বলে খোলার বদলে ওটা আরও সেঁটে বসছিল!"

কথা শেষ করে দর্জিলদা কাজে নামল। বাঁদিকের পেডালটা এবার সহজেই খুলে গেল।

"কী আশ্চর্য কাণ্ড! তুমি না এলে সাইকেল সারানোর দোকান খুঁজে বের করতে হত আমাদের।" বলল সুজিত।

"ঝামেলা তো চুকেছে, এবার কিছুক্ষণের জন্য নেওয়া যাক বিরতি। চা-টা খেয়ে আবার নাহয় কাজ শুরু করা যাবে।" প্রস্তাব পেশ করলাম আমি।

সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হল নিমেষেই! 'স্বচ্ছ সাইকেল' অভিযানে অতঃপর পড়ল সাময়িক বিরতি।

———

জয়ঢাকি বিজ্ঞাপন	
বিভিন্ন গ্যাজেট	তাপস মৌলিক
সংস্থাগত বিজ্ঞাপন	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
ট্যুরিজম	অরিন্দম দেবনাথ
আজব খাতা	
হুমোর ডায়েরি	তপোব্রত মুখার্জি
ভ্রমণ	
পৃথিবী,জল ও ভালবাসা	সুজয় রায়
ডারবানের ডায়েরি রেলরঙ্গ	দীপক গোস্বামী
বাহামা ক্রুজ ও নাসাউ	উমা ভট্টাচার্য
ভূতের আড্ডা	
ভূতের বাড়ি-ভিলিসকার	বিরুপাক্ষ
দেশবিদেশের ভূত--ডামরী	ইন্দ্রশেখর
বিশ্বের জানালা	
নদীর গল্প-ব্রহ্মপুত্রের	মীম নোশিন নাওয়াল খান
ইজরায়েল	অভীক দত্ত
অস্ট্রেলিয়ার পেটের ভিতর	পারিজাত ব্যানার্জি
কেনিয়ার বন্ধুরা	অংশুমান দাশ
আঙ্কল স্যাম	সংহিতা
বিচিত্র দুনিয়া	
বল্গাহরিণের খোঁজে	অরিন্দম দেবনাথ
লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	
ডাইনির গল্প	অর্কজ্যোতি ভট্টাচার্য
আমার পড়াশোনা	অভিরাজ দেবনাথ
ধাঁধা মজা রহস্য	
ধাঁধা	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধাচিত্র	ইন্দ্রশেখর
সুদোকু	ইন্দ্রশেখর
গত সংখ্যার উত্তর	ইন্দ্রশেখর
ধারাবাহিক উপন্যাস	
অন্তিম অভিযান	পিটার বিশ্বাস
জাদু রাজ্য	মুরাদুল ইসলাম

বনের ডায়েরি	
কিশোর তামাং এর গল্প	বিশ্বরঞ্জন দত্তগুপ্ত
ভারতের মানুষ ও না	কিপলিং।অনুবাদ পিয়ালী চক্রবর্তী
কাতুকুতু	
আত্মহত্যার তিনশ উপায়	রসিকলাল দাস
টাইম মেশিন	
ঠগির আত্মকথা	অলবিরুণী
সীমান্তের অন্তরালে	সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
ভারতভ্রমণ	দীন মহম্মদ -অনুঃ শান্তনু
ইতিহাসের খণ্ডচিত্র-সুকুমার	অতনু প্রজ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মরণীয় যাঁরা	
নোবেল বিজয়ী	অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়
সেই মেয়েরা	
হেনরিয়েটা ল্যাকস	উমা ভট্টাচার্য
ক্যামেরার পেছনে	
ওয়ান টু থ্রি ক্লিক	শম্পা গুহমজুমদার
বই পড়া	
রাজেশ বসুর বই	তাপস মৌলিক
দেবব্রত দাসের বই	শুভঙ্কর সেন
বাংলাদেশের বই	মীম নোশিন নওয়াল খান
দেশ ও মানুষ	
রামময় রামনামী	স্বপ্না লাহিড়ী
ধারাবাহিক অভিযান	
কনটিকি অভিযান	থর হেয়ারডাল অনুবাদ ইন্দ্রনাথ
এভারেস্ট	এরিক শিপটন অনুবাদ বাসব
অন্নপূর্ণা	মরিস হারজগ অনুবাদ তাপস
এস গান শুনি	
সুরঢাক-গাওতি	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়
আলোর পানে প্রাণের চলা	সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

ডেঙ্গুর ভয়ে পঙ্গু?

মশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুন। আমাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

মশা মারার ট্যাঙ্ক

মশা মারার কামান

মশা মারার বন্দুক

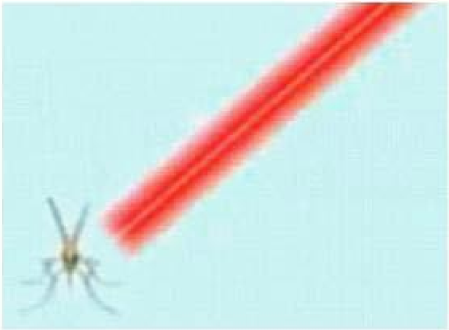

মশা মারার লেসার গান

মশা মারার নস্যাস্ত্র বা স্নিফ গান

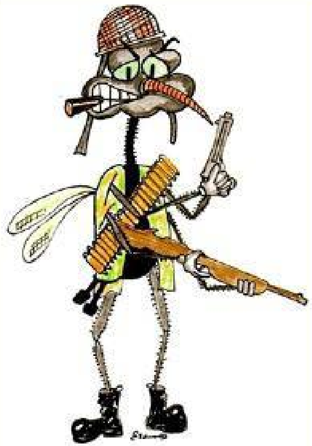

উগ্রপন্থী ডেঙ্গুর
মশাকে চিনে নিন ™

মশকামান
একটি মশাবিরোধী সংস্থা

বিজ্ঞাপন

জুতো পরে খালি পায়ে হাঁটুন

প্রকৃতির সঙ্গে গড়ে তুলুন নিবিড় সম্পর্ক~~তা~~।

আপনার পা যখন প্রকৃতির কোলে ছুটে যেতে আকুল, নরম সবুজ ঘাসের স্পর্শের জন্য ব্যাকুল, অথচ মনে আছে পায়ে কাদা লাগার ভয়, কিম্বা পিঁপড়ের কামড় খাবার আশঙ্কা, তখন বেছে নিন আমাদের প্রাকৃতিক জুতোর সম্ভারের হরেকরকম ডিজাইন থেকে আপনার পছন্দসই মডেলটি আর নির্ভয়ে নির্ভাবনায় বেরিয়ে পড়ুন গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ ধরে।

Nature Trail

খালি পায়ে হাঁটার জুতো

TM

কুকুর বলে কি মানুষ নই আমরা?

ধরো তোমার মনিব তোমায় নিয়ে পার্কে হাঁটতে বেরিয়েছেন, এমনসময় ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নেমে পড়ল। তোমার মনিব দিব্যি ছাতা খুলে মাথায় দিলেন, কিন্তু তুমি চুপ্পুস ভিজে গেলে আর ভিজে গিয়ে সর্দিকাশি-জ্বর-গলাব্যথা শুরু হয়ে গেল। রাত্রে যখন বাড়িতে একটা চোর চুরি করতে এল তখন গলা দিয়ে আর ঘেউ ঘেউ বেরোল না। কিম্বা ধরো সল্ট লেকের জিমি নামের কুকুরটার কথা। তার মনিব দেরি করে ঘুম থেকে উঠতেন, বেলা দশটায় হাঁটাতে নিয়ে যেতেন। বেচারা জিমির ধবধবে সুন্দর চেহারা সূর্যের আলোর আলট্রাভায়োলেট রশ্মি লেগে লেগে কালোই হয়ে গেল। তাই আর নয়, আজই তোমার মনিবকে বলো তোমার জন্যও একটা ছাতা কিনে আনতে, নইলে তাঁর সঙ্গে হাঁটতে বেরোনোর সময় ঘেউ ঘেউ করে প্রবল আপত্তি জানাও।

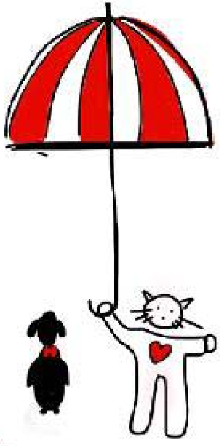

ছত্রধর ।। সারমেয়দের সার কথা ™

এসো এক ছাতার তলায়

লিফটের আটতলার পর বাকি দুটো তলা হেঁটে উঠতে হয়? খেলার মাঠে কিচ্ছু দেখা যায় না? বাসে ট্রামে লাফমেরে পাদানিতে উঠতে হয়? এসে গেল আন্তর্জাতি খ্যাতিসম্পন্ন "হাই-টেনশন"।

জয়পেট সঙ্ঘ

জয়ঢাক পেট ক্লাবে স্বাগত। আমাদের দোয়েলসেশিয়ান, অজগরু, গিরগিটিয়া ইত্যাদি অসংখ্য পুষ্যিদের থেকে তোমার পছন্দের পুষ্যিটিকে বেছে নাও। ভাড়া সপ্তাহে একটি কর্নেটো আইসক্রিম।

আমাদের কোন শাখা প্রশাখা মূল, শিকড় কাণ্ড, ফুল ফল ইত্যাদি নাই।

যোগাযোগঃ joydhak@gmail.com

চলুন
বেড়িয়ে আসি
ঢেঁকিতে চেপে
বেলুনের পাশাপাশি
contact ; NAROD TRAVELS; ISLAND 15 ; KHIRSOMUDRO ; WWW.naroddheki.com

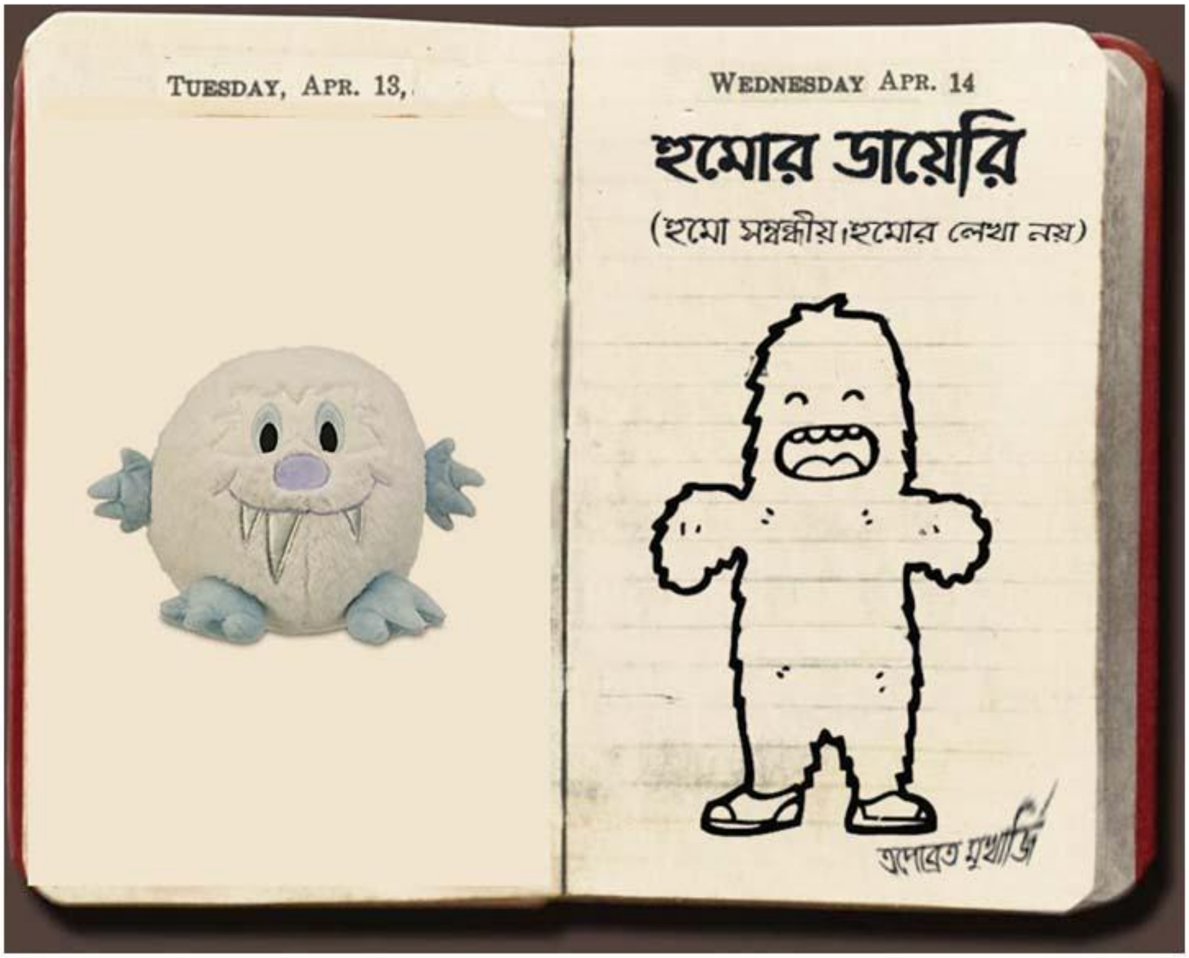

এত যে সব্বাই আন্দোলন-টন করে, এদিকে কেউ খেয়াল করেছে কি যে কোত্থেকে এসব এল? জন্মেই তো কেউ এসব শেখেনি, তবে? আসলে মানুষ এসব জানত না। কী করে জানবে, যখন এসব শুরু হল তখন মানুষ কই? কি ঠাণ্ডা চারদিকে! আবার যেখানে যেখানে গরম সেখানে এইসান গরম যে হাওয়া দিলে তুমি এক্কেবারে বাষ্প হয়ে যাবে। পৃথিবী তো তখন আর পৃথিবী, মানে এখনকার মত ছিল না বাপু। ওসব বেশ উদ্ভট কাণ্ড হত। তুমি তো ভাবছ বসে এই চাদ্দিকে যা হচ্ছে, তার চেয়ে উদ্ধুটে কাণ্ড নাকি আর কিছুই নেই। তবে সেইযুগে থাকলে কী বলতে শুনি?... অবশ্য বলাও যায় না, ছিলে হয়ত। আমি তো ছিলাম না, জানিও না। এই আজকাল একটু একটু যা জানছি তাই বলে টলে যাচ্ছি আর কি।

যাকগে, যা বলছিলাম শুরুতে আর কি, সেই আন্দোলন কোত্থেকে এল-টেল, এখন সে'সব শোন বসে। এর আগেই তো বেশ জানো যে হুমোরা কী করে এলো এখানে। এইবার দেখ, শুধু একা একা তো কেউ থাকতে পারে না, হুমোরও হুমি-র দরকার পড়ে। এ তো জানোই যে হুমোরা সব যারা খাঁচায় বন্দি ছিল, সেই অন্যরকম কারা-দের ফাঁকি দিয়ে-টিয়ে নেমে পড়েছিল। তো, তারপর হল কী, এদিক ওদিক ঘুরে, খাবার খুঁজে খেয়ে টেয়ে বেশ করে পরিপুষ্ট হয়ে-টয়ে তেনাদের মনে হল, নাঃ, এতো কিছু হল, তবু ঠিক কিছু হচ্ছে না।

আসলে হয়েছিল কি, ওই খাঁচা থেকে যে হুমোরা নেমেছিল তারা সব ছেলে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে গেছিল একদিকে, আর যে হুমিরা নেমেছিল তারা গেছিল অন্য পানে। এইবার, বুঝতেই পারা যাচ্ছে, একদঙ্গল ছেলে-কাচ্চা বাচ্চা আর বুড়ো ধেড়ে একদিকে থাকলে ঠিক কী কী দশা হয়। ওদিকে আবার একগাদা কুচি-কাঁচি সঙ্গে

গোটা খানেক বেদো বুড়ি জুটলে যে কি হয় সে তো আর বলে দিতে হবে না, আন্দাজ করাই যায়। ব্যাপার সেই রকমই দাঁড়াল। দিন আর চলেই না।

যা শুনেছি আর কি, ওদিকে তিব্বত বলতে তো সব্বাই চেনেই, সেইখানেই তখন এক হুমি গেছিল ঘুরতে না ফল খুঁজতে কীসের কাজে যেন। তখন এই শক্ত শক্ত বরফদলা, তার সাথে আরও কীসব থাকতো মিশে। সেইসবই ছিল খাবার।

এইবার হয়েছে কী, একদলা বরফ ভেবে কী একটা নরম মত তুলে হুমি বসিয়েছে কামড়। আর বরফও হাত পা ছুঁড়ে হাঁইমাই করতে শুরু করেছে। কামড় বসিয়েই হুমি বুঝেছিল যে এ বরফ সে বরফ নয়। কিন্তু সে যে হাত-পা ছুঁড়ে চ্যাঁচাবে কে জানত! হুমি বেশ অবাক।

আসল কেলো হয়েছিল এই যে ওখানে নাকি কীসব করছিল একটা বাচ্চা-মত হুমো। তখন ওই হুমো-হুমিদের গায়ে খুব জোর ছিল তো, তাই হুমি টানতেই সে এসেছে উঠে কিন্তু সে যে কে তা আর বলবার সুযোগই পায়নি। তার আগেই রামকামড়ানি!

তো, হুমোদের গলার আওয়াজ আজকালের মানুষের মত তো ছিল না, আর তখন মানুষ ছিলই বা কোথায়। সেই এক চিৎকারে কোত্থেকে আরও কত যত হুমো ছিল এলো দৌড়ে। এক মাতব্বর গোছের হুমো আগে আগে তেড়ে এলো বেশ।

কিন্তু ব্যাপার হল, তেড়ে আসাই সার। সামনে এসেই কেমন যেন ভেবলে গেল। বাচ্চা হুমোটা তো তখন হাত-পা ছুঁড়ে যত পারছে অভিযোগ জানাচ্ছে। কিন্তু সে আর কে শোনে তখন।

এইফাঁকে কিন্তু আরও অন্য হুমোরাও এসে গেছে। তারা সব ওই দল-টল বেঁধে খাবার খুঁজতেই বেরিয়েছিল হুমির মত। শুধু বেচারি হুমি-ই কত্তোদূর এসে পড়েছিল বলে যত ঝামেলা শুরু। ততক্ষণে হুমি-বেচারি বেশ ঘাবড়ে গেছে। কি যে করবে বুঝতে পারছে না। রাগবে, কাঁদবে না হাসবে- সব বেচারির গুলিয়ে যাচ্ছে।

যাক গে, কিছুক্ষণ পরে বোম্বাচাক ভেঙে হুমো বলল সে হুমি কে তাদের দিকে নিয়ে যেতে চায়। হুমির তখন খিদেতে পেটের নাড়ি জ্বলছে। তাই আদিখ্যেতা যে তার মোটেই সুবিধের লাগছিল না সে ভালো করেই দিল বুঝিয়ে। তো হুমোগুলো তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে খাওয়ালো কিছু। তারপর হুমি গেল হুমোদের ঘরের দিকে।

তারপর বেশ দিনকতক গেল। (কত দিন বলা মুশকিল। আমাদের দিন আর হুমোদের দিন এক ছিল কিনা তাই বা কে জানে) তারপর একদিন দেখা গেল পালে পালে হুমো আসছে, আর ওপার থেকে হুমি। সেই যে অন্যরকম কারা-দের খাঁচা থেকে পালাবার পর এই এত্ত দিনে সব্বাই এক হল। বোধহয় হুমোদের আগের গ্রহে এমন কিছু ছিল-টিল না, এইখানে এসে, মানে পৃথিবীতে এই প্রথম এমন হল। তো, হল তো হল, খুব বুড়ি হুমি-রা এসে সব সদ্য-বুড়ো, মাঝারি বুড়ো, কচি-আধকচি সব হুমোদের খুব আদর-টাদর করল।

হুমোদের আসলে সবকিছু বড় ঘেঁটে ছিল। হুমি-বুড়ি গুলো ছিল সেই যাকে বলে সাত-বুড়ির এক বুড়ি, সব জানতো-টানতো। তাই মাতব্বর হুমোরা বলল যে এইবার থেকে হুমি বুড়িরাই হুমোগুষ্টি টানবে। সব্বাই তাদের মেনে-টেনে চলবে। সব্বাই তো বেশ খুশি টুসি হল।

তবে তারপর থেকে কিছু খারাপ অবস্থা হল বটে হুমোদের। বেচারাদের সারাদিন ঘুরে ঘুরে বরফ খুঁজে বেড়াতে হত। কাজে ফাঁকি দিলে প্রথমে কিছু ডাণ্ডা-বাড়ি, আর তারপর বুড়ির সারাদিনের বকবক চলত। বেশ কিছু আধবুড়ো হুমো বেশ চেঁচিয়ে-মেচিয়ে এককাট্টা হতে গেছিল বটে (মানে, ওই বলতে পারো আন্দোলন-টনের শুরু), কিন্তু ডাণ্ডা-বাড়ির চোটে সেসব আর বেশি কিছু পারেনি। কিছু কচি হুমো তাই পালিয়ে টালিয়ে গিয়ে একটু গরম-সরম জায়গায় এসে আস্তে আস্তে ইয়েতি হয়ে পড়েছিল।

যদিও তাতে মুক্তি-টুক্তি নেই। কোন পাহারাদার হুমো খুঁজে পেলে ঠিক খবর দিত বুড়িদের। ধরে আনলে সারাদিন কানের কাছে চোদ্দবুড়ি বসে বকে বকে মাথার লোম খসিয়ে দিত হুমোদের।

জানি, এইবার ভাবছ তো, যে ছিল হুমোরা ভালো, মাঝের থেকে এইসব হুমি-টুমি টেনে এনে বিপদ বাড়াল! আচ্ছা ভাব তো, আজ হুমিরা না থাকলে কিন্তু এই আরশোলা, ডাইনোসর, টিকটিকি, ইয়েতি, মানুষ- কেউ থাকত না। কেন? বিজ্ঞান পড়েছ? পড়োনি? তবে বাদ দাও।

আর আমি এসব জানলাম কোত্থেকে? ঠিক, এতো কথা কাগজে বেরোয়নি বটে। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক জায়গায় এখন গুহার ছবি পাওয়াটাওয়া গেছে। এই ধরো স্পেন, মেক্সিকো মায় আমাদের ছত্তিশগড়ে। শুধু সিকিম নাকি, সেসব জায়গায়ও গেছি। তুমি কি শুধু ভাবো তোমার ঠাকুমা-দিদাই গল্প বলে গেছে, আর কেউ কিছু বলেনি? খুঁজে পেলে ইয়েতিদের জিজ্ঞেস করো। না পেলে ঘুরে দেখ। অনেক জনে অনেক কিছু বলে বটে, কিন্তু আসল কথাখানা এইখানে বলে দিলাম। ইচ্ছে হলে বিশ্বাস কর, না হলে সব ঘুরেঘারে তারপর এমন করে একটা রচনা লিখতে বসো তো দেখি।

গ্রাফিক্স্ ইন্দ্রশেখর

যেখানে আকাশ, পৃথিবী, জল ও ভালোবাসা মেশে লক্ষ একর অরণ্যে

সুজয় রায়

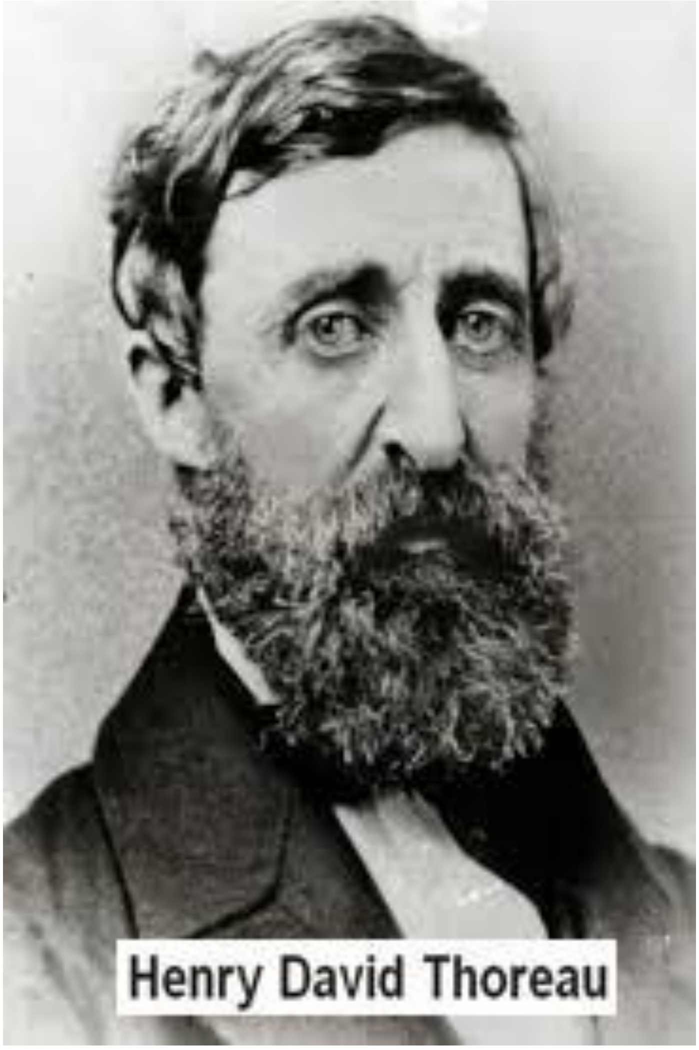

Henry David Thoreau, আমেরিকার সুবিখ্যাত নিসর্গ-বিলাসী, চিন্তানায়ক ও লেখক বলেছিলেন, অরণ্য সভ্যতাকে বাঁচাবে। উনবিংশ শতাব্দীতে ম্যাসাচুসেটস-এর Concord শহরে পেন্সিল তৈরি করে আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করতেন। আজ নগরায়ন বেড়ে গ্রাস করে নেয় তৃণভূমি ও শ্যামল বন। তাই এই মনিষীর বাণী স্মরণ করা হয়। বর্তমান জগতে পরিবেশ সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি ঠেকছে। আমেরিকার Appalachian National Scenic Trail ২১৭৫ মাইল লম্বা সরকার সংরক্ষিত দীর্ঘতম ভ্রমণপথ। দেশের দক্ষিণে জর্জিয়াতে Springer Mountain থেকে শুরু করে ১৪টি রাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে উত্তর-পূর্বে Maine-এ Mount Katahdin গিয়ে শেষ হয়। একে চলতি কথায় public footpath বলা হয়। Appalachian পর্বতমালা কিন্তু Maine অতিক্রম করে কানাডাতে প্রবেশ করে হয়েছে একটা আন্তর্জাতিক ভ্রমণপথ। আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্ভার অপার।

আমি গিয়েছিলাম যেখানে জল, আকাশ, ও মাটি মেশে লক্ষ একর জঙ্গলে। আমেরিকার ত্রিশ শতাংশ মানুষ পৃথুল, তারা অমিতাহারী; হট ডগ, আলু ভাজা ও কোক প্রিয় তাদের। খাওয়া প্রচুর, অপচয় না হলে তারা সচ্ছন্দ বোধ করে না। জোরে বলে কথা, উচ্চগ্রামে হাসে, জীবনযাত্রা বড়ো মাপের। গ্রীষ্মে একবার long weekend, অর্থাৎ সপ্তাহে তিনদিন ছুটি পাওয়া গেল। হাইওয়ে ও ইন্টার-স্টেট রাস্তা ধরে গাড়ি চলেছে গটর গটর। অসংখ্য গাড়ি কিন্তু অবাধ গতি তাদের। রাস্তার প্রসারতা আমরা কল্পনা করতে পারি না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি আগ্রাসী পন্থা নিয়ে ইউরোপে প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের গ্রাস করেছিল জার্মান নাগরিকদের বাসযোগ্য যথেষ্ট জমি (‘Lebansurum’, i.e, living space) সংকুলান করবার প্রধান প্রয়োজনে। আমেরিকার মেদিনী এতটাই যে মানুষ সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে।

গভর্নর হাউস, ম্যাডিসন

গাড়িতে সস্ত্রীক চলেছি Illinois, Iowa, Wisconsin, Michigan ইত্যাদি রাষ্ট্রের এপার ওপার করে। পালা করে গাড়ি চালাচ্ছে পুত্র ও পুত্রবধু, সঙ্গে আছে ছোটো নাতিটি। বিশেষভাবে রাস্তায় চোখে পড়ে সারিবদ্ধ চলেছে Recreational Vehicle (RV)। গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে চার চাকার বসবাসযোগ্য একতল বা দ্বিতল ভ্যানকে। আমোদ-প্রমোদ, খেলা, শ্রান্তি-বিনোদনের সব উপাদান ও উপকরণ ভ্যানে আছে। বেশি বয়সের মানুষেরা বিষয়-সম্পত্তি বিক্রী করে এই বন্ধনহীন জীবনযাত্রা বেছে নিয়ে সুখী। পথকে তারা প্রমোদ উদ্যান করে নিয়েছে।

Iowa-কে ‘Food capital of the world’ গণ্য করা হয়। প্রধানত গম ও আখ এখানে উৎপন্ন হয়। কৃষিজীবিদের গড়ে হাজার একর জমি আছে। মেদিনী কতটা চাই! John Deeree কোম্পানি গত একশো আশি বছর যাবত ক্রমান্বয়ে

বেলে পাথরের প্রাকতিক ভাস্কর্য

অত্যাধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে চলেছে যা কৃষিকে বড়ো মানের সফলতা দিয়েছে। Moline (Illinois) শহরে এর কেন্দ্র ও সাঁইত্রিশটা ভিন্ন দেশে এর কার্যনির্বাহি শাখা রয়েছে। আমেরিকাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রায় নিত্য সঙ্গী। Iowa-তে বছরে প্রায় পঁয়ত্রিশটা টর্নেডো হানা দেয়। শহরের মানুষের জন্য নিরাপদ আশ্রয় থাকে মলে। আর থাকে পর্যাপ্ত খাবার ও বিছানা, কম্বল। আমাদের গাড়ি চলেছে দুরন্ত গতিতে। না, জানতে চেয়ো না পথ কত বাকি। G.P.S. (Global Positioning System) যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করে নিই এখন এলাম কোথায়, রাস্তার ম্যাপ, গ্যাস অর্থাৎ পেট্রল স্টেশন, মাঝপথে আহারের প্রয়োজনে MacDonald's, Starbuck-এ ফাস্টফুড, কোন সরাইখানায় রাতের বিশ্রামটা পাওয়া যাবে - নানান জরুরি জানকারি।

Moline (Illinois) থেকে যাত্রা শুরু করা হয়েছে। গলা শুকিয়ে গেলে গ্যাস স্টেশনে energy drinks তুলে নেওয়া যায়। আমরা ছুটে চলেছি যেন যাযাবর। উত্তর আমেরিকার Prairie ঘাসে ঢাকা সামান্য ঢেউ খেলানো বহু দূর প্রান্তর। অন্যত্র Savannah অর্থাৎ গাছপালাবিহীন ন্যাড়া প্রান্তর। যে অঞ্চলে পথের ধারে ঘন ঘাস, সে যেন ঠাস বুনোনে দিগন্তজুড়ে golf course। আমাদের চোখে কালো চশমা, গাড়িতে একটা কোমল বাজনা মন বিবাগী করে তুলছে।

Madison এক ঝকঝকে শহর। Wisconsin-এর রাজধানী। এটা অবস্থিত Lake Superior আর Mississippi নদীর মাঝখানে। Governor House-এ আছে সেখানকার Supreme Court আর আইনসভা। Supreme Court-এ দর্শকদের যাওয়া চলে। এর কারুকার্যখচিত ভেতরকার দৃশ্য চোখ কেড়ে নেয়।

এর পরে যাত্রায় বলার কথা Lake Superior, যা Michigan-এ অবস্থিত। এটা এ দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল। এখানে শীত বেশি। এই লেক আমেরিকার চার National Lake-এর মধ্যে একটি। এটি পৃথিবীর সবচাইতে দীর্ঘ fresh water লেক। এর জল এতই গভীর যে জল ছাড়া পেলে আমেরিকার ৪৮ রাজ্য হাঁটু পর্যন্ত ভরে যাবে। প্রসঙ্গত, Yellowstone, Grand Canyon, Shenandoah ও Smoky Mountains-কে দেশের National Park ধরা হয়। এই সমস্ত এই দেশে প্রকৃতির সম্ভার। Lake Superior সৃষ্টি হয়েছিল glacier বা হিমবাহ গলে। সেই বরফ গলা জল এসে পড়ে কানাডার Ontario প্রদেশ থেকে।

আপালাশিয়া

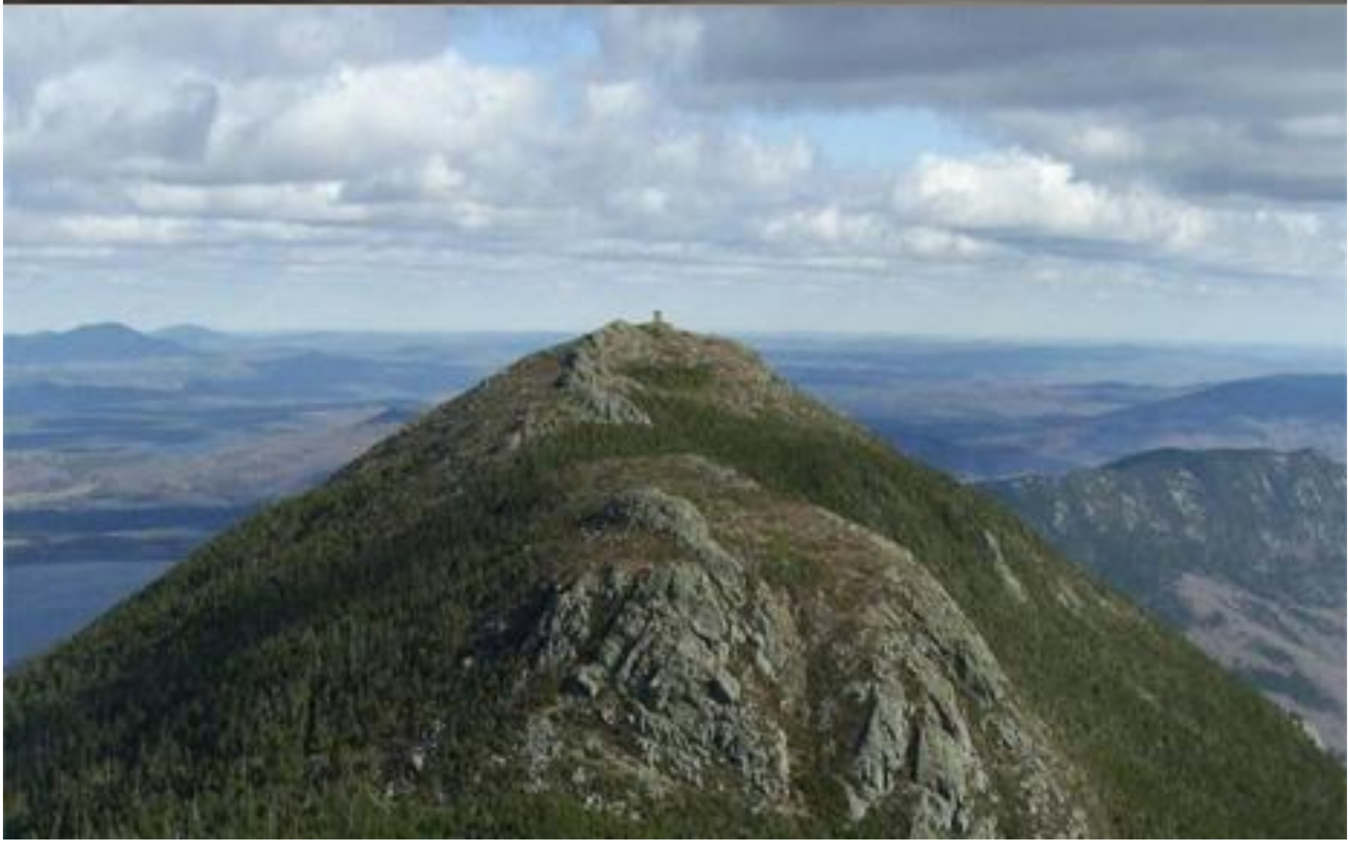

লেক সুপিরিয়র। নানান রূপে

এই দিগন্তবিস্তৃত লেকের জলরাশি সরবে মথিত করে স্টীমার টুরিস্টদের নিয়ে বিহার করে। এর জল স্বচ্ছ। নীল আকাশ লেকের জলে মুগ্ধ হয়ে আপনার মুখ দেখছে। পাড়ে প্রায় কয়েকশো ফুট উঁচু sandstone pictured rocks নামে খ্যাত। লেকের এই রঙিন পাড় ২৭ কিমি দীর্ঘ। তাদের রঙের বৈচিত্র চিত্রকারের খামখেয়ালি ছবি যেন। লক্ষ বছর আগেকার কথা। হিমবাহ পিছু হটেছিল, রেখে গিয়েছিল জলরাশি। সেইভাবে লেকের সৃষ্টি। Ontario-তে বেশ কয়কটি kettle lake রয়েছে যা হিমপুষ্ট নদীর অববাহিকার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। জলযানে আমরা দেশবিদেশের টুরিস্ট চলেছিলাম জোর গতিতে। হিমশীতল বাতাসে মুখ, কান অসাড় হয়ে যাচ্ছে। ঐ হাওয়ায় মাথার টুপিটা যেন ডানা মেলে উড়ে গেল। স্টীমারের গাইড উষ্ণ গলায় বন্ধুত্বের ঢঙে বিবরণ দিয়ে চলেছে। তা এমনই মজার যেন বাড়তি লাভ এবং তথ্যবহুলও বটে। আমরা চিৎকার করে আমোদ করছি। কিন্তু হাওয়ার গর্জনে তা শুনবার উপায় নেই। সমুদ্রের বেলাভূমিতে জলোচ্ছ্বাস কোলাহল ছাপিয়ে যাচ্ছে যেন। সামনে উধাও দিগন্ত। প্রকৃতির মুক্তাঙ্গন।

তাই তো রবি ঠাকুর বলেছেন, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের সবক'টা দ্বার খুলে দিয়ে অনুভব করতে হবে - 'fullest utterance of nature'।

ডারবান ঘুরে এসে দীপক গোস্বামীর রিপোর্ট আর ANNE MARIE NZIOKI এবং ঋতুপর্ণ গোস্বামীর ছবি)

রেলরঙ্গ পর্ব - ২

১৬। ডারবানের একটা দ্রষ্টব্য VIRGINIA CIRCLES MINIATURE TRAINS. এটা পরিচালনা করেন ৯৪ বছরের পুরনো ডারবান সোসাইটি অব মডেল ইঞ্জিনিয়ার্স। কয়লা দিয়ে স্টিম তৈরি করে এই মডেল ট্রেন চলে।

১৭। প্রতিমাসের দ্বিতীয় রবিবারে এটা চালানো হয়। প্রচুর যাত্রী। ড্রাইভার এবং ছয় থেকে দশজন যাত্রীকে দু'ধারে পা ঝুলিয়ে বসতে হয়।

১৮। স্টিম ইঞ্জিনের পাশাপাশি ডিজেল ইঞ্জিনও আছে, যদিও যাত্রীদের প্রথম পছন্দ স্টিম ইঞ্জিনই।

১৯। ইঞ্জিন যাই হোক না কেন, সবগুলোতে বাচ্চারাই প্রধান অতিথি।

২০। আট থেকে দশ মিনিটের যাত্রার জন্য রীতিমতো টিকিট কেটে ট্রেনে উঠতে হয়।

২১। টিকিট পরীক্ষার ব্যবস্থাও আছে।

২২। আকারের তুলনায় অথেষ্ট ভালো গতি এবং ট্রেনের চাকার শব্দে প্রকৃত রেলযাত্রার আনন্দই পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, যাত্রীরাও সবাই খুশি।

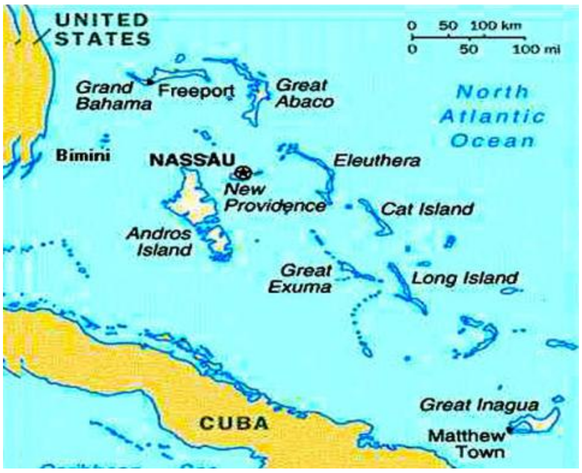

বাহামা ক্রুজ ও নাসাউ

মধ্য অতলান্তিক সাগরের বুকে কিউবা ও হাইতির উত্তরে, ফ্লোরিডা উপদ্বীপের প্রায় দক্ষিণে অবস্থিত একগুচ্ছ ছোটোবড়ো দ্বীপের সমষ্টি নিয়ে বাহামা দ্বীপরাষ্ট্র। প্রায় ৭০০টির মতো দ্বীপ নিয়ে গঠিত লুসাইয়ান আর্কিপেলেগো বা দ্বীপমালার একটা অংশ বাহামা, 'কমনওয়েলথ অফ বাহামা' নামেই পরিচিত। এর কাছেই ফ্লোরিডা। ওর্লাণ্ডো। ফ্লোরিডার এক মনোরম সুন্দর শহর। শহরটির সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। অসংখ্য জলাশয়, তাতে আছে ফোয়ারা যাতে জলে চলন থাকে, জল ভালো থাকে। সে সব জলাশয়ে নানা জলচর পাখি ভেসে বেড়ায় সারাদিন; খাবার খুঁজে নেয় জলের তলে ডুব দিয়ে। গাছে গাছে নানা জাতের পাখি। আছে বড়ো বড়ো রিসর্ট আর নামীদামী হোটেল। অনেকগুলিই পাঁচতারা। ওর্লান্ডো থেকে পোর্ট ক্যানারভিলে বন্দর দিয়ে বাহামার দিকে যাত্রা শুরু হয় সমুদ্রপথে। পথে পড়ে ইন্ডিয়ানা আর বানানা নামে দুটি নদীর মাঝখানে ক্যানারভিলে অন্তরীপ। ক্যানারভিলে বন্দর থেকেই বিরাট বড়ো দুধসাদা জাহাজে চড়ে আমার যাত্রা শুরু হল।

অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পর (চেকিং) দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে এগোতে এগোতে জাহাজের ভিতরে প্রবেশ করা গেল। যাত্রীদের লাগেজ আগেই চলে গিয়েছিল জাহাজের পেটের খোলে। জাহাজের কর্মচারীরাই ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট রুম নম্বর দেখে দেখে লাগেজ পৌঁছে দিয়েছিল ঘরে ঘরে। জাহাজে উঠবার চেকিং যেখানে শুরু হয়েছিল সেখানেই আমাদের পাসপোর্টের ছবি ও ডিটেল তুলে নিয়েছিল ওদের হাতে রাখা ট্যাবে। সেই ছবিই সারা জাহাজের সব প্রবেশপথে আর বহির্গমনের পথের কর্মরত দ্বারপালদের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল। কারচুপির বালাই নেই। সকলেরই আইনানুগ পরিচয়পত্র আছে। তাই জিনিস চুরি হওয়া বা বাজে লোকের খপ্পরে পড়বার কোনও ভয় ছিল না। আর শুরুতেই আমাদের দেওয়া হয়েছিল একটি সমুদ্রে প্রবেশের টিকিট 'সী পাস' যেটি

জাহাজে থাকবার চাবিকাঠি। হারালেই গেল। ক্যানারভিলে বন্দর থেকে যাত্রা শুরু হল সকাল এগারোটায়। ধীরে ধীরে নগর, বন্দর, স্থলভাগ দূরে সরে যেতে লাগল।

কয়েক ঘন্টা বাদে সব উধাও হল। তখন চারদিকে শুধু জল আর জল। এসময় জাহাজের সঙ্গী হল কিছু সামুদ্রিক পাখি। জাহাজের মাথার ওপর অনবরত পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগল। সমুদ্র আর আকাশের নীলিমার প্রতিযোগিতা দেখতে দেখতে দিন কেটে গেল। পরদিন দুপুরবেলায় আমরা পৌঁছুলাম বাহামা দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী নাসাউ দ্বীপে। পুরো একটি দিন চলেছিলাম অতলান্তিকের জলে ভেসে।

সমুদ্রের জলের যে কত শেড হতে পারে তা বুঝলাম অতলন্তিক মহাসাগরের বুকে জাহাজে বাহামা ভ্রমণে এসে।

সমুদ্রসবুজ (সী গ্রীন), আকাশনীল, ঘন নীল, তারপরে একসময় গভীর জল কালচে নীল হয়ে দেখা দিল। সেই নীল সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে ভেসে চলল আমাদের ময়ূরপঙ্খী নাও – দুধসাদা চৌদ্দতলা জাহাজ 'কার্নিভাল লিবার্টি'। মনে হল স্বপ্নরাজ্যে ভেসে চলেছি। মাথার ওপরে নীল আকাশ, নিচে নীল তরঙ্গময় সমুদ্র। তার ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে মাথার চিমনির পথে ধোঁয়া উড়িয়ে চলছিল বিরাট জাহাজ।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এগিয়ে এল। সূর্যদেব বিশ্রাম নিতে চললেন পশ্চিম দিগন্তকে অস্তরাগে রাঙিয়ে দিয়ে। আপন মনেই গুনগুনিয়ে উঠলাম, 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো তোমার যাওয়ার আগে'। মধ্য অতলান্তিকের বুকে ভেসে ভেসে দিগন্তে সূর্যদেবের অস্তরাগের ফাগের খেলা দেখতে তখন সবাই উদগ্রীব। বাদ সাধল মেঘ। হঠাৎ কোথা থেকে মেঘের দল এসে ঢেকে দিল সূর্যকে। নড়নচড়ন নেই, কিছুতেই যেন সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করতে দেবে না। তবুও এক ফাঁকে তরল সোনার থালার একটুখানি দেখা গেল। কৃপা করলেন সূর্যদেব। যেটুকু দেখা পাওয়া গেল, প্রকৃতিপ্রেমীরা তখনই সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করতে ছুটলেন তেরো তলার ছাদে। আমিও একটুকরো সূর্যকে ক্যামেরাবন্দী করলাম।

রাতের আঁধার নেমে এল পার্থিব জগতে। আকাশে তারাদের অবিরত ঝিকিমিকি দেখতে উঠে গেলাম তেরোতলার ডেকে। নিচে তো আলোর বন্যা আর মিউজিকের কলতান। নৈঃশব্দ নেই ক্রুজের ভাসমান শহরের ন'তলায়। সেখানে পুলে পুলে তখনও স্নান চলছে, সঙ্গে জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানো

হচ্ছে নাচগানের অনুষ্ঠান। কখনও বা দেখাচ্ছে সমুদ্রের তলদেশের প্রাণীদের কাণ্ডকারখানা। কখনও চলছে কোনও ফাটাফাটি সিনেমা। পৃথিবীর কত দেশের কত মানুষ যে সেই প্রমোদ অভিযানে সামিল হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সকলের পছন্দমতো অনুষ্ঠান দেখানো হচ্ছে পাল্টে পাল্টে। পাঁচতলায় চলছে লাইভ সঙ্গীতানুষ্ঠান আর আনুষঙ্গিক নৃত্য। চারতলায় বিভিন্ন অংশে আছে দোকানপাট, নাটকের স্টেজ, আর বিশাল এলাকা নিয়ে আছে ক্যাসিনো। সারাদিন সেখানে খেলার লোকের অভাব নেই।

আমরা তখন বাস করছি সমুদ্রে ভাসমান বিলাসবহুল এক বিরাট শহরে। কী নেই সেখানে! অফুরান আনন্দের উপকরণ মজুত আছে ক্রুজে। ন'তলায় জনারণ্য। কারণ, সেখানেই রয়েছে ছোটোবড়ো পাঁচটি সুইমিং পুল, হট ওয়াটার স্পা। ছোটোদের জন্য সুইমিং পুলগুলি জাল দিয়ে ঘেরা। সারাদিন, এমনকি সারারাত সেগুলিতে চলছে হুটোপুটি। চৌদ্দতলার ডেক থেকে নেমে এসেছে একটি ঘোরানো স্লিপ খাওয়ার জায়গা। ঠিক ওয়াটার রাইড বলা যাবে না, তবুও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেখানে লাইন থাকছে। বাচ্চা-বড়ো ভেদ নেই, সকলেই সেই স্লিপ বেয়ে দূরন্তগতিতে নামতে নামতে এসে পড়ছে সুইমিং পুলে। জল ছিটকে উঠছে, আনন্দে হুল্লোড় করে উঠছে সবাই। সারি দিয়ে পরপর নেমে আসছে লাইনে দাঁড়ানো সবাই একে একে। সে যে কী আনন্দসায়রে ভাসছে তারা, মুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। আমার দেশের দরিদ্র মানুষগুলোর মুখ মনে পড়ে গেল। ভাবতে লাগলাম, তারা কি কোনওদিন হতে পারবে এমন আনন্দযজ্ঞের অংশীদার!

আমি ক্রুজের ভেতরের ডাইনিং হল, বিভিন্ন জলসা আর ভেতরের চমকদার সাজসজ্জার কিছু ছবি নিলাম। একটি ছোট্ট ভিডিও তুললাম চলতে থাকা আনন্দ অনুষ্ঠানের।

দিনের বেলায় জাহাজের তেরোতলার ডেকে দাঁড়ালে দিগন্তের মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল ছোটো ছোটো দ্বীপ, আর 'কে'। যেসব ভূমি সমুদ্রের তল থেকে সবেমাত্র মাথা চাড়া দিচ্ছে সেগুলি হল 'কে' । এসব দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম লুসাইয়ান আর্কিপেলেগোর কাছে। সেই দ্বীপমালার নানা ছোটোবড়ো দ্বীপের পাশ দিয়ে চলতে চলতে এসে পৌঁছুলাম বাহামা দ্বীপরাষ্ট্রের নিউ প্রভিডেন্স দ্বীপের নাসাউ বন্দরে। একসময়ে ক্যারিবিয়ান পাইরেটদের স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠা নাসাউ আজ বাহামার প্রাণচঞ্চল রাজধানী শহর।

বন্দরে জাহাজ পৌঁছুবার পর সঙ্গে সঙ্গেই নামা যাবে না। জাহাজের বিভিন্ন ফ্লোর থেকে যাত্রীরা লাউড স্পিকারের নির্দেশ অনুসরণ করে নেমে আসছিল। লাইন করে এসে জাহাজের একতলায় পৌঁছুবার পর বাইরে যাওয়া যাবে। বেরোবার পথে আবার চেকিং হল। সী পাস আর পাসপোর্ট দেখানো হল। ট্যাবে তোলা পাসপোর্টের ছবির তথ্য আর হাতের পাসপোর্টের তথ্য মিললে তবেই বাইরে যাওয়ার অনুমতি মিলবে। সব

নিয়মের বেড়া টপকে বাইরে বেরিয়ে এলাম দলের সবাই। সামনেই দেখা গেল 'নাসাউয়ে স্বাগত' লেখা গেট। এগোলাম বাহামার রাজধানী শহর নাসাউয়ের দিকে। বিরাট নাসাউ বন্দরটি আটলান্টিক সমুদ্রপথে খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

আমাদের জাহাজের বিপরীতদিকের ঘাটেই এসে থেমেছিল আরেকটি জাহাজ। সেখান থেকেও কাতারে কাতারে মানুষ নেমে আসছিল। পথ ভোলার ভয়ে আমাদের দলের সবাই একত্র হলাম একটি শেডের নিচে। আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই, প্রকৃতি বোধহয় নীলের পাত্র উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে সেখানে। সূর্যের প্রচন্ড কিরণ থেকে বাঁচাতে ক্ষণিকের ছায়া এনে দিচ্ছে টুকরো টুকরো সাদা মেঘের ভেলা।

একটু এগোতেই সামনেই দেখা গেল কিছু মানুষ, দ্বীপের আদিম মানুষদের জাতীয় পোশাক, পাখির পালক, গাছের পাতা দিয়ে বানানো শিরস্ত্রাণ, হাতে বল্লমের মত অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে। উপজাতীয় পোশাকে সেজে তারা স্বাগত জানাচ্ছে নানা দেশে থেকে আগত মানুষদের। তাদের দেশ দেখতে আসা মানুষজনকে আহ্বান জানাচ্ছে তাদের সঙ্গে ছবি তোলবার জন্য। অনেকে তাদের সঙ্গে ছবি তুলছে। ছবি তুললে সেই ছবি পর্যটককে দেবার বিনিময়ে মিলবে অর্থ, খানিকটা আয় হবে। নাসাউয়ে পর্যটনই প্রধান শিল্প। এর ওপরই এই দ্বীপের অধিকাংশ মানুষের জীবন নির্ভর। তাই পর্যটক তাদের কাছে অতিথি নারায়ণ।

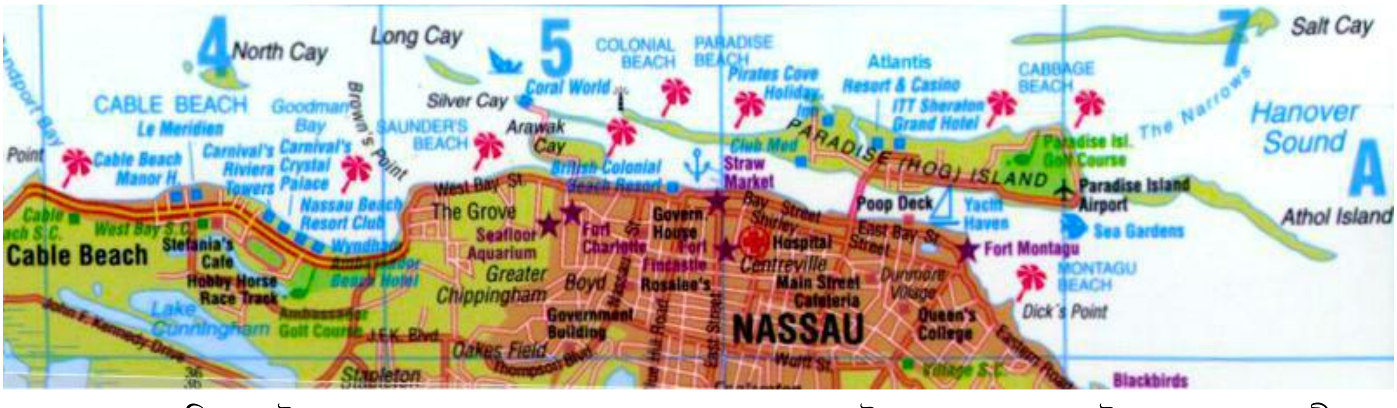

এবার আসি নাসাউয়ের কথায়। হাজার বছরের মধ্যে অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করেছে নাসাউ। বাহামার নানা দ্বীপের মতো বর্তমানের নাসাউ, অতীতের চার্লস টাউন। নাসাউয়ের গা ঘেঁষেই রয়েছে এর উপগ্রহের মতো ছোট্ট অথচ সুন্দর দ্বীপ 'প্যারাডাইস আইল্যান্ড'। এইসব দ্বীপের আরণ্যক পরিবেশে সভ্যজগতের নানা জটিলতার বাইরে একসময় সুখেই ছিল আদিম লুসাইয়ান উপজাতির নানা শাখার বনজীবি মানুষেরা। এখানকার আদিম টাইনো উপজাতির মানুষরা জায়গাটির নাম রেখেছিল

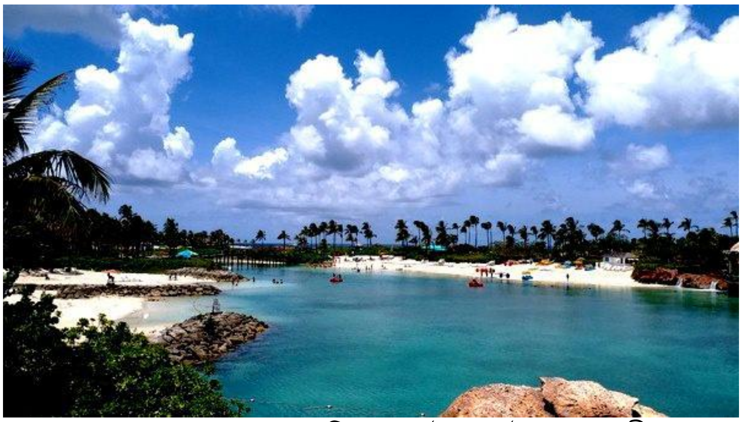

‘বাহামা’ - ওদের ভাষায় এর অর্থ হল ‘বিগ আপার মিডল ল্যান্ড’। স্পেনিয়রা বাহামা দখল করার পর নাম দিয়েছিল ‘বাজা মার’, অর্থাৎ অগভীর সমুদ্রের দেশ। সত্যি এর চারপাশের সমুদ্রের গভীরতা খুব বেশি নয়। এসব অজানা দ্বীপের জগৎ নিয়ে ইউরোপের নানা দেশের মানুষদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ছিল। যেমনটি ছিল মশলা, সোনা, রূপা, নানা দামী পাথরের দেশ অজানা ভারতবর্ষকে নিয়ে।

ভারতবর্ষের সম্পদের লোভে ভারত আবিষ্কারের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন স্পেনিয় নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ১৪৯২ সালে জানা বিশ্বের বাইরে এই বাহামা দ্বীপপুঞ্জের পূর্বাংশে প্রথম পা রেখেছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন এশিয়া তথা ইণ্ডিজে পৌঁছে গেছেন তিনি। নতুন দেশটির নাম দিয়েছিলেন ‘ইন্ডিজ’। পরে বুঝতে পারলেন সেটি ইণ্ডিয়া বা ভারত নয়। সেখানে তিনি প্রায় পোশাকহীন, বন্য কালো আদিম মানুষদের সন্ধান পান। লুসাইয়ান-ট্রাইনো উপজাতির আদিম, অরণ্যজীবি প্রায় ৩০,০০০ হাজার মানুষের বাস ছিল তখন এইখানে। এই মানুষেরা হিসপ্যানিওলা বা হাইতি আর কিউবা থেকে এসে এইসব জনহীন দ্বীপগুলিতে বসতি করেছিল একাদশ শতকে।

নতুন দেশ আবিষ্কার করলেও আশাভঙ্গ হওয়াতে কলম্বাস সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করলেন না। ফিরে গেলেন তিনি। কিন্তু সেখানে রয়ে গেল তাঁর সঙ্গে আসা কিছু লোভী স্পেনিয় নাবিক। কিছুদিনের মধ্যেই এরা দ্বীপের সরল সাদাসিধে, কর্মক্ষম মানুষগুলিকে বন্দী করে জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যেতে লাগল বিভিন্ন দ্বীপে। বিক্রি করতে লাগল ‘দাস’ হিসাবে। আটলান্টিক পথে ক্রীতদাস ব্যবসার শুরু হল সেই থেকে। দাসব্যবসা করে ধনী হয়ে উঠতে লাগল স্পেনিয় নাবিকরা। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য আরও দেশ এই ব্যবসা শুরু করে। আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে গড়ে ওঠা কলোনির বাসিন্দা ইংরেজরাও প্রচুর দাস সংগ্রহ করেছিল। তাদের লোভের শিকার হয়ে ১৫১৩ থেকে ১৬৪৮ সালের মধ্যেই বাহামার দ্বীপগুলো প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল। সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে ১৭১৮ সালের মধ্যে প্রায় জনহীন বাহামা হয়ে উঠেছিল ক্যারিবিয়ন জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য।

যে ইংরেজরা ব্রিটেন ছেড়ে এসে উত্তর আমেরিকার পূর্বাঞ্চল জুড়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তেরোটি রাজ্য নিয়ে গড়ে তোলা কলোনিগুলি দীর্ঘদিন ব্রিটেনের রাজার শাসনাধীন ছিল। ১৬৭০ সাল নাগাদ কিছু অর্থবান ব্রিটিশ পরিবার কলোনি ছেড়ে নাসাউয়ে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের প্রত্যেকের দখলে ছিল প্রচুর জমি। তারা নাসাউয়ে ‘চার্লস টাউন’ নামে শহর স্থাপন করেছিল। এ শহরটিও ছিল ব্রিটেনের রাজা দ্বিতীয় চার্লস-এর শাসনাধীন। তাদের বসতির দক্ষিণ দিকে কাছেই ছিল নাসাউ বন্দর। ধীরে ধীরে আরও অনেক ব্রিটিশ পরিবার এসে সেখানে বসতি গড়ে তোলে। শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রথমে তারা চার্লস্ টাউনে একটি দুর্গ স্থাপন করে। সেখানে গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র মজুত থাকত। ১৬৮৪ সালে স্পেনিয়রা অতর্কিতে আক্রমণ করে চার্লস টাউনকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

দশ বছরের মধ্যেই, ১৬৯৫ সালে ইংরেজ গভর্নর নিকোলাস ট্রটের তত্ত্বাবধানে আবার নতুন করে গড়ে উঠেছিল চার্লস টাউন। এবার নাম হল নাসাউ। ব্রিটেনের তৎকালীন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের ডাচ নাম ছিল ‘অরেঞ্জ নাসাউ’। তাঁর নামেই নতুন টাউনের নাম রাখা হল নাসাউ। নতুন নাসাউয়ের জন্ম হল। ট্রটের পরে সুশাসকের অভাবে নাসাউ-এর আবার দুর্দিন এল।

১৭০৩ সালে সুযোগ বুঝে ফ্রান্স আর স্পেন একযোগে আক্রমণ করল নাসাউ। এক অরাজক সময়ের মধ্য দিয়ে চলল নাসাউ ১৭১৮ সাল পর্যন্ত। একদিকে শত্রুদেশের আক্রমণ, অন্যদিকে জলদস্যুদের উৎপাত। তখন নাসাউতে প্রায় ১০০০ ডাকসাইটে জলদস্যুর বাস ছিল। নাসাউকে জলদস্যুরা ‘পাইরেট রিপাবলিক’ বলে ঘোষণা করেছিল। অল্পসংখ্যক সাধারণ ব্রিটিশ নাগরিক যারা ছিল তারা দস্যুদের ভয়ে দ্বীপ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সেই অরাজক অবস্থায় নাসাউয়ের গভর্নরের দায়িত্ব নিয়ে এলেন ইংরেজ ক্যাপ্টেন উডস রজার্স। শক্ত হাতে দমন করলেন পাইরেটদের। রাস্তাঘাট তৈরি করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করলেন, রাস্তা ঘাট পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করলেন, নাগরিক প্রশাসনের সংস্কার করলেন, সুরক্ষার জন্য দুর্গ স্থাপন করলেন আরেকটি। সেখান থেকে আক্রমণকারীদের গতিবিধির ওপর আর নাসাউ বন্দরের ওপর নজর রাখা হত।

ওদিকে ১৭৭৫ সালে আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের সেই তেরটি উপনিবেশ ইংল্যান্ডের শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য যুদ্ধ শুরু করেছিল। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ। নয় বছর ধরে চলাকালীন যুদ্ধের সময় অনেক মানুষ আমেরিকার মূল ভুখন্ড ছেড়ে নাসাউ চলে আসতে থাকে। এছাড়া ব্রিটিশ উপনিবেশের যেসব মানুষ স্বাধীনতাকামী রাজ্যগুলির প্রতি সহানুভুতিশীল ছিল, যুদ্ধের সময় তাদের সাথে ছিল,

১৭৮৩ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষে সেইসব বিশ্বস্ত মানুষেরা উপহার হিসাবে অনেক জমিজমা পেল নাসাউয়ে। নাসাউ তো আগে থেকেই ইংরেজ উপনিবেশ ছিল। দলে দলে বিত্তশালী শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ আমেরিকানরাও এসে বসতি করল নাসাউয়ে। এইসব পরিবারের সঙ্গে এদের বহুসংখ্যক ক্রীতদাসও এসেছিল। তারা ঝোপ-জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈরি করল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পরোক্ষ ফল হিসাবে শুরু হল নাসাউয়ের উন্নয়ন। নাসাউ আবার জমজমাট শহর হয়ে উঠল। নাসাউয়ের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হল।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হতে হতেই আবার বিপর্যয় নেমে এল নাসাউয়ে। ১৭৭৬ সালে ঘটল নাসাউ যুদ্ধ। চিরশত্রু ব্রিটেনের উপনিবেশ বলে নাসাউকে জলে স্থলে একযোগে আক্রমণ করল ফ্রান্স আর স্পেন। আটলান্টিক বাণিজ্যপথে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ নাসাউ বন্দর দখলে রাখার জন্য বিদেশি নানা দেশের চেষ্টার অন্ত ছিল না।

উনিশ শতকে নাসাউয়ের শহরীকরণ শুরু হল। নতুন নাগরিকদের অর্থে নাসাউয়ের অনেক উন্নতি হল। তেইশ হাজারের মতো নতুন বাড়ি তৈরি হল, রাস্তাঘাট তৈরি হল, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা হল। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় হিসাবে মশার আঁতুড়ঘর ছোটো ছোটো জলাশয়, ডোবাগুলি বুজিয়ে ফেলা হল, নতুন দুর্গ তৈরি হল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ার এল।

ইউরোপিয়রা বাড়িঘর বানাল উত্তর দিকের সমুদ্রের তীর ধরে পুব থেকে পশ্চিমে। তাদের বসতির পূর্ব সীমায় ছিল মন্টেগু ফোর্ট আর পশ্চিম সীমায় ছিল সান্ডার্স বেলাভূমি। বিংশ শতাব্দীতেও আর শ্বেতাঙ্গ মানুষ এসে বসতি স্থাপন করল, পুব থেকে পশ্চিমে আরও বাড়িঘর তৈরি হল। অর্ধচন্দ্রাকারে গড়ে ওঠা সেইসব বসতি বজায় ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত। শহরের কেন্দ্রস্থলে ছিল সরকারি অফিস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভবন যা এখনও আছে। নিকটবর্তী বাহামা দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপ থেকেও মানুষেরা এখানে এসে বসতি গড়েছিল। ক্রীতদাস হিসাবে আসা আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গদের বসতি ছিল বর্তমান নাসাউ শহরের দক্ষিণ দিকে গ্রান্টস টাউন, ব্রেইন টাউন ও আরও কয়েকটি নির্দিষ্ট শহরে সীমাবদ্ধ।

ক্রমে নাসাউয়ের নাম ছড়িয়ে পড়ল সভ্য দুনিয়ার নানা দেশে। নীল, সবুজ জলের মাঝে নাসাউ আর তার গা ঘেঁষে জেগে থাকা নাসাউয়ের সঙ্গী দ্বীপ ‘প্যারাডাইস আইল্যান্ড’ হয়ে উঠল বিশ্বের ধনীদের আবাস স্থল, ব্যবসার জায়গা। অপূর্ব সুন্দর দ্বীপ হয়ে উঠল পর্যটকদের গন্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য হোটেল তৈরি হতে লাগল। সবচেয়ে দামী বিলাসবহুল ‘হোটেল আটলান্টিস’ স্থাপিত হল প্যারাডাইস দ্বীপে। বিপুল বৈভবের অধিকারী বিশ্বের তাবৎ মানুষদের গন্তব্য এই হোটেলে আছে মিউজিয়াম, ওয়াটার পার্ক, ডলফিন এনকাউন্টার সেন্টার, সবচেয়ে বড়ো মেরিন অ্যাকোয়ারিয়াম, কৃত্রিম ঝরনা, বোটিং করার জন্য কৃত্রিম জলাশয় - যার স্বচ্ছ জল সমুদ্রনীল, ধারের দিকগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত কোরালের চাদরে ঢাকা । অন্দর সজ্জার উপকরণের মধ্যে আছে নানান মডেল আর বিশ্বের তাবড় শিল্পীদের দিয়ে তৈরি করানো গ্লাস ওয়ার্ক আছে, আছে অসংখ্য ক্যাসিনো, সেখানে দিবারাত্র খেলা চলছে। গাছপালার মধ্যে পাম, খেজুর আর নানা ফুলের গাছ। আমাদের দেশের সাদা চাঁপাফুলের গাছও আছে।

নাসাউয়ে প্রবেশের মুখেই দেখলাম সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত চুল বাঁধার দোকান। আফ্রিকানদের নিজস্ব স্টাইলে চুল বাঁধা হয় সেখানে। অনেক পর্যটক সেখানে চুল বাঁধতে বসে গেছে।

১৯৬০ সালের পর সরকার থেকে নিম্নবিত্তদের জন্য সরকারি সহায়তায় স্বল্পখরচে বাড়িঘর তৈরির ব্যবস্থা করার পর প্রচুর কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ বসতি পেল। ১৯০১ সালে নাসাউয়ে যেখানে জনসংখ্যা ছিল ১২,৫৩৪ জন মাত্র, ২০১৬ সালে দেখা গেল সেই জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৭৪,৪০০ জনের মতো। সমগ্র বাহামার জনসংখ্যার ৭০%-এরই বাস নাসাউ-এ। নাসাউতেই আছে বাহামার সবচেয়ে বড়ো মনুষ্যবসতি। ৮৫% আদি জনজাতি আর আফ্রিকান, ১২% ইউরোপিয়ান আর বাকি ৩% এশিয়ান আর হিস্পানিক।

এরপর আমাদের আফ্রিকান আমেরিকান গাড়িচালক আমাদের নিয়ে চলল নাসাউয়ের নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখাতে। প্রথমেই দেখা গেল পার্লামেন্ট স্কোয়ার, যেখানে আছে সমস্ত সরকারি ভবন। বাড়িগুলি সবই গোলাপি আর সাদা রঙের। প্রথম দেখলাম পার্লামেন্ট ভবন, যার সামনে রয়েছে রানি ভিক্টোরিয়ার কম বয়সের একটি প্রতিকৃতি। এখনও রানিকে তারা মানে, সেকথা জানাল আমাদের গাড়ির চালক। এরপর দেখলাম সুপ্রিম কোর্ট ভবন, সেনেট বিল্ডিং, প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাসাউয়ের যুদ্ধ শহীদদের স্মৃতিতে তৈরি রেমেমব্রান্স পার্ক এবং শহীদ বেদী। ঘোড়ায় টানা গাড়িও দেখা গেল, যাতে চড়ে বহু বিদেশিরা নগরদর্শন করছে।

পথে পড়ল 'ট্রেজারি বিল্ডিং' পুরনো কেল্লার ভগ্নস্তূপের ওপর তৈরি করা 'ব্রিটিশ কলোনিয়াল হিলটন হোটেল', ডাইভারস ক্লাব। চলার পথে দেখলাম ইয়াট ক্লাব, সারি সারি ইয়াট রাখা আছে সেখানে।

এবার চললাম পুরনো কেল্লা ফোর্ট ফিনক্যাসেল দেখতে ক্যাসেলের সামনেই সারি সারি দোকান। পোশাক, ব্যাগ, মেমেন্টো, রঙিন চটি, পাতায় বোনা রঙবেরঙের টুপি, বাচ্চাদের খেলনা, হাতপাখা - কী নেই সেখানে! অপূর্ব সেসব হাতের কাজ। আফ্রিকান উপজাতির মানুষদের নিপুণ হাতে তৈরি কাঠ ও বাঁশের নানা জিনিস, সুন্দর সুন্দর মুখোশ, তলোয়ার, ফুলদানি ইত্যাদি নানা হস্তশিল্পের পসরা সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা।

তীব্র রৌদ্রের তাপে ক্লান্ত পর্যটকদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য আছে ডাব। দা দিয়ে সুন্দর করে কেটে দিচ্ছে। খাবার পর শাঁসটুকুও খাওয়া যাচ্ছে। তবে মুদ্রামূল্য আমাদের কাছে একটু বেশি লাগল, একটি ডাব পঁচিশ ডলার।

এবার ঢোকা গেল ফিনক্যাসেল দুর্গের ভিতর। দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু জায়গা সোসাইটি হিল ওরফে বেনেট'স হিলের ওপর দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল ১৭৯৩ সালে। লর্ড ডানমোরের দ্বিতীয় উপাধি ছিল ভাইকাউন্ট ফিনক্যাসেল। তাই তাঁর নামেই দুর্গটির নাম রাখা হয়েছিল। গভর্নর ডানমোরের পরিকল্পনায় একটি প্যাডেল-স্টিমারের আকারে তৈরি হয়েছিল দুর্গটি।

স্পেন ও ফ্রান্সের অতর্কিত আক্রমণ ঠেকাতে আর নাসাউ বন্দরের ওপর সতর্ক নজর রাখার জন্য তৈরি দুর্গটি শহরের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত ছিল। তাই চারদিকে নজর রাখা যেত। সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠতে গেলে ডানদিকে রয়েছে সারি সারি ফাঁকা (গোলাবারুদের) কুঠুরি । সেগুলিতে রয়েছে কয়েকটি পাতলা কাঠের তক্তার ওপর আঁকা প্রতিষ্ঠাতা ও শাসকদের ছবি, নিচে নাম ও পরিচয় লেখা । রেলিং দেওয়া ছাদের ওপর আছে কাঠের ডায়াস। সেখান থেকে জাহাজঘাটা, , সমুদ্র, বিশাল পানীয় জলের ট্যাঙ্ক, সাধারণ মানুষদের বাড়িঘর, প্যারাডাইস আইল্যান্ড, হোটেল আটলান্টিস, হোটেল হিল্টন - সবকিছু নজরে আসে। দূর দিগন্তে সমুদ্র আর আকাশ মিলেমিশে মিতালি করছে, তাও দেখা যায়।

এখানে আত্মরক্ষার জন্য প্রচুর গোলাবারুদ মজুত থাকত একসময়। বিভিন্ন রেঞ্জের ৬টি কামান এখানে ফিট করে রাখা ছিল। যার কয়েকটি এখনও আছে। ১৮১৭ সাল পর্যন্ত দুর্গটি এলাকার লাইট হাউস হিসাবে ব্যবহৃত হত। প্যারাডাইস আইল্যান্ডে একটি লাইট

হাউস নির্মাণের পর এটির মাথায় বসানো টাওয়ার থেকে সিগনাল স্টেশনের কাজ করে চলেছে। বন্দরে আমদের জাহাজটিকেও নোঙর করা দেখলাম দুর্গের ছাদ থেকে। এখানে পাইরেট সেজে ছবি তোলার ব্যবস্থা আছে, একটি পাতলা কাঠের মানুষের অবয়ব আঁকা, পরনে পাইরেটের পোশাক আর হাতে বন্দুক থাকলেও মাথায় পাকানো পাগড়ি। মনে হয় কোন সান্ত্রীর পোশাকের আদলও হতে পারে। কারণ, ইংরেজ জমানায় সান্ত্রীদের মাথায় পাগড়িই থাকত। কাঠের কাঠামোর মুখের জায়গাটি কাটা। পিছনদিকে একটি পাথরখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে ফাঁকা জায়গা দিয়ে মুখটি বাড়ালেই ওই বেশে ছবি তোলা যাচ্ছে।

একে একে সকলেই এই মজার ছবিটা তুলল। তবে সব মজার ব্যাপার ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। তাই কিছু ছবির ব্যবস্থা। সপ্তাহে সাতদিনই সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত খোলা থাকা দুর্গটি দেখতে দেশবিদেশের পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে।

আমাদের ক্যাবটির (ওদেশে ভাড়ার ট্যাক্সিকে বলে ক্যাব) চালক 'রভি' চলার পথে অনর্গল ইংরেজিতে করে আমাদের বোঝাচ্ছিল নাসাউয়ের নানা কথা। দেখব, না শুনব ভাবতে ভাবতে আর চারদিকের দৃশ্যের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম আর এক পুরনো দুর্গ মন্টেগু ফোর্টে।

নাসাউয়ের পূর্বাংশে সমুদ্রতীরে, রাজধানীর প্রধান যোগাযোগকারী সড়ক বে স্ট্রীটের ধারেই বন্দরের দিকে মুখ করে অবস্থান। বিখ্যাত নাসাউ সিটি সেন্টারের মাইল খানেকের মধ্যেই অবস্থিত। কয়েকটি কামান ছাড়া ভিতরে আর কিছু দেখার না থাকলেও চারদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। মনে হবে ঘণ্টার পর ঘন্টা বসে থাকলেও বিরক্তি আসবে না। মাথার ওপর দুপুরের খর রৌদ্র থাকলেও দীঘার সমুদ্রের ঝাউবনের মতো পাম আর নারকেল গাছের হাওয়ায় শরীর মন জুড়িয়ে যায়।

ফ্রান্স ও স্পেনের বারংবার আক্রমণের হাত থেকে ব্রিটিশ নাগরিকদের ও দ্বীপকে রক্ষার জন্য দুর্গটি প্রথম তৈরি হয়েছিল ১৭২৫ সালে। এরপর আরও শক্তপোক্ত করার জন্য ১৭৪১ থেকে ১৭৪২ সালের মধ্যে আরও সংস্কার করা হয়। এখানে রাখা হয়েছিল বাইশটি কামান আর মজুত ছিল প্রচুর গোলাবারুদ। এই গোলাবারুদের জন্য এই দুর্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ চালিয়েছিল 'ইউনাইটেড মেরিন করপ্স'। দুর্গরক্ষার জন্য প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে জেনে আটটি রণতরী পাঠিয়েছিল তারা। কিন্তু আক্রমণের আঁচ পেয়েই রাতের অন্ধকারে একজন আধিকারিক সমস্ত গোলাবারুদ নিয়ে অগাস্টিন দ্বীপে চলে গিয়ে আত্মগোপন করেন।

দুর্গের পিছনদিকেই রয়েছে অপ্রশস্ত নীল সমুদ্র, পরপারে প্যারাডাইস আইল্যান্ড, হোটেল আটলান্টিস ও অন্যান্য রিসর্ট দেখা যায়। তীরের কাছের জল পান্না-সবুজ, কিন্তু যত ভিতরের দিকে তত নীল। এখানে তীরের কাছে জলের গভীরতা কম। এখানে ওখানে পাতলা জলের নিচে ভেসে আছে কোরালের চাদর, কোথাও ঢিপির আকারে জমে জমে তৈরি হয়েছে প্রবালের প্রাচীর। সেই পথ বেয়ে সমুদ্রের খানিকটা মাঝখানে চলে যাওয়া যায়। তীরের একটু ওপরেই বালুকাবেলা। অর্ধচন্দ্রাকার সমুদ্রতীর ধরে আছে বাড়িঘর, রিসর্ট। সারি সারি পাম আর নারকেলগাছের পাতা সমুদ্রের জোরালো বাতাসে কাত

হয়ে যাচ্ছে আবার সোজা হয়ে যাচ্ছে। শীতল বাতাসে মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল। সমুদ্রের কাছেই চাঁদোয়ার নিচে ছোটোখাটো দোকান। দোকানি হাসিমুখে অভ্যর্থনা করছে পর্যটকদের। সমুদ্রের নীল জলে পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে হাল্কা ইয়াট।

এবার যাত্রা করলাম প্যারাডাইস আইল্যান্ডে। পথে দুই দ্বীপের মধ্যেকার সমুদ্রটুকু পার হলাম ব্রীজের ওপর দিয়ে। এখানে পরপর দুটি ব্রিজ আছে।, পথেই দেখলাম নাসাউ ইয়াট ক্লাবটি।

বাহামা দীর্ঘকাল ছিল ব্রিটেনের উপনিবেশ। পরাধীনতার বাঁধন ছিন্ন করে ১৯৭৩ সালের ১০ই জুলাই স্বাধীনতা লাভ করে। আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের মতো মহোৎসবের মধ্যে পালিত না হলেও সাধারণ পার্টি, খাওয়াদাওয়া, খেলাধূলা, দৌড় প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছুটির আমেজে দিনটি উদযাপন করে। হোটেল হিলটন আর হোটেল আটলান্টিসে আগের রাতে বাজি প্রদর্শনী হয়। জাতীয় নৃত্য 'জুনকানুর' দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। জন কানু নামে এক ব্যক্তি এই নৃত্যের সৃষ্টিকর্তা। রঙবেরঙের পোষাক আর গয়না পরে বাজনার সাথে স্ট্রীট প্যারেডই এই নাচের বিষয়। ঐদিন ইয়াচ প্রতিযোগীতাও হয়।

সামুদ্রিক জলভাগ নিয়ে বাহামার মোট এলাকা প্রায় ৪৭০,০০০ বর্গ কিমির মধ্যে নাসাউয়ের আয়তন ২০৭ বর্গ কিমি মাত্র। আয়তনের তুলনায় অনেক বেশি লোকের বাস নাসাউয়ে। বাহামার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগই বাস করে রাজধানী শহর নাসাউয়ে। ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী বাণিজ্যিক শহর ও রাজধানী নাসাউয়ের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৭৪,৪০০ জন। অধিকাংশই আফ্রিকান বংশোদ্ভূত। তারা স্বীকার করে যে তারা সেইসব দুর্ভাগা ক্রীতদাসদের বংশধর। তবে আজ তারা আর কারও কেনা গোলাম নয়। তারা স্বাধীন নাসাউবাসী, বাহামিয়ান।

নাসাউ নিরক্ষীয় মৌসুমী জলবায়ুর দেশ। শীত এবং গরম কোনওটাই চরম নয়। উষ্ণতা ১৫ ডিগ্রির নিচে কখনই নামে না। প্রায় সারাবছরই নাতিশীতোষ্ণ মনোরম আবহাওয়ার কারণে এখানে পর্যটকের ভিড় লেগেই থাকে। এছাড়া সুন্দর পরিবেশ, আরাম, আর ভোগবিলাসের সমস্ত উপকরণ মজুত থাকার কারণে বিশ্বের নামকরা ধনীদের ছুটি কাটানোর জায়গা, আর পর্যটকদেরও গন্তব্য হয়ে উঠেছে নাসাউ। আর এই পর্যটন শিল্পই হয়ে উঠেছে নাসাউবাসীদের স্বাধীন জীবিকার উপায়। ক্যাব চালিয়েই প্রচুর মানুষ জীবিকা অর্জন করে। ভিখারি সেখানে দেখিনি। একমাত্র আটলান্টিস হোটেলই প্রায় ৬০০০ বাহামিয়ান কাজ করে। ক্রুজে ভারতীয় আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষজনই বেশি। ক্রুজের দুনিয়ায় নানা দোকানে, ফটোগ্রাফির দোকানে, পোশাকের দোকানে, গয়নাগাটি, ঘড়ি, ম্যাসেজ পার্লার সব দোকানের কর্মরত ছেলেমেয়েদের বেশিরভাগই এইসব দেশের মানুষ। ক্রুজে কিচেনের সব রাঁধুনিই ছিল ভারতীয়। ডাইনিংয়ে প্রায় সব কর্মী ছেলেমেয়েরাই ছিল ভারত, জাপান, আর ইন্দোনেশিয়ার থেকে আসা।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য এখানে বহু বিখ্যাত সিনেমার শ্যুটিং হয়েছে এবং হচ্ছে। ফলে মাথাপিছু আয় বেশ বেড়েছে। বাহামার গর্ব এখানকার শিক্ষার অবস্থা। সাক্ষরতার হার শতকরা ৯৫ ভাগ। স্কুলে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। জাতীয় বাজেটের ২৪% শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হলেও সরকারি স্কুলগুলিতেও পয়সা খরচ করে পড়াতে হয়। কোনওভাবেই ফ্রীতে পড়াশুনা করা যায় না বা স্কুলে ফ্রী লাঞ্চ কিছুই পাওয়া যায় না। তাই হয়তো পড়াশোনাটা ছেলেমেয়ে এবং অভিভাবকদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ছোট্ট নাসাউ দেশটিতে শতকরা ৯১জন হাই স্কুল উত্তীর্ণ, শতকরা ৪৩ জন স্নাতক। স্কুলছুটের সংখ্যা নগণ্য, শতকরা ৯ জন।

নাসাউ হস্তশিল্প সংস্কৃতির উৎকর্ষতার জন্য ইউনেস্কোর 'ক্রিয়েটিভ সিটিস নেটওয়ার্ক'-এ জায়গা করে নিয়েছে, 'সিটি অফ ক্র্যাফটস এণ্ড ফোক আর্ট'-এর তকমা অর্জন করেছে। সব মিলিয়ে আজ ভালো আছে একসময়ের কেনা গোলাম হয়ে যাওয়া মানুষদের বংশধরেরা। বাহামা ক্রুজে গিয়ে এক অনবদ্য দেশ দেখলাম আর অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে নিয়ে ফিরে এলাম দেশে, যার সবটুকু বলা হল না।

সমাপ্ত

সে ছিল ১৯১২ সালের জুন মাসের একটা রবিবার। লীনা আর ইনা স্টিলিংগার নামে দুই বোন গেছে চার্চে। সেখানে গিয়ে তাদের জোসিয়া আর সারা মুর-এর সঙ্গে দেখা। আইওয়ার এই ছোট্টো পাহাড়ি শহর ভিলিসকাতে সবাই সবাইকে চেনে। জোসিয়াদের মেয়ে ক্যাথলিনের সঙ্গে লীনা ইনাদের খুব ভাব। সেদিন সন্ধেবেলা দুই পরিবারের বাচ্চারা মিলে চার্চের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার কথা সেদিন সন্ধেবেলা।

ক্যাথলিন তাদের বলল, চল আমাদের সঙ্গে। সন্ধেবেলা প্রোগ্রামের পর আমাদের বাড়িতেই রাত্তিরে থাকবি। লীনা, ইনা তো এক কথায় রাজি। জোসিয়া তখন তাদের দিদি ব্লানশ-কে ফোন করে বলে দিলেন বাচ্চারা রাতে তাঁদের বাড়িতে থেকে যাচ্ছে। পরদিন ফিরবে।

অনুষ্ঠানের পর তারা সবাই মিলে মুরদের বাড়িতে পৌঁছোল রাত দশটা নাগাদ।

পরদিন সকালে মুরদেরপাশের বাড়ির গিন্নি মেরি পেকহ্যাম কাপড় ধুয়ে বাইরে মেলতে দিয়ে এসে খেয়াল করলেন মুরদের বাড়িতে কেউ তখনো ঘুম থেকে জাগেনি। আশ্চর্য নিথর হয়ে আছে দরজা জানালা বন্ধ করা বাড়িটা। কেমন একটু সন্দেহ হতে মেরি মুরদের বাড়িতে ঢুকে দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কেউ সাড়া দিল না।

মেরি এবার ঘাবড়ে গিয়ে জোসিয়ার ভাই রস মুরকে ফোন করে ডেকে আনলেন। তিনি এসেও ডেকেডুকে কোন সাড়া না পেয়ে শেষে নিজের চাবির গোছায় রাখা সে বাড়ির একজটা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে তার সদর দরজা খুললেন।

একতলার শোবার ঘরের দরজা খুলে তিনি দেখলেন, সেখানে দুটি রক্তে মাখামাখি মৃতদেহ। সে দুটো ছিল লীনা আর ইনার।

পুলিশে খবর গেল। তারা এসে দোতলার ঘরগুলো থেকে আরো ছটা মৃতদেহ উদ্ধার করল। সেগুলো ছিল,জোসিয়া, সারা আর তাঁদের চার ছোটোছোটো ছেলেমেয়ে ক্যাথরিন, হার্মান, বয়েড আর পল-এর। ভারী কিছু দিয়ে প্রত্যেকের মাথার খুলি গুঁড়ো করে খুন করা হয়েছে তাদের। খুন করবার অস্ত্রটাও পাওয়া গেল নীচতলার ঘরটাতে ইনা আর লীনার শরীরের পাশে। সেটা ছিল জোসিয়ার একটা কুড়ুল।

তারপর অনেক তদন্ত হল। দেখা গেল বাড়ির সব ঘরের জানালার পর্দা টানা। যে দুটো ঘরে পর্দা নেই সেগুলোর জানালায় কাপড় ঠুসে দেয়া হয়েছে।

একশো বছরেরও আগের কথা। আজকের মত উন্নত বিজ্ঞান তখন তদন্তকারীদের সাহায্যের জন্য ছিল না। ব্লাডহাউন্ড এল, আঙুলের ছাপ নেয়া হল, কিছুতেই কিছু হল না। রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেল খুনে বা খুনেরা। কোন শত্রু ছিল না জোসিয়াদের। তাই সন্দেহের খাতায় তেমন কোন নামও উঠে আসেনি। শুধু জানা গিয়েছিল রাত বারোটা থেকে পাঁচটার মধ্যে খুনগুলো করা হয়েছে।

বাড়িটা আজও সেখানে আছে। তার নাম লোকমুখে দাঁড়িয়েছে ভিলিসকা অ্যাক্স মার্ডার হাউস। রাতে সেখানে অনেকে থাকতে যান অ্যাডভেঞ্চার করবার জন্য। তাঁরা সেখানে ছোটোদের গলার শব্দ পান। হাসি, খেলা, আর্তনাদ-

২০১৪ নভেম্বর মাসে উইসকনসিন থেকে একদল পর্যটক সে বাড়িতে ভূত দেখতে এসেছিলেন। রাতে সব বন্ধুদের নিচে রেখে একলা দোতলার বেডরুমে গিয়ে ঢোকেন রবার্ট স্টিভেন লরসেন নামের এক ভূতপ্রেমিক। রাত দুটো নাগাদ হঠাৎ নীচে থাকা বন্ধুদের মোবাইলে লরসেনের ফোন আসে। আর্তনাদ করছিলেন লরসেন। সাহায্য চাইছিলেন। বন্ধুরা দৌড়ে ওপরে উঠে গিয়ে দেখেন নিজের বুকে নিজেই ছুরি বসিয়ে দিয়েছেন লরসেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে হেলিকপটারে ওমাহার বড়ো মেডিকেল কলেজে। কোনমতে প্রাণটা বেঁচেছে লারসনের। কিন্তু কোন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনি গিয়েছেন রাতের ওই মুহূর্তগুলোতে সে নিয়ে তাঁর মুখ খোলানো যায়নি এখনো।

আসলে রাত দুটো নাগাদ ভিলিসকা শহর দিয়ে হুইশিল বাজিয়ে একটা ট্রেন যায়। একশো বছর আগেও যেত। বলা হয় তার দীর্ঘ হুইশিলের আওয়াজের মুহূর্তগুলোকে কাজে লাগিয়ে খুনের দল নিরীহ শিশুদের আর তাদের চারজনের মা বাপকে খুন করেছিল পেশাদারী দ্রুততায়।

আজও এ বাড়িতে তাই ও সময়টা থেকে বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে। অনেকে দেখেছেন, সেসময় একটা আবছা কুয়াশার পিণ্ড ভেসে আসে, প্রথমে সারাদের শোবার ঘর, তারপর তাদের ছেলেমেয়েদের ঘর হয়ে ভেসে আসে নিচের সেই শোবার ঘরে, যেখানে শেষ হয়ে গিয়েছিল লীনা আর ইনা নামে দুটো মেয়ের প্রাণ। তারপর শোনা যায় টুপ টুপ করে ঝরে পড়া তরলের শব্দ—যেন রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ছে কাঠের মেঝেতে।

আর এই সময়টাতেই লারসেনের সেই ভয়াবহ আত্মহননের চেষ্টাটাও ঘটেছিল সারাদের শোবার ঘরের ভেতরে।

এ সময়টায় ২০০৫ সালে একটা ইনফ্রা রেড ভিডিও তোলা হয়েছিল জায়গাটার। ডেভিড পিয়ার্স রডরিগেজ নামীক অনুসসন্ধানকারীর তোলা এ ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, অনুসন্ধানকারী নিচতলার ঘরের একটা আলমারির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। খোলা আলমারিতে একটা মেয়েদের সে যুগের আকর্ষণীয় পোশাক রাখা হয়েছে। তাঁর সামনে সেই আলমারির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে কিছু রহস্যময় আলোর গোলা--

http://www.doyouseedeadpeople.org/usr/rte/PRISM-Closet-Orb-Villisca%20House-animated.gif

ডামরি

ডামরী কিন্তু একলা কোন পেত্নী নয়। সে হল নানাজাতের পেত্নীদের একটা দল। যথা যোগিনী, যক্ষিনী, কিন্নরী, অপ্সরী, ভূতিনি এইসব। ভূত ডামর নামে একখানা বই আছে। তা থেকে বেছে বেছে মন্ত্র পড়ে এদের একেকজনকে নাকি বশ করে ভূতের ওঝারা।

এ পেত্নীরা মানুষ মরে জন্মায় না। কেউ কেউ বলে এরা সব অন্য কোন মাত্রার জীব। ভূত ডামরের মন্ত্র পড়ে নানান কায়দাকানুন করে ডাকলে আমাদের দুনিয়ায় ঢুকে আসতে পায়। তারপর যে ডাকে তার আদেশ মেনে নানান ভূতের কীর্তি করে বেড়ায়। কায়দায় পেলে যে ডাকে তারও ঘাড় মটকে দিতে পারে।

কোবল্ড

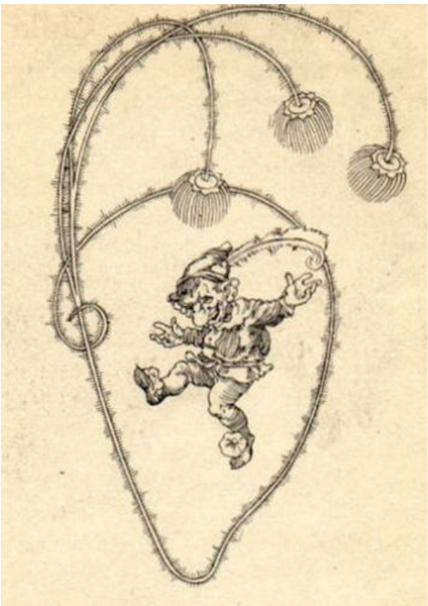

জার্মান ভূত। এমনিতে অদৃশ্য, কিন্তু যেকোন জন্তু, মানুষ আগুণ এইসব চেহারা ধরে এসে হাজির হতে পারে। মানুষের কাছাকাছি যে কোবল্ডরাথাকে তারা চাষাভুষোদের পোশাক পরে। খনি অঞ্চলের মাটির তলার কোবল্ডরা বিচ্ছিরি দেখতে হয়। জাহাজের চিমনির বাসিন্দা কোবল্ডরা নাবিকের চেহারায় দেখা দেয়।

ঘরবাসী কোবল্ডরা মেজাজ শরিফ থাকলে ঘরের অনেক কাজ করে দেয় নিমেষে আর মেজাজ খারাপ হলে বারির লোকজনকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে তারা নানান দুষ্টুমি করে।

থেকে।ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন, গবলিন, কবুটার এই সাহেব ভুতদের নামও এসেছে এই কোবল্ডদের নামের থেকেই। মজার খবর হল মৌলিক ধাতু কোবাল্ট-এর নাম এসেছে এই কোবল্ডদের থেকে। এর আকরিক আর্সেনিকজাতীয় ও বিষাক্ত হুয়ায় খিনিশ্রমিকরা ভাবতেন বুঝি কোবল্ডরা সে বিষক্রিয়ার জন্য দায়ী। বেচারা ধাতু তাই তার নাম পেয়েছে এই সাহেব ভূতের নাম থেকেই।

ব্রহ্মপুত্রের পৃথিবী ভ্রমণ

মীম নোশিন নাওয়াল খান

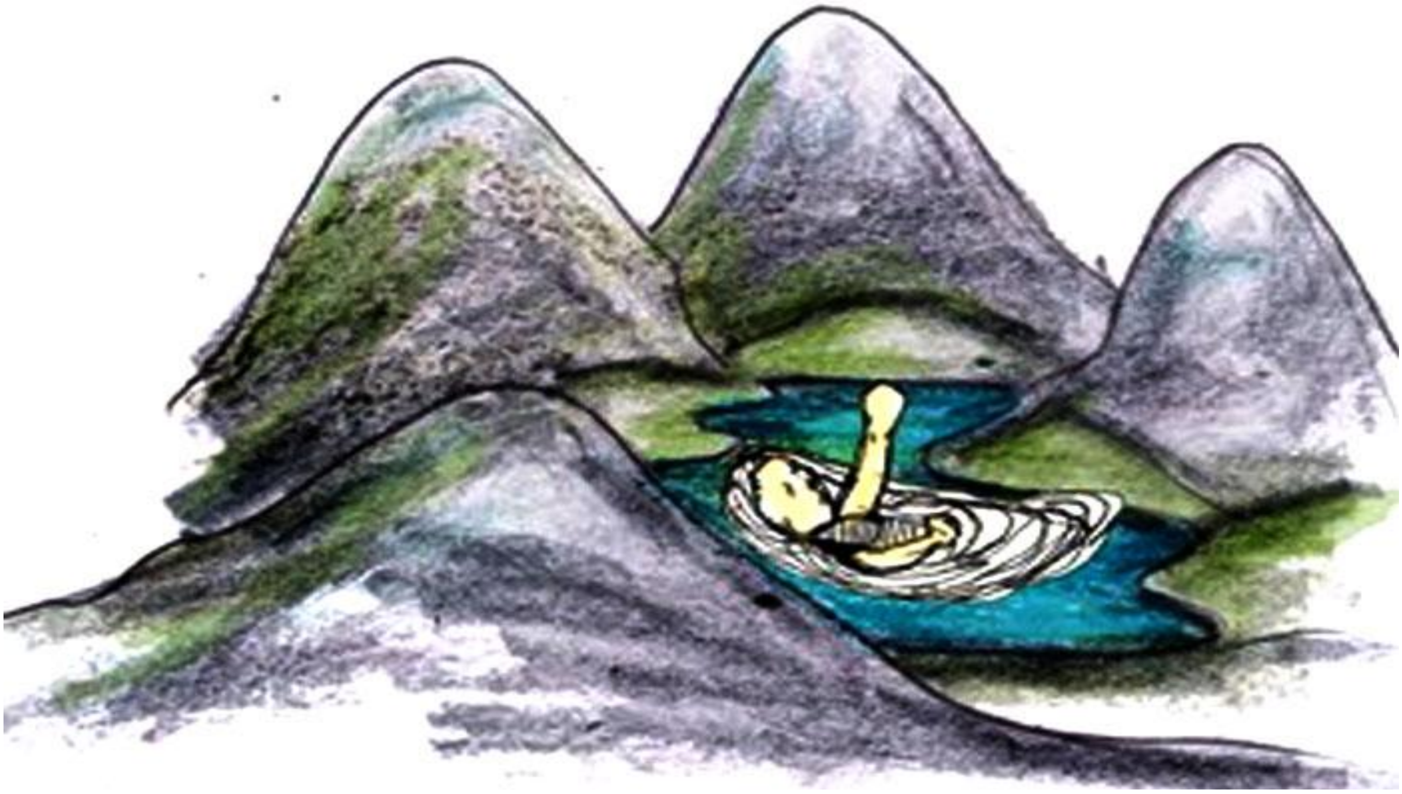

অনেক অনেকদিন আগের কথা। হিমালয় পর্বতমালার কাছে ছিল এক কাঠুরের বাড়ি। সেই কাঠুরের এক ছেলে ছিল। সে ছিল খুব চঞ্চল। একদিন কাঠুরের ছেলে বায়না করল, তাকে পাহাড় দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। সে ছোট্টবেলা থেকে এই পাহাড়ের কাছে থাকে, অথচ পাহাড়কে সে ঠিক করে দেখেইনি! কাঠুরে প্রথমে মোটেই রাজি হচ্ছিল না। ছোট্ট ছেলেটাকে পাহাড়ে নিয়ে যেতে সে খুব ভয় পেত। কিন্তু ছেলের কান্নাকাটি আর মনখারাপ দেখে সে শেষপর্যন্ত রাজি হল। একদিন খুব সকালে সে তার ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল পাহাড় দেখাতে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, কাঠুরে আর তার ছোট্ট ছেলে পাহাড় বেয়ে উঠছে তো উঠছেই। ঠাণ্ডায় ছোট্ট ছেলেটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কিন্তু কাঠুরে বারবার বাড়ি যাওয়ার কথা বললেও সে মোটেই রাজি হচ্ছিল না। সে বারবার বলছিল, "আরেকটু উপরে উঠি না বাবা! আরেকটু দেখি না!"

দুপুর যখন শেষ হয়ে বিকেল নামার উপক্রম হল, তখন কাঠুরে ও তার ছেলে ক্ষুধায় কাতর। কাঠুরের বৌ তাদের সঙ্গে কিছু খাবার দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হিমালয়ের ঠাণ্ডায় সেগুলো জমে গিয়েছিল। কাঠুরে তার ছেলেকে বলল, "তুমি একটু এখানে থাক, আমি দেখি আগুন জ্বালানোর জন্য কিছু শুকনো পাতা বা কাঠ জোগাড় করতে পারি কি না। তারপর আগুন জ্বালিয়ে খাবারগুলো একটু গরম করে খাওয়া যাবে।"

ছোট্ট ছেলেটা সায় দিল।

কাঠুরে চলে যাওয়ার পর ছেলেটা ভাবল, সে একা একা বসে থেকে আর কী করবে? বরং জায়গাটা একটু ঘুরে দেখা যাক। এই ভেবে সে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল। ছোট্ট ছেলেটা ভাবল, এবার ফিরতে হবে। কিন্তু ফিরতে গিয়ে সে দেখল, সে পথ হারিয়ে ফেলেছে! অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সে আর ফেরার পথ খুঁজে পেল না। সে ওখানে বসে কাঁদতে শুরু করল।

কাঠুরের ছোট্ট ছেলেটা হাঁটতে হাঁটতে যেখানে এসে পৌঁছেছিল, সেটা ছিল তিব্বতের পশ্চিম অংশে হিমালয় পর্বতমালার কৈলাস শৃঙ্গের কাছে জিম ইয়ংজং হিমবাহ। সেখানে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ছেলেটা কাঁদতে লাগল।

স্বর্গ থেকে দেবতা ব্রহ্মা ছোট্ট ছেলেটাকে কাঁদতে দেখলেন। তার কান্নার কারণটাও জানতে পারলেন। তিনি একটা বুদ্ধি করলেন। স্বর্গ থেকে একটা নদীকে পাঠিয়ে দিলেন ছেলেটাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। সেই নদীটা জিম ইয়ংজং হিমবাহ থেকে নেমে এল। ছেলেটাকে ডেকে বলল, "তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।"

ছোট্ট ছেলেটা নদীর সঙ্গে চলতে লাগল। নদীটা প্রথমে তিব্বতের মধ্যে দিয়ে চলল। সেই অঞ্চলের লোক তার নাম দিল জাংপো। এরপর সে ভারতে ঢুকে পড়ল। ভারতের অরুণাচলে ছিল কাঠুরের বাড়ি। এখানে এসে সে কাঠুরের ছোট্ট ছেলেকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিল।

ছেলেটাকে খুঁজে না পেয়ে কাঠুরে আর তার বৌ খুব কান্নাকাটি করছিল। তাকে খুঁজে পেয়ে কাঠুরে আর তার বৌ তো ভীষণ খুশি। তারা নদীটাকে অনেকবার ধন্যবাদ দিল। ছোট্ট ছেলেটাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পেরে নদীটাও ভীষণ খুশি। সে ভাবল, সে আর ফিরে গিয়ে কী করবে? সে বরং পৃথিবীটাকে ঘুরে ঘুরে দেখবে।

অরুণাচল থেকে সিয়ং নাম নিয়ে নদীটা চলতে লাগল। এরপর সে পৌঁছল আসামে। এখানকার লোকেরা তার নাম দিল দিহাঙ। আসামে এসে দিহাঙ নদীর সাথে দেখা হল দিবং এবং লোহিত নামের আর দুটো নদীর। এই নদী দুটোও ঘুরতে বেরিয়েছিল। তাই তারা তিনজন একসঙ্গে চলতে শুরু করল।

একসাথে চলতে চলতে আসামের সমভূমিতে তিনটা নদী একসাথে একটা বিশাল বড়ো নদ হয়ে গেল। যেহেতু ব্রহ্মা তাদের সবাইকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল বিভিন্ন কাজে, তাই তাদের তিনজনের একসাথে নাম হল 'ব্রহ্মপুত্র নদ'।

আসাম উপত্যকায় অনুপ্রস্থভাবে ৭২০ কিলোমিটার লম্বা পথ পাড়ি দিল ব্রহ্মপুত্র। তারপর নদটা গারো পাহাড়কে ঘিরে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ল। ময়মনসিংহের দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারের দক্ষিণে মেঘনায় গিয়ে মিশল।

১৭৮৭ সালে একটা বড়সড় ভূমিকম্প হল, সেই সাথে বন্যা। তখন ব্রহ্মপুত্র নদ বেশ ভয় পেয়ে গেল। সে তার চলার পথ পরিবর্তন করে ফেলল। নতুন যেই পথে ব্রহ্মপুত্র চলতে শুরু করল, তার নাম দেয়া হল যমুনা নদী। গোয়ালন্দের কাছে গিয়ে যমুনা নদী মিশল পদ্মার সাথে। উৎপত্তিস্থল থেকে যমুনার দৈর্ঘ্য ২৪০ কিলোমিটার। নদীটার সর্বাধিক প্রস্থ ১২০০ মিটার। যমুনা মূলত ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী। এই যমুনারও আবার উপনদী আছে। এগুলো হল - তিস্তা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই, সুবর্ণশ্রী।

বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের চলার পথ খুব একটা বড়ো নয়। তবে এই নদে অনেক চর আছে। দেশের উত্তর-দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত এই নদীপ্রণালী সবচেয়ে প্রশস্ত।

হিমালয়ে উৎপত্তির জায়গা থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ ২৮৫০ কিলোমিটার লম্বা হয়ে গেল। আর এর সর্বোচ্চ প্রস্থ ১০৪২৬ মিটার। বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে ব্রহ্মপুত্রই সবচেয়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রভাবিত এলাকা প্রায় ৫,৮৩,০০০ বর্গ কিমি, যার ৪৭,০০০ বর্গকিলোমিটারের অবস্থান বাংলাদেশ এলাকায়।

এভাবেই কাঠুরের ছোট্ট ছেলেকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে পৃথিবী ঘুরে বেড়াল ব্রহ্মপুত্র নদ। শেষপর্যন্ত সে পদ্মার সঙ্গে মিশে একাকার হল। এখন তারা একসাথে হেসেখেলে, গল্প করে দিন কাটায়।

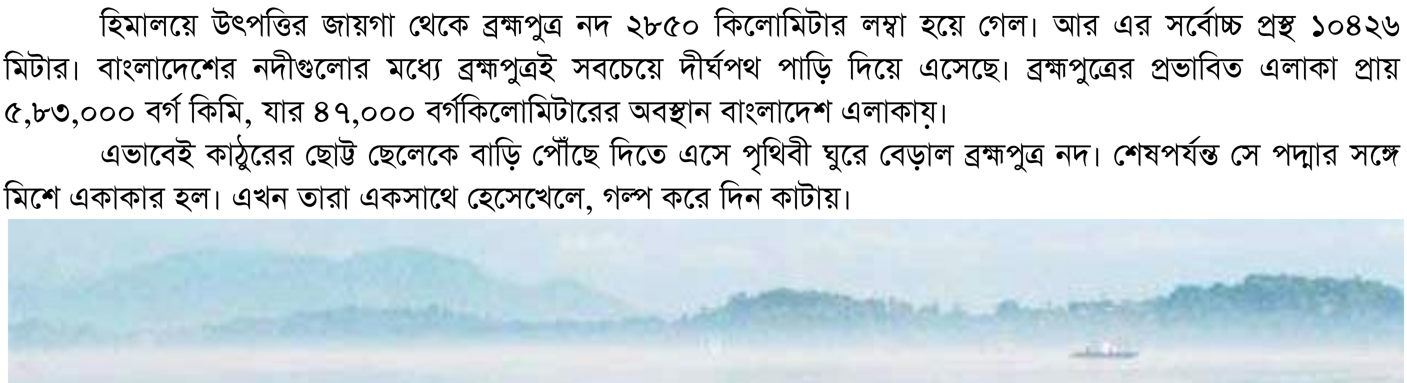

অভীক দত্ত

রাশিয়ান এয়ারলাইন অক্ষরে অক্ষরে দস্তয়েভস্কি আর গোর্কিকে অনুসরণ করে। রাত নেমে আসা মস্কোর নর্দমার পাশের গলির ঘুপচি ঘরে, সন্তদের মূর্তি রাখা কুলুঙ্গির পাশে রান্না হওয়া খাবারের স্ট্যান্ডার্ড এরোফ্লোট এয়ারলাইনে দস্তুরমতো চিনে নেওয়া গেলো। পুশকিন-তুর্গেনেভের জমিদারি চাল সেখানে অমিল। দিল্লি থেকে মস্কো পৌঁছে দেখতে পেলুম টারম্যাকের অদূরে পাইন বনের জঙ্গল। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল গত দ্বিতীয় যুদ্ধের গল্প।

আরো ভয়ানক ব্যাপার দেখি মস্কো টু তেল আভিভের উড়োজাহাজটি-র নাম নিকোলাই গোগোল। ফ্লাইটে তা জানিয়েও দিলেন পাইলট। রাশিয়ান সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক -আমার পিতাশ্রী -যখন বড়ছেলের ডাকনাম গোগোল (ছোটোছেলের ডাকনাম গোর্কি) রেখেছিলেন-তখনও তিনি এমন মাহেন্দ্রযোগ কল্পনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। আলেক্সান্ডার রোগঝকিনের সিনেমা দ্য কুকু-র মতোই এখানে তিনরকম ভাষাভাষীর উপস্থিতি। হিব্রু, হিন্দি আর রাশিয়ান। দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্যের ব্যাপার, কেউ কারো কথা বিন্দুমাত্র বোঝে না। এদিকে সব্বাই ইংরেজিতে সমান দড়। স্বর্ণকেশী বিমানবালিকাটিকে জিজ্ঞেস করলুম - হ্যাঁগো বাছা, আমার মালপত্তর তেল আভিভে পৌঁছে যাবে তো সরাসরি? সে মেয়ে মোহিনী হাসি হেসে বললে- ইউ নো ওয়ারি। আই ডোন্ট নো লাগেজ। কোক অর ওয়াতার? আমি মুখে বললুম কোক, মনে মনে বললুম দূর হতচ্ছাড়ি।

ইন্ডিয়ান টাইম দুপুর দেড়টায় শেষমেশ প্রতিশ্রুত ভূমি বা প্রমিসড ল্যান্ড ইজরায়েলে পৌঁছানো গেল। মালপত্তর গুছিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতে যাব-এক ব্যাটা ট্যাক্সিওয়ালা হাজির। আমি দোনামোনা করাতে সে দেখি একগাল হেসে বলে- আই ক্যাব ড্রাইভার। আই দোনত কিদন্যাপ ইউ। শুনে বেজায় রাগ হলো। তার থেকেও বেশি পেলো হাসি। আরে ব্যাটা তুই পাঁচ ফুটিয়া হিব্রু, আমার এই বপুকে কিডন্যাপ করতে তোর আরও গোটা দুতিনবার জন্ম নিয়ে আসতে হবে।

ট্যাক্সি বুথ থেকে শেষে গাড়ি নিয়ে রুক্ষ পাহাড়িয়া জমির মধ্যে দিয়ে কাটা ঝাঁ চকচকে রাস্তা ধরে ইউনিভার্সিটি এলাম। রাস্তার দুপাশে কেবলি ধুধু করছে মাঠ। মাঝে মাঝে তাতে সবুজের ছিটে দিয়েছে

ছোটছোট ঝোপ আর মাঝারি উচ্চতার কিছু গাছ। দেখে মনে হয় ইজরায়েলের প্রকৃতি তিন হাজার বছর ধরে রুক্ষ প্রসাধনটিকে শরীরে একভাবে ধরে রেখেছে।

ড্রাইভারের নাম ইলান। তাকে পুছলাম আই হোপ দেয়ার ইজ নো পলিটিকাল আনরেস্ট ইন দিজ পার্টস নাওয়েদেজ। সে বলে - নো নো, ইউ রিচ উনিভার্সিটি দেন ইউ রেস্ট। ইন্ডিয়ান পিপল গুড পিপল। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে বসলুম। নামার সময় টাকাপয়সা মিটিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে দেওয়া বিলটির দিকে তাকিয়ে (যাতে ড্রাইভারের নাম ধাম গাড়ি নাম্বার হিব্রুতে লেখা আছে) বললুম গুডবাই মিস্টার শাবতোন। সে ভারী অবাক হয়ে বললো ইউ নো হিব্রু? আমি বাঙালিসুলভ সবজান্তা হাসিটি দিলুম। ট্যাক্সির ভিতরে রোমান আর হিব্রু হরফে পাশাপাশি লেখা ছিল ইলান শাবতোন।

ইজরায়েলি সেটলমেন্ট ওয়েস্টব্যাঙ্কের একপাশে উনিভার্সিটি আর শহরখানি। ময়দানবের মন্ত্রবলেই যেন আদিগন্ত রিক্ততার মাঝে হঠাৎই ঝাঁ চকচকে সমস্ত বিল্ডিং আর রিসার্চ ফেসিলিটি গড়ে উঠেছে। ইজরায়েলিদের টেকনোলজির অগ্রগতির কথা এদ্দিন শুনেইছিলুম খালি। এখন স্বচক্ষে দেখা গেল। এখানে স্বাগত জানালো জয়দীপ। বজবজের ছেলে। এখানে এক বচ্ছর কাটানোর সুবাদে ইজরায়েলে ভারতীয় জীবনযাপন বিষয়ে তাক লাগানোর মতো দক্ষতা অর্জন করেছে। রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' এর কাটসিনস্কি-র কথা মনে আছে? যিনি নানা অসম্ভব রকম জায়গা থেকেও জিনিসপত্র ঠিক জোগাড় করে নিতেন- জয়দীপ তারই মতো দড়।

প্রথমদিন ওর ফ্ল্যাটেই লাঞ্চ সারা গেল। জয়দীপের অর্ধাঙ্গিনী অনিমা যত্ন করে খেতে দিল ভাত-তরকারি-মুরগির ঝোল মায় কাঁচা আমের চাটনি পর্যন্ত। ফ্লাইটের রাশিয়ান স্যালাড আর শুকনো বিফরোল এর পর এমন খাবার দেখে আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলি আর কি। চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখে ঢালাও খাওয়া গেল। বাংলা থেকে অনেক দূরে, এই সদালাপী সুভদ্র যুগলটি যে ছোট্ট নীড়টি এখানে গড়ে নিয়েছে- তার শান্তশ্রী মন ছুঁয়ে যায়।

শহরটি পাহাড়ের ধাপে ধাপে তৈরি করেছে আব্রাহামের ছেলেপুলের দল। আমার্ এপার্টমেন্ট এমনি একটি ঢালের উপর। সিগারেট খাওয়ায় এখানকার লোকজনের কোনো কমতি নেই- কিন্তু ঘরে খাওয়া মানা। স্মোক ডিটেক্টর সদা তৎপর। জয়দীপের গিন্নির কাছে শুনলুম লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে রান্না করলে প্রায়ই সিকিউরিটি দৌড়ে আসে-তখন তাকে দিস ইজ ইন্ডিয়ান কুকিং-ব্যাটা গাম্বাট-নো ডেঞ্জার- আকাট মুখ্যু কোথাকার-ইউ গো ব্যাক- এইসব বলে ভাগাতে হয়।

অগত্যা সিগারেট খাওয়ার বন্দোবস্ত ব্যালকনিতে। ব্যালকনিতে এসে চমকে গেলুম। দূরের পাহাড়ের গায়ে গায়ে সাজানো রয়েছে প্যালেস্টাইনের বসতি। মানবসভ্যতার এই নাভিমূল ফিলিস্তিনি-ইজরায়েলি-আসিরীয় দের দ্বন্দ্ব-সখ্যতার ইতিহাস শুকনো মাটির ধাপে ধাপে আজো লালন করে চলেছে। সালোমের ঈর্ষা - বাথশেবার পরিণতি-স্যামসন-ডেলাইলার ব্যর্থ প্রেম সে পাহাড়িয়া আখরে পড়ে নেওয়া যায় ঠিক।

(চলবে)

সঙ্গে ছবি ব্যালকনি থেকে তোলা প্যালেস্টাইনের। দিনের ও রাতের দুটি ক্যাপচার।

পুনশ্চ- বলতে ভুলে গেছি- আমার নেক্সটডোর পড়শিটি অন্ধ্রপ্রদেশের ছেলে। তার নাম লেনিন কুমার ভার্দি। এই না হলে রাশিয়ান কানেকশন!!

শীর্ষচিত্রঃ ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের একটি সেটলমেন্ট। ফটোঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

প্যালেস্টাইনের দিন ও রাতের ছবিঃ লেখক

অস্ট্রেলিয়া নাকি এক বিশাল বড় দ্বীপপুঞ্জ! পড়ার টেবিলে যে অ্যাটলাস বলটা আছে, তা খানিক ঘোরালেই তার কিছুটা আন্দাজ অবশ্য পাওয়া যায়। আমাদের ভারতের প্রায় আড়াইগুণ বড়!

তবে লোকসংখ্যার হিসাবে নেহাতই পুঁচকে এ দেশ, সে কথা বলাই বাহুল্য! এই মহাদেশের মস্ত একখানি পেটও রয়েছে আবার! বা, বলা ভাল, কিঞ্চিৎ পেট-সর্বস্ব এই মহাদেশ। সেই কোন ছোট্টবেলা (মানে এই তোমাদের বয়সী যখন ছিলাম আর কি! এখন তো ধাড়িবুড়ি হয়েছি একেবারে!) থেকে শুনে আসছি বলো তো কত কথা আজগুবি এই দেশ নিয়ে! এই যেমন ধরো, দক্ষিণ গোলার্ধে থাকা এই দ্বীপপুঞ্জে সবকিছুই কেমন যেন উলটো উলটো! এখানে বর্ষার জন্য আলাদা কোনো ঋতু নির্দিষ্ট নেই আমাদের মতো। অক্টোবর থেকে এপ্রিল– যখনতখন নাকি ঘটতে পারে তার আবির্ভাব! শুধু যে বৃষ্টি হয়েই রক্ষা করবে, তা কিন্তু নয়– তার সাথে নেমে আসে হুশহুশ বাতাস আর এলোপাথাড়ি ঝড়। ছাতা টাতা তখন উলটে একেবারে একশা!

আসলে প্রশান্ত সাগর ঘিরে রেখেছে তো এই মহাদেশের (অস্ট্রেলিয়া আমাদের সাতটি মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ছোট)আশপাশ, তাই প্রকৃতির অহেতুক খামখেয়ালীপনায় বড় বেহিসাবী এখানকার আবহাওয়া। চারটে ঋতুতে নামকে ওয়াস্তে ভাগ করা যায় বটে অবশ্য ঋতুকাল–গ্রীষ্ম, শরত, শীত আর বসন্ত, তবে সত্যি কথা বলতে কি ভাগটা নেহাতই ক্যালেণ্ডার মেনে। আর বিশেষ কোনো তাৎপর্য আছে বলে তো মনে হয় না। এই শনশন করে এমন হাওয়া খেলে গেল, হাড়ের মধ্যে যেন প্রলয়নাচন হওয়ার জোগাড়! সত্যি বলছি গো– চারটে লেপ গায়ে দিয়েও তখন শান্তি মিলবে না একদম! পরক্ষণেই রোদ্দুরটোদ্দুর উঠে গরমের হলকা বইবে বাতাসে! যেন রাজস্থানের মরুভূমি! দিনের বেলা ৪৫ ডিগ্রি টেম্পারেচারও তখন আশ্চর্য করে না সাহেবসুবোদের। তবুও সবসময় মোটা জ্যাকেট একটা বয়ে চলাই শ্রেয়– কখন যে তার প্রয়োজন পড়বে তার ঠিক নেই কিনা!

আরও একটা মজার ব্যাপার কী জানো তো! বললাম না আগে এখানে সব উলটপুরাণ হয়ে বসে আছে! এদের জানুয়ারি মাসে গ্রীষ্মকাল শুরু হয় আর জুন মাসে পরে শীত! তাহলেই বোঝো কাণ্ডখানা! সবে আমাদের

ভারতবর্ষের গ্রীষ্মকাল পার করে কোনোক্রমে এই ভিনদেশে এসেই শুনি কিনা সামনে আবার দাবদাহের সময় আসছে! বলো কী বাজে ব্যাপার!

তার মধ্যে আমার তিনি বলে দিলেন, "সিডনি কিন্তু একদম সমুদ্রের পাড়ে। জানোই তো এসব জায়গায় আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় সমুদ্র থেকে আসা জলজ বাষ্পে। ওসব শীতের জামাকাপড় ওখানে লাগবে না। তার চেয়ে আরও কিছু টিশার্ট প্যাক করে নাও– গরমে পরে আরাম!"

কী যে ঠকেছি তাকে বিশ্বাস করে, কী আর বলব তোমাদের! এখন তো সেপ্টেম্বর পড়ে গেছে– মানে নিয়মমাফিক বসন্তকালও শুরু, তবু একদিন রাতে ঠান্ডায় ঘুম আসে না, তো পরদিন গরমে। সকাল সাতটায় আট ডিগ্রি, তো বেলা বাড়তেই তা ছুঁয়ে গেল পঁয়ত্রিশ। শরীর তো বুঝতেই পারছে না কেমন ভাবে নিজেকে মানিয়ে নেবে পরের দেশে এসে! কী যে জ্বালাতন!

সে যাকগে! এসে যখন পড়েইছি দূরদেশে সব্বাইকে ছেড়ে, তোমাদের কিন্তু এখানকার বেশ কিছু গল্প না শুনিয়ে ছাড়ব না। এই যেমন, আবহাওয়ার তো একটা আভাস পেলে– এও বুঝলে, সমুদ্র প্রধান দেশ এই অস্ট্রেলিয়া। তাই বলে কি আর পাহাড় নেই? আমাদের হিমালয়ের মতো অত বড় কিছু না থাকলেও ছোটখাট এদিক-ওদিক ঢালু জমিও আছে, রয়েছে ছোট বড় নানান উপত্যকা, টিলা আবার পাহাড়ও। সমুদ্রের পাড় বরাবর উঠে যাওয়া এই পাহাড়িয়া পাথুরে প্রকৃতির নিজস্ব এক অভিনব রূপ রয়েছে কিন্তু! চোখে দেখলে মন ভরে না– ছুঁয়ে দেখতে সাধ হয়। বিকেলে কিছুক্ষণ নীরবে এমন কোনো উপত্যকায় বসে ম্যাগপাই, কাকাতুয়া আর নাম না জানা বসন্তের সব পাখিদের কাণ্ডকারখানা দেখতে, সত্যি বলছি, মন্দ লাগে না কিন্তু।

গাছের একটা পাতা পড়লেও সেই আওয়াজ তোমার ঘোর ভাঙিয়ে দেবে, শান্ত এই নির্মল পরিবেশ ছেড়ে যেতে মন কেমন করবেই তোমার! কয়েকটা ঘণ্টা ফেসবুক, ফোন, ইন্টারনেট ছাড়াও দিব্যি কেটে যাবে তখন!

পাহাড়ি এলাকায় আন্দাজ মতোই ঠাণ্ডাও সমতলের থেকে কিছু বেশি। খুব যে সেলসিয়াসের মাত্রার তারতম্য ঘটে তা নয়। সমস্যাটা হাওয়ায়। এত জোরে হঠাৎ কনকনে হাওয়া আছড়ে পড়বে যে ফুটন্ত চা কফি

মুহূর্তে ঠাণ্ডা! দাঁতে দাঁত লেগে কথাটথা জড়িয়ে ভারী বিপদে পড়তে হয় তখন! আমি ভুক্তভোগী হাড়েমজ্জায়। সেই ঘটনাটা এখানে একটু বলেই দিই তোমাদের।

সিডনি থেকে দেড় ঘন্টার ড্রাইভে পৌছে যাওয়া যায় **ওলংগঙ** বলে ছবির মতো সুন্দর এক পাহাড়ি উপত্যকায়। একপাশে ঘননীল প্রশান্ত মহাসাগর অন্যদিকে বেশ কিছুটা খাড়াই। দুপুর দেড়টায় যখন আমার এক বন্ধু পিক আপ করে নিল আমায় সিডনি থেকে, তখন বেশ গরম। গরম জামা বলতে উলিকট রয়েছে, তাতেই মনে হচ্ছে, ইশ, না পরে এলেই হত। তা সে যাই হোক– ওলংগঙে হেলেন্সবার্গে দক্ষিণ ভারতীয় ধাঁচের এক বিশাল মন্দির রয়েছে। ওখানে পৌছে গাড়ি থেকে নামতেই হাওয়ার ধাক্কাটা প্রথম খেলাম। কোনোক্রমে মন্দিরে ঢুকে তো পড়লাম,থাকলামও বেশ কিছুক্ষণ। গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে ভারী সুন্দর পুজো হয় এখানে। (এখানে কয়েকজন গণেশ ঠাকুরও কিন্তু সোয়েটার পরে নেয়! আমার যে কেন অমন সুবুদ্ধি হল না সেদিন!)

মন্দিরের পেছনে খাওয়া দাওয়ার কিছু স্টল ছিল। এমন হাওয়া দিতে শুরু করল হঠাৎ, বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ সেইসব স্টল গুটিয়ে এক চাতালের তলায় সেঁধিয়ে গেছে। কথা বললে ধোঁয়া বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। গায়ে যেন পিন ফুটছে হাওয়ায়। এরমধ্যেই আবার শুরু হল ঝিরঝিরে বৃষ্টি– উফ্ কী যে কষ্ট হয়েছিল সেদিন!

পাহাড়ের মাথায় আরও একটা পয়েন্ট আছে– ওখান থেকে পুরো পাহাড় আর সমুদ্রতট একসাথে দেখা যায়। দেখলাম, পাহাড়ের মাথায় জমাট বাঁধছে কালো মেঘের সারি–যেন কোনো আগ্নেয়গিরির মুখ! কী যে সুন্দর লাগছিল!

তবে গরম জামা না থাকায় বেশিক্ষণ দাঁড়ানোই যেন বিড়ম্বনা সেখানে! কয়েক মিনিট দাঁড়িয়েই টের পেলাম, আমার নাক চোখ দিয়ে অবিরাম জল পড়ে চলেছে। সর্দি নয় কিন্তু, কেবল জল!বন্ধু নিজের গাড়িতে এক্সট্রা এক সেট জ্যাকেট ভাগ্যিস রেখেছিল– সে যাত্রায় তাই রক্ষে পেলাম বলতে পারো! নাহলে কে এসব গল্প শোনাত বলো তোমাদের!

ঠাণ্ডা এত বলে আবার ভেবে বোসো না গরম নেই! যখন গরম পড়ে, তাপমাত্রা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যেও ঘোরাফেরা করে বেশ কিছুদিন। মুশকিল একটাই। রাতে হয়তো আবার তা নেমে কুড়ির নিচেও চলে যায়। দিনের রাতের হেরফের বেশ ভোগায় জনসাধারণকে। নানা ধরণের ফ্লু, ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ঘরে। এখানের সরকার তখন প্রতিষেধক বিনামূল্যে বণ্টন করে সবাইকে নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য।

এখানে আরও কিছু মারাত্মক রোগের কথাও কিন্তু দেখা বা শোনা যায় প্রতিনিয়তই। বিশেষ করে 'মেলানোমা' বা চামড়ার একজাতীয় মারাত্মক ক্যান্সার। অ্যান্টার্কটিকার এক জায়গায় ওজোনমণ্ডলে ফুটো থাকায় ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মি ঢুকে পড়ে আমাদের বায়ুমণ্ডলে। অস্ট্রেলিয়া যেহেতু খুব দূর নয় এই মহাদেশের থেকে, তাই এর ক্ষতিকারক প্রভাব ভীষণভাবে পড়তে দেখা যায় এখানে। নেহাৎ চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক উন্নত এদের, তাই যা রক্ষে!

তবে তোমরা আবার ভয় পেয়ে বোসো না কিন্তু! ঠিকমতো সানস্ক্রিন লাগালে আর শরীর ঢাকা জামা পড়লে বিপদের আশঙ্কা অনেকটাই কমে যায়। আমি বলছি না গো এ কথা। বলছেন স্বনামধন্য সব সায়েন্টিস্টরাই।

চলো, এবার তাহলে রোগভোগের বালাই পেরিয়ে তোমাদের নিয়ে ঢুকে পড়ি এই দেশের কিছু উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের গণ্ডিতে। আমাদের মতো এত সুপ্রাচীন সভ্যতা কিন্তু নয় এখানের। বরং, বলা যেতে পারে,

নিতান্তই ছেলেমানুষ এরা আমাদের সমৃদ্ধ পুরাকালের হিসাবে।

আনুমানিক ১৬০০ সাল থেকে বিভিন্ন সময় বেশ কিছ ডাচ জাহাজ এসে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রান্ত বরাবর সমুদ্র উপকূলে। তখন সেই জাহাজগুলির নাবিকেরা এই প্রান্তরের নাম দেয় "টেরা অস্ট্রালিস ইনকগনিটা" বা "অজানা দক্ষিণপ্রান্তের দেশ"।

পাকাপাকি ভাবে খাতায় কলমে অস্ট্রেলিয়ার আবিষ্কারের সন অবশ্য ১৭৭০ সাল যখন ইংল্যাণ্ডের ক্যাপটেন জেমস্ কুক অন্য এক অভিযানে যাওয়ার পথে হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেলেন এই সুবিপুল দ্বীপমালার

একাংশ যেখানে আজকের এই সিডনি শহর অবস্থিত। এরপর বিশেষ কিছু আর বাকি থাকে না তেমন। একে-একে এই সমস্ত মহাদেশ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের অধীনতা বরণ করে। আজ আর অস্ট্রেলিয়া কারও সরাসরি তত্ত্বাবধানে না থাকলেও লণ্ডনের রানিকেই নিজেদের অধীশ্বরী বলে সম্মাননা এবং স্বীকৃতি দিয়ে চলে। এদের ডলারেও তাই রানীর মুখ জ্বলজ্বল করে আজও।

সেইসব গল্প তোমাদের তো জানাই রয়েছে, কী বলো! না জানা থাকলেও ইতিহাস বই ঘাঁটলেই পেয়ে যাওয়া যায় এইসব তথ্য। তবু এর পিছনে ধামা-চাপা পরে থাকে আরও এক ইতিহাস যা কষ্টের, অপমানের, দুঃখের, নৃশংসতার। সেই গল্প বরং কিছুটা এবার ভাগ করে নিই তোমাদের সাথে।

প্রায় আড়াইশোরও বেশি উপজাতির বাস ছিল এই মহাদেশে। সাহেবরা এখানে ঘাঁটি গাড়বার অনেক আগে থাকতেই। ইউরোপিয় নাগরিক সভ্যতার প্রভাব যেহেতু এই সুদূর দক্ষিণে এসে পৌছয়নি তখনও, নিজেদের মতো করেই দিব্য জঙ্গলে পাহাড়ে সমুদ্রে ঘুরে দিন কেটে যেত তাদের। নিতান্ত প্রয়োজনীয় সব জিনিস যেমন সুষম খাদ্য, অস্ত্র সবেরই সংস্থান করত তারা প্রকৃতির বুক থেকে। বাকি পৃথিবীর খবর তাদের জানা ছিল না। পৃথিবীর এই এক খণ্ডই ছিল তাদের বিচরণভূমি কেবল। শিকার করে, ঘুরে বেড়িয়ে দিব্যি কেটে যেত তাদের।

হঠাৎই ১৬০০ শতাব্দীর কিছু পর থেকে ইউরোপিয় ডাচ কলোনির কিছু সদস্য ঘটনাচক্রে প্রথম পদার্পণ করে অস্ট্রেলিয়ায়। কেউ যায় দক্ষিণে তাসমানিয়া অঞ্চলে, কারো জাহাজ ভুল করে ভিড়ে যায় উত্তরে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফে। এমনই কিছু সাহেবের ডায়েরি ঘেঁটে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সভ্যসমাজের থেকে এতটাই দূরে বাস ছিল এই আদিবাসী সভ্যতার, সাহেবদের গায়ে পরা জামাকাপড় দেখে তারা এদের অন্য কোনো প্রাণী পর্যন্ত ভেবেছিল! শেষে সব জামা প্রায় খুলে সাহেবদের প্রমাণ দিতে হয়, তারাও মানুষ! বোঝো কাণ্ড!

ধীরে ধীরে এই যাযাবর আদিম মানুষগুলির সাথে জানাশোনা বাড়তে থাকে সাহেবদের। বেশ কিছু সভ্য উপজাতি বাস করাও শুরু করে 'অ্যাবরিজিনলস্'(আদিবাসীদের যে নামে ডাকে এরা) দের পাশাপাশি। আরও এক চমকপ্রদ তথ্য অনুযায়ী বারোজন বাঙালি নাবিকও নাকি সেইসময় থেকেই সাহেবদের সাথে পথভ্রান্ত হয়ে এসে

এই মহাদেশেই বাস শুরু করে। শোনা যায়, সাহেবদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের থেকে এই সরল ‘কালো মানুষ’গুলিই বেশি মন টেনে নিয়েছিল সেই পথহারা নাবিকদের।

আমরা তো দেখেছি, কিভাবে ভারতবর্ষ দখল করেছিল ইংরেজরা। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই ভোগ করতে হয়েছিল পরাধীনতার গ্লানি। ঠিক তেমন প্রতাপেই শেষমেষ ক্যাপটেন কুক প্রায় অপ্রতিরোধ্যভাবে দখল নেয় এই সুবিশাল অঞ্চলের। হয়ত বন্য কাঠের সামান্য অস্ত্র নিয়ে তারাও প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল সাহেবদের– সেই মর্মান্তিক আন্দোলনের খবর আজ অবশ্য আর কেউ রাখেনি।

শোনা যায়, এরপর জোর করে ওই হার মেনে নেওয়া নিষ্পাপ মানুষগুলোর কাছ থেকে তাদের সন্তানদের একরকম ছিনিয়ে এনে ‘সভ্যতা’র পাঠ শেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সাহেবরা। তার ফলে বেশ কিছু প্রজন্ম হয়ে পড়ে অনাথ, সহায়সম্বলহীন। ভাবো তো, তোমাদের মতোই ছোটছোট ছেলেমানুষের দল– বনে জঙ্গলে বাবা মায়ের কোলেপিঠেই ছিল যাদের বাস, হঠাৎ একদিন সকালে ‘অসভ্য’ বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। হারিয়ে যায় তাদের নিজস্ব পরিচয় থেকে। এমনকি, তাদের সমস্ত ইতিহাসও প্রায় মুছে ফেলা হয় পৃথিবীর বুক থেকে! উফ্! কী ভয়াবহ, তাই না?

এখনকার অস্ট্রেলিয়া অবশ্য অন্যরকম। চিন্তাশীল। সাহেবসুবোরাও মুখে অতটা সোচ্চার না হলেও বোঝে তাদের অন্যায়। তাই তাদের মধ্যেই কেউ কেউ নতুনভাবে সমস্ত তথ্য সাজিয়ে নতুন ভাবে পরিবেশনা করতে চায় ইতিহাস। বলা অবশ্য বাহুল্যই এখানে বড্ড দেরি হয়ে গেছে ভুল,দোষ, ত্রুটিগুলো স্বীকার করতে। সেই হারিয়ে যাওয়া আদিমতা, তার না জানা সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস বেশিরভাগই তাই থেকে যায় আজও অধরা। হিসেব পাওয়া যায়না বিস্মৃত চিত্রপটের।

সেক্ষেত্রে, খাতায়কলমে বলতে গেলে, এই সভ্যতার এখনকার বয়স আনুমানিক ২০০ বছরের কিছু বেশি। ঝকঝকে রাস্তাঘাট হয়েছে চারধারে, প্রথম বিশ্বের তকমা লেগেছে গায়ে, সিডনি টাওয়ার, অপেরা হাউসের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে চারদিক, সাদা চামড়ার মিথ্যা অহংকারও রয়ে গেছে অল্পসংখ্যক গোঁড়া সাহেবের মধ্যে।

তবু যেন কোথাও গিয়ে অন্তঃসারশূন্য এই সমাজ। ভারত, চিন থেকে দলেদলে লোকেরা এসে ভিড় জমিয়েছে। সাদা কালোর পাশাপাশি গমরঙা এশিয়াবাসীরও বিপুল সংখ্যক বাস আজ এ দেশে। সর্ব বর্ণ সর্ব ধর্মের সমন্বয়।

আচ্ছা, এদের মধ্যে সব ভুলে যাওয়া যে আদিবাসীরা আজও আছে, সন্ধ্যা নামলে কি তারা শুনতে পায় গগনভেদী রাতজাগা নিশাচরের ডাক? কিংবা বাঘের মতো ডোরাকাটা তসমনিয়ান শেয়াল অবলুপ্ত হয়েও কি আড়াল থেকে দেখে তাদের বিলুপ্ত আদিম প্রিয়জনদের?

বড্ড ভারী করে ফেললাম না লেখাটা! আক গে সেসবকথা। এবার কিছু খাওয়াদাওয়া তো করতে হবে , নাকি! চলো ঘুরিয়ে আনি তোমাদের অস্ট্রেলিয়ার রান্নাঘর থেকে।

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কোনোকিছুর অভাব নেই এই দেশে। যেহেতু অনেক দেশের অনেক মানুষের একত্রে বাস এখানে, তাই ভোজনরসিকদের জন্য রয়েছে এক বিশাল আয়োজন। ভারতীয় সব রকমের খাবার তো

পাবেই, এমনকি যেই রকম ভাবে চাইনিজ খাবার খাই আমরা, বা পানিপুরী– তাও মিলবে এখানে।

ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, পয়সা ফেললে কলকাতার বাজারে বাঘের দুধও পাওয়া যায়। সে কথা সত্যি কিনা, পরখ করার সুযোগ হয়নি ঠিক কখনও। তবে, অস্ট্রেলিয়ায় যে কতখানি সঙ্গত এই উপমা, তা ইতিমধ্যেই বেশ টের পেয়েছি। শহরের বুকে যে সিডনি টাওয়ার, তারই এক বিত্তশালী রেস্তোরাঁয় বুফের মেনুটি থেকে কিছু পদ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে উদাহরণ হিসেবে।

মুরগি,গরু, শুয়োর, ভেড়ার মাংস তো খুবই সাধারণ– এদের সাথেই এখানে পাতে পড়ে চিংড়ি, অক্টোপাস, স্কুইড, কাঁচা ঝিনুক, গেঁড়ি গুগলি, স্যামন থেকে শুরু করে নানান সামুদ্রিক মাছ,এমু, এমনকি– উট, কুমির, ক্যাঙ্গারুও। অ্যাডিলেডের নাম তো শুনেইছ (এখানকার ক্রিকেট খেলার মাঠ বেশ জনপ্রিয়)– সেখানে তো আবার এক ধরণের সবুজরঙের পোকা ব্যবহার করা হয় চিজ এবং স্যালাডে। উল্লেখ্য– পোকাটি কিন্তু রীতিমত অনুভব করা যায় নিজের মুখে! ভাবতে পারছ?

তবে নিপাট বঙ্গসন্তানদের ভয়ের কোনো কারণ নেই বিশেষ। রুই, কাতলা থেকে ইলিশ – এসবও বাংলাদেশী বন্ধুদের সহায়তায় বেশ সহজলভ্য এখানে। নানাধরণের কুইজিন চেখে দেখতে চাইলেও এদেশের জুড়ি মেলা ভার। ভিয়েতনামিজ, জাপানিজ, অথেন্টিক চাইনিজ, লণ্ডনের সাহেবদের প্রিয় ফিশ অ্যান্ড চিপ্‌স্‌,স্প্যানিশ চুরোজ(একধরণের বিস্কুট জাতীয় নরম খাদ্যবিশেষ)– কি নেই! সাথে তোমাদের প্রিয় বার্গার, স্যান্ডউইচ,নানারকম সুস্বাদু হট চকোলেট তো রয়েছেই!

খাওয়াদাওয়া বেশি হয়ে গেলেও চিন্তা নেই। অস্ট্রেলিয়াবাসীরা খেলাধূলাতেও সিদ্ধহস্ত। আমরা এদের ক্রিকেটীয় আধিপত্যের কথা তো জানিই। তবে এদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা রাগবি। ওভাল শেপের বল নিয়ে অনেকটা ফুটবলের ধাঁচেই চলে এই খেলা। এখানেও গোল হয়, গোলপোস্ট থাকে। তফাৎ একটাই– পায়ের সাথেই

সমানতালে হাতের ব্যবহারও হয় এখানে। ফুটবলের মতোই বেশ উত্তেজনাপূর্ণ খেলা এটি। এছাড়া, গল্ফখেলাটিও বেশ উপভোগ করে সবাই। বয়স্করাও দিব্যি মেতে যায় ছুটির দিনে এইসব গল্ফকোর্সে।

এখানকার ঘোড়দৌড়ও কিন্তু উচ্চবিত্তদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। অনেক সাধারণ মানুষও রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আশায় ঘোড়ার উপর বাজিও ধরে অবশ্য। চকচকে নিটোল ঘোড়াগুলি দৃপ্ততেজে উর্ধ্বশ্বাসে যখন

লাইনের শেষমাথা লক্ষ্য করে দৌড়য়, নিছক তার সৌন্দর্য উপভোগ করতেই একবার রেসকোর্সে যাওয়াই যায় বোধহয়!

অস্ট্রেলিয়রা অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসও বেশ উপভোগ্য। বরফ,পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র– সমস্তটাই যেহেতু একসারি তে এসে মিলে যায় এখানে, তাই সবকিছুকে জয় করার নেশাও ঘোর লাগায় বইকি সব্বার মনে! স্কাইডাইভিং, স্কিইং, ক্যাম্পিং, সার্ফিং,ওয়াটার রাফ্টিং, গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ ভ্রমণ, ডলফিনদের সাথে সাঁতারের পাশাপাশি সাইক্লিং বা নিছক রানিং শ্যু গলিয়ে দৌড়ানো, হাঁটাতেও বেশ স্বচ্ছন্দ সবাই। একটা সুবিধা অবশ্য আছে এ দেশে– গরম পড়লেও, আমাদের কলকাতার মতো তেমন ঘাম হয় না শরীরচর্চায়। হইহই করে ঘুরে বেড়ানো যায় সারা বছরই। নতুন কিছুর নেশায় মেতে হুজুগে মিশে যেতে তাই সময় লাগে না তেমন!

এদেশের খাবারের এতো যে বিপুল আয়োজন, তার পিছনে অবশ্য এখানকার প্রাকৃতিক রসদের এক বিশাল হাত রয়েছে। মোটা মোটা জার্সি গরু, ভেড়া, মুরগির পাশাপাশি বেশ দুর্লভ নানান প্রাণী ঘাঁটি বেঁধেছে এই দ্বীপপুঞ্জে।

গাছে চড়তে পারা ছোট্ট ছোট্ট মিষ্টি কোয়ালা ভাল্লুক,বাচ্চাকে নিজের চামড়ার পকেটে ঝুলিয়ে লাফিয়ে বেড়ানো ক্যাঙ্গারু, ওয়ালাবি, অবাক গোলগোল চোখে তাকিয়ে থাকা বেশ বড় এমু পাখি তো আছেই, সাথে হিংস্র ডাকওয়ালা শেয়াল, তসমানিয়ন ডেভিল, ডিম দেওয়া স্তন্যপায়ী হাঁসের মতো দেখনদারির ঠোঁটওয়ালা প্ল্যাটিপাস, বিষাক্ত লাল পেটওয়ালা কালো সাপ, লাল পিঠে বিষ বহন করা মাকড়সা, নীল জিভধারী টিকটিকি, কাকাতুয়া, নানা ধরণের টিয়া ইত্যাদি প্রজাতি যেমন স্থলচর রাঙিয়ে তুলেছে, জলজ সম্ভারও বিশেষ কম নয় কিন্তু! পৃথিবীর

সবচেয়ে কুৎসিত প্রাণীর তকমা-আঁটা থ্যাবরা ব্লবফিশ থেকে শুরু করে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত বাক্স জেলিফিশ, কালো রাজহাঁস, মাংসাশী সামুদ্রিক অ্যানিমোন, হাঙর, অবলুপ্তির পথে হেঁটে যাওয়া গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের প্রবাল, জলপরীদের মতো মসৃণ ডুগং, ক্লাউনফিশ– এই তালিকা কখনই শেষ হওয়ার নয়।

তবে, মানুষের থেকে নৃশংস প্রাণী তো আর কেউ হয় না! তাদের লোভের শিকার এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের রোষে অনেক জন্তুজানোয়ারই আজ তাই প্রায় অবলুপ্তির পথে, যেমন বাঘের মতো ডোরাকাটা তসমানিয়ান শেয়াল, হাসিখুশি ভাল্লুকজাতীয় কুয়োক্কা, ক্যাসোওয়ারি পাখি, ডিম দেওয়া আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণী একিডনা প্রভৃতি।

অস্ট্রেলিয়ার গাছপালার সম্ভারও বেশ ঈর্ষণীয়। বিশেষত বসন্তকালে চোখ ফেরানো দায় প্রকৃতির অনীর্বচনীয় রূপ থেকে। এইসময়, রাধাচূড়ার মতো হলুদ ফুল উপচে পড়ে ইউক্যালিপটাস গাছ থেকে, আইসক্রিম কোণের আকারের ফুল ধরা ব্যাঙ্কসিয়া গাছ ভরে থাকে সমুদ্রতটের চারপাশ। এছাড়াও রয়েছে উইলো বটলব্রাশ, লালরঙের ঝাউ প্রকৃতির মোরেটন বে ফিগ, উজ্জ্বল পাপড়িহীন সাদা ফুলে ভরা গ্রেভিলিয়া,রঙচঙে লিলিপিলি যার থেকে উৎপাদন হয় মেরুন রঙের বেরিফল, ইলাওয়ারা আগুন গাছ (যখন লাল ফুল উপচে পড়ে এই গাছে, মনে হয়, আগুন লেগেছে– তাই থেকে এই নাম), মোটা খোলস ছাড়ানো পেপারবার্ক, বিশাল বড় দোহারা অ্যান্টার্কটিক গাছ যার সবুজাভ শিকড় মাটির উপর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। এসব দেখলে মনকেমন করবেই– এত সমৃদ্ধশালী দেশ কি আর চট করে চোখে পড়ে সবসময়, ভারতবর্ষ ছাড়া?

ভারতবর্ষের কথা যখন উঠলই, বলে রাখি, এদেশে প্রায় ৬ লাখ ভারতীয়/ বংশোদ্ভূতর বাস। প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে এই সংখ্যা। পড়াশোনা বা চাকরিসূত্রে এখানে এসে এদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে অনেকেই। তার উপর রয়েছে বাংলাদেশী এবং পাকিস্তানবাসীদের ভিড়। এখানে অবশ্য ভারত পাকিস্তান বলে দূরে সরে থাকে না কেউ। পাশাপাশি বাস করাই শুধু নয়, পুজোপার্বণে একসুরে মেতে উঠতেও দেখা যায় সবাইকে। বাংলাদেশী

পুজোয় গিয়ে জমিয়ে যেমন খিচুড়িভোগ খাওয়া যায়, পাকিস্তানি রেস্তোরাঁয় কাবাব চেখে দেখারও সুখ এদেশে সত্যিই আলাদা! দিওয়ালির বাজির রোশনাইয়ে বেজে ওঠে যখন আজানের সুর, সত্যি মনে হয়, এই তো ভালো ছিলাম– তবে কেন বড় বড় বেশ কিছু মাথা ক্ষমতার লোভে আমাদের দেশটাকে টুকরো টুকরো করে দিল?

যাক্, দূর দেশ অন্তত সে ব্যবধান কিছুটা হলেও ঘুচিয়ে দেয় বইকি– তাই বা কম কি?

এতক্ষণ যারা আমার সাথে সাথে অস্ট্রেলিয়ার পেটের ভিতরে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছ, তারা অনেকেই হয়তো ভাবছ, কই দেশটা তো ঘুরে দেখালাম না তোমাদের! সিডনি হারবার, অপেরা হাউজ, টরোঙ্গা চিড়িয়াখানা,মেলবোর্ন, অ্যাডিলেড, প্রশান্ত মহাসাগর, স্নো মাউন্টেন, তসমানিয়া, গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ– যাহঃ, কিচ্ছুটির কথাই তো বললাম না! সব কিছুই যে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলাম!

কি করব বলো? সময়ের বাঁধনে কিছুটা হলেও আটকা পড়ে থাকি যে আমরা সবাই। আস্ত এই মহাদেশের প্রাকৃতিক বৈপরীত্য এতখানি, যে সবকিছুকে তুলে ধরা আমার সাধ্যের যে অনেকখানি বাইরে গো! তাছাড়া, ভেবে দেখলাম, অনেক ভ্রমণকাহিনীতেই সেসব গল্প তোমরা পেয়ে যাবে। চাও কি, টুক করে একবার ঘুরেও যেতে পারো এদেশ পরের স্কুলের ছুটিতে।

কিন্তু একটা দেশ মানেই তো শুধু আর কয়েকটা বেড়ানোর জায়গা নয়, সেখানকার প্রকৃতি, আবহাওয়া, সংস্কৃতি, মানুষজন – সব! ছোট ছোট করে এগুলোর যদি হদিশ দেওয়া যায়, তাহলে একবারেই অনেকটা ধরে ফেলা যায় নতুন অদেখা এক মানচিত্রকে। মেপলগাছের পাতায়, কাকাতুয়ার ডাকে, ক্যাঙ্গারুর লাফানোয়, নিকষ কালো আদিবাসী সম্প্রদায়ের নির্মল হাসির রেশে, ২০০ বছর ধরে বাস করা সাদা সাহেব আর আমাদের মতো গমরঙা এশীয় মানুষদের মিশেলে এ এক ভারী বিচিত্র দেশ– এক টুকরো বিশ্ব –আর এক পৃথিবী। এদের মাঝামাঝি বলে কিছু নেই, সবই চূড়ান্ত– কেউ মোটা তো এতটাই, যে হাঁটতে পারেনা–আবার কেউ রোগা তো এতটাই, তার পাঁজর বেড়িয়ে পড়ে। কোনো জন্তু বহন করে চলে আদিমতার উৎস, কেউ বা আবার আনকোরা নতুন– পরিযায়ী। দিনের বেলা যত হুল্লোড়, রাত পরতেই নিঃঝুম।কেউ একদম নাকউঁচু এশীয় বিদ্বেষী–অন্যজন সেখানেই অমায়িক, ভদ্র,পরের সংস্কৃতির দেখভালের দায় তুলে নেয়য়া সর্বংসহা। এই দিনের বেলা ছোট ছোট গ্রীষ্মকালীন পোষাক, সেখানেই রাতে কম্বলের ওম! আরও কত বলব?

তবুও সব পাশাপাশি রয়েছে তো কেমন মিলেমিশে! এই ঢের! একে অপরের ভালোয় মন্দয় হাত ধরাধরি করে,অসি(অস্ট্রেলিয়াবাসী) বলে পরিচয় দেয়, এটাই তো শেখার, এই নিয়েই তো পথচলা!

অংশুমান দাশ

কেনিয়া যাওয়ার ঠিক আগে আগেই সারা দেশ জুড়ে চলছিল বিচিত্র বর্ণ বিদ্বেষী কাজ কারবার। আফ্রিকার মানুষজন নাকি সবাই অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত - এই যুক্তিহীন ধারণার উপর বিশ্বাস করে আমাদের দেশে পড়তে আসা,কাজ করতে আসা আফ্রিকানদের হেনস্তা হতে হচ্ছিলো। আমি ভাবছিলাম কেনিয়া, ইথিওপিয়া, বুরকিনা ফাসোয় আমার বন্ধুদের মুখ দেখাবো কি করে।

জর্জ আমার ছাত্র আর বন্ধু। বরাবর গম্ভীর - এয়ারপোর্টে আমাদের দেখে যেরকম লাফালো মনে হল আমি যেন আমার নিজের দেশে ফিরলাম।

ঠিক তেমনই আদর পেলাম জর্জের বাড়ি। জর্জের বাড়ি অনেক লোক - মা, দাদা, বৌদি, অনেকগুলো বাচ্চা - অনেক মাসিমা, মেসোমশাই।

পরে বুঝলাম, এইসব দারুণ হাসিখুশি হৈহৈ মানুষজনের কিছু পাড়াতুতো, কিছু বাড়িতুতো। সবাই নিজের। সবাই বড়সড় চেহারার - হা হা করে হাসেন আর মাথায় কোঁকড়া ঘন চুল । জর্জের মা সবাইকে ডেকেছেন - আর রান্না করেছেন এতো এতো - গরুর মাংসের সুরুয়া, ছাগলের একটা গোটা পায়ের রোস্ট - যাকে বলে 'ন্যামাচমা'। আর বাঁধাকপির স্যালাড আর পরোটা। পরোটাটা দিব্বি এদেশীয়।

রান্নাঘরে বাসন বলতে বিশাল বিশাল ডেকচি, আর প্রচুর কাপ - ছোট বাসন নেই কিছু। বোঝা গেল, এইরকম পাড়া-খাওয়ানো লাঞ্চ-ডিনার হয় প্রায়শই। আর এই হলো জুনিয়র জর্জ। আমার ছেলে উজান যাকে ছেড়ে আর নড়ে না।

একজন ছিলেন জর্জের মাস্টারমশাই - কী চমৎকার তাঁর ইংরেজি! তিনি এবং তাঁর স্ত্রী, দুজনেই সত্তরের কোটায়। আফ্রিকায় প্রত্যন্ত গ্রামে বসে এরকম ইংরেজি শুনে তো আমি অবাক। খবর পেলাম, যেহেতু কেনিয়ায় ছিল ব্রিটিশ কলোনী, তারা জোর করে শিখিয়েছে ইংরেজি। জর্জ আদতে কৃষক, নিজের খাবার নিজেই উৎপাদন

করেন। তাঁর ক্ষেতের একধারে সিনিয়র জর্জের সমাধি - সেই সমাধির উপরেই জর্জের বাড়ির বাগান। জর্জের বোন নাইরোবি থেকে এসেছে আমাদের সঙ্গ দিতে।

সকাল থেকেই জর্জের মা এর রান্নাঘরে টুকটাক খুটখাট। জর্জের মা-এর যত নাতিনাতনি, সব হাজির যেখানে যা আছে সব নিজেরাই ঘেঁটেঘুঁটে খেয়েদেয়ে যাবে সব স্কুলে। আর জর্জের মা বসাবেন একহাঁড়ি দুধ, তাতে দেবেন দু চামচ চা-পাতা, আর সেই দুধ সবাই খাবে চা ভেবে।

আমাদের সঙ্গে ঘুরলেন আর কেনিয়া ঘোরালেন মাচারিয়া। সঙ্গে তার ছাদ খোলা গাড়ি, ব্যারিটোন গলা, শক্তপোক্ত শরীর, আর অসম্ভব ভালোবাসা জন্তুজানোয়ারদের উপর আর প্রবল দায়িত্ববোধ। কিছুতেই ৬০ কিমি প্রতিঘন্টার উপর গাড়ি চালাবেন না কারণ তা নিয়মবিরুদ্ধ। হাতের তালুর মত জঙ্গল চেনেন মাচারিয়া। বড়দার মত উনি ছিলেন বলে কেনিয়ার প্রতিটি মুহূর্ত আমরা চেটেপুটে নিয়েছি। অতি যত্নের সঙ্গে বুঝিয়েছেন কেনিয়ার সাধারণ মানুষজনের জীবনযাত্রা, হেঁশেলের খবর ও খাবার। ভীষণ দাম সাধারণ জিনিসের। হিসাব করে দেখা গেল, বাড়িতে রান্না করে খেলে একেকবারের খাবারে একজনের খরচ প্রায় ২০০ ভারতীয় টাকা।

মাসাইমারা জাতিটাই একটি জীবন্ত রূপকথা । সিংহের মুখের উপর দিয়ে এই লম্বা লাল চাদর পড়া মানুষগুলি গরু নিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। কি সুন্দর স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে লাফিয়ে নাচেন, চাদ-সিংহ-সূর্যের গান করেন বিচিত্র আওয়াজে। আলাপ হলো ডেভিডের সঙ্গে - এদের সবারির একটা কঠিন নাম আছে অবশ্য। ডেভিডের সঙ্গে গেলাম মাসাইমারা মেয়েদের একটা স্কুলে। সেখানে মালিনী শোনালো গুপী গাইন বাঘা বাইন-এর গল্প - ভীষণ খুশি তারা, গান শোনালো আমাদের। ভীষণ সপ্রতিভ বাচ্চা সব, অন্যতম আদিম জাতির সদস্য হলেও সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে

দেশ বিদেশের আধুনিকতম ঘটনার সঙ্গে সমান পরিচিত তারা। মাসাইদের লাল চাদর জড়িয়ে তাদের আঁকা ছবির সামনে ছবি তুললাম আমরাও। যতদূর দেখা গেল, তারা হাত নাড়তেই থাকল। গল্পেরও দেশ নেই, গানেরও।

কেনিয়ার সবাই খুব বন্ধুবৎসল, বিশেষত ছোটদের সঙ্গে। সে নৌকা নিয়ে ঘোরানোই হোক,কিংবা ছিপে মাংসের টুকরো গেঁথে মাছ ধরা - সব কাজে তারা একগাল হাসি নিয়ে প্রস্তুত, বিরক্তি নেই একটুও। মধ্যরাতে ক্যামেরা চার্জার কাজ করছেনা, ভগবানের মতো হাজির কেউ - বাড়ি থেকে চার্জার এনে বলে - 'রেখে দাও, আমার কোনো কাজে লাগছেনা'। কোথাও মনে পড়েনা হোটেল আর তাঁবুর দরজায় তালা দিয়েছি।

ছদিনের জন্য সফর সেরে যখন জর্জের বাড়ি ফিরে এলাম, উজান বললো - 'বাপি, অনেকদিন পর যখন বাড়ি ফিরে আসি, যেমন ভালো লাগে - এখন তেমন লাগছে'।

কোথায় দেশ, কোথায় বাড়ি - বাড়িতো সেটাই, যেখানে আমার ভালো লাগে। যেখানে ক্লান্ত হয়ে ফিরলে দেশি মুরগির রোস্ট অপেক্ষা করে। আর জর্জ জড়িয়ে ধরে এয়ারপোর্টে ফেরার আগে, আমাদের গলা বুজে আসে। গায়ের রং দেশের সীমানা - এসব তো মানুষের বানানো দেয়াল। কবে যে এসব মুছে যাবে আমাদের দেশ থেকে, আমাদের পৃথিবী থেকে!

আঙ্কল স্যাম

শুধু সবুজ বা গাছ নয়। প্রকৃতি এখানে জেগে থাকে নানান অভাবনীয় চেহারায়। যেমন লা ব্রি পিট বা আলকাতরার পুকুর। এটার কথা প্রথম জেনেছিলাম সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের লেখা পড়ে। তারপর ভূতত্ত্ব পড়ার সময়, ফসিলের বিতর্ক পড়ার সময়। এলাকাটা লস এঞ্জেলস কাউন্টি মিউজিয়াম অফ আর্টের ঠিক পাশেই লস এঞ্জেলস শহরের প্রাণকেন্দ্রে, মিরাকল

মাইলস এলাকাতে। এখনও সেখানে গেলেই পোড়া পিচ আর আলকাতরার গন্ধে ম-ম করে। পিটের অধিকাংশটাই ফসিল সংগ্রহের কাজের জন্য আর সংরক্ষণের জন্য সাধারণের নজরের আড়ালে রাখা হয়েছে। তবে সাধারণের নজরেও রাখা হয়েছে একফালি পিট। সেখানে গেলেই দেখা যায় ফুটবলের মাপের বুদবুদ বানিয়ে, ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ করে আলকাতরা ফুটে বের হচ্ছে। পুরো পুকুরে যেন তেলে-জলে মিশে আছে। পিটের পাশের পায়ে চলা রাস্তা ফুঁড়েও কোথাও কোথাও বেরিয়ে এসেছে আলকাতারা। সেই রাস্তার পাশে লোহার বেড়া, লোহার বেড়ার অন্যপারে শহরের গাড়িচলা রাস্তা। তবে গাড়িচলা রাস্তা আর লোহার বেড়ার মধ্যে রয়েছে সাইড-ওয়াক বা ফুটপাথ। সেই ফুটপাথও যেখানে সেখানে ফেটে গিয়ে বেরিয়েছে ব্রি।
https://youtu.be/SQRwjXt48eY

লা ব্রি পিট ফসিলের খনি। পিটে জল খেতে আসা জন্তু পাড় বেয়ে পিটে নামলেই তার পা এঁটে যেত আলকাতরায়, তারপর নিজের শরীরের ভারে ক্রমে সেই জন্তু তলিয়ে যেত পিটে। তাই পিটে হাতি, শেয়াল, চিল এমনকি আধুনিক মানুষেরও অবশেষ পাওয়া গেছে। এই মানুষের অবশেষ কিন্তু জীবাশ্ম বা ফসিল নয়। কারণ, এই অবশেষ আধুনিক মানুষের, যার বয়স দশ হাজার বছরের কম। জীবাশ্ম হতে হলে মাটির নিচে পাথরের স্তরে চাপা পড়া জীবাবশেষের বয়স কম করে দশ হাজার বছর হতে হয়। অর্থাৎ, মাটির নিচে পাথরের স্তরে চাপা পড়া যে জীবাবশেষ আধুনিক মানুষের উৎপত্তির থেকে প্রাচীনতর তাকে জীবাশ্ম বলা যায়। আধুনিক মানুষের উৎপত্তি হয়েছিল এখন থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে কিনা।

পিটে আটকে পড়ে ক্রমে পিটের নিচে তলিয়ে যাওয়া জন্তুদের শরীর এবং শরীরের অংশ সংরক্ষিত হয়েছে আলকাতরায়। পিটের এইসব জীবাশ্ম থেকেই জানা গেছে সেবার টুথ টাইগারের কথা। সেবার টুথ টাইগারের ক্যানাইন হত সেবার অর্থাৎ বাঁকা তলোয়ারের মতো। মাংসাশী এই প্রাণীর বাস ছিল এই পিট এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। পিটে আটকে পড়া মাংসল হাতি আর অন্যান্য জন্তুর মাংসের লোভে এরা পিটে ঝাঁপ মেরে পড়ত জন্তুর ঘাড়ে। আর ডুবন্ত জন্তুর মাংস খেতে মশগুল হয়ে খেয়াল করত না যে মাংসল জন্তু তলিয়ে যাচ্ছে। টের পেতে পেতে এত দেরি হয়ে যেত যে তখন আর ঝাঁপ দিয়ে পাড়ে ফেরার উপায় থাকত না। কিন্তু সে জন্য মরিয়া চেষ্টা করে যে লম্ফঝম্প জুড়ত তাতে আরও তাড়াতাড়ি ডুবে যেত পিটে! সেবার টুথ টাইগার বিলুপ্ত প্রাণী। কিন্তু তার কথা জানা গেছে পিটের অন্দরে তার জীবাশ্ম রয়ে গেছে বলে।

তাছাড়াও আগ্নেয় পর্বতের ছড়াছড়ি দেখা যায় নিউ মেক্সিকোতে। ফ্রি ওয়ের দু'পাশে বসে থাকা শঙ্কু আকৃতির পাহাড়গুলো আসলে যে মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ তা আর বলে দিতে হয় না। আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণের সময়ে প্রচুর ছাই আর নানান মাপের পাথরের টুকরো বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে। তারপর বহু সহস্র বছর ধরে জমাট বেঁধে পাহাড় তৈরি করে। তার মধ্যে ফাটল থাকলে জল ঢোকে। না হলে তার দানাগুলোর ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে ঢোকে জল। সেই জল পাহাড়ের দানার ছোটোবড়ো ফাঁকফোকর দিয়ে গড়িয়ে যায় উঁচুর থেকে নিচের দিকে। তাতে কিছু ছাই ও পাথর গুলে যায়, খয়ে যায়, পাথরের গায়ে তৈরি হয় কন্দর। সেই সবই দেখা যায় নিউ মেক্সিকোর এখানে সেখানে।

আবার ডেথ ভ্যালিতে বড়ো বড়ো পাথর রাতারাতি হড়কে আসে শতেক মাইল। মাটি জমে রয়ে যায় তার আসার পথের দাগ। কোথাও হ্রদ জমে পুরোটাই নুনের সমতল হয়ে গেছে, কোথাও মাটির গভীর থেকে মাঝে মাঝেই উগরে উঠছে গরম জল। কোথাও আদিগন্ত ঘাসবনে চরে বেড়ায় বাফেলো বা তাতাঙ্কা।

তাতাঙ্কা শব্দটা নেটিভ ইন্ডিয়ান শব্দ। নেটিভ ইন্ডিয়ানরা আজও ইউনাইটেড স্টেটসের সর্বত্র রয়েছেন। কিন্তু নেটিভ ইন্ডিয়ান রিজার্ভের ভেতরেও তাঁদেরকে আজকের গড়পড়তা যেকোনও মানুষের থেকে কিছুমাত্র আলাদা লাগে না। অর্থাৎ, তাঁরাও সমকালের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছেন। তাঁরা সাবেক পোশাক পরেন না। সাবেকি ঢঙে সাজেনও না। বাস করেন না উইগ্বাম কিংবা টিপিতে। তবে নিউ মেক্সিকোতে এখনও বসবাস চলে অ্যাডোবি হাউসে। টিপি যেমন পুরো শঙ্কু আকৃতির তাঁবু, উইগ্বাম তেমন নয়। উইগ্বাম হলো বার্চ গাছের বাকলে বানানো আবাস যার ছাদ সাধারণত গম্বুজের মতো। অ্যাডোবি হাউস বা পুয়েবলো বানাতে লাগে খড় দিয়ে মাখা কাদাকে ঝলসে বানানো ইট। কিন্তু নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠানে নেটিভ ইন্ডিয়ানরা এখনও সাবেকি সাজে সাজেন, সাবেকি গান করেন, বাজনা বাজান এবং পোশাক পরেন। ক্যালিফোর্নিয়াতে হলিউডের খুব কাছেই আরউইনডেল নামের এক ছোট্টো শহরের পাবলিক লাইব্রেরিতে একবার নেটিভ ইন্ডিয়ান নাচ দেখার আর নেটিভ ইন্ডিয়ানদের মুখে তাঁদের সংস্কৃতির কথা শোনার সুযোগ হয়েছিল। গোটা অনুষ্ঠানটার ১৫টা ভিডিও খণ্ডের লিংক দেয়া রইল এই লিংকে–

ইন্ডিয়ান নাচগান ও সংস্কৃতি

এঁদের নাচ দেখে বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল ইম্ফলে প্রজাতন্ত্র দিবসে দেখা নাগা ডান্সের কথা। হয়তো সাজপোশাকের সাযুজ্যের জন্য। আবার কোনও কোনও নাচ মনে করিয়ে দিচ্ছিল অরুণাচলের টাইগার ডান্স।

ইউনাইটেড স্টেটসের রাস্তা আর ড্রাইভিংয়ের নিয়মকানুনের কথা বলেছি আগে। এখন মনে পড়ল পশুর ক্যারাভ্যানের কথা। মানে পশুতে টানা গাড়ির ক্যারাভ্যান নয়। পশুকে দূরদূরান্তে নিয়ে যাওয়া গাড়ির ক্যারাভ্যান। ঘোড়া বওয়ার গাড়ি একরকম হয়। আবার গরু বওয়ার গাড়ি হয় আরেকরকম। ঘোড়াকে কেন নিয়ে যাওয়া হয় গাড়ি চাপিয়ে এখনও জানি না। তবে গরুকে গাড়ি চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া খাওয়ানোর জন্য। এক চারণভূমি থেকে আরেক চারণভূমিতে। আবার বরফ পড়ার সময়ে চারণভূমি থেকে নিয়ে যাওয়া ঢাকা গোয়ালে।
এখনও মিডওয়েস্টে ক্যাটল শো ভীষণ জনপ্রিয়। ডালাসের উপকণ্ঠে নিয়মিত প্রদর্শনী চলে গরু, ঘোড়া, শূকর ইত্যাদি গবাদি পশুকে দড়ির ফাঁসে মানে ল্যাসো দিয়ে ধরার খেলার। এসবের আবার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয়।

গরু-ঘোড়া এসব প্রসঙ্গে মনে পড়ল ‘বাগি’র কথা। আমিস দুনিয়ায় ঘোড়ায় টানাকে গাড়িকে বাগি বলে যেমন, তেমনই ইউনাইটেড স্টেটসের দক্ষিণতম প্রান্তের রাজ্যগুলোর অন্যতম জর্জিয়ায় শপিং কার্টকে বাগি বলা হয়! ইউনাইটেড স্টেটসের অন্যত্র যেকোনও দোকানে খদ্দেররা মালপত্র বওয়ার জন্য যে ঠেলাগাড়ি ব্যবহার করেন সেগুলো সাধারণত শপিং কার্ট বলেই ডাকা হয়। আবার যেকোনও হাতে ঠেলা মাল বওয়া গাড়িকে কার্ট বা ডলি বলা হয়। ইনক্লাইন নামে আরেকধরনের যানের কথা বলেছি আগে পিটসবার্গের কয়লাখনি প্রসঙ্গে। সেই প্রসঙ্গে মনে পড়ল যে ঐ কয়লাখনিতে ছিল শিশুশ্রমিক নিয়োগের রমরমা। চিত্র সাংবাদিক লিউইস হাইন-এর লাগাতার প্রতিবেদনে আর ব্যক্তিগত প্রয়াসে ১৯১০ সালে আইন তৈরি হয় খনির মতো বিপজ্জনক ক্ষেত্রে শিশুশ্রমিক নিয়োগের চল বন্ধ করার জন্য। তবে যেকোনও চা-দোকানে বা খাবারের দোকানে এখনও চোদ্দ বছর বয়সের বেশি বয়সী ছেলেমেয়েরা মা-বাবার অনুমতি থাকলে কাজ করতে পারে। অনেকে এভাবে উপার্জন করে নেয় কলেজে পড়ার খরচ।

টর্টিলার ব্যাপারে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে টর্টিলা আটা আর ময়দা দিয়েও বানানো হয়। আর দেখছি যে মাইকেল কহরস ব্যাগ এখন দেশেও পাওয়া যায়। কলকাতার কোয়েস্ট মলেই একটা আউটলেট আছে আসল মাইকেল কহরস ব্যাগের। আর নকলগুলো পাওয়া যাবে নিউ মার্কেটের সামনের রাস্তা জুড়ে সাজানো ব্যাগের পসরায়।

দেশে এখন অনেক জিনিস এবং পরিষেবা ব্যবহার করলে স্বচ্ছ ভারত কর দিতে হয়। চতুর্দিকে হৈ হৈ করে চলে পায়খানা ব্যবহারের নানারকম বিজ্ঞাপন। কিন্তু এই ব্যাপারেও ইউনাইটেড স্টেটস এমন একটা ব্যবস্থা বানিয়েছে যে মাঠে-ময়দানে প্রাকৃতিক কৃত্য সারার প্রয়োজন হয় না। দূরদূরান্তের শহর আর কসবাকে জোড়ে যে হাইওয়েগুলো সেখানে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর আছে পাব্লিক রেস্ট

এরিয়া। সেখানে গাড়ির থেকে নেমে যেমন আড়মোড়া ভাঙা যায় তেমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম ব্যবহার করা যায়, ফ্রিতে। না হলে যেকোনও কসবায় গ্যাস স্টেশনের বাথরুম ব্যবহার করা যায়। তবে গ্যাস স্টেশনে বাথরুম ব্যবহার করলে কিছু কেনাটা ভদ্রতা রক্ষার উপায়। মানে যে গ্যাস স্টেশনের বাথরুম ব্যবহার করা হয়, সেখান থেকে গাড়িতে গ্যাসোলিন না ভরলেও চলে, কিন্তু কফি বা চকোলেট কিনে সৌজন্য রাখাটা চল।

মুদির দোকান বা শপিং মলে কমোডের সিটে বিছোনোর জন্য কাগজ দেওয়া থাকে উপযুক্ত কাটিংয়ে। বাথরুম ব্যবহারের পর জল দেওয়াটা অধিকাংশ জায়গাতেই স্বয়ংক্রিয়। মানে নানান সংস্কৃতির মানুষের বাথরুমের ব্যবহারের রীতির ওপর ভরসা না রেখে ব্যবস্থাটা স্বয়ংক্রিয় করে নেওয়া হয়েছে। শিকাগো ওহায়ার এয়ারপোর্টে কমোড সিটের কভার বদলানোর কাজটাও স্বয়ংক্রিয়। হ্যান্ড স্যানিটাইজার, জল সাবান আর হাত মোছার পেপার টাওয়েলের সাথে অধিকাংশ পাবলিক টয়লেটেই দেখা মেলে হাত শুকানোর যন্ত্রের। কেবলমাত্র নায়াগ্রাতেই ভারতীয় মানুষের দ্বারা চালিত কনভেনিয়েন্স স্টোরে দেখেছি যে বাথরুম যে শুধু খদ্দেরদের ব্যবহারের জন্য তা স্পষ্ট করে লেখা আছে। ভারতীয় মানুষ বলতে ভারত উপমহাদেশে বসবাস যে মনুষ্যগোষ্ঠীর সেই গোষ্ঠীয় বা বংশীয় মানুষ বোঝাতে চেয়েছি।

চরম আবহাওয়ায় দিন গুজরান করা বল্গাহরিণ চারণদারদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে ২০১৩ সালে ল্যান্ডরোভার ও রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি প্রদত্ত স্কলারশিপপ্রাপ্ত লন্ডনের একটি তিন সদস্যের অভিযাত্রী দল ফেলিসিটি এস্টনের (Felicity Aston) নেতৃত্বে ভৌগোলিক সমীক্ষা করেন। চরম আবহাওয়ায় চলার উপযোগী ল্যান্ডরোভার ডিফেন্ডার গাড়িতে চেপে ‘রোড অফ বোনস’ ধরে এ অভিযান চলেছিল রাশিয়ার সাইবেরিয়ার সাখা প্রদেশে। লেক বৈকাল (Baikal) থেকে এই অভিযানের যাত্রাপথ ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের সহর মাগদান (Magdan) পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার লম্বা।

তাইগা (taiga) নামে পরিচিত ঘন জঙ্গলে আবৃত এই অঞ্চলে আনুমানিক দেড় লক্ষেরও বেশি বল্গাহরিণ চারণদারদের তত্ত্বাবধানে চরে বেড়ায়। আধুনিক সভ্যতা নামক প্রায় কোনও কিছু এখনও খুব একটা কলুষিত করেনি সাইবেরিয়াকে। প্রায় দু’সপ্তাহ ধরে গাড়ি চালিয়েও বরফের রাজ্যে একটিও বল্গাহরিণ বা তার চারণদারদের দেখা পায়নি দলটি। অভিযাত্রী দলটির দোভাষী সালভা জানিয়েছিল অভীষ্ট লক্ষ্যে সহজে পৌঁছানো যাবে না। কারণ হাইওয়ে দিয়ে চলতে থাকা ট্রাক ড্রাইভাররা হরিণ দেখলেই গুলি চালিয়ে মেরে ফেলে মাংসের জন্যে। তাই হাইওয়ে থেকে অনেক দূরে বরফের মাঝের জঙ্গলে থাকে হরিণ ও তার রাখালরা। এদের খুঁজে বের করাটা দুরূহ।

এই অঞ্চলের সেরকম কোনও ম্যাপ নেই। ম্যাপের প্রয়োজনও পড়ে না কারও। কারণ, ওই একটি মাত্র রাস্তা ‘রোড অফ বোনসের’ ধারেই সব গ্রাম ও শহর।

সাইবেরিয়ার মাত্র কয়েকটি উপজাতির মানুষই হরিণ চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এদের মধ্যে উল্লেখ্য হল, ইভানি (Evani), দোলগান (Dolgan), ইভাঙ্কি (Evenki) এবং উকাঘির (Yukaghir)।

বল্গাহরিণের দলের খোঁজ করতে করতে ২০১৪ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি অভিযাত্রীরা পৌঁছলেন ‘রোড অফ বোনস’ ওরফে কলিমা হাইওয়ের (Kolyma Highway) থেকে একশো কিলোমিটার দূরের এক গ্রাম, রাশিয়ার সাইবেরিয়ার সাখা (Sakha) রিপাব্লিকের ওমিয়াকন্সকি (Oymyakonsky) জেলার ওমিয়াকনে (Oymyakon)। এই গ্রামটি ‘পোল অফ কোল্ড’ নামে খ্যাত।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে, ১৯২০ সালে শীতকালে এই গ্রামের তাপমাত্রা নেমে গেছিল -৭১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এখনও পর্যন্ত নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে মানুষের বসতি আছে এরকম একটি স্থানের এটাই নথিভুক্ত সবচাইতে কম তাপমাত্রা।

পৃথিবীর সবচাইতে শীতলতম প্রাচীন বসতি ওমিয়াকনে পেনের কালি জমে যাওয়া, ব্যাটারি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, মোবাইল ফোন কাজ না করা, জানালার কাঁচ মুখের চামড়ায় আটকে যাওয়া হল দৈনন্দিন ঘটনা। সবচাইতে কষ্টকর হল

শীতকালে মৃতদেহ কবরজাত করা। পাঁচশো বাসিন্দার এই গ্রামের লোকজন শীতকালে কখনও গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে না। একবার বন্ধ হয়ে গেলে ইঞ্জিন পুনরায় চালু করা প্রায় অসম্ভব।

সমুদ্রতল থেকে সাতশো পঞ্চাশ মিটার উচ্চতার এই গ্রামটি তিন হাজার মিটারেরও বেশি উঁচু সব বরফ পাহাড়ে ঘেরা। ওমিয়াকনের সাইবেরিয়ান আদিম ধাঁচের কাঠের ঘরবাড়ি নিখুঁতভাবে প্রবল শীতের মোকাবিলা করার উপযোগী করে তৈরি। মূলত বল্গাহরিণ (rein deer) আর ঘোড়ার মাংস খেয়ে বেঁচে থাকা গ্রামের পাঁচশো বাসিন্দা অপুষ্টি কী জানে না। সমস্যাটা হয় পানীয় জল জোগাড় করতে। নদী থেকে চাক চাক করে বরফ কেটে বল্গাহরিণ টানা কাঠের স্লেজে চাপিয়ে বাড়ির সামনে স্তূপ করে রাখে গ্রামের বাসিন্দারা। তারপর সেই বরফ আগুনে গলিয়ে জোগাড় হয় পানীয় জল। গ্রামের কোনও বাড়ির ভেতরে বাথরুম নেই। প্রত্যেক বাড়িতে সামান্য আচ্ছাদন দেওয়া একটা করে বাথরুম থাকে বাগানের এক কোণায়। কারণ, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জল ও সবকিছু নিমেষে বরফ হয়ে যাওয়ায় কোনওরকম নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

এই গ্রামে একটা কয়লা-চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে ঠিকই। কিন্তু মাঝে মাঝে কয়লার জোগান কোনও কারণে বিঘ্নিত হলে বয়লার বন্ধ হয়ে গ্রামের বাড়িঘর বিদ্যুৎবিহীন হয়ে যায় সাময়িকভাবে। নিশ্চল হয়ে যায় ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা। ঘরের ভেতর গরম রাখতে তখন কয়লা আর কাঠই ভরসা গ্রামবাসীর। এই নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই ওমিয়াকনবাসির। এরা তো সেই পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে এসেছে কী করে শীতের মোকাবিলা করতে হয়।

ওমিয়াকনে শীতকালে গড় তাপমাত্রা মাইনাস ষাট ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরা ফেরা করে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা উঠে যায় আবার ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে। ইন্দিগ্রিকা (Indigirka) নদীর তীরে এইরকম বেদম ঠাণ্ডার জায়গায় এই গ্রামটি গড়ে ওঠার কারণ হল একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। ওমিয়াকন শব্দটার অর্থ হল ‘না জমা জল’ – নন ফ্রিজিং ওয়াটার। এই অঞ্চলে মূলত সাইবেরিয়ার বল্গাহরিণ চারণদাররাই চলাফেরা করে। আর হরিণদের জল খাওয়ানোর জন্যে সব হরিণ চারণদাররাই তাদের হরিণের পাল নিয়ে আসত এই উষ্ণ প্রস্রবণে। এছাড়া হরিণ শিকারি ও বরফ-নদীতে মাছ ধরিয়ের দলও ভিড় জমায় এখানে।

১৯২০ সালে তদানীন্তন সোভিয়েত সরকার শিল্পায়ন ও আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়া না পাওয়া এই ভবঘুরেদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওমিয়াকনে একটা পুরোদস্তুর গ্রাম বানিয়ে দিল। কাছাকাছি শহর ইয়াকুস্ক প্রায় সাতশো কিলোমিটার দূরে। দু'দিনের মোটর-পথ। সারা গ্রামে একটাই মাত্র দোকান। যাবতীয় জিনিস মেলে এই দোকানে।

এই গ্রামের কেউ শীতকালে মারা গেলে তাঁর কবর খোঁড়ার জন্যে প্রথমে ইস্পাত কঠিন বরফের ওপর কাঠ জ্বালানো হয়। তারপর বরফ একটু গললে একটা ছোটো গর্ত খুঁড়ে একটা ধাতব পাত্রে জলন্ত কয়লা ঢেলে বসিয়ে দেওয়া হয় ওই গর্তে। কয়লার উত্তাপে ধীরে ধীরে বরফ গলতে শুরু করে। খানিক পর পর ওই গলা জল তুলে ফেলা হয় আর আরও কয়লা জ্বালানো হতে থাকে ওই গর্তের ভেতরে। মোটামুটি দিনতিনেক লাগে মৃতদেহ কফিনজাত করে কবর দেবার উপযোগী একটা গর্ত করতে!

অভিযাত্রীরা যখন ওমিয়াকনে পৌঁছলেন তখন ওখানকার তাপমাত্রা ছিল -৫৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গাড়ির ভেতরের গরম থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার কয়েক মিনিটের মধ্যে শুকনো ঠাণ্ডায় অভিযাত্রীদের গলা শুকিয়ে যেতে লাগল। বিশেষ ধরনের মেরু অঞ্চলের পোশাকের ওপর চামড়ায় তৈরি স্থানীয় জুতো ও হাত মোজা পরেও অভিযাত্রীদের হাত-পা ঠাণ্ডায় নিঃসাড় হয়ে যেতে থাকল। অভিযাত্রীরা ক্রমাগত হাত-পায়ের আঙুল নাড়াতে লাগলেন রক্ত সঞ্চালন বজায় রাখতে। এই ঠাণ্ডায় ধাতু ভঙ্গুর হয়ে যায়। জ্বালানি তেল জমে মোমের মতো শক্ত হয়ে যায়। রাবার শুকনো মাটির মতো ভেঙে যায়। অভিযাত্রীরা ওমিয়াকনে পৌঁছেও খোঁজ পেলেন না বল্গাহরিণ চরিয়েদের।

এখানে শীতকালে মাত্র ঘণ্টা তিনেক দিনের হালকা আলো থাকে আর বাকি সময় রাত। গ্রীষ্মে আবার ঠিক উল্টোটা হয়।

রাতটা ওমিয়াকনে কাটিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন অভিযাত্রীরা। চলেছেন পুবের অভিমুখে। 'রোড অফ বোনস' ধরে চলতে চলতে আচমকা অভিযাত্রী দলের দোভাষী সিলভা চিৎকার করে উঠল, "থাম।"

গাড়ি রাস্তার ধারে দাঁড়াতে সিলভা বলল, "আমি বরফের ওপর কিছু হরিণের খুরের দাগ দেখতে পেয়েছি।"

অভিযাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে বরফের ওপর খুব হালকা স্লেজ ও হরিণের পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন।

ভাগ্যের ওপর ভরসা করে অভিযাত্রীরা রাস্তা ছেড়ে বরফের ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে এগোতে লাগলেন। কিন্তু বরফের ওপর সেই ছাপ এতই অস্পষ্ট যে অভিযাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে কঠিন ঠাণ্ডায় বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে সেই ছাপ খুঁজে খুঁজে এগোতে লাগলেন। পেছন পেছন বরফে চলার উপযুক্ত গাড়ি আসতে লাগল। অভিযাত্রীরা ঘণ্টা খানেকেরও বেশি সময় ধরে হাঁটতে হাঁটতে উপত্যকার মাঝামাঝি বরফে ঢাকা গাছের জঙ্গলে পৌঁছে গিয়েও কিছু দেখতে পেলেন না। এর আগেও একবার খানিক উড়ো খবর পেয়ে অনেক বরফ রাস্তা পেরিয়ে বল্গাহরিণের দলের দেখা পাননি অভিযাত্রীরা। হতাশ হয়ে অভিযাত্রীরা যখন আবার মূল রাস্তায় ফেরত আসবেন আসবেন করছেন, তখন আলো-আঁধারিতে নজরে এল অনেক দূরে উপত্যকার প্রায় শেষে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে হালকা কাঠ পোড়া ধোঁয়ার রেখা উঠছে।

অভিযাত্রীরা ধোঁয়া লক্ষ করে এগিয়ে দেখতে পেলেন গাছের ফাঁকে একটা পিরামিড আকৃতির তাঁবু খাটানো। দু'জন লোক তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। চামড়ার দড়িতে বাঁধা ভয়ংকর হয়ে ওঠা দুটো কুকুর, বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে আসতে চাইছে। কুকুরের চিৎকারে খান খান হয়ে উঠছে বরফের নিস্তব্ধতা।

তাঁবুর বাসিন্দারা বাইরের লোকের উপস্থিতি কীভাবে নেবে ভাবতে ভাবতে কুকুরের হিংস্রতা উপেক্ষা করে তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছতে অভিযাত্রীদের সমস্ত সংশয়কে কাটিয়ে তাঁবুর দরজা খুলে ধরে হাসিমুখে ভেতরে যাবার ইশারা করল লোক দু'জন। তাঁবুর ভেতর একটা জ্বলন্ত কাঠের উনুনের পাশে এক মহিলা বসে কড়াইতে মাংস রান্না করছিলেন। একটা চর্বির প্রদীপ জ্বলছিল তাঁবুর ভেতরে। অভিযাত্রীরা ভেতরে ঢুকতে মহিলা নিজের পরিচয় দিলেন 'মারথা' বলে। বসতে বললেন পুরু খড়ের ওপর বিছানো একটা বল্গাহরিণের চামড়ার ওপর।

অভিযাত্রীরা ভাবলেন যে তাঁরা ভুল সময়ে এসেছেন। এটা নিশ্চয়ই হরিণ চারণদারদের রাতের খাবার সময়। ভুল ভাঙল অচিরেই যখন দোভাষী সিলভা জানাল যে তাদের খাবার তৈরি। এখন খেতে শুরু করলেই হয়। বহুদূর থেকে গাড়ির আলো দেখতে পেয়েই মারথা খাবার বানানো শুরু করে দিয়েছিল। ইভানি উপজাতির মানুষরা ভয়ংকর আবহাওয়ার দেশে খাবার দিয়ে অতিথিদের স্বাগত জানায়।

মারথা ছাড়া এই তাঁবুর আর দুই বাসিন্দা হল মারথার স্বামী নিকোলাই ও আরেক হরিণ চারণদার সারগি।

জ্বলন্ত উনুনের তাপে চামড়া থেকে তৈরি তাঁবুর ভেতরটা সবসময় খুব গরম থাকে। এই আগুন কখনও নেভানো হয় না। নিভলেই বিপত্তি। ছুঁচলো তাঁবুর ওপরে একটা ছোট গর্ত থাকে ধোঁয়া বেরনোর জন্য।

কড়াই থেকে মগে করে গরম মিষ্টি চা পান করতে করতে অভিযাত্রীরা শুনছিলেন নিকোলাইদের কথা। এই রুক্ষ অতি ভয়ংকর শীতের রাজ্যে শয়ে শয়ে হরিণের পাল চরিয়ে বেড়ানো হরিণদের একটারও মালিক নন এঁরা। সমস্ত পশুর পালের ওপর অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের। হরিণ প্রতিপালন করার জন্য হরিণপিছু একটা নির্দিষ্ট অর্থ পান এঁরা। কোনও কারণে পালে হরিণের সংখ্যা কমে গেলে অনেক অর্থ জরিমানা দিতে হয়। আবার পালে নতুন শাবক জন্মালে বেশি অর্থ জোটে। যেহেতু বল্গাহরিণ দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়, তাই দলছুট হয়ে হরিণের সংখ্যা কমে যাবার কোনও সম্ভবনা নেই। হরিণ মেরে ফেলে নেকড়ের দল। এগারোটা নেকড়ের দল এই অঞ্চলে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। তাই প্রতিদিন গিয়ে গিয়ে হরিণের পালকে দেখে আসতে হয়। এই নেকড়েগুলো এত ধূর্ত যে এদের চোখে দেখতে পাবে না। কুকুর আর মানুষের আনাগোনা টের পেলে দূরে পালিয়ে যায় এরা। শুধুমাত্র বরফের ওপর এদের পায়ের ছাপ আর

আধখাওয়া হরিণের দেহ এদের উপস্থিতি জানান দেয়। গেল বছর অনেকগুলো হরিণ মেরে ফেলেছিল নেকড়ের দল। আক্ষেপ করছিল নিকোলাই।

পরদিন নিকোলাই অভিযাত্রীদের তাইগাতে নিয়ে গেল হরিণের দল দেখাতে। অভিযাত্রীরা গিয়ে বরফে আবৃত ধূসর গাছপালার মাঝে খুরের আওয়াজ আর কিছু চলাফেরার আবছা আভাস ছাড়া কিছু দেখতে পেলেন না। অজানা মানুষের পায়ের আওয়াজ পেতে জন্তুগুলো আরও দূরে সরে যেতে লাগল। ম্যাজিক শুরু হল নিকোলাই মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করতে থাকার পর। হরিণের দল আর সরে না গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বরফ খুঁড়ে ঘাস আর গাছের পাতা খেতে লাগল।

অভিযাত্রীরা দেখলেন, শক্তিশালী পেশিবহুল বেশ কয়েকটা হরিণের গলায় চামড়ার ফিতে দিয়ে একটা ছোটো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র বসানো। জি.পি.এস ট্র্যাকার, জানাল নিকোলাই। একটা স্যাটেলাইট টেলিফোনও তাঁবুতে আছে। বল্গাহরিণ চরিয়েরা আধুনিক সভ্যতা থেকে শুধু অতি প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিয়েছে। আর বাকিটা রেখে দিয়েছে সেই আদিকালে।

দুপুরবেলা সারগি এক হরিণে টানা হাতে তৈরি কাঠের স্লেজে চেপে চলল কয়েক কিলোমিটার দূরে চারণরত মূল হরিণের পালের দেখভাল করতে। হরিণে টানা স্লেজের গতি খুব কম। অভিযাত্রী দলের নেত্রী ছ'ফুট লম্বা ফেলিসিটি এস্টন

সারগিকে বলল, "যখন তোমরা স্যাটেলাইট ফোন, জি.পি.এস ট্র্যাকার ব্যবহার করছ, তখন একটা স্নো-বাইক নিচ্ছ না কেন? এতে তো খুব তাড়াতাড়ি যাতায়াত করতে পারবে!"

সারগি হেসে উত্তর দিয়েছিল, "বরফে স্নো-বাইকের ইঞ্জিন সবসময় চালু রাখা কঠিন। কিন্তু বল্গাহরিণ সবসময় সচল।"

ডাইনির গল্প

একটা ডাইনি ছিল। সে লিচুগাছের পাতায় বসেছিল। সে লিচুগাছের ডালে উঠে সব লিচু খেয়ে নিত। তারপর গাছে থেকে নেমে হেঁটেহেঁটে গিয়ে একটা লোককে তাড়া করল। লোকটা একটা গর্তের মধ্যে পড়ে মরে গেল।

তখন জঙ্গলে একটা ঈগল ছিল। সে ডাইনিকে মুখে নিয়ে উঁচুতে উড়ে গেল ডানা নাড়তে নাড়তে। তারপর মুখ থেকে নিচে ফেলে দিল। পড়ে গিয়ে ডাইনি আবার বেঁচে উঠল।

তখন একটা হেলিকপটার গরগর করে উড়ছিল। ডাইনি আকাশে উড়ে গিয়ে হেলিকপটারটাকে চুড়মুড় করে ভেঙে দিল।

ভয়ঙ্কর ডাইনি। রাতে বাইরে যেও না। বাবলু, টুবলু আর পাপ্পুকে কে না করেছিলাম রাতে বাইরে যেও না। ওরা তাও গেল। ডাইনি ওদের মাথায় তাল ফেলে দিয়ে ওদের গিলে ফেলল।

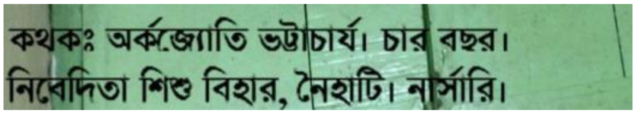

কথকঃ অর্কজ্যোতি ভট্টাচার্য। চার বছর।
নিবেদিতা শিশু বিহার, নৈহাটি। নার্সারি।

আমার পড়াশোনা

আমি অভিরাজ। অভিরাজ দেবনাথ। ব্যারাকপুর মডার্ন স্কুলে আপার নার্সারিতে পড়ি। ব্লক দিয়ে খেলতে আমার খুব ভাল লাগে। খেলনা ডাইনোসর, ড্রাগন, সমুদ্রের প্রাণী আর জন্তু জানোয়ার আমার বন্ধু। বাড়িতে আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে পড়তে বসি। ওদেরও তো পড়াশুনা শিখতে হবে!

এখন ডাইনোসরকে বাংলা শেখাচ্ছি যাতে নিজে নিজে আবোলতাবোল পড়োতে পারে। কত আর পড়ে

শোনাব?

আমার পার্ক

সবাই ভালো। শুধু ড্রাগনটাই যা একটু বদমাশ। সুযোগ পেলেই আমার দুর্গে হানা দেয়।

প্রথম ধাঁধাঃ

নিচের বাক্যগুলোর মধ্যে কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে?

ক। একটামাত্র বাক্যই মিথ্যে

খ। ঠিক দুখানা বাক্য মিথ্যে

গ। কেবলমাত্র তিনটে বাক্য মিথ্যে

ঘ। ঠিক চারটে বাক্য মিথ্যে

ঙ। এই পাঁচটা বাক্যই মিথ্যে

দ্বিতীয় ধাঁধাঃ

উজ্জয়িনীর একটা কিউরিও শপে দুটো প্রাচীন মুদ্রা বিক্রির জন্য এসেছে। প্রথমটার গায়ে একজন রাজার ছাপ দেয়া। তার তলায় দেবনাগরীতে লেখা আছে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। দাবী, সেটি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলের মুদ্রা। দ্বিতীয়টার গায়ে একজন রাজার ছাপ দেয়া। তার তলায় দেবনাগরীতে লেখা আছে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। দাবী, সেটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলের মুদ্রা। এদের মধ্যে একটা জাল বলে খবর আছে। কোনটা জাল?

তৃতীয় ধাঁধাঃ

এক পরিবারে প্রত্যেকটা ছেলের যতগুলো ভাই ততগুলো বোন আর প্রত্যেকটা মেয়ের যতগুলো বোন তার দ্বিগুণসংখ্যক ভাই। পরিবারটায় কতজন ভাই আর কতজন বোন আছে?

চতুর্থ ধাঁধাঃ

ব্রিজটা এক মাইল লম্বা। ঢোকবার মুখে একটা ওজন মাপবার প্ল্যাটফর্ম আর তার পাশে নোটিস, আট টনের এক গ্রামও বেশি ওজন নিয়ে ব্রিজে উঠলে ধ্বংস অনিবার্য।

একটা ট্রাক এসে ওজনদাঁড়িটার ওপর দাঁড়াল। যন্ত্রের ডিসপ্লে দেখাল ওজন ঠিক ৮০০০ কিলোগ্রাম। ট্রাকটা সাবধানে ব্রিজ পাড় হবার জন্য রওনা দিল। ব্রিজের ঠিক মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছে ট্রাকটা ঠিক তখন কোত্থেকে একটা চিল উড়ে এসে তার মাথায় বসল। কিন্তু ব্রিজটা ভাঙল না। কেন?

পঞ্চম ধাঁধাঃ

বন্দুকবাজঃ(বন্দুকের সেফটি ক্যাচ খুলতে খুলতে) দেখ, আমি টুপিটা ঝোলাবো। তারপর চোখ বেঁধে দিবি। তারপর আমাকে কাঁধে তুলে দশ মিনিট এলোমেলো ঘুরবি। তারপর যেখানে নামাবি, যে অবস্থায় নামাবি আমি একটা গুলি ছুঁড়ে টুপিটা ফুঁড়ে দেব।

বন্ধুঃ অসম্ভব।

বন্দুকবাজঃ চ্যালেঞ্জ?

বন্দুকবাজঃ চ্যালেঞ্জ।

বন্দুকবাজ চ্যালেঞ্জে জিতে গিয়েছিল। কীভাবে?

ষষ্ঠ ধাঁধা।

চারজন লোক একটা ব্রিজের কাছে এসে দাঁড়াল মাঝরাতে। ব্রিজে একবারে দুজনের বেশি লোক ওঠা অসম্ভব।তাদের প্রত্যেকের ব্রিজটা পেরোতে যথাক্রমে 1 মিনিট 2 মিনিট ৫ মিনিট আর ১০ মিনিট লাগে। সবচাইতে কম কত সময়ে তারা চারজন ব্রিজটা পেরোতে পারবে?

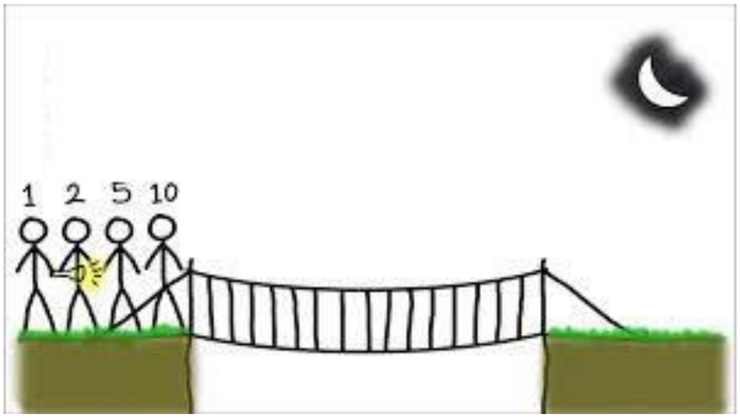

ডুডলঃ

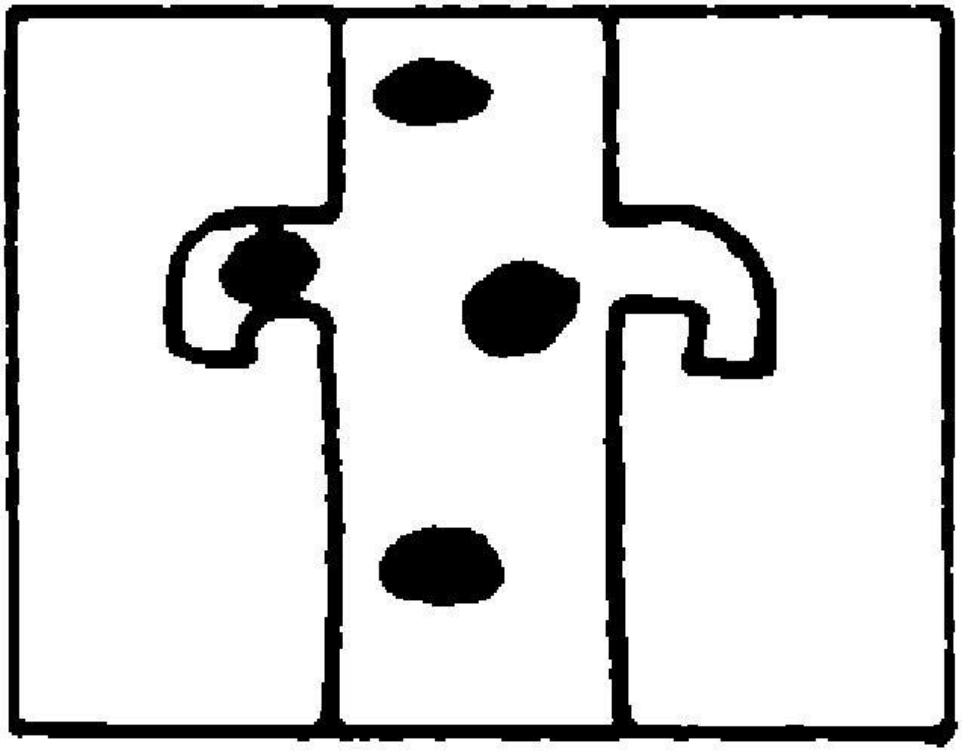

কীসের ফটোঃ

সুদোকুঃ

					1	2	3	
1	2	3			8		4	
8		4			7	6	5	
7	6	5						
						1	2	3
	1	2	3			8		4
	8		4			7	6	5
	7	6	5					

আগের সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

ধাঁধাঃ

প্রথম ধাঁধাঃ

পাঁচ লিটারের জগ ভরে জল তোলো। তার থেকে তিন লিটারের জগ ভরে জল ঢাল। তাহলে রইল উ লিটার। এবার তিন লিটারের জগ খালি করে দাও। তাতে ওই দু লিটার জল ঢেলে রাখ। তাতে তাহলে খালি রইল এক লিটার জলের জায়গা। ফের পাঁচ লিটারের জগ ভরে জল তোল। ওর থেকে তিন লিটারের জগের খালি অংশ ভরেজল ঢাল(তার মানে এক লিটার জল ঢালা হবে) তাহলে পাঁচ লিটারের জগে বাকি রইল চার লিটার।

দ্বিতীয় ধাঁধাঃ ৩১ ডিসেম্বর। কথাটা বলা হচ্ছে কোন একটা সালের পয়লা জানুয়ারি। তার মানে গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর তার বয়স চলছিল ২৫। ৩১ ডিসেম্বর তার বয়স হয়েছে ২৬। এই সালের ৩১ ডিসেম্বর তার বয়স ২৭ হবে। পরের সালের জন্মদিনে তার আঠাশ বছর বয়স হবে।

তৃতীয় ধাঁধাঃ দশমিক

চতুর্থ ধাঁধাঃ

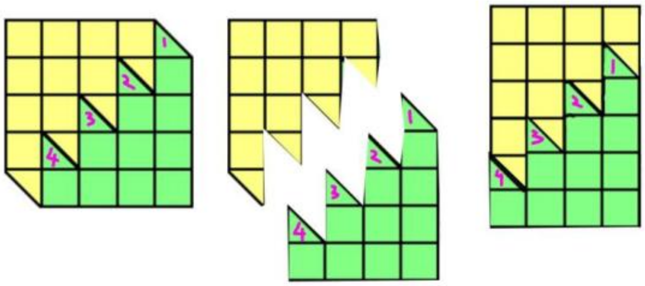

পঞ্চম ধাঁধাঃ বলা আছে হয় তিনটেই মিথ্যে নয় একটা সত্যি। সোনার বাক্স আর সিসের বাক্সের লেখা একে অন্যের উলটো। অতএব দুটো একসঙ্গে মিথ্যে হবে না। তার মানে এক আর তিনের মধ্যে একটা সত্যি। তার মানে বাকিদুটো মিথ্যে। তার মানে দুই মিথ্যে। তার মানে দু নম্বর বাক্সে (রূপোর বাক্সে) আংটি আছে।

ষষ্ঠ ধাঁধাঃ

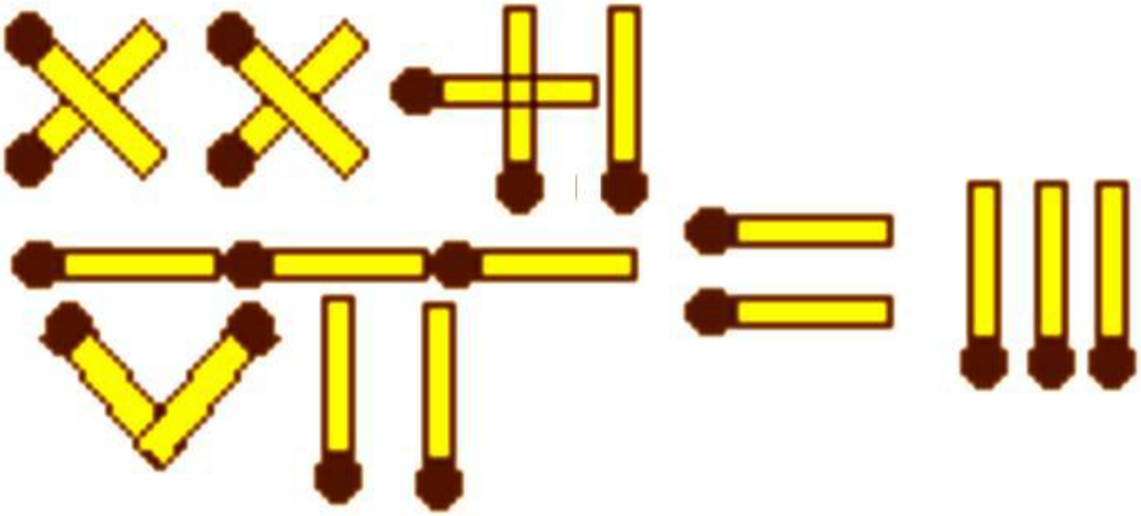

ধাঁধাছবিঃ
ড্রুড্‌ল্- সুমো টি শার্ট পরেছে।
ফোটোঃগ্রাফি   এই লিংকে দেখঃ
https://i.imgur.com/LPX9obl.webm

সুদোকুঃ

1	5	4	8	7	3	2	9	6
3	8	6	5	9	2	7	1	4
7	2	9	6	4	1	8	3	5
8	6	3	7	2	5	1	4	9
9	7	5	3	1	4	6	2	8
4	1	2	9	6	8	3	5	7
6	3	1	4	5	7	9	8	2
5	9	8	2	3	6	4	7	1
2	4	7	1	8	9	5	6	3

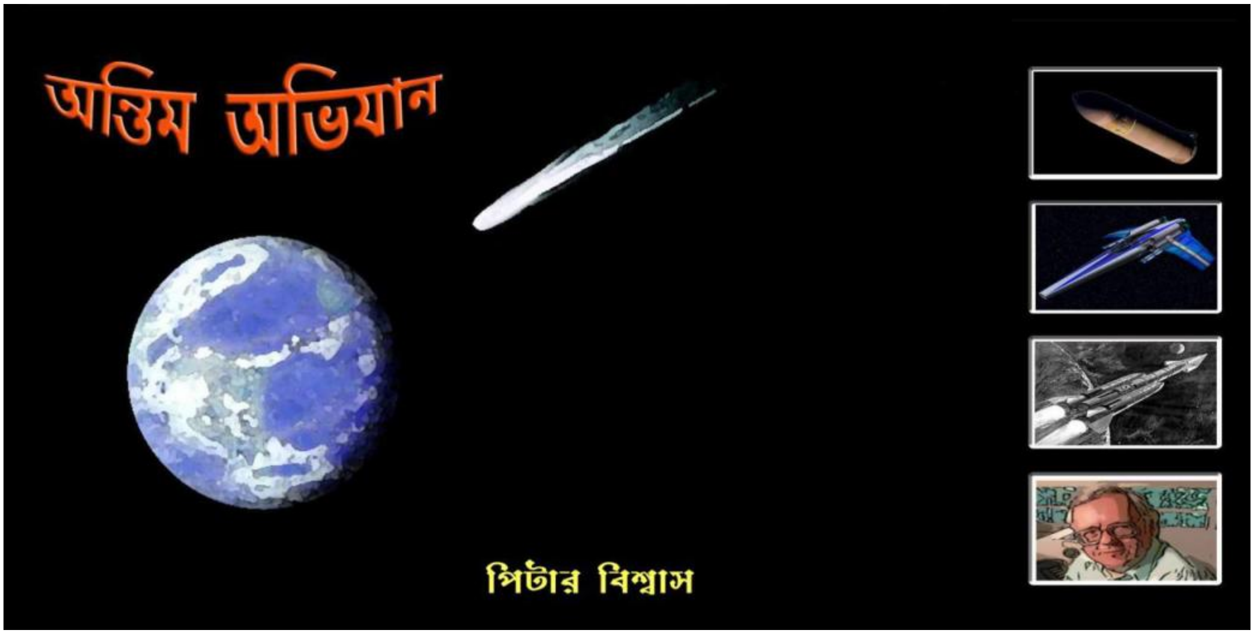

তাদের সামনের পর্দায় তখন একটা ছোটো বিন্দু এগিয়ে চলেছে পর্দার বাঁদিকের কোণের দিকে। তাকে ঘিরে ছড়িয়ে থাকা ম্যাপটায় প্রতিমুহূর্তে তার পেরিয়ে যাওয়া ল্যান্ডমার্কগুলোর নাম ফুটে উঠছিল। না, অন্য কোথাও নয়। নিজের ঘরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। কাছাকাছি অন্য কোন মানুষ নেই। ওর রুমমেটের আইডেন্টিফিকেশন চিপের উপস্থিতি টের পাচ্ছিল শুধু তার গলার কাছে অলক্ষ্যে আটকে দেয়া আণুবীক্ষণিক বিকনটা। পর্দায় রুমমেটের পরিচয়ও ভেসে উঠছে তখন। সেদিকে চোখ রেখে গ্রোভার মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, "এখন থেকে কয়েকটা দিন ও যেখানে যার সঙ্গে যোগাযোগ করবে তাদের সবার খবর আমার চাই। যদি ওকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে কেউ ব্যবহার করতে চায়, অথবা ও যদি নিজেই—"

"দ্বিতীয় সম্ভাবনাটার বিষয়ে তুমি বোধ হয় খুব সিরিয়াস নও গ্রোভার, তাই না?"

"সে সম্ভাবনা কম। কা পোন চি-র সন্তান-"

হঠাৎ মৃদু হাসলেন জালাল, "একটা আকর্ষণীয় জিনিস দেখবে?" বলতেবলতেই তাঁর ইশারায় পর্দায় পাশাপাশি দুটো আঁকাবাঁকা দাগের ছবি ভেসে উঠেছে।

"চেন?"

"আমার সময় নষ্ট কোরো না জালাল। স্কুলস্তরের বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর করবার জন্য আমরা এখানে আসিনি। দুটো ডি এন এ তন্তুর ছবি—"

"সময় নষ্ট নয় গ্রোভার। আমাদের সঙ্গে ব্যাবসা করে এমন প্রতিটি পার্থিবের জেনেটিক পরিচয়ের ডেটাবেস আমাদের কাছে রয়েছে তা তুমি জান। ক্রিসকে অজ্ঞান করবার জন্য ব্যবহার করা ছুঁচটাতে তার ডি এন এ-র সামান্য নমুনা রয়েছে। তার আইডেনটিফিকেশন চিপ থেকে তার পিতৃপরিচয় পাবার পর ডেটাবেস থেকে কা পোন চি-র ডিএন এ সংক্রান্ত তথ্য ডাউনলোড করেছি আমি। পাশাপাশি তাদের দুজনের ডি এন এ-র ছবি দেখছ তুমি মনিটরে।"

"কিন্তু তা থেকে—"

"ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবার পথে দুটোকে গণকযন্ত্রে তুলনা করে দেখেছি আমি খানিক আগে। এই হল তার ফলাফল—

পর্দায় ছবিদুটো মিলিয়ে গিয়ে একটা লাইন শুধু ভেসে উঠেছে সেখানে, "নো ম্যাচ ফাউন্ড!!"

"বিশ্বাসঘাতক! এটাজানবার পরেও তুমি ছেলেটাকে ছেড়ে দিলয়ে এলে? তুমি—"

“হাতটা নামাও গ্রোভার,” মৃদু হাসল জালাল।তার গলায় বরফের শীতলতার ছোঁয়া ছিল, “তুমি বড়োমাপের বিজ্ঞানী হলেও স্ট্র্যাটেজির খেলায় তুমি এখনো শিশুই রয়ে গেছ। অ্যাডমিরাল ঠিকই বুঝবেন। একটু অপেক্ষা কর। তাঁর কাছেও এ খবরটা পৌঁছে গেছে এতক্ষণে।”

“তার মানে?”

“শোনো–”

******

“তার মানে?”

গ্রহানুপুঞ্জ বলয়ের কোন গোপন এলাকায় আত্মগোপন করে ভেসে থাকা দুটো অতিকায় যানের প্রথমটির মধ্যেও গ্রোভারের প্রশ্নটাই উচ্চারিত হচ্ছিল সেই মুহূর্তে। জেমস আরিয়ানা খানিকটা অবাক হয়েই তাকিয়েছিলেন পর্দার দিকে। সেখানে জালাল-এর কাছ থেকে সদ্য এসে পৌঁছোন তথ্যস্রোতটার ছবি ফুটে উঠেছে। এটা জানা সত্ত্বেও ছেলেটাকে আরও অনুসন্ধান করবার জন্য ধরে না রেখে ওরা ছেড়ে দিল? এর দায়িত্ব জালালকে নিতে হবে। ওদের ফের একবার ক্যাম্পাসে ঢুকে যে কোন মূল্যে–”

সেদিকে তাকিয়ে লালপিওতের চোখদুটোয় একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠছিল, “শাস্তি নয় জেম্‌স্‌। জালাল একদম সঠিক পদক্ষেপটাই নিয়ে নিয়েছে। হয়ত শুধু এই পদক্ষেপটার জন্যেই আমাদের এতদিনের সাধনা শেষমুহূর্তে এসে ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা কমে আসবে জেম্‌স্‌।”

বলতেবলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করছিলেন লালপিওতে। খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়লেন জেম্‌স্‌ আরিয়ানা, “আমি বুঝতে পারছি না অ্যাডমিরাল। আপনি-”

“বুঝতে পারছ না জেম্‌স্‌? তাহলে শোন। পার্থিব প্রজেক্ট একাগ্নীর কথা তোমার মনে আছে আশা করি!”

“প্রফেসর সত্যব্রত বোস?”

“হ্যাঁ। দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকবার পর উত্তরপূর্ব ভারতের জঙ্গলে আমি তাকে শেষ করেছিলাম। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আমার মেলেনি। পালিয়ে থাকবার সময়টা সে কোন কাজে লাগিয়েছিল?

যেখান থেকে তাকে আমরা ধরি সে জায়গাটা সভ্যতা থেকে বহু দূরে। সেখানে একমাত্র মনুষ্যবসতি বলতে ছিল একটা গুহাবাসী উপজাতিগোষ্ঠী। সেক্ষেত্রে প্রফেসর বোস সেখানে থাকবার সময় তাদের সহায়তা পেয়েছিলেন সেটা ধরে নেয়া যায়। ঘটনাটা ঘটবার পর তারা সে অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ উধাও হয়ে যায়। তাদের গুহা আবাসের মুখ আমরা হাজার চেষ্টাতেও খুঁজে পাইনি। কেন?

প্রফেসর বোস যখন চাঁদ থেকে পালান তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর একটি ছেলে ছিল। বেঁচে থাকলে সে এই ক্রিসের বয়সী হত। তার কোন হদিশ আমরা আর পাইনি। কেন?

আমাদের রসদের পার্থিব সরবরাহকারীদের প্রত্যেকের বিষয়ে যাবতীয় অনুসন্ধান আমরা করি। কা পোন চি-র বিষয়ে অনুসন্ধানে আমরা জেনেছি, সে এই গুহাবাসী সম্প্রদায়েরই একজন বিতাড়িত সদস্য।

এই চারটে প্রশ্নকে একত্র করে দেখ জেম্‌স্‌। আর, তার সঙ্গে জালালের পাঠানো তথ্যটা মিলিয়ে দেখ। কা পোন চি-র তথাকথিত সন্তানের ছবিটা দেখ। সম্পূর্ণ বাঙালি চেহারা। এবার সবক’টা তথ্যকে একত্র মিলিয়ে দেখ জেম্‌স্‌!! জালাল এ পরীক্ষাটা না করলে এ সম্ভাবনাটার দিকে আমাদের নজর কখনই পড়ত না।”

“অথচ জালালের তাকে ছেড়ে দেয়াকে আপনি সমর্থন করছেন অ্যাডমিরাল। আমার পরামর্শ, ছেলেটাকে ফের ধরে এনে–”

মৃদু হাসলেন লালপিওতে, “কোন লাভ হবে না জেম্‌স্‌। গ্রোভার এবং জালাল, আমার সেরা দুজন কাউন্সিলর ওকে জেরা করেছে। তাদের দক্ষতায় আমার বিশ্বাস আছে। সত্যকে আড়াল করতে গেলে সেটা তাদের চোখে ধরা পড়ত।”

“সেক্ষেত্রে ওকে এখানে এনে-”

“জেমস্,” ক্লান্ত গলায় বললেন অ্যাডমিরাল লালপিওতে, “তুমি একজন যোদ্ধার মত কথা বলছ। কেন বুঝতে পারছ না, ছেলেটা নিজেকে কা পোন চি-র সন্তান হিসেবে বিশ্বাস করে। ওকে ধরে এনে আমাদের কোন লাভ হবে না। অথচ, কিছু একটা রহস্য আছে এর মধ্যে। সেটা আমার সামনেই আছে। ছুঁতে পারছি না কেবল। প্রফেসর সত্যব্রত বোসের ছেলের সঠিক সময়ে এভাবে ফিরে আসা–তার কমিউনিকেটর থেকে তার অজান্তে আমাদের প্রোগ্রামকে ধরবার ম্যালওয়ার চালু হওয়া, এর পেছনে কোন একটা পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে আছে।

“ছেলেটা কোন জটিল খেলার বোড়ে জেম্স্। এটুকু এতক্ষণে আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ। খেলাটা কী আমরা তা জানি না। তবে এইটুকু জানি, দশটা বছর ওই অজানা পাহাড়ের আশ্রয়ে সত্যব্রত বোস চুপচাপ বসে থাকেননি। এই মানুষটাই সব জানতেন। একমাত্র এই মানুষটার হাতেই পৃথিবীর অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের প্রতিষেধক ছিল। বুকের মধ্যে এই একটামাত্র দুশ্চিন্তা লুকিয়ে নিয়ে এতগুলো বছর আমি চলেছি। আজ ভাগ্য হঠাৎ করেই একটা নতুন সুতো আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে।

“কী করে রেখে গেছেন প্রফেসর বোস ওই পাহাড়ের বুকে তা জানবার জন্য এই ছেলেটা হয়ত আমাদের একমাত্র সূত্র। কিছু একটা পরিকল্পনা তাঁর নিঃসন্দেহে ছিল। এ ছেলেটা হয়ত নিজের অজ্ঞাতে সে পরিকল্পনার কোন অংশ। একে খাঁচায় ভরে রাখলে শেয়ালের গর্তের সন্ধান পাওয়া যাবে না।

“সমস্ত পার্থিব এজেন্টদের খবর দাও। আজ থেকে প্রত্যেকটা মুহূর্ত এর প্রতিটা গতিবিধিকে অনুসরণ করে চলবে তারা। এই মুহূর্ত থেকে তাদের আর সমস্ত অপারেশান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হল। আমাদের হাতে সময় বড্ডো কম জেম্স্। বড্ডো কম। আজ তেইশ আগস্ট ২১২৫। সংঘাতমুহূর্ত ১৪ আগস্ট ২১২৬ মাঝরাত। একটা বছরও আর বাকি নেই। ”

জেম্স্ আরিয়ানা মাথা নাড়লেন একবার, “একেবারেই সামরিক প্রশাসকের মত কথা বললে লালপিওতে। উপনিবেশের সাধারণ প্রশাসন আমাকে চালাতে হয়। খাদ্য ট্যাবলেট থেকে পাওয়ার স্টেশনের জ্বালানি, এই প্রত্যেকটা জিনিসের অন্য আমরা–”

“তার আর বেশিদিন প্রয়োজন হবে না জেম্স্,” মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন লালপিওতে, “সুইফ্‌ট্ টাট্‌ল-এর গতিপথের খবর পার্থিব সরকার জানবার পর বুদ্ধের ডেটাবেস থেকে মঙ্গল উপনিবেশের সঙ্গে গোটা বিষয়টার সম্পর্কের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া কেবল খানিকটা সময়ের ব্যাপার। সেটা আমার হিসেবের মধ্যে রয়েছে। মঙ্গল উপনিবেশ আমাদের হাতছাড়া হবে। নিজে ধ্বংস হবার আগে পর্যন্ত পার্থিব সরকারই তার সব দায়িত্ব নেবে। সুন্দর হিসাব, তাই না?”

****

“সাড়ে আঠাশ ডিগ্রি উত্তর–পঁচানব্বই ডিগ্রি পূর্ব–” বেলুনটা ধীরে ধীরে নেমে আসছিল গুহাটার মুখের কাছে--

একটা সরু অন্ধকার পথ–তার একপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া অন্ধকার পাতালনদীটার জল ছলছল শব্দ তুলছিল। তার সামনে অন্ধকার মেঝের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে–ওটা কী? ওর পরিচয় সে জানে–এ–একাঘ্নী--

--ঘন্টি বেজে উঠেছে–বিপদজ্ঞাপক ঘন্টা–প্রক্সিমিটি সেনসর সাক্ষাত মৃত্যুর উপস্থিতি টের পেয়ে মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে হঠাৎ। গুহার নৈঃশব্দ খানখান হয়ে যাচ্ছিল সেই শব্দে– তাকে ঘিরে গমগম করে উঠছিল একটা গলা–জিষ্ণু--

“ক্রিস–”

চমকে উঠে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল সে। ধীরেন্দ্র বাজপেয়ীর কঠোর মুখটা একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

“আমরা অপেক্ষা করছি। গত এক বছরে তুমি তোমার কাজে-”

আস্তে আস্তে কমপিউটার কনসোলের মধ্যে তার ডেটা চিপটা গুঁজে দিল ক্রিস্টোফার। পর্দায় ফুটে উঠতে থাকা সৌরজগতের স্কেমাটিকটার দিকে তাকিয়ে ডঃ বাজপেয়ী কিছু বলে উঠতে গিয়েছিলেন। তাঁকে ইশারায় থামতে বলল সে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, “যে গবেষণার জন্য আমার এখানে সুযোগ পাওয়া, গত এক বছরে আমি তার সামান্যই করে উঠতে পেরেছি স্যার। তবে সে নিয়ে বলবার আগে--”

টেবিলে অপেক্ষায় থাকা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল একটা। ডঃ বাজপেয়ীর হতবুদ্ধি মুখটা ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছিল। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়েও ফের বসে পড়তে হল তাঁকে। পর্দায় ফুটে উঠতে থাকা লাল আর নীল দুটো দাগের দিকে দেখিয়ে ক্রিস তখন বলে চলেছে, “এটা পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রশ্ন স্যার। আমাকে ঠিক দশ মিনিট সময় দিন আপনারা---”

গ্রাফিক্স্ঃ ইন্দ্রশেখর

তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তবে এর আগে জাদুকর মাহমুদের সাথে একবার দেখা করতে হবে তুরণ পাহড়ে। জাদুকর মাহমুদ আমাদের অপেক্ষায় আছেন সেখানে। আর তার সাথে আছে তার পোষা জাদুর হীরামন পাখি।"

তোবারক আলী রথে উঠে ঈগলের লাগাম হাতে নিয়ে তাগাদা দিলেন, "উঠে এসো, উঠে এসো।"

রাতুল এবং আকাশ মোচওয়ালা হাতিকে বিদায় জানাচ্ছিল। ঠিক তখন আরেকটি মোচওয়ালা হাতি এসে খবর দিল হাতিপাড়ায় কালো জাদুকর কোবিলাইয়ের গুন্ডাবাহিনী গন্ডারলীগ হামলা করেছে। এই গন্ডারদের দলকে নাম দেয়া হয়েছে গন্ডারলীগ। এরা দুধর্ষ এবং ভয়ানক। কিন্তু এর আগে কখনো হাতিপাড়ায় আক্রমণ করে নি। হাতিদেরও শক্তিমত্তা কম না। সুতরাং, প্রবল প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। হাতিপাড়ায় আক্রমণের খবর শুনে মোচওয়ালা হাতি রাতুলদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছুটল হাতিপাড়ায় দিকে। রাতুলরা উঠে পড়ল তোবারক আলীর ঈগলটানা রথে। তোবারক আলী লাগাম টানতেই ঈগলগুলো রথ নিয়ে ছুটল তুরণ পাহাড়ের দিকে।

কয়েকটি নীল রঙের পাহাড় এবং উজ্জ্বল গোলাপী রঙের হ্রদ পেরিয়ে রথ চলতে শুরু করল। আকাশের রঙ তখন হালকা বাদামী এবং নীলের মিশেলে অদ্ভুত এক রঙ ধারণ করে আছে।

তোবারক আলী রথ চালনা করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এই কোবিলাই সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছ?'

রাতুল বলল, "শুধু জেনেছি সে কালো জাদুকর এবং ভয়ংকর।"

তোবারক আলী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বেশ কসরত করে লাগাম টেনে রথকে নির্দিষ্ট কোণে ঘুরিয়ে নিতে নিতে বললেন, "তা ঠিক আছে। কোবিলাই এর মত ভয়ংকর আর কিছু আছে আমি ভাবতে পারি না। তবে তার সম্পর্কে আরো কিছু জানা উচিত তোমাদের। যেমন সে কে, কেমন করে জাদু রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হতে যাচ্ছে এসব।"

তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন কোবিলাই এর কাহিনী। সে কাহিনী তার ভাষাতেই হুবহু তুলে ধরা হলঃ

নিকোলাই এর পিতা সম্রাট আজানিস এর ছিল দুই পুত্র। নিকোলাই এবং কোবিলাই। নিকোলাই সাধারণ জাদুবিদ্যায় শিক্ষিত হলেন। তিনি ছিলেন বেশ সুঠাম দেহের অধিকারী। তার কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়ানো চুল। মুখভর্তি দাঁড়ি, নীল চোখ এবং উজ্জ্বল শ্যামলা গাত্রবর্ন যেন তার ব্যক্তিত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করত। তার গলার স্বর ছিল কিছুটা গম্ভীর।

আর কোবিলাই ছিল অপেক্ষাকৃত খাটো। সে কালো জাদুকর ইজাকার সান্নিধ্য পেয়ে হয়ে গেল প্রচন্ড ক্ষমতালোভী। কালো জাদুকর ইজাকা ছিল সম্রাট আজানিসের একজন জাদুকর। জাদু রাজ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কালো জাদুরও দরকার পড়ত। সেই ইজাকার কাছ থেকে কালো জাদু শিখতে লাগল কোবিলাই।

সাধারণত জাদু রাজ্যে সামান্য কিছু লোক ছাড়া কালো জাদুর চর্চা সবাই করতে পারত না। তাই কোবিলাই লুকিয়ে ইজাকার কাছ থেকে কালো জাদু শিখছিল। আর ইজাকারও সম্রাট আজানিসকে বেশ পছন্দ ছিল না। তাই সে আজানিসের পুত্র কোবিলাইকে কালো জাদু শিখিয়ে তৈরী করতে লাগল। তার ইচ্ছা ছিল কোবিলাইকে কালো জাদুশক্তির বলে ক্ষমতায় বসাবে। তারপর সে নিজেই হয়ে যাবে জাদু রাজ্যের সর্বময় কর্তা। তখন পুরো জাদু রাজ্যে বিস্তার ঘটাবে কালো জাদুর।

এখানে উল্লেখ্য যে কালো জাদুকররা শয়তানের কাছে সাহায্য চায় বলে জাদু রাজ্যে কালো জাদু ছিল ঘৃণ্য। কোবিলাই কালো জাদু শিখতে শিখতে নিজের মুখ বিকৃত করে ফেলল। কালো জাদুর প্রভাবে কালো জাদুকরদের মুখ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকৃত হয়ে যায়। কোবিলাই এর একটা চোখের যায়গায় কালো গর্ত হয়ে গিয়েছিল। এরপরেই জানাজানি হয়ে যায় সে কালো জাদুর সাথে যুক্ত।

সম্রাট আজানিস প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি কোবিলাইকে ডেকে পাঠালেন।

ইজাকা তখন কোবিলাইকে গিয়ে বলল, “তোমার বাবা নিশ্চয়ই তোমাকে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দেবেন। তুমি বঞ্চিত হবে সিংহাসন থেকে। তাই আমি বলি, বিষ খাইয়ে সম্রাট আজানিসকে মেরে ফেল। অতঃপর নিকোলাইকে বন্দী করে তুমি হবে সম্রাট।”

কোবিলাই তখন ভয় পেয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করল, “কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? অনেক বড় বড় জাদুকর আছেন রাজপ্রাসাদে। তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে রাজাকে বিষ দেয়া তো অসম্ভব!”

ইজাকা বলল, “সম্ভব করার দায়িত্ব আমার। আমি জাদুবলে কিছুক্ষণের জন্য সবাইকে মোহগ্রস্ত করে রাখতে পারব। সেই সুযোগে তুমি জাদুর সাহায্যে লুকিয়ে সাথে নিয়ে যাবে বিষের কৌটা। তারপর ঢেলে দিবে রাজার পানপাত্রে।”

তারপর সেই দিন এল। ইজাকা শয়তান লুসিফারের কাছ থেকে চেয়ে নিল তীব্র কিছু বিষ। সে রাজপ্রাসাদের সবাইকে তার জাদুমন্ত্রবলে সামান্য সময়ের জন্য মোহগ্রস্ত করে রাখল।

প্ল্যানমত প্রাসাদে ঢুকল কোবিলাই। রাজার পানপাত্রে সে বিষ মিশিয়ে দিতে পেরেছিল।

রাজপ্রাসাদে তখন সবাই জাদুমানব হলেও মাত্র একজন ছিলেন পৃথিবীর মানুষ। তিনি হলেন জাদুকর মাহমুদ। নিকোলাই এর প্রিয় বন্ধু। অদ্ভুত উপায়ে তিনি ছোটবেলা থেকে জাদু রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছিলেন। জাদুতে তার দখল ছিল অনেক। মহান জাদু দেবতা শিয়াংহোর কাছ থেকে তিনি উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন প্রচন্ড ক্ষমতাধর এক হীরামন পাখি। সে পাখিটাও সেদিন তার সাথে ছিল।

ইজাকার মন্ত্রে পাখিটা মোহগ্রস্ত হয়নি। জাদুর হীরামন পাখির উপর কোন ধরণের জাদুই কাজ করে না। পাখিটা সমস্ত ঘটনা বুঝে ফেলল। জাদুকর মাহমুদের উপর কালো জাদুর মায়া কাটিয়ে দিল পাখিটি। জাদুকর মাহমুদ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে হীরামন পাখির কাছ থেকে সব শুনলেন। তিনি বুঝতে পারলেন রাজার বিপদ আসন্ন। তাই খুব দ্রুত তিনি তার বন্ধু এবং রাজপুত্র নিকোলাই এর উপর প্রযুক্ত ইজাকার জাদু মায়াজাল কাটালেন। নিকোলাই কালো জাদুর মোহগ্রস্থতা থেকে বের হয়ে বন্ধু মাহমুদের কাছ থেকে পিতা আজানিসের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে অবহিত হলেন।

তিনি বন্ধুকে বললেন, “বন্ধু, তুমি রাজপ্রাসাদের অন্য জাদুকরদের উপর ইজাকার জাদুর প্রভাব নষ্ট করে দাও। আর আমি রাজার কক্ষে গিয়ে তাকে রক্ষা করছি।”

কালো জাদুর প্রভাবান্বিত হয়ে রাজা আজানিস হয়ত বিষ দেয়া পানীয় খেয়েই ফেলতেন। কিন্তু তার আগে গিয়ে উপস্থিত হন নিকোলাই। তিনি রাজাকে পানীয় পান থেকে বিরত রাখেন।

রাজপ্রাসাদের অন্য জাদুকরদের উপর থেকে ইজাকার প্রভাব একে একে দূর করে দিচ্ছিলেন জাদুকর মাহমুদ এবং তার হীরামন পাখি। প্রভাবমুক্ত হয়ে এসব জাদুকররা ইজাকার ষড়যন্ত্র বুঝতে পারলেন। তাদের কালো জাদু দিয়ে মোহগ্রস্থ করে রাখার মত দূঃসাহস দেখে অবাক হয়ে গেলেন তারা। এ যেন কল্পনাও করা যায় না। এমনকী স্বয়ং রাজা আজানিসকে কালো জাদু দিয়ে মোহগ্রস্থ করা হয়েছে!

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। ইজাকাকে একটি খয়েরী কাচের বোতলে বন্দী করে সাথে সাথে গভীরতম অন্ধকার কুয়ায় নিঃক্ষেপ করলেন রাজপ্রাসাদের প্রধান জাদুকর। আর কোবিলাইকে রাসপ্রাসাদ থেকে চিরতরে বহিঃষ্কার করেছিলেন রাজা আজানিস।

রাজাদের পুত্র হত্যা করতে নেই বলে তিনি তাকে মৃত্যুদন্ড দিতে পারেননি।

এর কিছুদিন পর বৃদ্ধ রাজা আজানিস নিকোলাইকে জাদু রাজ্যের সম্রাট বানিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করেন। তার বয়স হয়েছিল কয়েকশ বছর। এরপর নিকোলাই সম্রাট হয়ে অনেকদিন জাদু রাজ্য পরিচালনা করেন। সেসময় কোবিলাই অজ্ঞাতে থেকে কালো জাদুর জগতে আরো শক্তিশালী হতে থাকে।

তারপর একদিন হঠাৎ সে আবির্ভূত হয় রাজপ্রাসাদে। রাজপ্রাসাদের সব জাদুকরদের কব্জা করে হত্যা করে তার ভাই কোবিলাইকে। কোবিলাই এর পুত্র হারিরিকেও হত্যা করত। কিন্তু হারিরিকে নিয়ে পালিয়ে যান কোবিলাই এর এক বিশ্বস্ত জাদুকর সহচর। তার বন্ধু মাহমুদ তখন তুরণ পাহাড়ে জাদুবিদ্যার স্কুল খুলে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি রাজার বিপদ শুনে চলে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার আগেই পুরো তুরণ পাহাড়কে বন্দিশালায় পরিণত করে দিয়েছিল কোবিলাই। তিনি সেখান থেকে বেরোতে পারলেন না।

রাজা নিকোলাই এর বিশ্বস্ত সেই সহচর তার পুত্র হারিরিকে বাঁচাতে নিয়ে গেলেন পৃথিবীতে। এক জায়গা থেকে আরেকজায়গায় ঘুরলেন। শেষ পর্যন্ত হারিরির তোমাদের সাথে দেখা হল। অবশ্য সে দেখা হবার পিছনেও কারণ ছিল। জাদু রাজ্যের ভাগ্য মন্দিরের দেবতা ভবিষ্যতবানী করেছিলেন হারিরিকে উদ্ধার অভিযানে তোমরা দুজন অংশগ্রহণ করবে। অর্থাৎ নিজের অজান্তেই হারিরি এবং তোমাদের ভাগ্য একসাথে জড়িয়ে গেছে। এই উদ্ধার অভিযানের ফল কী হবে, হারিরিকে উদ্ধার করা যাবে কি যাবে না তা স্পষ্ট করে বলেন নি জাদুরাজ্যের ভাগ্যদেবতা। তবে কালো জাদুকর কোবিলাই যাতে জাদু রাজ্যের সব ক্ষমতার অধিকারী হতে না পারে এটা জাদু রাজ্যের প্রায় সবাই চায়। সে প্রচন্ড ক্ষমতালোভী ও নৃশংস। ফলে সে জাদু রাজ্যের সম্রাট হলে জাদুর জগত এবং পৃথিবীর মানুষের জগতের জন্য ডেকে নিয়ে আসবে অমঙ্গল।

কোবিলাই সম্পর্কে বলা শেষ করলেন তোবারক আলী। শেষ হলে রাতুল জিজ্ঞেস করল, “আমরা কীভাবে এই শক্তিশালী কোবিলাই এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব?”

তোবারক আলী গম্ভীর হয়ে বললেন, “তা আমিও জানিনা সঠিক।আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি ভাগ্য দ্বারা। তুরন পাহাড়ে জাদুকর মাহমুদ এর কাছ থেকে হয়ত কিছু জানা যাবে।”

আকাশ জিজ্ঞেস করল, “কিন্তু তিনি তো বন্দী?”

তোবারক আলী বললেন, “বন্দী বলতে তিনি ঐ পাহাড় থেকে বের হতে পারেন না। কিন্তু তার জাদুর স্কুল এখনো আছে। ছাত্ররা সেখানে জাদু শেখে। তার সাথে তার হীরামন পাখিটাও আছে। তার নিজের জাদুক্ষমতাও অনেক। আশা করছি তিনি হারিরিকে উদ্ধারের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবেন।”

রথ উড়ে চলল। ভয়ংকর সুন্দর জাদুরাজ্যের উপর দিয়ে তুরন পাহাড়ের দিকে। হালকা বাতাসের ভেতর দিয়ে, বিচিত্র ধরনের প্রানী এবং উড়ন্ত যানবাহন পেছনে ফেলে। কয়েকটি বিশালাকার ইঁদুরমুখো বাজপাখি রথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটি বিরাট তেলরঙা ভাল্লুককে। ভাল্লুকের নাকটা আবার খুব লম্বা। সে রথের পাশে পাশেই আরেকটি বিরাটাকার চড়ুই পাখির পিঠে চেপে উড়ে যাচ্ছে হলুদ রঙের প্রায় সাড়ে ছ’ফুট উচ্চতার এক তেলাপোকা। রাতুল এবং আকাশ অবাক হয়ে দেখছিল এসব আর রথ এগিয়ে যাচ্ছিল তুরন পাহাড়ের দিকে।

অধ্যায় তেরো

তুরন পাহাড় একটি বিরাট পাহাড়। পাহাড়ের গা ছোট ছোট সবুজ ঘাসে আবৃত। ঠিক যেন ছবির মত সুন্দর। পাহাড়ের বিভিন্ন গুহায় জাদু রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে জাদু শেখার জন্য ছাত্ররা এসে থাকে। তাদের জাদু শেখান জাদুকর মাহমুদ। তিনি পাহাড়ের প্রায় মধ্যেখানের একটি গভীর গুহায় জাদুবিদ্যার বিভিন্ন নিগুঢ় তথ্য নিয়ে চিন্তায় থাকেন প্রায়ই। কোবিলাই এর কালো জাদুর প্রভাবে তিনি এই পাহাড়ের বাইরে যেতে পারেন না। তার পোষা হীরামন পাখিটি আছে তার সঙ্গে।

তোবারক আলী জাদুকর মাহমুদের গুহার সামনে গিয়ে রথ থামিয়ে বললেন, ‘এটাই জাদুকর মাহমুদের গুহা। আমার সাথে তার যোগাযোগ হয়েছিল তার পোষা হীরামন পাখির মাধ্যমে। চলো, আমরা এর ভেতরে যাবো।”

তিনি রথ থেকে নেমে হেটে গুহায় প্রবেশ করলেন। তার পিছু পিছু গেল রাতুল এবং আকাশ। কিছুদূর যাওয়ার পর রাতুল দেখতে পেল একজন মধ্যবয়স্ক লোক কয়েকটি কাছিমকে কী যেন বুঝাচ্ছেন। কাছিমগুলোর ঠ্যাঙ মাত্র দুইটি এবং সেগুলো বকের ঠ্যাঙের মত লম্বা।

তারা যাওয়াতে তিনি তাদের দিকে ফিরে তাকালেন। তার মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

তোবারক আলী হাসিমুখে বললেন, “কেমন আছেন মাহমুদ সাহেব? এই দেখেন আমি কাদের নিয়ে এসেছি?”

জাদুকর মাহমুদ রাতুল এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বাহ! বেশ তো! তোমরা দেখছি এসে গেছ। আকাশ, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ?”

আকাশ কিছু বলার আগেই তিনি এগিয়ে আসলেন। তারপর আকাশের সামনে হাটুগেড়ে বসে বললেন, “আমি তোমার বাবা। এখানে বন্দি হয়ে যাবার পর তোমাকে আর দেখতে যেতে পারি নি। আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে এই পাহাড়ের পরিবেশে।”

আকাশ তার বাবাকে চিনতে পেরেছিল। এতদিন পর সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে বাবাকে দেখার পর তার চোখে জল চলে এল। বাবা প্রত্যেক সন্তানের জন্য ছায়ার মত। বাবা নিরুদ্দেশ হবার পর আকাশ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। সে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরল।

পিতা পুত্রের এই অপূর্ব মিলন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে রাতুলের মন ভালো হয়ে গেল। সে একবার তোবারক আলীর দিকে তাকিয়ে দেখল তিনিও হাসি হাসি মুখ নিয়ে পিতা ও পুত্রকে দেখছেন।

তোবারক আলী আকাশকে লক্ষ করে বললেন, “তোমার বাবা এখানে জাদুকর মাহমুদ নামে পরিচিত। তিনি সম্রাট নিকোলাই এর খুব কাছের লোক ছিলেন। হারিরিকে উদ্ধারে তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন।”

জাদুকর মাহমুদ উঠে দাঁড়িয়ে তোবারক আলীকে বললেন, “হারিরিকে কোথায় রাখা হয়েছে এর কোন হদীস পেলেন?”

তোবারক আলী বললেন, “হ্যাঁ, পেয়েছি। বিন্ধ্রপর্বতেই রেখেছে মনে হল।”

তারপর রাতুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, “রাতুল, ম্যাপটা উনাকে দেখাও তো?”

রাতুল জাদুর বই খুলে ম্যাপটা জাদুকর মাহমুদকে দেখাল। জাদুকর মাহমুদ দেখে বললেন, “হ্যাঁ, বিন্ধ্রপর্বতেই আছে হারিরি। কিন্তু এ তো পর্বতের দক্ষিণ অংশে। অর্থাৎ অগ্নিসমুদ্রের উপর দিয়ে যেতে হবে।”

তোবারক আলী জিজ্ঞেস করলেন, “কিন্তু অগ্নিসমুদ্রের উপর দিয়ে কোন রথ নিয়ে যাওয়া যায় না শুনেছি। আগুনের উত্তাপে নাকী গলে যায়।”

জাদুকর মাহমুদ বললেন, “ঠিক শুনেছেন। অগ্নি সমুদ্রের উপর দিয়ে রথ নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এর উপর দিয়ে যাওয়া যাবে একমাত্র জাদুর গালিচায় চড়ে।”

তোবারক আলী জিজ্ঞেস করলেন, “কোন গালিচার কথা বলছেন? বাদশাহ সুলেমানের জাদুর গালিচা?”

জাদুকর মাহমুদ বললেন, “হ্যাঁ, সেই গালিচাই। এছাড়া যাওয়া যায় কালো জাদু ব্যবহার করে লুসিফারের ভেলায় চড়ে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তো লুসিফারের ভেলায় চড়া অসম্ভব। সুতরাং, এখানে শুধু সুলেমানের জাদুর গালিচাই ভরসা।”

চিন্তিত মুখে তোবারক আলী বললেন, “কিন্তু সে গালিচা তো শুনেছি দহরমপুরে। দুখী দু পেয়ে দৈত্যের প্রাসাদে। তা কীভাবে আনা সম্ভব?”

জাদুকর মাহমুদ বললেন, “সে গালিচা আনতে হলে দুখী দু পেয়ে দৈত্যের প্রাসাদে হানা দিতে হবে। সে যখন প্রাসাদে থাকে না তখন প্রবেশ করে আনতে হবে গালিচা। তবে ঠান্ডার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কারন

দুখী দৈত্যের প্রাসাদ এবং প্রাসাদ সংস্লিষ্ট বাগানে কখনো বসন্ত আসে না। সব সময় সেখানে কনকনে ঠান্ডা বাতাস বয়। প্রায়ই বরফ পড়ে।”

তোবারক আলী বললেন, “কিন্তু তার প্রাসাদটা কোথায়?”

জাদুকর মাহমুদ বললেন, “এখান থেকে বেশ দূরে না। আমরা ছাত্ররা আপনাদের সেখানে পৌছে দিতে পারবে।”

তোবারক আলী বললেন, “তাহলে ডাকুন আপনার ছাত্রদের। নষ্ট করার মত সময় একেবারেই নেই। দেরী হয়ে গেলে কোবিলাই হারিরিকে হত্যা করে জাদু রাজ্যের সম্রাটের শপথ নিয়ে ফেলতে পারে।”

জাদুকর মাহমুদ বললেন, “তা ঠিক বলেছেন। তবে হারিরিকে হত্যা না করা পর্যন্ত জাদু রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী শপথ গ্রহণ হবে না। সুতরাং, রাজপ্রাসাদের জাদুকররা যদি হারিরির মৃত্যুর ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হন তবেই তারা শপথ পড়াবেন।”

মাহমুদ হাততালি দিলেন। তাতে বিশালাকায় তিনটি ডানাওয়ালা খরগোশ এসে হাজির হল।

জাদুকর মাহমুদ বললেন, “এরাই আপনাদের দুখী দৈত্যের প্রাসাদে পৌছে দেবে।”

রাতুল বলল, “দৈত্যটা কি ভয়ংকর?”

জাদুকর মাহমুদ বললেন, “ভয়ংকর বলা যায়। তার মাত্র একটি চোখ এবং সেটি ঠিক কপালের মাঝখানে। মাথায় লম্বা একটি শিং।”

আকাশ জিজ্ঞেস করল, “তাকে দুখী দৈত্য বলা হয় কেন?”

জাদুকর মাহমুদ বললেন, “সে আনন্দ, সুখ, হাসি ইত্যাদি সহ্য পারে না। সে দুঃখ পছন্দ করে। সব কিছু দুখী দেখতে চায়। এজন্যই তার এই নাম।”

তোবারক আলী, রাতুল এবং আকাশ খরগোশ তিনটির পিঠে চেপে বসল। জাদুকর মাহমুদ বললেন, “সাবধানে যাবেন। গালিচা নিয়ে পিছনে ফিরে তাকাবেন না। সোজা ফিরে আসবেন।”

তোবারক আলী ‘ঠিক আছে’ বলে তার খরগোশকে উড়ার নির্দেশ দিলেন। জাদুকর মাহমুদ রাতুল এবং আকাশকেও বললেন, “সাবধানে যাবে। স্যারের কথা শুনে কাজ করবে। ভুল করলেই বিপদ। দুখী দৈত্য ধরতে পারলে পাথরের মূর্তি বানিয়ে রেখে দেবে তার প্রাসাদে।”

রাতুল এবং আকাশের খরগোশটিও উড়ল। তিনটি খরগোশ তুরন পাহাড় থেকে বের হয়ে ছুটল দুখী দৈত্যের প্রাসাদের দিকে। নীল এবং হলুদ রঙের আলো তখন চারিদিকে। খরগোশ তিনটি দুখী দৈত্যের প্রাসাদে আসতে বেশী সময় নিল না। উপর থেকেই দেখা যাচ্ছিল দুখী দৈত্যের প্রাসাদে এবং বাগানে তুষার জমেছে। খরগোশেরা প্রাসাদের সামনে এসে থামল।

একজন খরগোশ বলল, “এর সামনে যাওয়ার অনুমতি নেই আমাদের।”

তোবারক আলী, রাতুল এবং আকাশ নেমে পড়ল। তোবারক আলী চারদিকটা ভালোমত দেখে বললেন, “তোমরা দুজন দুদিকের দেয়াল টপকে বাগানে ঢুকে যাও। আমি প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকছি। দৈত্যের সাথে দেখা হলে বলব গুরুত্বপূর্ন আলাপ করতে এসেছি। সে অল্প বিস্তর আমাকে চেনে হয়ত, পরিচয় দিলে হয়ত চিনবে। সুতরাং, খপ করে ধরে কট করে ঘাড় ভেঙে দেবে না। কথাবার্তা বলতে পারে। আর এই সুযোগে তোমরা ওর প্রাসাদে ঢুকে যাবে। ওর রুমেই আছে বাদশা সুলেমানের জাদুর গালিচা। ব্যাটা গালিচাটি সাথে সাথে রাখে।”

তোবারক আলীর কথামত রাতুল উত্তর দিকের দেয়াল টপকে বাগানে ঢুকল। আকাশ ঢুকল দক্ষিণ দিকের দেয়াল টপকে। বাগানে বিস্তর জমেছে তুষার। গাছপালাগুলো শীতের প্রকোপে প্রায় মরে গেছে যেন। বিশাল বাগানে কোন সাড়াশব্দ নেই। পাখির ডাক নেই। বিরাজ করছে অনন্ত শব্দহীনতা।

রাতুল ঠান্ডায় জমে যাচ্ছিল। কোনক্রমে তুষার পায়ে ঠেলে সে দৈত্যের প্রাসাদের কাছাকাছি গিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রাসাদের দিকে তাকাল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

আর এদিকে প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করেছেন তোবারক আলী। তিনি কিছুটা এগিয়ে অতিথি বসার জন্য ছাউনি ছিল সেখানে গেলেন। তুষারের স্তূপ জমেছিল চেয়ারগুলোর উপর। তোবারক আলী তার পাশে দাঁড়িয়ে বিকট কণ্ঠে শুরু করলেন ছড়া-

বিরাট সে একখান দৈত্যের নানা
যেন তার চোখ নেই, একেবারে কানা
ভাঙা এক প্রাসাদের ঘুণ ধরা কোনে
একা একা শুয়ে বসে, ভুল গান শুনে

যেই তার চোখ উঠে মাঝখানে কপালের
ওমনি সে উঠে পড়ে হাই তুলে সকালের
মেলে বলে তার সেই অতি গোল আঁখি
ওরে বাবা! এত কিছু
দেখা ছিল বাকী!

তার এই অদ্ভুত ছড়া শুনে দৈত্য বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রাতুল গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখল বিরাটাকার দৈত্য থপ থপ পায়ে এগিয়ে চলেছে। মাথায় বিরাট শিং। কপালের ঠিক মাঝখানে বড় গোল চোখ।

দৈত্য কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তোবারক আলী ছড়া বন্ধ করে বললেন, “আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আপনার কাছেই এসেছি। তুরন পাহাড় থেকে।”

দৈত্য ছড়া শুনে কিছুটা রেগে গিয়েছিল। কিন্তু তুরন পাহাড়ের কথা শুনে সে খানিকটা অবাক হল। কারন তুরন পাহাড় যে একটা ভালো জাদু শেখার বিদ্যালয় তা জাদু রাজ্যের সবাই জানে।

দৈত্য জিজ্ঞেস করল, “তুরন পাহাড় থেকে! কেনো?”

রাতুল আর দেরি করল না। সে শুনতে পেল তোবারক আলী বলছেন, “আমার দুটি ছাত্র বুঝলেন, এই জাদু বিদ্যার উপরে বিশেষ পড়ালেখা করছে। তাদের আপনার একটু সাহায্য বড়ই প্রয়োজন……”

আরো কী কী যেন বলছিলেন তোবারক আলী। রাতুল উত্তেজনায় আর সেসব শুনতে পেল না। সে দৈত্যের প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখল বাহিরটা যতটা মনমরা দেখা যায় ভেতরটা তার চেয়ে অনেক বেশি দুখী দুখী দেখতে। তেমন কোন জিনিসই নেই বলতে গেলে। কয়েকটা পান পাত্র মেঝেতে পড়ে আছে। কয়েকটা ভাঙা টব জড়ো করে রাখা আছে এক কোনে।

রাতুল ভেতরের রুমে প্রবেশ করল। এটাই সম্ভবত দৈত্যের রুম। সেখানে একটি খাট ছিল। এবং খাটের একপাশে ভাঁজ করা ঝকঝকে গালিচা। এরকম একটি মনমরা কক্ষে সম্পূর্নরূপে বেমানান। যে কেউ একবার দেখেই বুঝতে পারবে এটা এই প্রাসাদের অন্য সব বস্তু থেকে আলাদা।

রাতুল তাড়াতাড়ি গিয়ে গালিচা হাতে নিল। ঠিক তখনি দৌড়ে প্রবেশ করল আকাশ। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "দৈত্য হেডস্যারের টুঁটি চেপে ধরেছে।"

রাতুল গালিচাটি ব্যাগে ভরে তার পিঠে বাঁধা জাদুর লাঠিটা হাতে নিল। তারপর ব্যাগ কাঁধে চাপিয়ে তড়িৎবেগে বের হয়ে গেল আকাশের সাথে। তারা দুজন দৈত্য এবং তোবারক আলীর কাছে পৌছেল। দৈত্য তখন তোবারক আলীকে গলা চেপে ধরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। তোবারক আলী পা ছুঁড়ছেন বেশুমার।

রাতুল আর দেরি করল না। সে তার হাতের লাঠিটি দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিল শিংওয়ালা দৈত্যের মাথায়। জাদুর লাঠির শক্তি অনেক। এছাড়া সম্পূর্ন অপ্রস্তুত অবস্থায় দৈত্য আঘাত পেয়েছে তার সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গায়। সুতরাং, সে মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

তোবারক আলী কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়ালেন। মাথায় বাড়ি খেয়ে দৈত্যের তখন আর উঠার শক্তি নেই। সে পড়ে আছে। তোবারক আলী কেশে রাতুলকে বললেন, "গালিচা বিছাও মাটিতে।"

রাতুল ব্যাগ থেকে গালিচা বের করে মাটিতে বিছাল। তোবারক আলী এর উপর উঠে বললেন, "হা করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? উঠে পড়ো। দৈত্য জেগে উঠলে রক্ষা নেই।"

রাতুল ও আকাশ গালিচায় উঠে দাঁড়াল। তোবারক আলী বললেন, "যাও গালিচা, তুরন পাহাড়ে যাও।"

বলে তিনি চোখ বন্ধ করে রইলেন। কিন্তু গালিচা নড়ল না।

বিষয় কী! এটা কি ঠিক সুলেমান বাদশাহর গালিচা? নাকী অন্য কিছু!

তোবারক আলী আবার বললেন, "যাও গালিচা, তুরন পাহাড়ে যাও।"

ইতিমধ্যে দৈত্য নড়তে শুরু করেছে। মাথার আঘাত সামলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে মাথা তুলতে চেষ্টা করছে।

তোবারক আলী দৈত্যের নড়াচড়া দেখে আবার খুব তাড়াতাড়ি বললেন, "যাও গালিচা, তুরন পাহাড়ে জাদুকর মাহমুদের কাছে যাও।"

গালিচা নড়ল না এবারও। এদিকে দৈত্য উঠে বসেছে। তার সুলেমান বাদশাহর গালিচা চুরি হয়ে যাচ্ছে দেখে সে গরিলার মত বুক চাপড়ে ভয়ংকর এক হুংকার দিয়ে উঠল। তাতে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়।

তোবারক আলী রাতুলের কাছ থেকে জাদুর লাঠিটা নিয়ে তরবারির মত দোলাতে লাগলেন যাতে দৈত্য এগিয়ে আসতে ভয় পায়। কিন্তু দৈত্যকে দেখে মনে হল না এতে সে সামান্যতম ভয় পেয়েছে। সে আরেকটি মাঝারি সাইজের হুংকার দিয়ে মুখ থেকে অগ্নি গোলক ছুঁড়ে দিল তোবারক আলী এবং রাতুলদের দিকে। তোবারক আলী নিচু হয়ে নিজের মাথা বাঁচালেন।

দৈত্য উঠে দাঁড়াল। তার কাছ থেকে গালিচায় দাঁড়ানো রাতুলদের দূরত্ব হবে মাত্র দশফুটের মত। তিন পা ফেলে দৈত্য এ দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলতে পারে। তবে মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে কিছুটা আস্তে হাটছে। এক পা এগিয়ে এসেই সে আবার ছুঁড়ে দিল আগুনের গোলা। এবার তোবারক আলীর জাদু দন্ডে লেগে তা অর্ধেক পুড়ে গেল।

দৈত্য এগিয়ে এল আরেক পা। এখন দূরত্ব হয়ে গেল পাঁচ ফুটের মত। রাতুলের মাথায় তখন দারুণ এক বুদ্ধি চলে এল। সে খুব দ্রুত তার ব্যাগ খুলে জাদুর বইটা বের করল। জাদুর বই খুলতেই দেখা গেল সেখানে লেখাঃ

“সুলেমান বাদশার গালিচা, যাও”

দৈত্য আরো এক পা চলে এসেছে। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছেন তোবারক আলী। দৈত্য এবার আরেক পা এগুলেই হাত বাড়িয়েই ধরতে পারবে তাদের।

রাতুল তখন বলে উঠল আদেশের সুরে, “সুলেমান বাদশার গালিচা, যাও; তুরন পাহাড়ে যাও।”

গালিচা সাথে সাথেই নড়ে উঠল এবং মুহূর্তের মধ্যে তাদের তিনজনকে নিয়ে উপরে উঠে গেল। গালিচাকে ধরার শেষ চেষ্টা করেছিল দৈত্য হাত বাড়িয়ে। হয়ত সে মাথায় আঘাতটা না পেলে একটু লাফিয়ে ধরে ফেলত। কিন্তু এবার নাগাল পেল না। গালিচা সাঁই সাঁই করে উড়ে চলল তুরন পাহাড়ের দিকে।

ক্রমশ

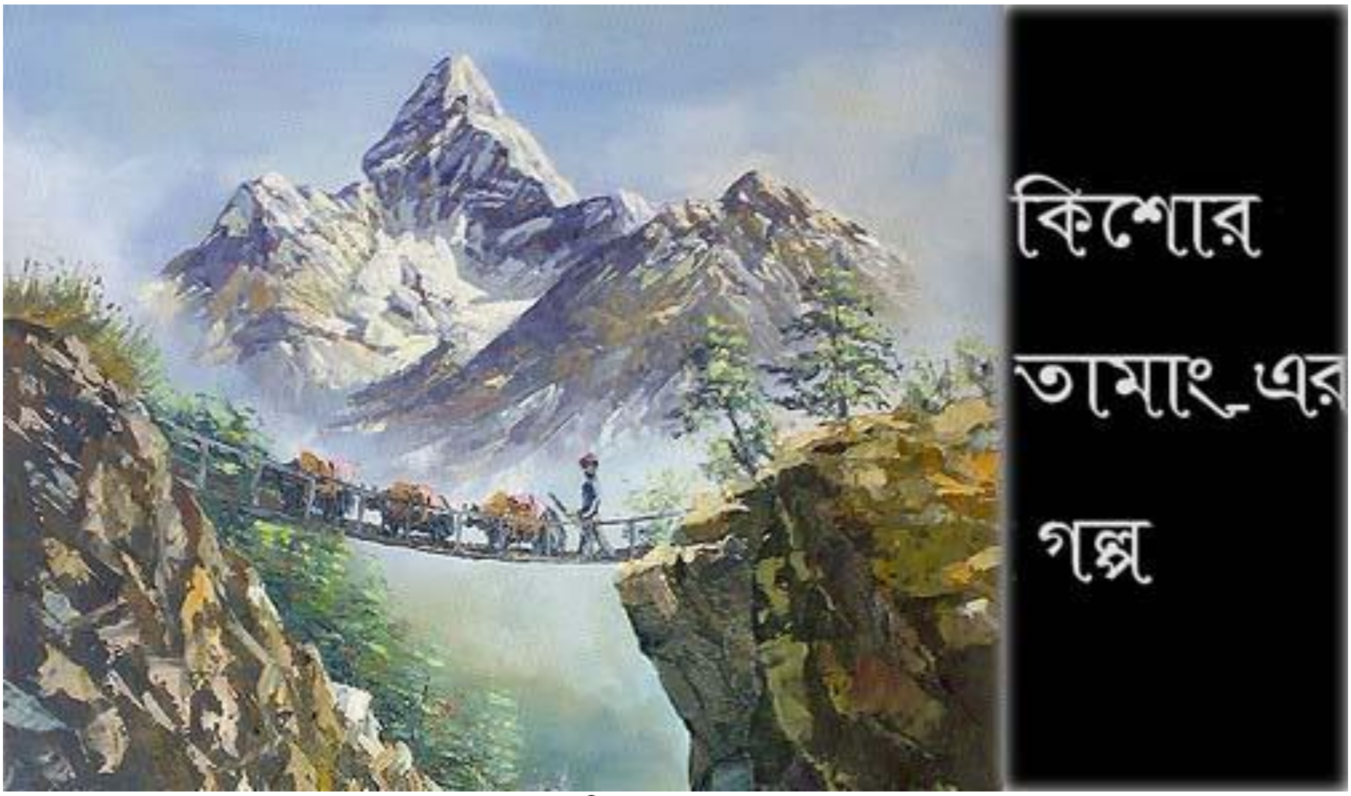

বিশ্বরঞ্জন দত্তগুপ্ত

গল্পটা আমার বড়োমামার মুখ থেকে শোনা। আজ থেকে বহুবছর আগের কথা। বড়োমামা তখন দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং থানার ‘বড়বাবু’। চারদিক সবুজ পাহাড় দিয়ে ঘেরা অপরূপ সৌন্দর্যভরা এই পাহাড়ি ছোটো শহরটি। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে ঝর্না, আর তার পাশ দিয়ে একেবেঁকে চলে গিয়েছে টয়ট্রেনের লাইন। সেই সময় কার্শিয়াং জায়গাটি এখনকার মতো এতটা জমজমাট ছিল না। এখানে বেড়াতে আসা লোকেদের থাকবার জন্য হাতে গোনা কয়েকটি হোটেল আর কয়েকটা দোকানপাট। খুন, জখম, রাহাজানি, ছিনতাই সেই অর্থে এখানে নেই বললেই চলে। থানাতেও কাজের চাপ খুবই কম। একদিন দুপুরবেলা আমার বড়োমামা থানায় ডিউটিতে রয়েছেন। হঠাৎ থানার বাইরে অনেক লোকের কোলাহল। তাদের থেকে যেটা জানা গেল সেটা শুনে সবাই একেবারে হতভম্ব। বড়োমামা থানার মেজোবাবুকে বললেন, “এখুনি হাসপাতালে যেতে হবে। জিপটাকে বের করতে বলুন আর আপনি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন।”

হাসপাতালে গিয়ে জানা গেল, কিশোর তামাংয়ের অবস্থা আগের তুলনায় একটু ভালো। তাকে এখন ঘুমের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। চেষ্টা করা হচ্ছে আজ রাতে তাকে শিলিগুড়ির বড়ো হাসপাতালে পাঠাবার জন্য। কারণ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার আরও ভালো চিকিৎসার প্রয়োজন।

কার্শিয়াং থেকে একটা সরু পাহাড়ি রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে আধঘন্টা উপরের দিকে গেলে ছোটো একটা পাহাড়ি গ্রাম। সাত-আট ঘর পরিবার বাস করে এই গ্রামে। পুরুষেরা মালবাহকের আর মেয়েরা চা-বাগানে চাপাতা তোলার কাজ করে কোনওরকমে জীবিকা নির্বাহ করে।

কিশোর তামাং এই গ্রামের ছেলে। বয়স পনেরো, কিংবা ষোলো। পাহাড়ি ছেলে, অত্যন্ত কর্মঠ। দূরে চারদিকের তুষার-আবৃত পাহাড়ের চূড়োগুলো দেখে মনে মনে ভাবে, সেও একদিন তেনজিং নোরগের মতো মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় উঠবে।

প্রতিদিন সকালবেলায় কিশোর তাদের গ্রামের থেকে আরও উপরের পাহাড়ে ভেড়ার পালকে চরাতে নিয়ে যায়। সঙ্গে থাকে তার পোষা একটা রাস্তার কুকুর।

ভেড়াগুলো আপন খেয়ালে ঘাস খাচ্ছে। কিশোর একটা বড়ো গাছের তলায় পাদুটো ছড়িয়ে বসে বিশ্রাম করতে গিয়ে তার একটু ঝিমুনিমতো এসেছিল। হঠাৎ যেন খেয়াল হল, তার ডানপায়ের পাতার কাছে কিছু একটা ভারী জিনিস ঠেকছে। পায়ের পাতায় তাকিয়ে দেখেই কিশোর একেবারে আঁতকে উঠল। পাহাড়ি ছেলে, দেখেই বুঝতে পারল সামনে তার বিরাট বিপদ। এখান থেকে চিৎকার করে ডাকলেও কেউ শুনতে পাবে না তার এই মহাবিপদের কথা। সে দেখল, একটা মোটা অজগর সাপ তার পায়ের পাতাটাকে কামড়ে ধরে রয়েছে। তার লেজটা কোথায় শেষ হয়েছে সেটাও সে বুঝতে পারছে না জঙ্গলের গাছপালার জন্য। কিশোর তামাং মনে মনে ঠিক করে নিল তাকে হেরে গেলে চলবে না। অসীম মনের জোর নিয়ে অজগরটার সঙ্গে তাকে মোকাবিলা করতে হবে। তার দু'হাত দিয়ে অজগরটার কামড়ে থাকা চোয়াল ধরে টেনে পাটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু গায়ের জোরেও সাপটার চোয়াল কিছুতেই ফাঁক করতে পারল না। হঠাৎ দেখল, সাপটা তার পা ধরা অবস্থায় মুখটাকে বেলুনের মতো ফোলাচ্ছে আর একটা নিঃশ্বাসের টানে তার পায়ের আরও কিছুটা অজগরটার মুখের ভেতরে চলে যাচ্ছে। অন্যসময় তার কোমরে একটা ভোজালি গোঁজা থাকে। আজ সেটা আনতেও ভুলে গেছে।

এরপর অজগরটা মাঝে মাঝে মুখটাকে বেলুনের মতো ফোলাচ্ছে আর সাপটার নিঃশ্বাসের টানে পায়ের একটু করে অজগরটার শরীরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। কিশোর খুব ভালোভাবেই জানে, এইভাবে পাহাড়ি অজগরগুলো বড়ো বড়ো জন্তুজানোয়ারগুলোকে যদি একবার ঠিকমতো ধরতে পারে, তবে পুরোটাই গিলে নেয়। সে অজগরটার আচরণ দেখে বুঝতে পারছে, এরপর তার কী অবস্থা হতে পারে। কিন্তু সে তখনও তার মনোবলকে অটুট রেখে বাঁচার জন্য প্রাণপণে লড়াই করে যাচ্ছে। একটা সময় অজগরটা মুখটাকে বেশ বড়ো করে ফুলিয়ে আর শক্তি সঞ্চয় করে তাকে টেনে নেবার চেষ্টা করছে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য।

হঠাৎই কিশোরের তার পোষা কুকুরটার কথা মনে পড়ে যেতে সে কুকুরটাকে তার মতো করে ডাকা শুরু করল। কুকুরটা আশেপাশে কোথায় হয়তো ছিল। কুকুরটা এসে বোধহয় বুঝতে পারল, তার মনিব বিপদে পড়েছে। হঠাৎ করেই কিশোরের পোষা কুকুরটা অজগর সাপটার মুখের উপর তার ধারালো পায়ের নখগুলো দিয়ে আঁচড়াতে শুরু করল। কিছুক্ষণ এই ধারালো নখ দিয়ে আঁচড়ানোর ফলে কিশোর অনুভব করল অজগরের চোয়ালটা তার পা কামড়ে ধরার থেকে একটু আলগা হয়েছে। এই সুযোগে কিশোর দেরি না করে আরও মনের জোর সঞ্চয় করে তার হাতদুটো দিয়ে অজগর সাপটার চোয়ালটাকে ফাঁক করেই মুখের ভেতর থেকে পাটাকে টেনে বের করে ফেলল। পা থেকে অঝোরে রক্ত পড়ছে। এই অবস্থায় কোনওরকমে টলতে টলতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে রাস্তায় নেমে দূরে একটা জিপগাড়ি দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেল। জিপটা ছিল বনদপ্তরের। তারাই কিশোরকে রাস্তা থেকে তুলে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়।

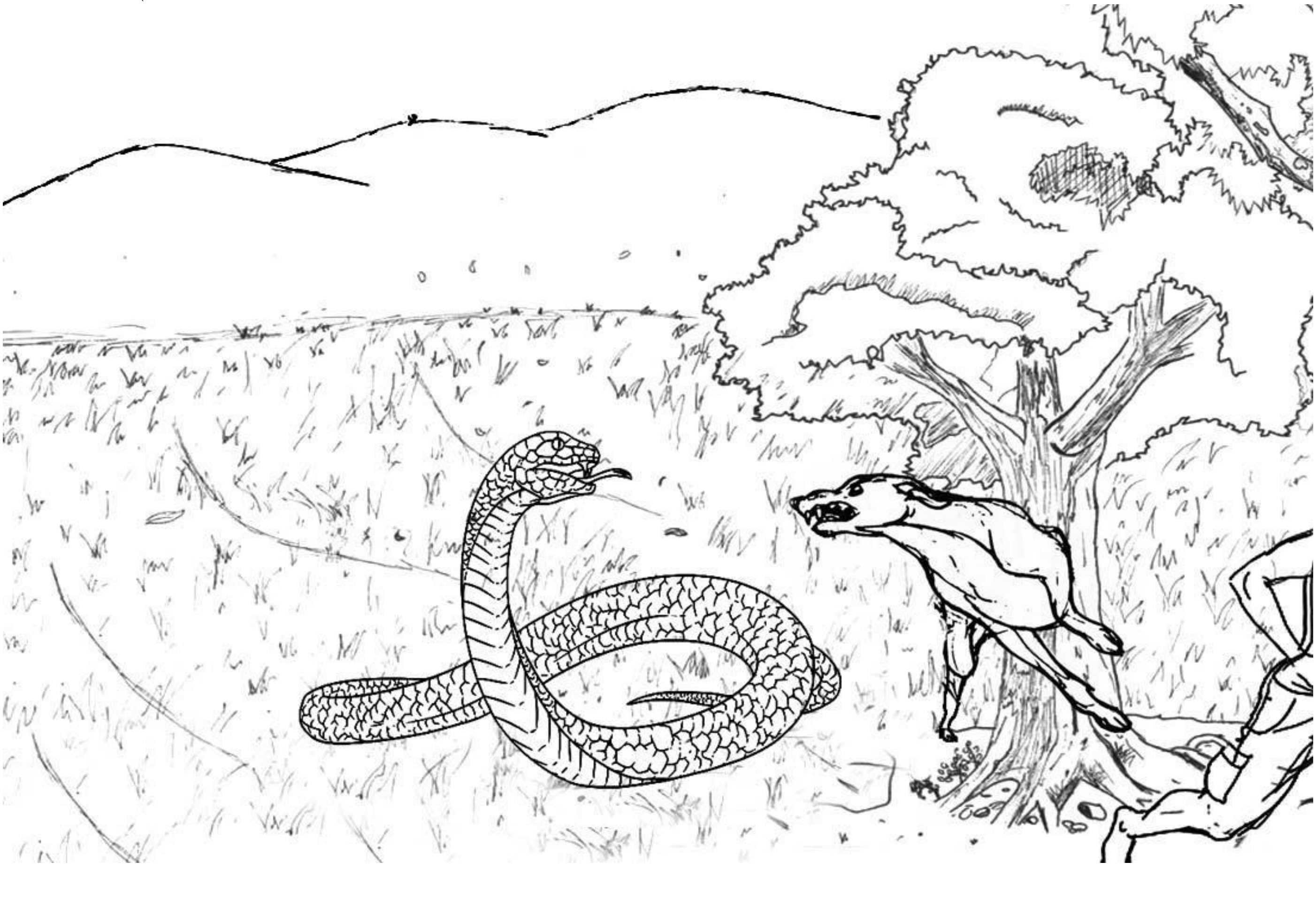

মাস তিনেক হাসপাতালে থেকে পায়ে একটা অপারেশন করে কিশোর সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফেরে। বাড়িতে আসার পর সে থানায় আসে দেখা করতে। প্রয়োজনীয় কথা হয়ে যাবার পর হঠাৎই আমার বড়োমামাকে উদাস হয়ে বলে, "স্যার, আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে এভারেস্ট অভিযানে যেতে পারব তো? স্যার, আমার জীবনের স্বপ্ন, আমিও একদিন তেনজিং নোরগের মতো বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরের চূড়ায় উঠে দেশের পতাকা পুঁতব।"

আমার মামা তাকে বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই পারবে। যদি তোমার মনের জোর, অধ্যবসায় আর কাজের প্রতি নিষ্ঠা থাকে তাহলে কোনও বাধাই তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না। তুমি জয়ী হবেই হবে।"

ছাগল আর ভেড়া

পিয়ালী চক্রবর্তী

ভগবানের নামে শিশুবলি
পরে অনুতাপের গরল,
শেষে আমার রক্তে পাপ ধুলো সব
আমিই ছিলাম সরল।

সকল পাপীর পাপের বোঝা
আমার তো নেই হায়,
তবুও আমিই স্বর্গে গেলাম
একলা অসহায়।

আমিই ভগবানের ভেট
মানুষের দায় কমে,
আমার জন্য খাঁড়ার ঘা
ঈশ্বরের পীঠস্থানে।

"এমন কোনও বাড়ি নেই, যেখানে একটি ছাগলকে বিদায় জানানোর ইচ্ছা না রেখেই প্রতিপালন করা হচ্ছে, অথবা তিনটি ছাগলকে পালন করা হচ্ছে যেখানে রোজ রাতে দেবদূতরা তাদের জন্য প্রার্থনা করে না।" মহম্মদ বলেছিলেন একথা।

ভারতের পশুপাখিদের যদি মানুষের মতো একটা করে ধর্ম থাকত, তাহলে ছাগলরা ইসলাম ধর্মের হত। কারণ, বেশিরভাগ হিন্দুরা ঘরে ছাগল পোষে তার মাংস খাবার জন্য, আর মুসলমানরা পোষে তাদের বড়ো করে ব্যবসা করার জন্য। এদের বাইরের চেহারার বিশেষত্বটাও তেমনই। ব্রাহ্মণী ষাঁড়কে দেখলেই প্রতি ইঙ্গিতে হিন্দু মনে হবে, কিন্তু ছাগলের চিরাচরিত চোখের চাউনি, একেবারে মুসলিমদের মতো।

প্রচুর পরিমাণে পুরুষ ছাগলকে প্রতিবছর কালীপুজোতে বলি দেওয়া হয়। কালী হলেন দেবী দুর্গার এক রূপ। আর একটা ধারালো খাঁড়ার মতো ছুরি দিয়ে তাদের মাথা কেটে নেওয়া হয়। এইভাবে কাটা প্রাণীই বোধহয় হিন্দুদের খাবার জন্য উপযুক্ত। একসময় তৎকালীন রাজপুতানার রাজধানী জয়পুরের আমের কেল্লা সংলগ্ন মন্দিরে ছাগল বলি দেওয়া হত। আবার

অন্য জায়গায় নিয়মিত মানুষের আত্মত্যাগের বদলে ছাগল বলি দেবার প্রথা চলত। ভারতের কিছু অংশে হিন্দুদের মধ্যে একটা প্রচলিত কথা হল ''ছাগল নিজের ল্যাজ নিয়েই আসে'। এই কথাটার সাথেও বলি দেওয়ার যোগ আছে। ছাগলের শরীরের প্রত্যেকটা অংশ ভগবানকে অর্পণ করা হয়। লেজের দিকটা নাকি বিষ্ণুর আর সেই একমাত্র প্রাণীটিকে বাঁচাতে পারে। তাই লেজটা আগে কেটে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাতে কিনা ছাগলটা উদ্ধার হয় আর তাকে মারার দোষ কেটে যায়। মুসলমানরাও যখন হালাল করে, তখন ছাগলটাকে মারার পাপক্ষয় করতে তারা প্রার্থনা করে। কিছু মুসলিম একটি শিশু জন্মানোর পরে ছাগল কাটে। আবার কোনও শিশু অসুস্থ হলেও ছাগলের গলা কেটে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়।

বলিদান

আমরা উপহাস করে বলি 'যখন শয়তান অসুস্থ ছিল' ইত্যাদি ইত্যাদি। আর ভারতে বলা হয় 'সবকিছু নিরাপদে মিটে গেলে পাঁঠা বলি দেব'। গল্পটা এরকম যে, মিও, এক বিশেষ উপজাতির মানুষ যারা গঙ্গার সেই অংশের পাড়ে থাকে যেখানে খুব কুমির। তাই সে যখন প্রবল বন্যায় গঙ্গা পার হচ্ছে, সে ভগবানের কাছে আর্জি জানায় যে ঠিকভাবে পার হলে পাঁঠা বলি দেবে। কিছুদূর যাবার পর সে যখন বোঝে, যে এইখানে বিপদ কম, তখন সে বলে কুমির নয় সে একটা মুরগি দেবে। যখন সে প্রায় পার হয়ে এসেছে, কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই, সেইসময় তার জামায় একটা পোকা বইতে দেখে সে সেই পোকাটাকে ধরে মেরে ফেলে আর বলে 'জীবনের জন্য জীবনের বলিদান'।

পাঞ্জাবের পার্বত্য জেলাগুলি এখনও সেই পুরনো মতবাদে বিশ্বাসী যে এই বলিদান সার্থক হয় না, যতক্ষণ না পশুটি থরথর করে কাঁপবে। সেখানকারই কোনও এক মোড়লের বিয়েতে, সেটার ওপর, বিপদসঙ্কুল বাঁকের মুখে ছাগল বলি দেওয়া চলছিল। এমনকি ট্রেন অবধি অপেক্ষা করেছিল কতক্ষণে পশুটি কাঁপবে। ব্রাক্ষণরা ব্যাপারটা আরও তাড়াতাড়ি করতে ছাগলের কান দিয়ে ঠান্ডা জল ঢেলে দেয়। ব্যস, সে ভীষণ কাঁপতে থাকে। একবার কুলুতে, তিব্বতের সীমানায় একটা পাহাড়ি প্রদেশ, সেখানে দু'জন মানুষের মধ্যে প্রচন্ড মতান্তর হয় এবং তারা একে অন্যের নামে মামলা করে। তারপর তারা ওখানকার বড়ো শহর নুগগুরে গিয়ে ছাগল বলির ব্যবস্থা করে। দুটো পশুকেই একসাথে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। যে আগে কাঁপবে, তার মালিক মামলা জিতবে। আর তারপর এই মামলা জেতার সুবাদে তাকে আইনজীবীকেও কোনও দক্ষিণা দিতে হবে না। তবে এক্ষেত্রে তারা ওই ঠান্ডা কিছু বাইরে থেকে ঢালেনি।

যতদূর আমি জানি, এই ছাগলদের কেঁপে ওঠার বিশ্বাসটা শুধুমাত্র পাহাড়ি অঞ্চলের বিশ্বাস। তিব্বতে বিশেষ করে এটাকে খুব বেশি মানা হয়। সাম্প্রতিক সিকিম যুদ্ধে এই ব্যাপারটা নাকি ভয়ংকর প্রভাব ফেলেছিল, যখন সিকিমের রাস্তার চাম্বি পাশের ওপর তিব্বত থেকে আমাদের দলের ওপর হামলা চালানো হয়।

ছাগলের মাংস মুসলমানদের একটা প্রধান খাদ্য। এমনকি ভারতের উত্তর অংশের হিন্দুদের কাছেও তাই। এমন ভাবা হয় যে, যখন পাশ্চাত্য সভ্যতায় নিরামিষাশী হবার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল তখনই ভারতে ছাগল, ভেড়া খাবার প্রচলন শুরু হয়। এমনকি নিরামিষাশী খাবার ছেড়ে আমিষ খাবারের চল শুরু হয় যা ব্রাক্ষণরাও শুরু করেছিলেন। যে অঞ্চলকে হিন্দুস্তান বলা হত, পাঞ্জাব লাগোয়া সেইসব অঞ্চল যেখানে মুসলিম প্রাধান্য বেশি ছিল, সেখানে এই মাংস খাবার প্রবণতা বেড়ে যায়। যদিও হিন্দু পুরুষেরাই মূলত খেত, হিন্দু মহিলারা প্রায় খেতেন না বললেই চলে। মাংস এবং আরও কিছু খাবার মহিলাদের ক্ষেত্রে খুব বেশি শক্তিশালী এবং বেশি ভালো বলে তাদের খেতে দেওয়া হত না। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়তো এই প্রবণতার একটা অন্যতম কারণ ছিল। আবার কিছু বিশেষ কারণও ছিল। যেমন এক ভারতীয় আমায় বলেছিল, 'তোমরা ইংরেজরা বেশি জ্বরে ভোগো না, কারণ তোমরা মাংস খাও' আর 'তোমাদের চোখের দৃষ্টি খুব ভালো, কারণ তোমরা প্রচুর মাংস খাও'। এই শেষেরটা হয়তো বা মাংসাশী পাখিদের দেখে মনে হয়েছে। এছাড়াও একটা প্রবাদ আছে যে, একজন কসাইয়ের কন্যা একটি পুত্রধারণ করেছিল দশ বছর বয়সে। সেই উড়নচন্ডী ছেলের এক দাদা আবার অভিযোগ করেছিল যে নাকি তার বাবা কোনওদিন তাদের হাতে একটা বাচ্চা ভেড়াও দেয়নি যা নিয়ে তাদের বন্ধুদের সাথে মজা করতে পারে। এইসব আমাদের মতো শহুরে পাশ্চাত্য মানুষদের কাছে এইসব একটু আজব লাগতে পারে, কিন্তু এদের কাছে এসব রোজের গল্প। যেসব চাকররা একপাল ছাগল নিয়ে বেড়াতে যায় তাদের খুশি করবার জন্য, তারাই আবার রমজানের সময় সেই ছাগল কেটে রক্তে লাল করে ফেলে সবকিছু। ভারতে থাকা ইংরেজরা বিশেষ ছাগল বা ভেড়া খায় না। কারণ, খুব প্রত্যন্ত গ্রামের দিকে তারা যে কাটলেট খেতে পেত তা আসলে ছাগলের মাংসের। কিন্তু তারা ছাগলের থেকে ভেড়া পছন্দ করে বেশি। কারণ, ছাগল শুধু ঘাসপাতা খায়, অন্যদিকে একটা ক্ষুধার্ত ভেড়া যা পায় তা খেয়ে নেয়।

একটা ছাগলের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়াটা বেশ কঠিন মনে হয়। তবুও ভারতের শহরগুলোতে ঝাঁকে ঝাঁকে চরে বেড়ানো দুগ্ধবতী ছাগলরা সারাদিন ধরে প্রচুর যন্ত্রণা সহ্য করে। ওদের স্তনবৃন্তগুলো বেঁধে দেওয়া থাকে। আর সবচেয়ে কষ্টকর হল, জীবন্ত অবস্থায় ওদের গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া এই বিশ্বাসে যে আবার ভালো মানের চামড়া তৈরি হবে। কলকাতার পশু নির্যাতন সুরক্ষা সংঘ প্রায় বাইশজনকে এর জন্য গ্রেপ্তার করেছিল ১৮৯০তে। আশা করে যাচ্ছে বাংলার রাজধানীতে অন্তত এই যন্ত্রণার উপশম হবে।

অলংকরণঃ জন লকউড কিপলিং

১। বিছানায় শুয়ে অনেক রাত্তিরে বই পড়ছ। দেয়ালে ঘড়ি নেই। মোবাইলটাও অনেক দূরে। এক্ষেত্রে বিনা কষ্টে ক'টা বাজে জানবার একটা সহজ উপায় আছে। সেটা হল চেঁচিয়ে গান গেয়ে ওঠা। একটুক্ষণ করলেই পাশের ঘর থেকে মা চিৎকার করে বলবে, "হচ্ছেটা কী? রাত আড়াইটে বাজে এখনও ঘুমের নাম নেই? উঠে এলে আজ তোর একদিন কি..."

ব্যস। হয়ে গেল তো?

২। -আপনাদের লাইব্রেরিতে 'আত্মহত্যার তিনশো উপায়' বইটা আছে?
-আছে। ইস্যু করে দিচ্ছি। ফেরৎ দিতে যিনি আসবেন তাঁর ফোন নম্বরটা রেজিস্টারে লিখে রেখে যান প্লিজ।

৩। মাস্টার - (আঙুলের সোনার আংটি জলে ডুবিয়ে ধরে) বল দেখি এবারে এতে মরচে ধরবে নাকি?
ছাত্র - না সার।
মাস্টার - বেশ বেশ। কী কারণে?
ছাত্র - কারণ সিম্পল। মরচে ধরার ভয় থাকলে কোন পাগলে ও জিনিস জলে দেয়?

৪। পাগলা গারদের এক বাসিন্দা একমনে কিছু লিখছেন।

ডাক্তার এসে প্রশ্ন করলেন - কী হে, চিঠি লিখছেন নাকি?
রোগীঃ আজ্ঞে।
ডাক্তারঃ কাকে লিখছেন?
রোগীঃ নিজেকে।
ডাক্তারঃ বাহ্! ভালো তো। তা কী লিখলেন?
রোগীঃ আপনি কি পাগল নাকি মশাই? সবে তো চিঠিটা লিখছি। চিঠি পাঠাব, দু'দিন বাদে চিঠিটা পাব, খুলে পড়ব। তারপর তো বলতে পারব কী লিখেছি!

||৩৫||

ঘাঁটিতে ফিরে আমি আমার ঠগি বন্ধুদের একত্র করে বললাম, "গফুর খান যে সাক্ষাত শয়তান সে তো তোমরা সবাই জান। পিন্ডারিরা সবাই বদমাশ, কিন্তু গফুর খানের ধারে কাছে কেউ আসে না। লোকটা মানুষ নয়। মোতি আর পীর খান, তোমাদের করিঞ্জার সেই মেয়েটার কথা মনে আছে? আমি তখনই মনস্থির করে নিয়েছিলাম, একদিন এর পাপের শাস্তি আমি নিজে হাতে দেব। আজ আল্লা আমায় সেই দিন দেখিয়েছেন। আজ শয়তানটা যা করেছে, তার চেয়ে জঘন্য পাপ যে আর হয় না সে তো তোমরা সবাই নিজের চোখেই দেখেছ। আজ তবে এর পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে। তোমাদের কী মত?"

"ঠিক কথা মীরসাহেব," সবাই একযোগে বলে উঠল, "ওর পাপের ঘড়া আজ পূর্ণ হয়েছে। ভবানীর শপথ, ও আমাদের।"

"তাই হবে। এখন শোন। আমার কাছে এখনও গুন্টুর থেকে আনা তিন বোতল ফিরিঙ্গি মদ রয়েছে। মদটা গফুর খান পছন্দ করে। এ মদের লোভ দেখালে ও ঠিক চলে আসবে। ওর পেয়ালায় খানিকটা আফিং মিশিয়ে দিতে হবে। কয়েক পেয়ালা আফিং মেশানো মদ খেলেই মুখ গুঁজে পড়বে'খন। তখন সবাই মিলে ওকে শেষ করে দেব, কী বল?"

"কবে করবে? আজ রাতে?" পীর খান জিজ্ঞাসা করল।

"উঁহু, আজকে নয়। অনেক লোকজন চারপাশে। কাল আমাদের তাঁবুটাকে একটু একটেরেতে নিয়ে লাগিও। কাজটা করব একেবারে মাঝরাতে।"

"একটা অনুরোধ ছিল," পীর খান বলল, "গফুর খানের ঘোড়ার জিনে অনেক ওনাদানা জমানো আছে। ওটা কি আমরা..."

"আমিও ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি, পীর খান। কিন্তু ওতে ধরা পড়বার একটা ভয় থেকে যাবে।"

ব্যাপারটা নিয়ে একটুক্ষণ ভেবে পীর খান বলল, "একটা বুদ্ধি করলে হয় মীরসাহেব। নেশা জমে উঠলে আপনি খানকে বলুন রাতে আর না ফিরে আপনার তাঁবুতেই থেকে যেতে। তারপর তাকে বলবেন তার ঘোড়া আর জিন চেয়ে পাঠাতে, যাতে সকাল সকাল উঠেই ঘোড়া নিয়ে তৈরি হয়ে পড়তে পারে। যদি বুদ্ধিটা কাজে লেগে যায় তাহলে জিন থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে সেটাও ওর সঙ্গে কবরে চালান করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। কী বলেন?"

"দাঁড়ান, আগে ভবানী কী সংকেত দেন দেখি। সেসব ভালো হলে চেষ্টাটা করা যেতে পারে," মোতিরাম মাথা নেড়ে জানাল।

"বেশ। কাল তাহলে সেসব একবার দেখেশুনে নিও। আমিও পীর খানের প্রস্তাবটা নিয়ে একটু ভাবব আজকের রাতটা।"

পরদিন সকাল থেকে আমি গফুর খানের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থেকে এটা ওটা গল্প করতে লাগলাম। পথে যেসব ছোটোখাটো লুটপাট হচ্ছিল সেসব দিকে নজর দিলাম না বিশেষ। কথা বলতে বলতে এক ফাঁকে আমি হঠাৎ বললাম, "খানসাহেব, গুন্টুরে সেই ফিরিঙ্গিদের বাড়ি পোড়ানোর কথা খেয়াল আছে আপনার? ব্যাটারা নবাবদের মতো বড়োলোক, অথচ বাড়িতে সোনাদানা দূরস্থান একটা ফুটো পয়সা পর্যন্ত রাখে না। খালি চিনেমাটির থালাবাসন ভর্তি। সেসব ভেঙে হাতের সুখ হয়েছিল কিছু।"

"মনে নেই আবার? চিতু-সর্দার যদি ভয় পেয়ে আমাদের না আটকাত তাহলে সেদিন ফিরিঙ্গির তোষাখানা লুট করে বড়োলোক হয়ে যেতাম আমরা। তার বদলে বাড়িগুলো লন্ডভন্ড করে আফসোস মেটাতে হয়েছিল।"

"যা বলেছেন। উহ্, বাড়িগুলো জ্বলতে দেখে ব্যাটাদের বুকে কেমন জ্বালা হয়েছিল ভাবুন তো। ওহো, বলতে বলতে মনে হল, একটা বাড়িতে গায়ে ছাপা কাগজের লেবেল লাগানো ছোটো ছোটো বোতলে একরকমের মদ পেয়েছিলাম, মনে আছে? জিনিসটা খেতে কিন্তু দারুণ ছিল।"

“মাশাল্লা। সে স্বাদ কি কেউ ভুলতে পারে? বেশ ক’দিন ধরে জিভে লেগে ছিল। কাফিরগুলো আর যাই পারুক না পারুক, মদ বানাতে ওস্তাদ। মাঝে মাঝে ভাবি ওখানে বসেই সব খেয়ে না ফেলে কয়েকটা বোতল যদি সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম তাহলে মাঝে মাঝে সারাদিনের খাটুনির শেষে দু-একপাত্র পেলে মন্দ হত না।”

“আমি কিন্তু একটু হিসেবি মানুষ, খানসাহেব,” আমি মাথা নেড়ে বললাম, “আমার কাছে এখনও কয়েকটা বোতল বাঁচিয়ে রাখা আছে।”

“আছে? তাহলে বন্ধু নিজের সম্পত্তি নিয়ে এত কৃপণতা কোরো না। এমন স্বর্গের সুরা, আমায় তার একটু ভাগ দাও। চল চল।”

“আহা সে তো আপনার সেবার জন্য প্রস্তুতই আছে, খানসাহেব। আপনি ইচ্ছে করলেই হয়। তবে এই দিনের বেলা লোকসমক্ষে মদ খেলে আবার বদনাম-টাম না হয়। বলি কী, আজ রাতে আমার তাঁবুতে আসুন না একবার। একটু পোলাও রাঁধিয়ে রাখব’খন কাউকে দিয়ে। খাওয়াদাওয়া সেরে তারপর আরাম করে বসে দু’পাত্র খেলেই হবে। কেউ জানতে পারবে না।”

“আহা মীরসাহেব, আপনার জয় হোক। আমি সন্ধে হতেই আমার সহিসকে বলব আমার ঘোড়াটা যেন সে আপনার ঘোড়াদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখে। কেউ জানতেই পারবে না আমি কোথায় গেছি। দ্বিতীয় কাউকে আমি সঙ্গেও আনব না। মানে বুঝতেই তো পারছেন, এসব অধর্মের কাজ...”

খানের কথাগুলো শুনে আমার বুকের ভেতরটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল একেবারে। যেমনভাবে চাইছি, কিছু না করতেই ঠিক তেমনিভাবে ধরা দিতে চলেছে গফুর খান। ওর সোনাদানাভরা জিনটা তাহলে হাতাতে কোনও অসুবিধেই হবে না আমাদের। মাথা নেড়ে বললাম, “কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন, খানসাহেব। কেউ দেখে ফেললে ব্যাপারটা মোটেই ভালো হবে না। আমার সঙ্গেও শুধু আমার ধর্মভাই পীর খান থাকবে। চেনেন তো? খুব ভালো ছেলে। সে ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ কোনওকিছু জানবেই না। তাহলে আজ সন্ধেবেলা পোলাওটা রান্না হয়ে গেলেই আমি আপনার কাছে খবর পাঠাব’খন।”

“আরে না না, খবরদার। ওসব একদম করবেন না। অন্ধকার হওয়ার পর আমি নিজেই সবার চোখের আড়ালে আপনার তাঁবুতে এসে ঢুকে পড়ব,” বলতে বলতে পাশে পাশে চলা সহিসের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলে, “এই শোন, আমি রাতের বেলা যেই বের হব সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘোড়াটাকে নিয়ে পেছন পেছন বের হবি। পেছন পেছন এমন ভাব করে আসবি যেন আমি কোথাও যাচ্ছি ঘোড়ায় চড়ে। তারপর সবার চোখের আড়ালে এসে ঘোড়াটাকে এনে মীরসাহেবের তাঁবুর পেছনে বেঁধে দিবি।”

সে মাথা নেড়ে বলল, “জো হুকম।”

“আর শোন, কোথায় যাচ্ছি সেকথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিবি না কিন্তু।”

“যে আজ্ঞে, মালিক।”

“কথাটা খেয়াল থাকে যেন। কাকপক্ষীতে জানতে পারলে তোর আর ধড়ের ওপর মুন্ডুটা থাকবে না এটা জেনে রাখিস।”

সারাদিন তীব্র গরমে ঘোড়া ছুটিয়ে সন্ধের মুখমুখ সেদিন আমরা আমাদের বিশ্রামের জায়গায় পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। খান ঘন ঘন লোক পাঠাচ্ছিল আমাদের পোলাও রান্নার কদ্দুর সে খবর নিতে। কিন্তু খাবার যে তৈরি সেকথা তাকে ঠিক সময়টা আসবার আগে জানিয়ে দিলে আমাদের কাজটাই পন্ড হয়ে যেত। কাজেই তাকে খবর দিলাম, রান্নার দেরি আছে।

মোতিরাম মধ্যে একবার এসে বলে, “সারাদিন যে খানসাহেবের সঙ্গে রইলেন মীরসাহেব, তা ভবানীর সংকেত-টংকেত কিছু খেয়াল করলেন?”

বললাম, “উঁহু, খেয়াল করিনি। তুমি কিছু পেলে?”

“আমার এসব কাজে আলসেমি করবার অভ্যাস নেই। কাল রাতেই কথাবার্তার পরে আমি আর পীর খান গিয়ে নিশানের পায়ে গুড়ের ভোগ চড়িয়ে ভবানীর আদেশ জানতে চেয়েছিলাম। ভবানী থিবাহু, পিলাহু দুই দিয়েছেন। আজকের কাজে তাঁর পূর্ণ আশীর্বাদ আছে।”

“থাকতেই হবে, মোতিরাম। পুণ্যকর্ম করতে যাচ্ছি যে! তবে একটা কথা কী জান, দেবতার আশীর্বাদ না পেলেও এ কাজটা আমি করতামই।”

“এমন কথা বলবেন না, জেমাদারসাহেব,” হাসতে হাসতে মোতিরাম বলল, “আপনি যা নিয়ম মেনে চলা লোক! তবে আর সেসব ভাবনার কোনও দরকার নেই। সব সংকেত শুভ। এখন কাজটা করে ফেললেই হয়।”

“এ কাজটা ভালোভাবে হয়ে গেলে আমরা আমাদের পথে ফের কয়েকটা কাজ করব বলে ঠিক করে রেখেছি। তবে সেসব পরে হবে। উপস্থিত এ লোকটা উধাও হবার পর একটা হইচই হবে। সেসব থিতিয়ে যাওয়া অবধি আমাদের একটু চুপচাপ থাকতে হবে।”

“ভালো। আসলে আমরাও কদিন ধরে এই নিয়েই ভাবনাচিন্তা করছিলাম। আপনার সঙ্গেও কথা বলব বলে ঠিক করেছিলাম। চারপাশে এই পিণ্ডারি কুকুরগুলো সঙ্গে হাজার হাজার টাকা নিয়ে ঘুরছে, আর আমরা কিনা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি! লজ্জার কথা। এখানে তো রোজ রাতেই কিছু না কিছু কাজ করা যায়।”

“একটু ধৈর্য ধর, মোতিরাম। আগে তো খানের ব্যাপারটা মিটুক! লোকজন নেই সাথে। লুগাইয়ের কাজটাও তো সেই আমাদেরই করতে হবে।”

“সে আমরা তৈরি আছি। আপনি ভাববেন না, মীরসাহেব।”

“তাহলে আর দেরি কোরো না। তোমার তাঁবুটা আমার তাঁবুর গায়ে গায়ে ঘেঁষে লাগিয়ে ফেল। মাঝখানে একটা পর্দা দিয়ে তার পেছনে গর্তটা খুঁড়বে। খান আসবার আগেই কাজটা... উঁহু, না। সন্দেহ করে এদিক ওদিক ঘুরে দেখতে পারে। ও বরং খান এসে আসর বসাবার পরই শুরু কোরো।”

“তা ঠিকই বলেছেন মীরসাহেব। লোকটা সেয়ানা আছে। এসে নেশা করতে শুরু করলেই চটপট হাতে হাতে কাজ হয়ে যাবে। আমাদের দলের জনাতিনেকের লুগাইয়ের কাজ করবার অভ্যেস আছে। ওরাই সামলে দেবে। গর্ত তো আর বেশি গভীর করতে হবে না!”

“সহিসটাকেও ছাড়া চলবে না, মোতি।”

“ও আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আপনি আর পীর খান মিলে এই খানটকে সামলান দেখি!”

“বেশ। সব ঠিক হয়ে গেল তাহলে। খেয়াল রেখ, খাবার জায়গায় খানের সঙ্গে থাকব কেবল আমি আর পীর খান। তোমরা বাকিরা থাকবে চোখের আড়ালে। ঘোড়াগুলো তৈরি রাখবে। কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে পালাতে পারি। তবে মনে হয় সেসবের দরকার হবে না, কী বল?”

“আমারও তাই মনে হয়। লোকটা এদের ওপরতলার মানুষ। হারিয়ে গেলে একটু হইচই হবে সেটা ঠিক, কিন্তু লোকে ভাববে হয় নিজের লুটের মাল নিয়ে পালিয়েছে ব্যাটা, আর না হয় পিন্ডারিদেরই কেউ তাকে খুন করেছে। ওকে তো কেউই পছন্দ করে না! দলের বেশ ক’টা পিন্ডারিকে খুনও করেছে ওর লোকজন। ফলে ওর ওপর অনেকেরই রাগ।”

“সে আমি জানি। এখন যাও, তৈরি হও গে। তোমার তাঁবুটা এনে লাগাও চটপট।”

অবশেষে সন্ধে হল। চারপাশ থেকে নামাজের শব্দ উঠছিল। লোকজন দলে দলে যার যার আসন বিছিয়ে নামাজে ব্যস্ত। তাদের দেখে কে বলবে যে তাদের অনেকেরই হাতে তখনও মানুষের রক্ত লেগে আছে!

নামাজের পাট চুকলে সবাই গিয়ে যে যার ঘোড়ার পাশে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। আমি আর পীর খান তখন আমাদের তাঁবুতে বসে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছি, কখন খান আসে। জীবনে এই প্রথমবার কোনও নির্দোষ মানুষের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য কাজ করবে আমার রুমাল!

“বোতলে আফিং মিশিয়েছ?”

পীর খানের প্রশ্নের জবাবে আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, “সব হয়ে গেছে। প্রথম বোতলটায় কিছু মেশাইনি। পরেরগুলোতে দু’তোলা করে আফিং মিশিয়ে রেখেছি। একটু গন্ধ ছাড়ছে বটে, তবে প্রথম বোতলটা সাবাড় করবার পর তো দু’নম্বরটা ধরবে! তখন অতশত টের পাবে না আর। একে দু’জন মিলেই দিব্যি সামলে দেব, কী বল?”

“না পারলে কীসের ঠগি হলাম আমরা, মীরসাহেব? গায়ের জোর খানের চেয়ে আমার কিছু কম নেই। আর রুমালে তো তুমি যাকে বলে সিদ্ধহস্ত। তবে শব্দটব্দ তো একটু হবেই। কী করব? খান প্রথম বোতল সাবড়াবার পর মোতিরামকে দু-তিনজনকে নিয়ে গানবাজনা করতে বসিয়ে দেব নাকি? ওর একটা সেতার আছে সঙ্গে। ঢোলকও পাওয়া যাবে। খান যতই ছটফট করুক না কেন গানবাজনার শব্দে সব চাপা পড়ে যাবে।”

“না না। একেবারে নয়। এদের বাকি লোকজন যদি গানবাজনা শুনতে চলে আসে তাহলে গোটা কাজটাই মাঠে মারা যাবে। ওসব থাক। আমরাই যা পারি করব। তারপর কী হবে না হবে সেসবের জন্য তো আল্লাই রইলেন মাথার ওপরে!”

রাত গভীর হল। একে একে চারপাশে সব শব্দ থেমে গেল। তাঁবুর দরজা ধরে আমি একরাশ দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। খান এখনও আসছে না কেন? বেশ কিছুক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে যখন ধরেই নিয়েছি যে খান আমাদের ফাঁকি দিয়েছে, তখন দেখা গেল অন্ধকারের মধ্যে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে থাকা পিন্ডারিদের মধ্যে সাবধানে পা ফেলে ফেলে একটা লম্বা চেহারার মানুষ এদিকে আসছে।

তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখে নিয়েই আমি পীর খানকে বললাম, “খান আসছে। ওর পেছনে ঘোড়া নিয়ে সহিসটা আসছে, দেখতে পাচ্ছ?”

“সুকর খুদা। আসছে তাহলে শেষ অবধি!”

“কে, মীরসাহেব নাকি?” অন্ধকারের মধ্যে থেকে গফুর খানের গলা ভেসে এল একটু বাদে, “আমার তো ভয় হচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে আপনার তাঁবুটাই না শেষমেষ হারিয়ে ফেলি।”

“হ্যাঁ, খানসাহেব। বান্দা হাজির। আসুন, আসুন!”

“কী, আসল বস্তুটা আছে তো? দেখবেন, ঠকাবেন না আবার।”

“ছি ছি, কী যে বলেন খানসাহেব! আমি আপনাকে ঠকাতে পারি?” বলতে বলতে খানকে তাঁবুর মধ্যে ডেকে এনে আমি একধারা সাজানো বোতলগুলো দেখিয়ে বললাম, “ওই যে দেখুন। সব তৈরি। পীর খান গেছে পোলাও নিয়ে আসতে।”

"বেশ বেশ। রাতে ভালো করে খাব বলে আজ আমি সারাদিন প্রায় না খেয়ে রয়েছি। ঘন্টাখানেক আগেই চলে আসবার কথা ছিল, কিন্তু দরবারে ডাক পড়ল হঠাৎ। তাই একটু দেরি হয়ে গেল।"

"আর আপনার ঘোড়া?"

"ও ঠিক আছে। আমার সহিস ঘোড়াটাকে আপনার ঘোড়াদের সঙ্গে খুঁটো মেরে দিয়ে গেছে। ঘোড়াটাকে একটু ঘাস-জল খাইয়ে দেবেন, কেমন? বুঝলেন মীরসাহেব, বাকি নফরগুলোকে দারুণ ধোঁকা দিয়েছি আজ। বললাম, মাথা ধরেছে, রাতে আর কিছু খাব না। এই বলে তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বললাম, কেউ যেন রাতের বেলা আমাকে আর না জ্বালায়। এ কথা বলার পরে ব্যাটাদের আর সারারাতের মধ্যে আমার তাঁবুতে ঢোকবার সাহসই হবে না। খানিক মটকা মেরে পড়ে থেকে তারপর তাঁবুর পেছনের কানাত তুলে চুপিচুপি বের হয়ে পালিয়ে চলে এসেছি।"

কথা বলতে বলতেই পীর খান পোলাওয়ের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকল। আমরাও আর দেরি না করে পোলাওয়ে হাত ডুবিয়ে দিলাম। দু'গ্রাস মুখে তুলেই খান বলে, "কই, মদ কোথায়? গলা যে শুকিয়ে উঠল আমার!"

"এই যে হুজুর," বলতে বলতে আমি খানের পেয়ালা ভরে ফিরিঙ্গি মদ ঢালতে ঢালতে বললাম, "আহা, রঙ দেখুন হুজুর!"

পেয়ালাটা তুলে সটান গলায় ঢেলে দিয়ে খান বলে, "আহা, কী স্বাদ! এ তো সাক্ষাৎ স্বর্গের শরবত, মীরসাহেব! ভেবে দেখুন, বেহস্তে যাবার পর আমরা, খাঁটি ধার্মিকেরা দিনরাত এমন শরবত খাব আর হুরিপরির দল আমাদের ঘিরে বসে থাকবে। আহা! কিন্তু ও কী? আপনি খাচ্ছেন না যে! নিন, নিন।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "এ বোতলটা গোটাটাই আপনার জন্য, খানসাহেব। তার পর আরও একটা আছে। তিন নম্বর বোতলটা আমি আর পীর খান ভাগ করে খাব।"

বোতল থেকে আর এক পেয়ালা ঢেলে নিতে নিতে খান বলে, "সাধে ফিরিঙ্গিরা এত বড়ো বড়ো কাজ করতে পারে? এমন মদ যারা দু'বেলা খায়, বীর তারা হবে না তো হবে কে? ব্যাটারা গোলটেবিলে বসে এই মদ খায়, তারপর চিৎকার করে করে গান গায় আর তারপর চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে উলটে পড়ে রোজ। কী মীরসাহেব, তাই না?"

"তাই তো শুনতে পাই, খানসাহেব। ফুর্তিবাজের দল সব।"

গফুর খানের নেশা হালকা হালকা চড়ছিল। বলে, "আচ্ছা ওদের কাছে যারা চাকরি করে তারা বোধহয় রোজ রোজ এই মদ খেতে পায়, তাই না?"

"পেতেই হবে," আমি জোর গলায় উত্তর দিলাম।

"তাহলে আমি এবারে ইংরেজের ঘরে চাকরি নিচ্ছি, এই বলে দিলাম মীরসাহেব। শুনেছি সিকন্দর জা-ও নাকি এই মদের ভক্ত।"

"হায়দরাবাদে আমিও তাই শুনেছি, খানসাহেব। আসলে ওখানে থাকতেই আমি এ মদটা প্রথমবার চেখে দেখি। বোতলটা আমার চেনা ছিল। গুন্টুরের ফিরিঙ্গির বাড়ি লুট করতে গিয়ে তাই বোতলগুলো দেখে আমার চিনতে ভুল হয়নি।"

বোতলের শেষ পানীয়টুকু গলায় উলটে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খান বলে, "আহা! সাক্ষাৎ রাজার পানীয়। তা আরেক বোতল আছে বলে বলছিলেন যে, মীরসাহেব?"

"এই যে, খানসাহেব," বলে আমি দ্বিতীয় বোতলটা বাড়িয়ে ধরলাম।

"আহা, কী সুখ! আমার এখন নাচতে ইচ্ছে করছে, গান গাইতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু... নাচলে লোকে নিন্দে করবে বোধহয়। তবে হ্যাঁ, গানবাজনাটা চলতে পারে। সেতার আছে নাকি কাছাকাছি? আমি কিন্তু খুব ভালো সেতারিয়া।"

আমি পীর খানের দিকে ঘুরে বললাম, "গিয়ে মোতিরামের সেতারটা নিয়ে এস। খানসাহেব, সেতারের মালিককেও আসতে বলব নাকি?"

"আরে মীরসাহেব, চাইলে স্বয়ং শয়তানকে নেওতা দিয়ে এস না। তোমার মোতিরাম গাইতে পারে?"

"সাক্ষাৎ বুলবুলের মতো গলা, খানসাহেব। কী আর বলব।"

বুলবুল শব্দটা কানে যেতেই খান দেখি সোজা হয়ে বসেছে। বলে, "বুলবুল! আহা, এখন যদি সত্যিই ক'টা বুলবুল এনে জড়ো করা যেত। এই সময়টা মীরসাহেব চুড়ির টুং টাং আর হরিণচোখের চাউনি না দেখলে মন ভরে না। কৃষ্ণার ধারে সেই নাচের আসরে... মনে আছে? আহা, কী দারুণ সব দিন গেছে তখন!"

"সব হবে, খানসাহেব। একবার নেমাওয়ারে পৌঁছে নিই। সেখানে নর্তকির অভাব হবে না। যত চান পাবেন।" বলতে বলতে সেতার হাতে মোতিরাম এসে ঢুকল।

"কী হে, সঙ্গীতরত্ন মুক্তারাম?" বলতে বলতে মোতির নাম নিয়ে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে কুটিপাটি হয়ে খান ফের বলল, "বাজনাটা সুরে বেঁধে এনেছ তো?"

"হ্যাঁ, জনাব।" মোতিরাম বিনীত কণ্ঠে বলল।

সেতারের তারগুলোর ওপর একবার মৃদু হাত বুলিয়ে নিয়েই বাহবা দিয়ে উঠল খান। বলে, "খাসা সেতার। মিষ্টি সেতার।"

“কিছু আলাপ শোনান, খানসাহেব,” আমরা একসঙ্গে বলে উঠলাম এইবারে।

“শোনাব, শোনাব, নিশ্চয়ই শোনাব,” খান দরাজ গলায় সম্মতি দিল। তারপর ফের মোতিরামকে বলে, “গজল জান? গজল? তাহলে এইটা ধর তো দেখি, খুব সোজা গজল, ওই যে, মাহি আলম সোজ ইমাম, কই ধর ধর...” বলতে বলতেই দু'নম্বর বোতল থেকে আর এক ঢোঁক মদ খেয়ে আমার দিকে ঘুরে বলে, “এর স্বাদটা কেমন যেন একটু অন্যরকম ঠেকছে, খানসাহেব?”

বললাম, “ওহো, হ্যাঁ। এ বোতলটার গায়ের ছাপা কাগজটা একটু অন্যরকম ছিল বটে। হবে কোনও আরও দামি মদ! সাহেবগুলোর পয়সার তো মাথামুন্ডু নেই।”

“সে সস্তাই হোক আর দামিই হোক। খেতে যতক্ষণ ভালো লাগবে ততক্ষণ খেয়ে যাব, ব্যস। তা কই হে মোতি, গানটা ধর!”

মোতিরাম গান ধরল। খানসাহেবের সেতারের হাতটাও বড়ো মিষ্টি। গানবাজনায় আসর জমে উঠল বেশ। গান শেষ হলে আমি আর পীর খান সাবাশি দিয়ে উঠলাম। পীর খান বলে, “আমাদের কপাল ভালো। নইলে এই পোড়া জঙ্গলে এমন ওস্তাদি গানবাজনা ক'জনের ভাগ্যে জোটে। এবারে আপনার পালা, খানসাহেব। গান ধরুন একটা।”

“দাও হে, আর একটু হবে নাকি?” খানসাহেব খালি পাত্রটা বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে।

আমি আবার তার পেয়ালাটা ভরে দিলাম। এক চুমুকে সেটা শেষ করে ফেলে সে পেয়ালা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, “আর?”

“আর সাকুল্যে আধবোতল মতো বাকি রয়েছে, হুজুর।”

“তাহলে মোতিরামকে এক পেয়ালা দাও হে। বড়ো ভালো গানবাজনা শোনাল।”

“আজ্ঞে জনাব, আমি একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ,” মোতি সবিনয়ে জানাল।

“তোমার নাম মোতিরাম না হয়ে মোতি খান হলে বড়ো ভালো হত হে! মরার পরে স্বর্গে গিয়ে আল্লাতালাকেও তোমার গান শোনাতে পারতে।”

খান তার গজল ধরল যখন ততক্ষণে তার গলা ভারী হয়ে এসেছে। কিন্তু তারই মধ্যে চোখ ঘুরিয়ে, শরীর বাঁকিয়ে নাচনেওয়ালি মেয়েদের এমন সুন্দর নকল করে গাইতে লাগল যে আমরা হেসে কুটিপাটি। তার পেয়ালায় আরও একটু মদ ঢেলে দিতে সেটা খেয়ে নিয়ে সে আরেকবার গজল গাইবার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে তার জিভ একটু একটু জড়িয়ে এসেছে।

মোতিরাম এবারে আবার একটা গজল গাইল। কিন্তু খানের সেতারের হাত তখন আর সুস্থ নেই। সুর-তাল সব কেটে যাচ্ছিল তার বারবার। খানিক বাদে রেগে গিয়ে সেতারটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল খান। তারপর হিক্কা তুলতে তুলতে বলে, “আরে ধুত! তিন হাজার সওয়ারের সেনাপতি আমি (হিক) গফুর খান, সারাদিন খেটেখুটে পিন্ডারি তাড়িয়ে এসে শেষে (হিক) গাওয়াইয়ার মতো গান গাইব নাকি? কভি নেহি (হিক)। কিন্তু-আ-(হিক) এই হিক্কার কী উপায় করি বলুন তো, মীরসাহেব?”

“আরেকটু মদ খান। একমাত্র মদ খেলেই হিক্কা কমতে পারে, হুজুর,” বলতে বলতে আমি আরেক পাত্র মদ তার সামনে ধরে দিয়েছি।

পাত্রটা হাতে নিয়ে গফুর খান বলে, “দাও দাও, যত মদ আছে তোমার কাছে সব দাও। আমি আজ ফিরিঙ্গি কাফির সাহেবদের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদ খাব। হুঁ হুঁ হুঁ, সাহেববাড়ি চাকরি নেব। তারপর মদ খাব। সবার চেয়ে বেশি খাব, তারপর... কী বলে যেন চিৎকার করে মাতাল সাহেবে? কী যেন সেই...”

“বলুন, হিপ–হিপ–হিপ। সাহেবরা যখন মদ খেয়ে বেজায় মাতলামি করে তখন ওই বলে চিৎকার করে।”

“অ্যাঁ। বেশ, তাহলে আমিও বলব, এই হিপ হিপ হিপ... আচ্ছা মীরসাহেব, হিপ হিপ মানে কী?”

“মনে হয় ওইভাবে ওদের দেশে ভগবানের নাম করে ব্যাটারা। এই আমরা যেমন বলি না, বিসমিল্লা ই রহমানে রহিম, সেইরকম আর কী!”

“ঠিক বলেছেন, মীরসাহেব। আপনি জ্ঞানী মানুষ। আহা কী জিনিস যে খাওয়ালেন, সোজা একেবারে মাথায় চড়ে গেছে। তাঁবুটা চারপাশে এইসা পাক খাচ্ছে! এখন আমায় ধরুন দেখি একটু, উঠে দাঁড়াই। তারপর ফিরিঙ্গিদের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ পাত্রটা খেয়ে ফেলি।”

“আহা দারুণ, দারুণ বলেছেন, খানসাহেব। আসুন।” এই বলে আমি তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হাতে মদের পেয়ালাটা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, “এই যে, জনাব। খেয়ে নিন।”

“বিসমিল্লা–হিপ–হিপ–হিপ” বলে জড়ানো গলায় একটা হাঁক মেরে খান পাত্রটা মুখে উপুড় করে দিল একেবারে। তারপর সামনের দিকে এক পা এগোতে গিয়ে ধড়াস করে আছড়ে পড়ল মাটির ওপর।

পীর খান ঠিক সময়ে সরে গেছিল খানের সামনে থেকে। এইবারে তার পড়ে থাকা শরীরটার দিকে তাকিয়ে বলে, “বাস। মহান খানসাহেব, আমাদের অনেক আনন্দ দিলে তুমি আজ। এবার খেল খতম।”

“একে তুলে বসিয়ে দাও কেউ। আমি তৈরি আছি। কেউ একজন ঝিরনিটা দিয়ে দিও,” আমি চাপা গলায় বললাম।

খানকে তুলে বসিয়ে দিতে দেখা গেল মুখ থেকে গ্যাঁজলা বের হচ্ছে তার। মাথাটা বুকের ওপর ঢুলে পড়েছে।

“এ তো মারা যাচ্ছে!” মোতিরাম হঠাৎ অবাক গলায় বলে উঠল। তারপর আমাদের দিকে ঘুরে বলে, “একে একদম ছোঁবে না। মরতে চলা মানুষের গায়ে হাত দিলে অমঙ্গল হয়।”

“মরছে, না আরও কিছু। জীবনে মদ ছুঁলে না, তুমি ওসব জানবে কী করে? আমি অনেক দেখেছি। এর নেশা হয়ে গেছে। এখন নাও, সোজা করে তুলে ধরে বসাও। মাথাটা কেউ তুলে ধর, আর ঝিরনি দাও তাড়াতাড়ি।”

অতএব তাই হল। ঝিরনির আওয়াজটা আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গফুর খানের প্রাণ বেরিয়ে গেল আমার হাতে। তার শরীরটা ছেড়ে দিয়ে আমি বললাম, “উল–হমুদ উল ইল্লা। ভবানী আর মহম্মদের অশেষ কৃপা। কাজ শেষ। এবার এর শরীরটার একটা গতি কর কেউ। এবারে সহিসটাকে দেখে আসি।”

খানের শরীরটা সেখানেই রেখে আমরা বাইরে এলাম। দলের বাকিরা সেখানেই অপেক্ষা করছিল। বললাম, “সহিস কোথায়?”

তারা দেখিয়ে দিল একটা গাছের নিচে সে ঘুমিয়ে আছে। পীর খান তার কাছে গিয়ে পা দিয়ে তার শরীরে একটা টোকা মারতে সে যেই ধড়মড় করে উঠে বসেছে অমনি পীর খান তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক মুহূর্তের মধ্যে সব চুকেবুকে গেল।

অগভীর একটা কবর খুঁড়ে তার মধ্যে শরীরগুলো পুঁতে দেয়া হল। খানের ঘোড়ার জিনের কাপড় কেটে তার মধ্যে থেকে অনেকটা সোনা আর দামি পাথর পাওয়া গেল। খান তার সব রোজগার সাহুকারদের কাছে সোনায় বদলে নিয়ে নিজের কাছে কাছে রাখত। সোনাদানা বের করে নেবার পর ঘোড়ার জিনটাকে কেটে ফালা ফালা করে খানের সঙ্গে এক কবরেই সেটাকেও পুঁতে দেয়া হল।

“ঘোড়াটাকে নিয়ে কী করা যায়, মীরসাহেব? এত ভালো ঘোড়া! আমাদের কাছে কাল এটাকে দেখা গেলে তো মুশকিল! গায়ের রঙ পালটে দেব তার সময়ও তো নেই!”

মোতিরামের কথা শুনে ঘোড়াটার দিকে ঘুরে দেখলাম আমি একবার। ভারি তাগড়াই তেজি ঘোড়া। তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললাম, “রেখে দিতে পারলে তো ভালোই হত। কিন্তু এর জানের চেয়ে আমাদের জানের দাম বেশি, মোতিরাম। এখান থেকে তির ছোঁড়া দূরত্বে একটা খাদ আছে। কেউ কি চেন?”

সবাই মাথা নাড়ল। কেউ দেখেনি খাদটা।

“হুঁ। তাহলে আমাকেই যেতে হবে দেখছি,” এই বলে আমার দলের এর একটা ছেলেকে ডেকে বললাম, “ঘাউস খান, ঘোড়াটাকে নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে একবার এস তো!”

খাদটা গভীর। খাড়াই পাড়গুলো ওপর থেকে একেবারে নিচে পর্যন্ত জঙ্গলে ঢাকা। তার একেবারে ধারে গিয়ে ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে ঘাউস খানকে বললাম সেটার লাগাম ধরে মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে দিতে। তারপর সে ঘোড়াটাকে শক্ত করে ধরতে আমি আমার তলোয়ারটা দিয়ে জীবটার গলায় একটা গভীর টান দিয়ে দিলাম। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে এল কাটা গলাটা দিয়ে। ঘোড়াটা কেঁপে উঠে এক পা পেছনদিকে যেতেই খাদের মধ্যে পড়ে গেল। একটুক্ষণ পরে অনেক নিচের থেকে ধুপ করে মৃদু শব্দ উঠল একটা। উঁকি মেরে দেখলাম, ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না আর।

তলোয়ারটা মুছে নিয়ে বললাম, "চল, ঘাউস খান। আর চিন্তা নেই। শেয়ালদের একটা বড়সড় ভোজ জুটে গেল আজকে রাতে।"

ঘাউস খান মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, "হায়দরাবাদের বাজারে কম করেও হাজার টাকা দাম মিলত ঘোড়াটার।"

"সে নিয়ে ভেব না," আমি হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিলাম, "অমন অনেক হাজার টাকা রোজগারের বন্দোবস্ত হচ্ছে তোমাদের।"

"কীভাবে, মীরসাহেব?" ঘাউস খান উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করল।

"আরে, এই তো আজকে রাতে আমরা আমাদের আসল কাজটা শুরু করে দিলাম। ইনশাল্লা এরপর আরও ভালো ভালো কাজ করব আমরা এখানে।"

তাঁবুতে ফিরে দেখি লুগাইরা তাদের কাজকর্ম সেরে ফেলেছে। গফুর খানের কবরের ওপরে আমাদের বিছানা পেতে দেয়া হয়েছে। সেখানে সবাই মিলে শুয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে গফুর খানের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া নিয়ে হাজারো গুজব ছড়াল চারপাশে। কারও কারও মত হল, লোকটা যা বদমাশ ছিল তাতে শয়তান স্বয়ং এসে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেছে গতরাতে। আবার কেউ কেউ বলছিল, লোকটা এত সম্পত্তি জমিয়ে ফেলেছিল যে পাছে সেসব হাতছাড়া হয়ে যায় তাই সব নিয়ে রাতের অন্ধকারে দল ছেড়ে পালিয়েছে। গফুর খান যে তার সব লুটের মাল সোনায় বদলে নিয়ে ঘোড়ার জিনের সঙ্গে থলিতে সেলাই করে রাখত সে খবর পিন্ডারিদের সবারই জানা ছিল।

সেদিন সারাদিন চলবার পর রাতের ঘাঁটিতে পৌঁছে চিতু আমায় দরবারে ডেকে পাঠাল। গিয়ে দেখি দরবার একেবারে ভর্তি। গফুর খানের চাকরবাকরগুলোকে দড়ি বেঁধে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। আমি ঢুকে সেলাম দিতে চিতু আমায় ডেকে পাশে বসিয়ে বলল, "ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক, মীরসাহেব। গফুর খান গেল কোথায়? সেই ছোটোবেলা থেকেই আমার সঙ্গে আছে। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও তো বেশ ভালোই ছিল। তাহলে হঠাৎ পালাতে যাবে কেন? তোমার কী মনে হয়?"

বললাম, "আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, হুজুর। নানান লোকে নানান কথা বলছে বটে, কিন্তু সেসব গুজবের কানাকড়িও দাম নেই। খানের চাকরবাকরদের থেকে কিছু জানা যায়নি?"

"উঁহু। এখনও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়নি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। নাও, শুরু কর।"

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, হুজুর। কিন্তু শুরুটা আপনিই করুন। এরা আপনাকে অনেক বেশি সম্ভ্রম করে তো! সত্যি কথাটা বলে দেবে।"

"বেশ। তাই হোক," বলে চিতু তার এক নফরকে ডেকে বলল, "ব্যাটাদের একটাকে আমার সামনে আন।"

একটা বয়স্কমতো লোক কাঁপতে কাঁপতে চিতুর সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল।

"নাম কী তোর?" চিতু জলদগম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল।

"আজ্ঞে, সৈয়দ ইব্রাহিম, হুজুর।"

"গফুর খানের কাছে কী কাজ করতি?"

"খিদমতগার ছিলাম, মালিক। খানসাহেবের জামাকাপড় ঠিক রাখতাম, স্নান করিয়ে দিতাম, রাতে বিছানা পাততাম..."

"ঠিক আছে, ইব্রাহিম। এইবার যা জানিস সব ঠিকঠিক বল। ভয়ের কোনও কারণ নেই। তবে মিথ্যে কথা বলছিস টের পেলে এইখানেই কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব, এই বলে দিলাম।"

"না, মালিক। যা বলব, সত্যি বলব।"

"নে, তাহলে শুরু কর।"

"হুজুর, কাল সন্ধেবেলা আপনার দরবার থেকে ফিরে খানসাহেব দরবারের কাপড়জামা ছেড়ে তাঁবুতে গিয়ে শুলেন। আমি গিয়েছিলাম স্নানের জলসাবান নিয়ে। তা আমায় বললেন, ওসবের দরকার নেই। খাবার রান্না করা ছিল। বললেন, রাতে খাবেন না, আমরা যেন তাঁর জন্য রান্না করা খাবারদাবার সব খেয়ে নিই। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ে বললেন, রাতে যেন আর তাঁকে বিরক্ত না করা হয়। সারাটা দিন খানের সঙ্গে দৌড়োদৌড়ি করে আমিও ক্লান্ত ছিলাম। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আমিও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে ফের যখন খানকে জাগাবার জন্য তাঁবুতে ঢুকলাম, দেখি বিছানা খালি। খান নেই। খানের তলোয়ারটাও নেই। হাঁটবার সময় সঙ্গে একটা ছোটো ডান্ডা রাখতেন, সেটাও নেই। এর বেশি আমি কিছু জানি না। তবে হ্যাঁ, শেখ কাদির আমার পরে নাকি খানকে দেখেছিল। সে আরও কিছু জানতে পারে।"

শেখ কাদিরকে সামনে ডাকা হল। সে যা বলল তা মোটামুটি এইরকম, সে ছিল খানের হুঁকাবরদার। মালিককে তামাক, আফিং এইসব সেজে দেয়া তার কাজ ছিল। আগেরদিন রাত একটু গভীর হলে সে দেখে খান তার তাঁবুর পেছনের কানাত তুলে আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে হাঁটা দিয়েছে। কৌতূহলী হয়ে সে খানের পিছু নিয়েছিল। কিন্তু খান হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে রেগে উঠতে সে কোরা খাবার ভয়ে এক বন্ধুর তাঁবুতে পালিয়ে যায়। এর বেশি আর কিছু সে জানে না।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, “উঁহু। কিছু বোঝা যাচ্ছে না, হুজুর। আচ্ছা একটা কথা, খানের ঘোড়াটা কোথায়? এখনও এখানেই আছে তো?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক। ঘোড়া কোথায় খানের?” চিতু আমার কথার প্রতিধ্বনি করল।

শেখ কাদির করুণ গলায় বলে, “জানি না, হুজুর। খানসাহেবের দুটো ঘোড়ার একটা আর তার সহিস দুটোই উবে গেছে কাল রাতে। খানের সোনাদানার থলে লাগানো জিনটাও গায়েব।”

“হুম। তা অন্য ঘোড়ার সহিসটা কোথায়?”

দরবারের এক দারোয়ান অমনি হাঁক দিয়ে উঠল, “পীর-উ-মুরশিদ-হাজি–ই–ই–র।”

সঙ্গে সঙ্গে খানের আর এক চাকর সামনে এগিয়ে এসে সেলাম দিল।

“তুমি কী জান, বল।”

“আজ্ঞে হুজুর, ছেয়ে রঙের ঘোড়াটাকে বিকেল থেকেই জিন পরিয়ে রাখা ছিল। এত সোনারুপোর থলেওয়ালা জিনটাকে খালি ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে রেখেছে কেন জিজ্ঞাসা করতে তার সহিস রেগে উঠে আমায় যা নয় তাই করে বলল, হুজুর। বলে, মালিকের হুকুম আছে। তোর এতে কথা বলবার কী দরকার। অন্ধকার হবার পর দেখি সহিস ঘোড়াটাকে খুলে নিয়ে বের হচ্ছে। আগেরবার বলতে গিয়ে গালি খেয়েছি, তাই তখন আর আমি কিছু বলতে সাহস পাইনি।”

আমি মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখে বললাম, “গফুর খান তাহলে তার টাকাপয়সা নিয়ে পালিয়েই গেছে, হুজুর। এ ছাড়া আর তো কিছু হতে পারে বলে মনে হচ্ছে না।”

“আমারও তাই মনে হচ্ছে, মীরসাহেব। হায়দরাবাদে ওর অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। ওখানেই পালিয়ে গিয়ে থাকবে। মানুষ এত অকৃতজ্ঞও হয়? আমার ছেলেবেলার বন্ধু। এত সুযোগ দিলাম, তিন হাজার ঘোড়সওয়ারের সেনাপতি বানিয়ে দিলাম, কিন্তু শেষে আমাকেই ছেড়ে চলে গেল?” বলতে বলতে খানের চাকরবাকরগুলোর দিকে তাকিয়ে চিতু বলে, “যাও হে তোমরা। তোমাদের আরে কী দোষ! খানের অন্য ঘোড়াটাকে আমার আস্তাবলে নিয়ে বেঁধে রেখে এস গে।”

ব্যাপারটা এখানেই ধামাচাপা পড়ে গেল। এরপর আমরা প্রায় প্রতি রাতেই দুটো একটা করে পিন্ডারি শিকার করতে শুরু করলাম। কিন্তু সেসময় নেমাওয়ার যত এগিয়ে আসছে ততই একটা দুটো করে পিন্ডারি দল ছেড়ে পালাচ্ছে। ফলে দু-একটা লোকের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ হয়নি। তার ওপর কাছাকাছি একটা ফিরিঙ্গি সৈন্যের দল আমাদের তাড়া করে চলেছে তখন। তার মধ্যে এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কারও মাথা ঘামাবার সময় ছিল না।

শেষ পর্ব

এখন এই সম্পূর্ণ লেখাটি জয়ঢাক প্রকাশন থেকে পুস্তকাকারে পাবেন। ঘরে বসে কপির জন্য মেইল করুন joydhakbooks@gmail.com

সীমান্তের অন্তরালে

সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলন ও সম্পাদনা—শ্রীমতী স্বপ্না লাহিড়ী

“১৮৩৮-৪০ সালের যুদ্ধে জেনারেল এলফিনিস্টন যে ভুল করেছিলেন কাবুল শহরে সৈন্যাবাস করে, রবার্টস সেরকম ভুল করলেন না। তিনি বালাহিসার প্রাসাদের উত্তরে বিমারু পাহাড়ের গায়ে শের আলির অসমাপ্ত দুর্গ শেরপুরে ক্যান্টনমেন্টে স্থাপিত করলেন।

“কাবুলের আশেপাশে রবার্টসকে উপজাতীয় সৈন্যদের সঙ্গে কয়েকটি বড়ো লড়াই লড়তে হয়েছিল, নিজের সৈন্যদলের তুলনায় অনেক বড়ো বড়ো দলের সঙ্গে। কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের আঙিনায় পৌঁছেও তিনি জয়ের নিশান ওড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা করা তাঁরও আর হয়নি। মহম্মদ জান নামক এক আফগান সর্দার এক লক্ষ যোদ্ধার বাহিনী নিয়ে হামলা করলেন এবং হিসার প্রাসাদ ও কাবুল শহর অধিকার করলেন। রবার্টস তাঁর সৈন্যদল নিয়ে শেরপুর দুর্গে অবরুদ্ধ হলেন। তাঁর বাহিনীতে মাত্র সাত হাজারের কাছাকাছি সৈন্য ছিল। মহম্মদ জান তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে শেরপুর দুর্গে ঝাঁপিয়ে পড়েন কোন দিন, কোন সময় তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল দুর্গের ভিতর।

“ইতিমধ্যে রবার্টস গুপ্তচর মারফত জানতে পারলেন মহম্মদ জানের দুর্গ আক্রমণের সবিস্তার পরিকল্পনা। মহম্মদ জান ঠিক করেছিলেন যে দুর্গের দক্ষিণ এবং পশ্চিমদিকের প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করে হামলা করবে একটি ছোটো সৈন্যদল। ব্রিটিশ সৈন্যদল নিজের সমগ্র শক্তি দিয়ে স্বাভাবিকই সেই দুইদিকে নিয়োজিত করবে। সেই সময় তাঁর মূল বাহিনী দুর্গের পূর্বদিকের প্রাচীরের ফাটল দিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদলকে পিছন থেকে আক্রমণ করবে। মহম্মদ জানের পরিকল্পনা জানতে পেরে রবার্টস উপযুক্ত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। রবার্টস গান্ডামাতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চার্লস গাফকে হেলিওগ্রাফে আদেশ দিলেন তাঁর সৈন্যদল সমেত সত্বর কাবুলে চলে আসতে। গাফের সৈন্যদলে মাত্র তেরশো যোদ্ধা ছিল। কিন্তু সেই দল সময়মতো এসে পড়লে অন্তত কিছুটা সাহায্য পাওয়া যাবে। দুর্গের ভিতর রবার্টস দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে কিছু সৈন্য মোতায়েন করে বাদ বাকি সৈন্য পূর্বদিকে জড়ো করলেন, আর তাঁর কামানের সমস্ত মুখ পূর্বদিকে ঘুরিয়ে সাজালেন।

“প্রতীক্ষিত আক্রমণ আরম্ভ হল। দুর্গের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে রাইফেল ফায়ার শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরের ওপর হামলা। দুর্গের ভিতর থেকেও ফায়ার আরম্ভ হল উত্তরে। সেই সময় কাতারে কাতারে হাজার হাজার আফগান আক্রমণ করল দুর্গের পূর্বদিকে। আফগানরা রাইফেল ফায়ার করতে করতে ঝড়ের মতো ছুটে চলল। যখন আফগান সৈন্যের তরঙ্গ আর্টিলারি কামানের স্টার শেলের পাল্লার মধ্যে পৌঁছেছে তৎক্ষণাৎ ঘন ঘন কামান গর্জন আরম্ভ হল দুর্গের ভিতর থেকে। একেকটি স্টার শেল ফাটে আর শত শত আফগান ধরাশায়ী হয়। মহম্মদ জানের আফগান সৈন্য, তরঙ্গের পর তরঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্গের পূর্বদিকের ফাটলের ভিতর প্রবেশ করার প্রয়াসে, আর রবার্টসের নিখুঁতভাবে সাজানো কামানের সারি ঘন ঘন স্টার শেল উদ্গিরণ করে তাদের শেষ করে দেয়।

“এমনি করে যুদ্ধ চলল সমস্ত রাত আর পরদিন দুপুর পর্যন্ত। মহম্মদ জানের সেই বিশাল সৈন্যদল ক্ষতবিক্ষত হয়ে রণে ভঙ্গ দিল। কাবুল শহর ও বালাহিসার প্রাসাদ আবার ব্রিটিশের অধিকারে এল। তারপর কাবুলে জেনারেল রবার্টসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস আর কারোর হয়নি।

“আফগানিস্তানকে দুর্বল করে রাখার উদ্দেশ্যে রবার্টস এক পরিকল্পনা পেশ করে গভর্মেন্টের কাছে সুপারিশ করলেন দেশটাকে তিন ভাগে ভাগ করে খণ্ডিত করতে। তাঁর পরিকল্পনা, হিরাট অঞ্চল অর্পণ করা পারস্যের হাতে, কান্দাহারে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তন, আর বাদ বাকি দেশটায় একজন ব্রিটিশের অনুগত আমিরের শাসনাধীনে রাখা। লর্ড লিটনও সে প্রস্তাবে সায় দিলেন।

“কিন্তু গোল বাধল রাজার অভাবে। হিরাট ও কান্দাহার বাদ দিয়ে যা থাকবে তার জন্য একটা রাজা দরকার। ইয়াকুব খাঁ আর রাজা হয়ে থাকতে চাইলেন না। কণ্টকময় রাজসিংহাসন অপেক্ষা একজন সাধারণ ব্রিটিশ প্রজা হয়ে হিন্দুস্থানে থাকা বাঞ্ছনীয় বলে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন জেনারেল রবার্টসের কাছে। কাজেই ইয়াকুব খাঁকে হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মুশকিলে পড়লেন, একজন রাজা কোথায় পাওয়া যায়। আজকালকার দিন হলে দেশবিদেশের সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন দিলেই কাজ হাসিল হয়ে যেত। ঝুড়ি ঝুড়ি দরখাস্ত এসে পড়ত সেই পোস্টের জন্য। এ যুগের অনেক দেশের রাজা এবং রয়াল ফ্যামিলি মেম্বাররা রাজ্য হারিয়ে বসে বেকার জীবন যাপন করছেন। তাঁরা এগিয়ে আসতেন ইন্টারভিউ দিতে।

“কিন্তু সে যুগে আফগানিস্তানের জন্য ব্রিটিশের মাপকাঠি অনুযায়ী রাজা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। আফগানিস্তান রাজবংশের কোনও সুশীল ও সুবোধ রাজপুত্র মাথায় তাজ পরতে চাইল না। কারণ, ব্রিটিশ কর্তৃক স্থাপিত রাজার গর্দান যেতে দেরি লাগবে না ব্রিটিশ সৈন্য কাবুল থেকে চলে যাবার পর।

“জেনারেল রবার্টস তাঁর অনুসন্ধানের ফলে জানতে পারলেন যে ভূতপূর্ব আমির শের আলির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফজল খাঁর পুত্র আবদুর রহমান খাঁ কাবুল সিংহাসনে বসার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। তিনি ইতিপূর্বে একবার শের আলিকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজের পিতাকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কিন্তু আফজাল খাঁ নিজের অলস প্রকৃতির ও মদিরায় আসক্তির জন্য সিংহাসন হারিয়েছিলেন শের আলির হাতেই।

“আবদুর রহমান সে সময়ে রাশিয়ায় বাস করছিলেন এবং একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করে রুশ-আফগান সীমান্তে এসে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন সিংহাসন দখলের। জেনারেল রবার্টস আবদুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কাবুলের সিংহাসন তাঁকে দেবার প্রস্তাব করলেন। আবদুর খাঁ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি ত্রিখন্ডিত আফগানিস্তানের মাত্র

এক খণ্ডের ছোটো গণ্ডির মধ্যে রাজত্ব করতে অস্বীকার করলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করলেন সমগ্র আফগানিস্তান। অন্যনোপায় হয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে গোটা আফগানিস্তানই তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে এই শর্তে যে তিনি ব্রিটিশের অনুগত হয়ে থাকবেন এবং তাঁর কোনও কার্যকলাপ ব্রিটিশ স্বার্থবিরোধী হবে না। সেইরূপ চুক্তি সম্পাদিত হল এবং আবদুর রহমান খাঁ আফগানিস্তানে প্রবেশ করার প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন।

"আবদুর রহমান খাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া হওয়ার পরেই জেনারেল রবার্টসের কাছে দুঃসংবাদ এল, কান্দাহারে ব্রিটিশ ফৌজকে পরাস্ত করেছেন শের আলির আরেক পুত্র আয়ুব খাঁ। আয়ুব খাঁর সৈন্যবাহিনী কান্দাহারে মোতায়েন ব্রিটিশ ফৌজ অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল এবং সেখানে ব্রিটিশ সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বারোজ আয়ুবের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের মুখে দাঁড়াতে না পেরে কান্দাহার দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন ও সেখানে অবরুদ্ধ অবস্থায় আছেন। কাবুল থেকে রবার্টস আবার ছুটলেন নিজের ফৌজ নিয়ে কান্দাহারে। যদিও তাঁর বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা আয়ুবের সৈন্যের তুলনায় অনেক কম ছিল, কিন্তু তিনি তাঁর রণকৌশলে শেষপর্যন্ত আয়ুব খাঁকে পরাজিত করলেন।

"আবদুর রহমান খাঁ আমিরের তাজ পরে আফগানিস্তানের সিংহাসনে বসলেন এবং দোস্ত মোহম্মদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুচারুরূপে রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করলেন।"

১৬

"আবদুর খাঁর দেশ শাসনপর্ব এখন মুলতুবি রেখে আমরা ফিরে যাই অতীতের সেই জোয়াকি যুদ্ধের আরেকটি অধ্যায়ে। সেই অধ্যায়ে আফ্রিদি খণ্ড জাতি জাকাখেলের সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধটাই মুখ্য, জোয়াকিদের কাহিনীটি যদিও গৌণ, কিন্তু এর মধ্যে পাখতুনদের আরেকটি দিক দেখতে পাওয়া যায়।

"জাকাখেল খণ্ড জাতি থাকে খাইবার পাসের বারা এবং বাজার উপত্যকায়। সেখানে কদম গ্রামের অখতার খাঁর বিবাহ হয়েছিল জোয়াকিদের পায়া গ্রামের দিলদার খাঁর ছোটো বোন নসিবের সঙ্গে। দুই পরিবারের মধ্যে জানাশোনা ছিল অনেকদিনের, আর তাদের মধ্যে সদ্ভাবও ছিল। একদিন কী একটা ছোটো ব্যাপার নিয়ে দিলদার আর অখতারের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হল। কী বিষয় নিয়ে তর্ক হচ্ছিল তা জানা নেই, কিন্তু শুনেছি বিষয়টি অকিঞ্চিৎকর। ক্রমে তর্ক থেকে কলহে গিয়ে দাঁড়াল এবং রাগের মাথায় দিলদার অখতারকে বেহায়া ও বেইমান বলে বসল। অখতার কোমরবন্ধ থেকে ছোরা বের করে দিলদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দিলদারের ছোটোভাই ছুটে গেল দিলদারকে সাহায্য করতে আর অখতারের ছুরি আমূল বিঁধে গেল তার বুকে। দিলদার তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে প্রতি আক্রমণ করার আগেই অখতার নিজের ঘোড়াটির পিঠে লাফ দিয়ে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল নিজের গ্রামে।

"কয়েকবছর পরে একদিন অখতারের ছোটোভাই যাচ্ছিল জাকাখেল এলাকার বাইরে একটি সরু পথ ধরে পায়া গ্রামের পাশ দিয়ে। পথের ধারের একটি ঝোপ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে দিলদার ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর এবং তরোয়াল দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করল। তখন থেকে চলে আসছে দুই পরিবারের মধ্যে শোধবোধের পালা। তিন পুরুষ ধরে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে চলে আসছে শত্রুতা।

"বংশানুক্রমিক সেই শত্রুতার ফলে জোয়াকি-যোদ্ধা চমন গুলের হাতে একসময় মৃত্যু হল সাদিকের ছোটোভাই কাসিমের। এখন সাদিকের পালা চমন গুল পরিবারের যেকোনও একটি পুরুষের প্রাণ নেওয়া।

"এমন অবস্থায় জোয়াকিদের এলাকা ইংরেজ সৈন্যের অধিকারে চলে যাওয়ায় একটি জোয়াকি লশকরের যোদ্ধারা আশ্রয় নিল জাকাখেলদের গ্রামগুলিতে। জাকাখেলদের কদম গ্রামে মহম্মদ সাদিক খাঁর বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এক আঁধার রাতে পৌঁছল জোয়াকি লশকরের চমন গুল ও আরও কয়েকজন লোক। সাদিক খাঁর বৃদ্ধা মা একটি প্রদীপ হাতে নিয়ে এলেন বাড়ির প্রাঙ্গণে অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে। বৃদ্ধা চোখে ভালো দেখতে পান না, তাই প্রত্যেক আগন্তুকের মুখের সামনে চেরাগটি তুলে ধরেন মুখ চিনবার জন্য। চমন গুলের মুখের ওপর প্রদীপটি তুলে ধরতেই চমন বৃদ্ধার মুখ দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে ঘুরে পা বাড়াল বাইরে যাবার জন্য। বৃদ্ধা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'চমন, চলে যেও না। আমরা পাখতুনদের আইনের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকি। সেই আইনের নির্দেশ অনুসারে যেমন প্রতিশোধ নেওয়া অবশ্য কর্তব্য, আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়দানও তেমনি অপরিহার্য। রক্তের দেনাপাওনা এখন মুলতুবি থাকল। আমার ছেলে সাদিক আইন লঙ্ঘন করে প্রতিশোধ নিতে পারে না এমন সময়। তবে আতিথ্য যখন শেষ হবে, তখন আমাদের বংশের রক্তের বদলে রক্ত নিশ্চয় আদায় করব।'

"চমন গুল উত্তর দিল, 'ধন্যবাদ। আমি ভুল করে এ বাড়িতে প্রবেশ করেছি। তবে আমি আজ আপনার আতিথ্য গ্রহণ করলাম। ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে আমি হিসাবনিকাশের জন্য প্রস্তুত থাকব।'

"জাকাখেলদের মধ্যেও ইংরেজ বিদ্বেষ ঘনিয়ে উঠেছিল। তারা ইংরেজ দ্বারা আফগানিস্তান আক্রমণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিল। আফগানিস্তান তাদের পিতৃভূমি। তারা খাইবারের পথে ইংরেজ সৈন্যের আফগানিস্তান অভিযান নির্লিপ্তভাবে

দেখতে পারে না। তাদের শক্তি ইংরাজের তুলনায় তুচ্ছ। তাদের যোদ্ধা সংখ্যা মাত্র চার-পাঁচ হাজার এবং নিকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কিন্তু তাদের পিতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার কর্তব্য তাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর নয়।

"একটি সামরিক সিগনালার্স দল মেজর পিয়রসনের অধীনে আফগানিস্তান অভিযানকারী ইংরেজ সৈন্য ও পেশাওয়ারে সামরিক হেডকোয়ার্টারসের মধ্যে খবরাখবর আদানপ্রদানে রত ছিল। জাকাখেলদের একটি ছোটো লশকর ইংরেজ সিগনালার্স দলের ওপর হামলা চালিয়ে দলটিকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। ঘটনাটি ছোটো এবং আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ হলেও এটি ছিল বড়োরকমের গোলযোগ সৃষ্টির ইঙ্গিত। আফগানিস্তান আক্রমণকারী ব্রিটিশ সৈন্যের জীবনসূত্র বাঁধা ছিল খাইবার ও কুরম গিরিবর্ত্মের যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে। যেকোনও একটি গিরিবর্ত্মের, বিশেষ করে খাইবারের পথ ছিন্ন হলে আফগানিস্তানে ইংরেজ সৈন্যের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠতে পারে। ব্রিটিশের পক্ষে যেকোনও মূল্যে গিরিবর্ত্মগুলি দিয়ে তাদের সৈন্য চলাচল অব্যাহত রাখা একান্তই প্রয়োজন। অতএব ইংরেজ কর্তৃপক্ষ জাকাখেলদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা দ্রুত হাতে নিলেন।

"সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য ইংরেজ ব্যবহার করতেন তিনটি অস্ত্র - কূটনীতি, ছলচাতুরি ও আধুনিক মারণাস্ত্র। ইংরাজের ইন্টেলিজেন্স বিভাগ জানতে পারল যে কদম গ্রামের জাকাখেল সম্প্রদায়ের সঙ্গে কুকিখেল সম্প্রদায়ের সে সময় প্রচণ্ড মনোমালিন্য চলছে। ইংরাজের কাছে সেটা খুব সুখবর ও মস্ত সুযোগ। ইংরাজের কূটনীতির চালে কুকিখেলরা ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্যে কদম গ্রাম আক্রমণ করতে রাজি হয়ে গেল।

"কুকিখেলদের একটি বড়ো লশকর এসে কদম গ্রামের ওপর চড়াও হল। তাদের পিছনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কিছু ইংরেজ পদাতিক সৈন্য। প্রত্যেক গ্রামেই আছে সুউচ্চ মিনার এবং গ্রামের চারদিকে প্রশস্ত দেয়াল। আক্রান্ত হলে মিনার থেকে সুরক্ষিত অবস্থায় গ্রামবাসীরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালায় আক্রমণকারীদের ওপর। সেই গুলিবৃষ্টির মুখে আক্রমণকারীদের গ্রামে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

"কুকিখেল দ্বারা গ্রাম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা নিজেদের জাজয়েল নিয়ে পৌঁছে গেল মিনারের ভিতর। কিছু লোক ছড়িয়ে পড়ল দেয়ালের পিছনে। মিনারের ভিতর থেকে ও দেয়ালের পিছন থেকে গ্রামবাসীদের গুলিবর্ষণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে কুকিখেলরা পিছিয়ে গেল। বার বার চেষ্টা করেও গ্রামের দেয়াল অতিক্রম করতে পারল না। তখন ইংরেজ গোলন্দাজরা কামানের গোলাবর্ষণ আরম্ভ করল। গোলার আঘাতে মিনার ভেঙে পড়ল, দেয়ালের বেড়া চুরমার হয়ে গেল। তখন আর কুকিখেল লশকর ও ব্রিটিশ পদাতিক সৈন্যকে ঠেকানো গেল না। গ্রামবাসীরা ছুটল পাহাড়ের দিকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

"সাদিক খাঁ দেয়ালের আড়াল থেকে শত্রুর ওপর জাজয়েল ফায়ার করছিল। হঠাৎ কামানের গোলার একটা টুকরো তার বাঁ কাঁধের ওপর দিকটা ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সাদিক মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হওয়ার দরুন সে ক্রমে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। প্রতিক্ষণে তার অবস্থা সংকটজনক হতে লাগল। যদি তার কাঁধের রক্তক্ষরণ অচিরে বন্ধ না করা যায় তাহলে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু সেই ডামাডোল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে কে তাঁকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করবে? তার ক্ষতস্থান থেকে ক্রমাগত রক্ত গড়িয়ে চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হ্রাস হয়ে চলেছে। মৃত্যুর কালো হাত তার দিকে এগিয়ে আসছে। এমন সময় একটি লোক নিঃশব্দে তার কাছে এসে নিজের পাগড়ি থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে সাদিকের ক্ষতস্থান বেঁধে দিল, তারপর তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গ্রামের এক অন্ধকার কোণ দিয়ে বেরিয়ে গেল গ্রামের বাইরে পাহাড়শ্রেণীর দিকে। চেতনা সম্পূর্ণ রূপে হারাবার পূর্বে সাদিক চিনতে পারল তার প্রাণরক্ষাকারীকে, সে বংশপরম্পরায় তার শত্রুচমন গুল।

"কুকিখেল দ্বারা কদম গ্রাম আক্রমণ ও ধ্বংসের খবর তড়িৎবেগে ছড়িয়ে পড়ল বাজার এবং বার উপত্যকার সমস্ত জাকাখেলদের মধ্যে। তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে ইংরাজের কামানের সাহায্য ছাড়া কুকিখেলদের সামর্থে কুলোত না কদম গ্রাম ধ্বংস করা। আসল শত্রু ইংরেজ। গোটা বাজার ও বারা উপত্যকার জাকাখেলরা চঞ্চল হয়ে উঠল।

"খাইবার পাসের যত্রতত্র ব্রিটিশ সৈন্যের ওপর হামলা আরম্ভ করল জাকাখেল খণ্ড জাতি। খাইবার পাস দিয়ে সৈন্য চলাচল ভয়াবহভাবে বিঘ্নিত হয়ে উঠল। আফগানিস্তানে যুদ্ধরত ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য রসদ প্রভৃতি পাঠাবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। বোঝা যাচ্ছিল, খাইবার পাস জাকাখেলদের হাত থেকে মুক্ত না করতে পারলে আফগানিস্তানে অভিযানকারী ইংরেজ ফৌজের দুর্বিপাক অবশ্যম্ভাবী।

"খাইবার পাসের নিরাপত্তার ভার ছিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল মডের ওপর। জাকাখেলদের দমন করার উদ্দেশ্যে মড স্বয়ং একটি সুসজ্জিত ফৌজ নিয়ে চড়াও হলেন বাজার ও বারা উপত্যকার ওপর। সহকারী সেনাপতিরূপে সঙ্গে নিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টাইটলারকে।

"জাকাখেল অপারেশন ফোর্সে ছিল পাঁচটি দূরপাল্লার কামান, দুটি অশ্বারোহী সৈন্যদল, এক কোম্পানি সামরিক এঞ্জিনিয়ার ও দু'হাজারেরও বেশি পদাতিক সৈন্য। ফৌজের সঙ্গে ছিল প্রচুর সামরিক উপকরণ, অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং অঢেল রসদ। জেনারেল মড ফৌজটিকে দু'ভাগে ভাগ করে, একটি সৈন্যদল দিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টাইটলারের অধিনায়কত্বে ও আর অন্য দলটির সেনাপতিত্ব নিলেন নিজে।

"জেনারেল মড আলি মসজিদ শিবির থেকে সোজা জাকাখেলদের এলাকায় প্রবেশ করা স্থির করলেন এবং টাইটলারকে হুকুম দিলেন ডাক্কা ফোর্ট থেকে যাত্রা করে সফেদ কোহ পর্বতমালার মধ্যে সিসোবি গিরিবর্ত্ম দিয়ে এগিয়ে বাজার উপত্যকায় মডের মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে। সফেদ কোহ পর্বতমালার সিসোবি গিরিবর্ত্ম দিয়ে টাইটলারকে পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিল যাতে আক্রান্ত হয়ে জাকাখেলরা সফেদ কোহ পাহাড়ের মধ্যে পশ্চাদপসরণ করে আত্মগোপন করতে না পারে।

"রাতের অন্ধকারে মড ও টাইটলার নিজের নিজের সৈন্যদল নিয়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে আগুয়ান হলেন। জেনারেল মডের পরিকল্পনা ছিল ভোরবেলায় অকুস্থলে পৌঁছে অতর্কিতে জাকাখেলদের আক্রমণ করবেন। কিন্তু সেটা সঠিকভাবে কার্যে পরিণত করতে পারা গেল না। মানচিত্র দেখে শুধুমাত্র আনুমানিক দূরত্বই জানা ছিল জেনারেল মডের। পথের মধ্যে প্রাকৃতিক বাধার এবং

পথের দুর্গমতার হদিশ মানচিত্রে ছিল না। কাজেই জেনারেল মডের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভোরবেলায় গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারলেন না, পৌঁছলেন বিকালবেলায়। টাইটলারের সৈন্যদল তখনও সেখানে উপস্থিত হতে পারেনি। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট পথ ছিল আরও দুর্গম। সেইজন্য জেনারেল মডের সঙ্গে মিলিত হতে তাঁর আরও একদিন সময় লাগল।

"জাকাখেলদের কয়েকটি গ্রামের আশেপাশে মড এবং টাইটলার সৈন্য সাজালেন। ভারী কামানগুলিকে উপযুক্ত স্থানে বসানো হল। তারপর আরম্ভ হল সংহারের পালা। জেনারেল টাইটলারের কামানের গোলার আঘাতে জাকাখেলদের নিকাই নামক গ্রামের মিনারগুলি সব একে একে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হালওয়াই নামক আর একটি গ্রাম ঘিরে ফেললেন জেনারেল মড। তারপর মেগাফোনের মারফত খাঁটি পশ্তো ভাষায় গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললেন, 'গ্রামের সমস্ত পুরুষ মানুষ নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রামের বাইরে এসে আত্মসমর্পণ কর। আমার সৈন্য তোমাদের গ্রামটিকে ঘিরে রেখেছে, আমার ভারী কামানগুলিও প্রস্তুত আছে তোমাদের গ্রাম ভূমিসাৎ করার জন্য।'

"কদম গ্রাম ধ্বংস হওয়ার পর সেই গ্রামের বাসিন্দারা আশ্রয় নিয়েছিল হালওয়াই গ্রামে। তাদের সঙ্গে ছিল কিছু সংখ্যক জোয়াকি যারা পায়া গ্রাম ধ্বংস হওয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল কদম গ্রামে। কদম গ্রামের সাদিক খাঁ তখন আর চমন গুলের আশ্রয়দাতা নন। তিনি নিজেই আশ্রয়প্রার্থী। ইতিমধ্যে তাঁর কাঁধের ক্ষত প্রায় সেরে উঠেছে। কাঁধটায় আড়ষ্টতা আছে, সেই কারণে তিনি স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার জাজয়েল ফায়ার করতে পারেন না। তাঁর মনের মধ্যেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। তিনি ভুলে যেতে চান চমন গুল পরিবারের সঙ্গে শত্রুতার কথা। তিনি চেষ্টা করেও ভুলতে পারেন না যে তাঁর আহত অবস্থায় চমন গুল তাকে বিধ্বস্ত কদম গ্রাম থেকে কাঁধে তুলে নিরাপদ আশ্রয়ে না নিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যু অবধারিত ছিল।

"সাদিক খাঁ তার মানসিক দ্বন্দ্বের কথা তাঁর মাকে জানালেন। কিন্তু বৃদ্ধা তাঁর যুক্তি মেনে নিলেন না। বৃদ্ধার মতে চমন গুল সাদিকের জন্য যেটুকু পরিশ্রম স্বীকার করেছে সেটুকু যেকোনও পাখতুন তাঁর কর্তব্য মনে করে অবশ্য করত। তিনি সাদিকের

এ যুক্তি মানতে নারাজ যে কোনও সাধারণ পাখতুনের পক্ষে যে কাজটা কর্তব্য বিশেষ, বংশপরম্পরায় শত্রু চমন গুলের পক্ষে সাদিকের জন্যে সে কাজটা অবশ্য কর্তব্য হতে পারে না। বৃদ্ধা বললেন যে দুই পরিবারের মধ্যে শত্রুতা শেষ হওয়ার সময় তখনও আসেনি। তিনি দৃঢ় ভাষায় সাদিককে আদেশ দিলেন কাসিমের হত্যার প্রতিশোধ নিতে। পাখতুনদের বদলা নেবার নিয়মকানুন অত্যন্ত কঠোর এবং ইচ্ছা না থাকলেও সে নিয়ম মেনে চলতেই হবে।

"চমন গুল নিজের জ়াজয়েল কাঁধে ঝুলিয়ে চলেছে হাওলয়াই গ্রাম থেকে মাইল দুই দূরে পাহাড়ের মধ্যে একটি সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে। হঠাৎ কড়াক শব্দে জ়জয়েলের একটি ফায়ার হল আর তাঁর মাথার হাতখানেক ওপর দিয়ে সাঁৎ করে একটি গুলি গিয়ে অদূরে একটি পাথরে ঠিকরে পড়ল। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে পাহাড়ের মাথার দিক থেকে সাদিক খাঁ চিৎকার করে বলল, 'চমন, আমি দ্বিতীয়বার গুলি চালাবার আগে নিজের জাজয়েল তুলে ধর। নিজের আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। আমার দ্বিতীয় গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।' চমন গুল ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু প্রত্যুত্তরে নিজের জাজয়েল ব্যবহার করার কোনও লক্ষণ দেখাল না। কোমরে দুই হাত রেখে উত্তর দিল, 'সাদিক, তুমি কি মনে কর আমি এতই নির্বোধ যে বিশ্বাস করব তুমি মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে একজন ছ'ফুট লম্বা মানুষকে গুলি করতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছ? আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে তোমার দ্বিতীয় ফায়ার করার প্রয়োজন হত না। তুমি বোধহয় চাও যে আত্মরক্ষার তাগিদে তোমার গুলির উত্তরে আমি তোমাকে গুলি করে হত্যা করি। তুমি চাও যে এইভাবেই আমাদের শত্রুতার অবসান হোক। কারণ, তোমার পর তোমাদের পরিবারে আপাতত কোনও পুরুষমানুষ থাকবে না বদলা নেবার জন্য। কিন্তু তা হবে না, সাদিক। আমার যে হাতদুটি একদিন তোমার প্রাণরক্ষা করেছিল সে হাত আর কখনও তোমার প্রাণ সংহারের নিমিত্ত হবে না। আমাদের শত্রুতার অবসান একদিন হয়তো হবে, কিন্তু কবে, কীভাবে তা অজানা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে। তবে তুমি আমার ওপর এখনই বদলা নিয়ে শত্রুতার শেষ করতে পার। আমি তোমার বিরুদ্ধে হাত তুলব না।'

"ঠিক তখন হালওয়াই গ্রামে কামানের গুড়ুম-গুম শব্দে দু'মাইল দূরের পাহাড় কেঁপে উঠল। শব্দের প্রতিধ্বনি পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঠিকরে দূরে চলে গেল। সাদিক আর চমন অবাক হয়ে সেদিক ঘুরে তাকাল। তারপর চমন গুল বলল, 'সাদিক, আমাদের শত্রুতার নিষ্পত্তি এখন স্থগিত থাক। মনে হয় ইংরাজের সৈন্য হালওয়াই গ্রাম আক্রমণ করেছে। হালওয়াই এখন আমাদের দু'জনেরই আশ্রয়স্থল। আমাদের উচিত এখন আমাদের দুই পরিবারের রক্তের দেনাপাওনার হিসাব ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখে হালওয়াই গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।'

"সাদিক আর চমন ছুটে চলল পাহাড়ের গা বেয়ে হালওয়াই গ্রামের দিকে। গ্রামে তখন ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা আত্মসমর্পণে রাজি না হওয়ায় জেনারেল মড মৃত্যুর বন্যায় গ্রাম ভাসিয়ে চলেছেন। মুহুর্মুহু কামানের গোলার আঘাতে গ্রামের মিনার, ঘরবাড়ি সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। জাকাখেল গ্রামবাসীদের জ়জয়েল প্রায় নিস্তব্ধ। তাদের গুলি-বারুদ ফুরিয়ে এসেছে। মডের পদাতিক সৈন্য পশ্চাদপসরণকারী জাকাখেলদের ওপর গুলিবর্ষণ করে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। আর অশ্বারোহী সৈন্য তাদের ঘোড়া ছুটিয়ে জাকাখেলদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাউকে মাস্কেটের গুলিতে, কাউকে বল্লম দিয়ে আর কাউকে তলোয়ারের আঘাতে মরণের কোলে তুলে দিচ্ছে। কোনঅ কোনও পাখতুন ভিড়ের মধ্যে ধাবমান ঘোড়ার ধাক্কায় মাটিতে পড়ে তার পায়ের তলায় থেঁতলে যাচ্ছে। স্ত্রীলোক ও ছোটো ছেলেমেয়েদের গ্রামের বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবার সুবিধা দেবার জন্য কিছু গ্রামবাসী প্রাণপণ করে ব্রিটিশ সৈন্যদলকে আটকে রাখার প্রয়াস করে চলেছে।

"গ্রামের একটি গলিপথে গ্রামপ্রধান আর তাঁর কয়েকজন সহচরকে সেই সময় ঘিরে ফেলল ব্রিটিশ সোলজারের একটি দল। গ্রামপ্রধান ও তাঁর সহচরদের কাছে গুলি-বারুদ আর ছিল না। তারা জাজয়েল ঘুরিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল। জাজয়েলের কুঁদোর আঘাতে কয়েকজন সোলজার ধরাশায়ী হল। কিন্তু সেই অসমান যুদ্ধের পরিণতি যে কী তা সকলেই জানত।

"হাতাহাতি লড়াইয়ের সময় একটি পাথরে পা হড়কে গ্রামপ্রধান মাটিতে পড়ে গেলেন। দু'জন সোলজার তৎক্ষণাৎ তাঁকে লক্ষ করে বেয়নেট উদ্যত করল। ঠিক সেই সময় দুটি জাজয়েল গর্জে উঠল আর সোলজার দু'জন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

"সাদিক ও চমন সোলজার দু'জনকে ধরাশায়ী করে এগিয়ে চলল ব্রিটিশদলের অন্যান্য সোলজারদের হাত থেকে গ্রামপ্রধানকে রক্ষা করতে। কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোবার আগেই একদল অশ্বারোহী সৈন্য তাদের আক্রমণ করল। দুটি বল্লম এসে বিঁধল তাদের শরীরে, আর ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে তারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

"হালওয়াই গ্রামে জেনারেল মড তাণ্ডবলীলার মধ্যে নিজের কাজ শেষ করে সৈন্যদল নিয়ে চলে গেলেন আর একটি জাকাখেল গ্রাম ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। হালওয়াই গ্রামে ফিরে এলেন গ্রামের স্ত্রীলোক এবং অন্যান্যরা যাঁরা মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। গ্রামে আহত-নিহতদের তল্লাশ আরম্ভ হল। সাদিক খাঁর মা ও চমন গুলের স্ত্রীও তল্লাশকারীদের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা যুগপৎ দেখতে পেলেন একই জায়গায় সাদিক ও চমন পাশাপাশি পড়ে আছে। তাদের একজনের হাতের মধ্যে আর একজনের হাত রয়েছে করমর্দনের ভঙ্গিতে। দু'জনের রক্ত গড়িয়ে এক হয়ে মিশে গেছে মাটিতে। দু'জনই চেতনাহীন। তখনও তাদের ক্ষীণ নিঃশ্বাস বইছে। মৃত্যু তাদের আপাতত রেহাই দিয়েছে বলে মনে হল। সাদিকের মা দু'জনকেই নিয়ে গেলেন শুশ্রূষার জন্য গ্রামের ভিতরে। চমন গুলের স্ত্রীকেও নিয়ে গেলেন সঙ্গে।

“গ্রামের একটি ভাঙা ঘরে দু’দিন পরে সাদিকের চেতনা ফিরে এল। তখনও দূরে ব্রিটিশ সৈন্যের কামান ও মাস্কেটের গোলাগুলি বর্ষণ চলেছে গুড়ুম গুড়ুম ও কড়কড় শব্দে। হালওয়াই গ্রামের ঘরবাড়ির ভাঙা দেয়ালগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে। ইংরাজের সৈন্য তখন জাকাখেলদের অন্যান্য গ্রাম ধ্বংস করায় ব্যস্ত। চোখ খুলতে প্রথমটা সাদিকের সব ঝাপসা মনে হল, তারপর ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এল। তিনি দেখতে পেলেন বৃদ্ধা মাকে। মার মুখটি চিন্তাক্লিষ্ট, কিন্তু তাঁর ঠোঁটের কোণে হালকা হাসির আভাস রয়েছে বলে মনে হল। সাদিক ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘মা, আমি চমন গুলের ওপর গুলি চালিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার ফায়ার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। আমি আবার সুযোগের সন্ধানে থাকব। আশা করি, এবার আমার নিশানা ফসকাবে না।’

“তার মা একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, ‘সাদিক, তোমার নিজের বিবেকের সঙ্গে লড়াই আর আত্মপ্রতারণা করার প্রয়োজন শেষ হয়েছে বোধহয়। হালওয়াই গ্রামে ইংরাজের সঙ্গে লড়াইয়ে তোমার আর চমনের রক্ত একই সঙ্গে গড়িয়েছে। দুই রক্তের ধারা মিশে এক হয়ে তোমাদের রক্তে দেনাপাওনা সব শোধবোধ হয়ে গেছে। চমন যদি রাজি থাকে তাহলে আমাদের দুই পরিবারের শত্রুতা আমি এখানেই শেষ করে দিতে চাই।’

“কাছেই চমন গুল শুয়েছিল। তার চেতনা ফিরেছে আগের দিন, কিন্তু তখনও সে বেশ দুর্বল। বৃদ্ধার কথা শুনে চমন উত্তর দিল, ‘আপনার সিদ্ধান্ত আমি খুশি মনেই মেনে নিলাম। আমি আগেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম নিজের কাছে যে সাদিকের জীবননাশের জন্য কখনও হাত তুলব না। আমার তরফ থেকে শত্রুতার ভাব সেই মুহূর্তেই শিথিল হয়ে গেছে যখন আমি আপনাদের আতিথ্য স্বীকার করলাম। তারপর যখন দেখলাম ইংরাজের অস্ত্রের আঘাতে কদম গ্রামে রক্তাক্ত দেহে সাদিক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে, সেই সময়েই আমি স্থির করেছিলাম যে নিজেদের মধ্যে কলহে রক্তক্ষয় না করে পাখতুন জাতির স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে নিজের রক্ত দেব।’ এই বলে চমন গুল গড়িয়ে গড়িয়ে সাদিকের দিকে এগিয়ে গিয়ে ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল। সাদিক আনন্দোজ্জ্বল মুখে চমনের হাত ধরল।

“জেনারেল মড এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টাইটলার হালওয়াই গ্রামের পর পথে ছোটো ছোটো কয়েকটি জাকাখেল গ্রাম ধ্বংস করে এগিয়ে চললেন উপজাতির আর একটি বড়ো গ্রাম ‘চীনা’ অভিমুখে। উদ্দেশ্য ছিল গ্রামখানি ঘিরে ধরে গ্রামবাসীদের নির্মূল করা। চীনা গ্রামে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন যে গ্রামটি জনমানবশূন্য। গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে দুর্গম পাহাড়ের জঙ্গলে এবং তাদের গবাদি পশুও নিয়ে গেছে সঙ্গে। কিন্তু গ্রামে পাওয়া গেল প্রচুর খাদ্যশস্য। তাড়াতাড়িতে গ্রামবাসীরা সেগুলি সরাবার সময় পায়নি। জেনারেল মড সমস্ত খাদ্যশস্য আত্মসাৎ করলেন।

“এইভাবে জাকাখেলদের ছোটোবড়ো অনেক গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেল, তাদের খাদ্যশস্য লুঠ হয়ে গেল, অগণিত লোক ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধে হতাহত হল। জেনারেল মড সন্তুষ্ট মনে নিজের ফৌজ আর লুণ্ঠিত খাদ্যশস্য নিয়ে পা বাড়ালেন ফেরার পথে।

“নিশ্চিন্ত মনে চলছেন জেনারেল মড, সামনে বা আশেপাশে কোনও বাধা নেই। এমনি নিষ্কন্টক যাত্রাপথে এক ছোটো গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তাঁর বাহিনী। হঠাৎ ফৌজের পৃষ্ঠরক্ষী (রিয়ার গার্ড) দলের ওপর একঝাঁক গুলি এসে পড়ল। পিছন দিক থেকে অকস্মাৎ জাকাখেলদের আক্রমণে ফৌজের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা ও বিহ্বলতার সৃষ্টি হল আর সেই সুযোগে হামলাকারী জাকাখেল লশকর তাদের লুঠ হয়ে যাওয়া খাদ্যশস্য ফৌজের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। উপরন্তু ইংরেজ ফৌজের রসদ আর মালবাহী খচ্চর ও উটও নিয়ে গেল। এরপর গোটা পাহাড়ি অঞ্চলের পথে পর পর ছোটো ছোটো জাকাখেল দল ইংরেজ ফৌজকে হায়রান করে চলল। ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে জেনারেল মড পাহাড়ি অঞ্চল পার করে সমতল ভূমিতে পৌঁছবার পর জাকাখেলদের হাত থেকে রেহাই পেলেন।

“ওদিকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টাইটলার তাঁর সৈন্যদল নিয়ে ফিরছিলেন সিসেবি গিরিবর্ত্ম হয়ে। এক সন্ধ্যাবেলায় তাঁরা পৌঁছলেন একটি ছোটো উপত্যকায়। সেখানে সবুজ ঘাসে ভরা এক বিস্তীর্ণ জায়গায় রাতে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে ডেরা স্থাপন করলেন। সেখানে পাশ দিয়ে একটি পাহাড়ি নদী পড়ন্ত সূর্যের আলোর গোলাপি রঙ গায়ে মেখে চলেছে কুলু কুলু রবে। চারদিকের পাহাড়গুলিতে নানা রকমের সুন্দর গাছপালা ছেয়ে আছে। নদীর জলের কুলু কুলু আর বনের মধ্যে বাতাসের শ্রুতিমধুর ঝির ঝির শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। জায়গাটিতে এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। যুদ্ধে জাকাখেলদের গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে টাইটলারের সৈন্যদল শ্রান্ত। এখানে তাদের আশা যে এই শান্তিময় পরিবেশে রাতটা সুখনিদ্রায় কাটাতে পারবে। সৈন্যদল সেখানে নিজেদের তাঁবু খাটাল। রান্নাবান্না করে খাওয়াদাওয়ার পর কিছু সোলজারকে চারদিকের পাহাড়ে পাহারার জন্যে মোতায়েন করে বাদ বাকি সব নিদ্রাদেবীর কোলে এলিয়ে পড়ল রাতের আঁধার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে।

“জাকাখেলদের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। তাদের ঘরবাড়ি সব ধ্বংস হয়ে গেছে, খাদ্যশস্য নষ্ট করে দিয়েছে ইংরেজ সৈন্য। তাদের না আছে আশ্রয়, না আছে খাদ্য, আছে শুধু বুকের ভিতর প্রতিহিংসার আগুন আর নিজেদের দেশকে ইংরাজের কবল থেকে মুক্ত করার অদম্য স্পৃহা। মাঝরাতের গাঢ় অন্ধকারে টাইটলারের সৈন্যদল যখন ঘুমোচ্ছে, অফিসাররা হয়তো সুখস্বপ্ন দেখছেন যে জাকাখেলদের সাফল্যের সঙ্গে দমন করার জন্য কারুর হবে প্রোমোশন আর কেউ বা পাবেন বীরত্বের জন্য পদক।

“ঠিক সেইসময় জাকাখেলদের জাজয়েল কড়কড় শব্দে গর্জে উঠল চারদিকের পাহাড়ের শিখরগুলি থেকে। ব্রিটিশ সৈন্যদলের কোয়ার্টার গার্ড থেকে তীব্র সুরে বেজে উঠল বিউগল, সৈনিকদের হাতিয়ারবন্দ হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হওয়ার

নির্দেশ। ঘুমের ঘোর কাটিয়ে উঠে যতক্ষণে সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল ততক্ষণে জাকাখেলরা বেশ কিছু ক্ষতিসাধন করে অন্ধকারের আড়ালে চলে গেছে বহুদূর।

"সে রাতটা আর ব্রিটিশ ফৌজ ঘুমোতে পেল না। সজাগ এবং প্রস্তুত হয়ে থাকতে হল জাকাখেলদের সম্ভাব্য পুনরাক্রমণের মোকাবেলা করার জন্য।

"এমন সব বাধাবিঘ্ন জয় করে টাইটলার অবশেষে ফিরে গেলেন তাঁর ফৌজ নিয়ে ডাক্কা দুর্গে। খাইবার গিরিবর্ত্ম আপাতত শত্রুমুক্ত হল এবং আফগানিস্তানে অভিযানকারী ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।"

১৭

কিছুকাল বাদে একদিন মধ্যাহ্নভোজনের সময় রশিদ খাঁকে হাজির দেখে একটু অবাক হলাম। কারণ, তাঁর সঙ্গে সাধারণত দেখা হত রাতে খাবার সময়। তাও রোজ নয়। কী ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতে রশিদ বললেন, "শোন দোস্ত। আজ সন্ধেবেলা আমি একটি ছোটো চা পানের পার্টির ব্যবস্থা করেছি। সন্ধ্যা ছ'টার সময় থাল গ্রামের মালেক সাহেবের ফলের বাগানে নিমন্ত্রিত সকলে জমায়েত হবে। সরকারি চাকুরেরা বেশি নেই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। শুধু তুমি আর মেকানিক মহম্মদ জান, আর আসবে কুদরত খাঁ এবং মালেক সাহেব ও কয়েকজন পাখতুন বন্ধু।"

বললাম, "ব্যাপার কী, রশিদ? তুমি হঠাৎ পার্টি দিচ্ছ কী কারণে?"

"কারণ দুটো আছে। প্রথম হল যে আমি ওয়াজির ফোর্সের সঙ্গে ছিলাম, ওয়াজিরিস্তান অপারেশন মেডেল পেয়েছি আজকে। আর দ্বিতীয় কারণটি পরে বলব।"

আমি বললাম, "রশিদ, আমি এতদিনে তোমাকে যতটুকু জেনেছি তাতে তো মনে হয় যে ইংরেজ ওয়াজিরিস্তান অপারেশনে অকৃতকার্য হলেই তুমি খুশি হতে। কিন্তু দেখছি যে অপারেশন সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার অপারেশনে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে তোমাকেও তমগা দিয়েছে বলে তুমি খুশি হয়েছ। তোমার মনোভাব আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।"

সেদিন ছিল শনিবার। কাজেই লাঞ্চের পর আর অফিস যাবার তাড়া ছিল না। রশিদও বসে গেল আমার সঙ্গে খাবার জন্য। আধখানা মুরগি-রোস্ট আর খানকয়েক নান আরও আনিয়ে নিলাম।

রশিদ খেতে খেতে বলল, "ডিয়ার ব্রাদার, তুমি ঝট করে না বুঝেসুঝে একটা মতামত প্রকাশ করে বস। এটা তোমার একটা মস্ত দোষ। এই যে তমগা বা মেডেল, এটা নিকেল আর সিলভার দিয়ে তৈরি। এটা বিক্রি করলে রাইফেলের দু'রাউন্ড গুলি কিনতে পারা যায়। তাছাড়া পাখতুনদের মেডেল সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা আছে। মেডেল সম্বন্ধে একটা ঘটনা ঘটেছিল এ দেশে অনেকদিন আগে। দ্বিতীয় আফগান ওয়ারের সময় মোহমান্দ অপারেশনের কথা তোমাকে বলেছি, তোমার মনে আছে হয়ত। সেই অপারেশনে এক পরিত্যক্ত মোহমান্দ গ্রাম থেকে এক রুগ্ন বৃদ্ধাকে এক ব্রিটিশ জেনারেল উদ্ধার করেন এবং তাঁর চিকিৎসা করিয়ে বৃদ্ধাকে তাঁর আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়ে দেন। বৃদ্ধা জেনারেল সাহেবের ওপর খুবই খুশি হলেন এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর যুবক পুত্রকে ব্রিটিশের সেবায় অর্পণ করলেন। জেনারেল সাহেব সেই যুবককে ফৌজে ভর্তি করে নিলেন। কিছুকাল পরে মোহমান্দ অপারেশনে সাফল্য অর্জন করার জন্য অপারেশনে অংশগ্রহণকারী রেজিমেন্টগুলির জন্য বিলাতে মন্ত্রীমণ্ডল অপারেশন মেডেল মঞ্জুর করলেন। রেজিমেন্টের সবাইকেই মেডেল দেওয়া হল। সেই মোহমান্দ যুবকটি তার ব্যাটেলিয়ান কমান্ডারের কাছে নালিশ জানাল যে তাকে মেডেল দেওয়া হয়নি যদিও সে মোহমান্দ অপারেশনে যুদ্ধ করেছিল। কমান্ডার সাহেব উত্তরে বললেন যে সে মোহমান্দ যুদ্ধে অবশ্যই অংশগ্রহণ করেছিল, কিন্তু লড়াই করেছিল ইংরাজের বিরুদ্ধে। কাজেই মোহমান্দ অপারেশনে সে মেডেল পেতে পারে না। মোহমান্দ যুবকটি কমান্ডার সাহেবের উত্তরে সন্তুষ্ট হল না। তার দৃঢ় ধারণা যে মেডেলটি যখন মোহমান্দ যুদ্ধের জন্য দেওয়া হয়েছে তখন সে মেডেল তারও প্রাপ্য। কারণ, সেও যুদ্ধ করেছিল বীরত্বের সঙ্গে। কোন পক্ষে করেছিল, সেটা বড়ো কথা নয়। তোমাকে যেসব গ্রন্থের তালিকা দিয়েছি সেই গ্রন্থগুলির মধ্যে ঘটনাটির উল্লেখ পাবে। কাজেই মেডেল জিনিসটার প্রতি আমাদের একটু মোহ আছে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এতক্ষণে।

"দ্বিতীয় খবরটি হল যে তোমার ট্রান্সফারের হুকুম আসছে। তোমার ফ্রন্টিয়ার ট্রেনিং শেষ হয়েছে এবং তুমি হিন্দুস্থানে ফিরে যাচ্ছ এক সপ্তাহের মধ্যেই। তোমার পোস্টিং হচ্ছে রাওলপিণ্ডিতে। কাজেই তোমাকে একটা ফেয়ারওয়েল দিতে হবে তো, তাই একটা পার্টি দিয়েই দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছি।"

খবরটা শুনে আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, "আমার ট্রান্সফার আর পোস্টিং হচ্ছে সেকথা আমি এখনও জানতে পারিনি অথচ তুমি জানলে, সেটা কী করে সম্ভব?"

রশিদ বলল, "তুমি মনে করছ রশিদ গাঁজাখুরি হুইস্কি টেনে আবোলতাবোল বকছে। কিন্তু সরকারি খবরাখবর জানবার ব্যবস্থা আমার আছে এবং আমার সে ব্যবস্থা ত্রুটিহীন। আগামীকাল তোমার ও আমার নিমন্ত্রণ কুদরত খাঁর বাড়িতে। সকালবেলা নাস্তা থেকে আরম্ভ করে রাতের খাবার পর্যন্ত। আগামীকাল তো রবিবার। তোমার অফিস বন্ধ। তবে থালের বাইরে যাবার জন্য কর্তাদের অনুমতি প্রয়োজন হবে। সেটা নিয়ে রেখো। আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ে বেলা ন'টার মধ্যেই আমাদিশ্যমা পৌঁছে যাব।"

পাখতুনদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ মানেই সব জায়গায় একইরকম খাবারের ব্যবস্থা। অর্থাৎ তন্দুরি নান, বিরিয়ানি ও মুরগি কিম্বা দুম্বা রোস্ট। কিন্তু কুদরতের বাড়িতে কিছু রকমফের ছিল। সকালবেলা আমাদিশ্যমায় পৌঁছলাম ব্রেকফাস্টের সময়। কুদরতের স্ত্রী সলমা নাস্তা তৈরি করেই রেখেছিল। পেস্তা, বাদাম ও কিসমিসের হালুয়া এবং সবুজ চা। শুধুমাত্র মেওয়া বাটা ও খাঁটি ঘিয়ে ভাজা হালুয়া। খেতে খুবই উপাদেয় হলেও পরিমাণে বেশি খেতে পারলাম না। কিন্তু রশিদ ও কুদরত আমার ত্রুটিটা পূর্ণ করে দিল। হাজার হলেও ওরা পাখতুন, পাথর খেয়ে তাও হজম করতে পারে।

অনেক গালগল্পের মধ্যে ব্রেকফাস্ট সারা হল। তারপর কুদরত একটা সুন্দর উইঞ্চেস্টার রাইফেল দিয়ে বলল, "আমি সম্প্রতি এটা তৈরি করেছি।"

আমার মনের সন্দেহ কুদরতকে জানাতে চাইনি। তাই রশিদকে ইংরাজিতে বললাম, "এটা নিশ্চয়ই অ্যামেরিকান রাইফেল। কুদরতের এর হাতে এরকম রাইফেল তৈরি হতে পারে না।"

রশিদ আমার হাত থেকে রাইফেলটি নিয়ে নিচের লিভার টানল। এক রাউন্ড গুলি রাইফেলের ব্রিচ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। গুলির কার্টিজটি আমার হাতে দিয়ে রশিদ জিজ্ঞাসা করল, "গুলিটা কী ক্যালিবারের বলতে পার?"

আমি কার্টিজটি দেখে বললাম, "এটা তো থ্রি-নট-থ্রি এনফিল্ডের গুলি।"

রশিদ বলল, "তুমি নিশ্চয় জানো, থ্রি-নট-থ্রি বোর অ্যামেরিকায় তৈরি হয় না। এই রাইফেলটি উইঞ্চেস্টারের হুবহু নকল। কিন্তু রাইফেলের বোর রাখা হয়েছে থ্রি-নট-থ্রি। কারণ, এই ক্যালিবারের রাইফেল ও গুলি ব্যবহার করে ব্রিটিশ ফৌজ। তাই এই ক্যালিবারের অ্যাম্যুনিশান জোগাড় করা কিছুটা কষ্টসাধ্য হলেও পাখতুনদের পক্ষে অসম্ভব নয়। একটা আর্মি কনভয় লুঠ করতে পারলেই অনেক অ্যাম্যুনিশন হাতে এসে যায়। সেই কারণে পাখতুনরা যত রাইফেল তৈরি করে সবই এই বোরের।"

কুদরত বলল যে সে রাইফেলটি ফায়ার করে দেখেছে, খুব পাক্কা নিশানা। আমাদের অনুরোধ করল রাইফেলটি ফায়ার করে দেখতে। গ্রাম থেকে বেরিয়ে প্রায় আধমাইল দূরে একটি পাহাড়ের নিচে পৌঁছে সকলে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সলমাও গিয়েছিল এক থলেভর্তি আপেল নিয়ে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে পাহাড়ের গায়ে একটি লাল টুকটুকে আপেল রাখা হল। কুদরত রাইফেল লোড করে বাঁটটি কাঁধে লাগিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করল, আর আপেলটি টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এইভাবে তিনটি আপেল নষ্ট করল কুদরত। তার ফায়ার করা দেখে মনেই হল না যে সে নিশানা স্থির-টির করে ফায়ার করছে।

তারপর সলমাও একইভাবে একটি আপেল নষ্ট করল। এরপর আমার পালা। এক চোখ বন্ধ করে রাইফেলের ব্যাক সাইট ও ফোর সাইটের মধ্যে দিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে লাল রঙের আপেলটি একটি ছোট্ট বিন্দুর মতো দেখাচ্ছিল। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভালো করে এইম করে ট্রিগারে চাপ দিলাম। কিন্তু গুলিটি আপেলের প্রায় ছয় ইঞ্চি দূরে গিয়ে লাগল। পর পর তিনবার চেষ্টা করার পর আমার গুলিটি আপেলের এক পাশের একটু ছাল তুলে দিল মাত্র।

আমি রশিদের হাতে রাইফেলটি ধরিয়ে দিয়ে বললাম, "তুমি তো আমারই মতো কলম থেকে শুধু কালি ফায়ার করতে অভ্যস্ত। একবার চেষ্টা করে দেখ একটা আপেল ভেদ করতে পার কি না!"

রশিদ মুচকি হেসে রাইফেল আমার হাত থেকে নিল কিন্তু ব্রীচ লোড করল না। কুদরতকে একটা কী ইশারা করল, কুদরত একটি আপেল নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে সেটিকে আকাশের দিকে জোরে ছুড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে রশিদ পলকের মধ্যে লিভার টেনে ব্রীচ লোড করে আপেলটি মাটিতে পড়ার অনেক আগেই ফায়ার করল। আপেলটি ছোটো ছোটো টুকরো হয়ে চারদিকে ছিটিয়ে পড়ল। আমি রশিদের বিস্ময়কর নিপুণতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

রাতের বেলায় রশিদ আর আমি কার্পেটের শয্যায় শুয়ে গল্প করতে করতে বললাম, "রশিদ, তুমি আমার কাছে একেবারে অজানাই থেকে গেলে। নিজের সম্বন্ধে কিছুই বললে না কোনওদিন।"

রশিদ উত্তর দিল, "আমার জীবনীর সঙ্গে লিখিত ইতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ নেই। তবে তোমাকে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কিছুটা আভাস দেব তুমি জানতে চাইছ বলে এবং তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না বলে।

"তোমাকে কোহাট পাসের আদমখেল গ্রামবাসীদের সঙ্গে ইংরেজ স্যাপারদের প্রথম যুদ্ধের বৃত্তান্ত বলেছি। ইংরাজের স্যাপারদের তাড়াতে গিয়ে শমীর খাঁ মারা গিয়েছিলেন। তারপর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ক্যাম্বেলের ফৌজের আক্রমণের সময় সিকন্দর খাঁও মারা যান। সিকন্দরের স্ত্রী ও শিশুপুত্র এবং শমীর খাঁর পৌত্র ও পুত্রবধূ বেঁচে ছিলেন। সিকন্দর খাঁর একমাত্র বংশধর এখনও আছে। সে হল কুদরত খাঁ আর শমীর খাঁর শেষ বংশধর আমি।

"বাবা ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী পাখতুন। থাকতেন আফ্রিদি তিরাহ অঞ্চলে। মায়ের ইচ্ছা ছিল আমি কিছু লেখাপড়া শিখে কাবুল দরবারে গিয়ে কাজকর্ম করি। আমার শিক্ষা সম্বন্ধে বাবার কী ইচ্ছা ছিল জানতাম না। কিন্তু মা, বাবা মারা যাবার পর তাঁর কোনও বন্ধু মারফত আমাকে কোহাটে এক ইংরাজি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। বাবা যুদ্ধে মারা যাবার আগে ঐ তিরাহ অঞ্চলের অন্য একটি গ্রামের গুলজমানের ওপর আমার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়েছিলেন। স্কুলের পড়া শেষ করে পেশাওয়ারে কলেজে পড়তে গেলাম। আমার লেখাপড়া ও আনুষঙ্গিক খরচপত্রের জন্য টাকাপয়সা সময়মতো আমার কাছে এসে পৌঁছত অজ্ঞাত লোক দ্বারা। গুলজমান খাঁকে দেখেছিলাম মাত্র একবার, স্কুলে পড়া শেষ করার পর কোহাটে। কিন্তু তাঁর গ্রাম বা বাড়ি দেখিনি। কলেজে প্রথম গ্রীষ্মের ছুটি পড়বার পর একজন লোক পেশাওয়ারে গিয়ে আমাকে তিরাহ অঞ্চলে গুলজমানের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। গুলজমানের সংসারে শুধু তিনি আর তাঁর মেয়ে জায়েব। স্ত্রীর মৃত্যুর পর গুলজমান নিজেই মেয়েকে

লালন পালন করছেন তার তিন বছর বয়স থেকে, কাজেই সে বাপের ভীষণ আদুরে। কুড়ি বছর বয়সে সে বলতে গেলে তার বাপের ডানহাত ও তাঁর সব কাজের সাথী। গুলজমান মেয়েকে সংসারের কাজ, ক্ষেতখামারের কাজ এবং যুদ্ধবিদ্যাও ভালোভাবেই শিখিয়েছিলেন। রাইফেলের নিশানা অব্যর্থ। জায়েবের সৌন্দর্যের বর্ণনা করার মতো ভাষা আমি খুঁজে পাই না। আধফোটা গোলাপ দেখেছ, কত সুন্দর? জায়েব ছিল সেই আধফোটা গোলাপ।

"আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রেম নিষিদ্ধ। আমি কিন্তু জায়েবকে দেখেই তার প্রেমে পড়ে গেলাম। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। আমাদের দেশে খুব নিকট আত্মীয় না হলে যুবকযুবতীদের মেলামেশা করতে দেওয়া হয় না। কিন্তু গুলজমান খাঁ জায়েবের সঙ্গে আমার মেলামেশায় কোনও বাধা দিলেন না। কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম জায়েবও আমার প্রতি অনুরক্ত।

"পাখতুনদের দেশের অলিখিত আইনের চোখে আমাদের দু'জনেরই মনোভাব অত্যন্ত গর্হিত। কিন্তু মানুষের নিয়ম যাই হোক না কেন, প্রকৃতির নিয়মের শক্তির কাছে তাকে পরাজয় স্বীকার করতেই হবে। শায়ের জিগর মুরাদাবাদী তো বলেইছেন, 'পাসে অদব সে ছুপ না সকা রাজ়-এ-ইশক কা, জিস জা তুমহারা নাম সুনা সর ঝুকা দিয়া'।

"গুলজমানের বাড়িতে রঙিন স্বপ্নের মতোই আমার ছুটির সময়টা কেটে গেল। গুলজমান অবশ্য অলসভাবে আমাকে পড়ে থাকতে দেননি। ক্ষেতখামারের কাজ তিনি নিজে আমাকে শেখাচ্ছিলেন আর আমার অস্ত্রশিক্ষার ভার দিয়েছিলেন জায়েবের ওপর।

"শিক্ষয়িত্রী হিসাবে জায়েব ছিল খুব কড়া। শিক্ষার সময় আমার কোনও গাফিলতি সহ্য করত না। কিন্তু আমি তার শাসন খুবই উপভোগ করতাম। কলেজের ছুটির দিন ফুরিয়ে গেল। গুলজমান ও জায়েবের কাছে বিদায় নিলাম। গুলজমান বললেন যে কলেজের ছুটি হলেই যেন আমি বাড়িতে চলে আসি। কারণ, ইংরাজি লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় শিক্ষাও আমাকে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর কথাবার্তায় আর একটা জিনিসের ইঙ্গিত পেলাম। কলেজের পড়া শেষ হলেই জায়েবের সঙ্গে আমার শাদি হবে। পুলকিত মনে পেশাওয়ার ফিরে গেলাম।

"কলেজে গিয়ে লেখাপড়ায় আর তেমন মন বসাতে পারলাম না। সবসময়েই অন্যমনস্ক হয়ে শুধু জায়েবের কথাই ভাবতাম। পড়ার কেতাবে শুধু জায়েবের মুখই দেখছি বলে মনে হত। কয়েকদিন পরেই কলেজ কামাই করে আবার চলে গেলাম গুলজমানের বাড়িতে। বললাম, কলেজে কয়েকদিনের ছুটি হয়েছে, তাই চলে এলাম। জায়েব আমাকে দেখে খুশি হল, কিন্তু আমার কলেজের ছুটির কথা বিশ্বাস করল না। আমাকে বলল, 'সত্যি বল তো, তোমার কলেজের ছুটি হয়েছে না লেখাপড়ার ক্ষতি করে কলেজ থেকে পালিয়ে এসেছ?' আমি তাকে মিথ্যা কথা বলতে পারলাম না। চুপ করে থাকলাম।

"এরপর ফের একটা লম্বা ছুটিতে গুলজমানের বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে জায়েব আর আমি খড় জড়ো করার কাজ করছিলাম সেবার। অবশ্য খড়ের গাদার মধ্যে আমাদের লুকোচুরির খেলাও চলছে। আমি কাজের চাইতে অকাজই বেশি করছিলাম, এমন সময় গুলজমান ও তাঁর সঙ্গে জনাকুড়ি লোক ছুটতে ছুটতে বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। গুলজমান বললেন,

‘তোমরা রাইফেল নিয়ে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হও। আমার সঙ্গের লোকগুলি আমার আশ্রয়প্রার্থী। একটি ছোটো যুদ্ধের পর এদের গ্রাম ইংরাজের সৈন্য নষ্ট করে দিয়েছে ও এদের পিছু নিয়েছে।’

“সকলে রাইফেল নিয়ে ছড়িয়ে পড়লাম বাড়ির চারদিকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজের সৈন্যদল এসে আক্রমণ করল। তখন চলল রাইফেলের কড় কড় ধ্বনি দুই দলের মধ্যে। আমরা যখন সম্মুখ আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়ছি, সেই সময় কিছু সৈন্য পিছনদিক থেকে আমাদের ওপর একঝাঁক ফায়ার করল। তারপর সব নিস্তব্ধ। বেশ কিছুক্ষণ সময় পেরিয়ে গেল, কিন্তু রাইফেলের ফায়ার আর শুনতে পাওয়া গেল না। আমি আমার রাইফেলের ম্যাগাজিনে আর একটা চার্জ গুলি লোড করে বেরিয়ে পড়লাম সেই অকারণ যুদ্ধের খতিয়ান করার জন্য। প্রথমেই দেখলাম, গুলজমানের এবং আশ্রয়প্রার্থী কয়েকজনের মৃতদেহ। বাদ বাকিরা সম্ভবত পিছু হটে পাহাড়ের মধ্যে চলে গেছে। তারপর সেই খড়ের গাদার কাছে গিয়ে দেখলাম জায়েব রাইফেল হাতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার বুক আর মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে জায়গাটা লাল হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে তাকে চিৎ করে শোয়ালাম। তখনও তার চেতনা রয়েছে, কিন্তু বাঁচার কোনও আশা নেই। গুলি লেগেছিল তার পিঠে আর গলায়। তার দৃষ্টি নিষ্প্রভ, শ্বাসকষ্টও হচ্ছিল খুবই। সে তার দুর্বল তর্জনী দিয়ে ইশারায় আমার রাইফেল ও নিজের মাথা দেখাল। সে কী বলতে চাইছে বুঝতে পেরে আমি তার মাথায় রাইফেলের নল রেখে পর পর দুটি ফায়ার করে তার অসহ্য কষ্টের অবসান করে দিলাম। আধফোটা গোলাপ এক অযথা ঘূর্ণিবাত্যায় ঝরে পড়ল। রাইফেল ঘুরিয়ে নিয়ে নলটা নিজের মুখে দিয়ে ট্রিগারে চাপ দিতে গিয়ে থেমে গেলাম। পাখতুন আত্মহত্যা করে না। তার ধর্ম ‘প্রতিশোধ’, রক্তের বদলে রক্ত। আমার জীবনে আনন্দের আলো ফুটে ওঠার আগেই নিভে গেল আর জ্বলে উঠল প্রতিহিংসার আগুন। যারা আমার জীবন মরুভূমিতে পরিণত করল, তাদের রক্তপাত আর আমাদের দেশ থেকে তাদের উৎখাত করাই আমার ব্রত হল সেই ক্ষণ থেকে।

“পেশাওয়ারে ফিরে গেলাম এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করে শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলাম। তারপর নিলাম ইংরেজ সরকারের চাকুরি এবং পরিশ্রম ও ইংরেজ কর্তাদের তোষামোদি করে তাদের বিশ্বাসভাজনদের মধ্যে স্থান করে নিলাম। ঈপির ফকিরের লশকরের বিরুদ্ধে ইংরাজের ওয়াজিরিস্তান অপারেশনের কথা তো তুমি সব শুনেছ। কিন্তু তুমি জান না যে ঈপির ফকির সাহেব ছিলেন শুধুমাত্র ফকির। ধর্মগুরু হিসাবে ওয়াজিরিস্তানে তাঁর প্রভাব ছিল প্রচুর। কিন্তু যুদ্ধ চালাবার জন্য সাংগঠনিক দক্ষতা তাঁর ছিল না। যুদ্ধবিদ্যাতে তাঁর ব্যুৎপত্তিও বিশেষ ছিল না। সে বিষয়ে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন গুল শমীর নামে একটি লোক।

“প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৪-৩৫ সালের যুদ্ধটা বাধাবার মূলে ছিল গুল শমীর। বান্নুতে খাস ব্রিটিশ সংরক্ষিত এলাকা থেকে একজন হিন্দু স্ত্রীলোককে অপহরণ করিয়ে একজন পাখতুন মালেকের সঙ্গে তার বিয়ে দিল গুল শমীর। ব্রিটিশ কর্তারা খুবই অপমানিত বোধ করলেন। কারণ, স্ত্রীলোকটি অপহৃত হয়েছিল ব্রিটিশ রক্ষী সৈন্যদলের বৃত্তের ভিতর থেকে। ওয়াজিরি মালেকের কাছে ইংরাজের তরফ থেকে আল্টিমেটাম দেওয়া হল স্ত্রীলোকটিকে সত্বর ফেরত দেওয়ার জন্য। তখন ঈপির ফকির সাহেবের প্রভাবের সাহায্য নিয়ে গোটা ওয়াজিরিস্তানে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিল গুল শমীর। সমগ্র ওয়াজিরিস্তান রুখে দাঁড়াল ইংরাজের বিরুদ্ধে। ওয়াজিরি লশকরের পর লশকর আক্রমণ করল সমস্ত ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি। যুদ্ধ পরিচালনার ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন গুল শমীর এবং সমস্ত ওয়াজিরি উপজাতির মধ্যে সমন্বয়সাধনও করেছিলেন তিনি। যে ওয়াজিরিস্তানে মাসুদ, বাটানি, বঙ্গশ ইত্যাদি উপজাতিদের নিজেদের মধ্যেই লড়াই লেগে থাকত, তারা সব এক হয়ে নামল ইংরাজের বিরুদ্ধে। ঘোরতর যুদ্ধ চলল তিন বছর ধরে। স্পিনওয়ামে পাহাড়ের গুহায় ঈপির ফকিরকে ইংরেজ ধরতে যাবার ঠিক আগেই ফকির সাহেবকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছিল গুল শমীর। সে ইংরাজের প্রতিটি চালের খবর রাখত।

“বলা বাহুল্য যে গুল শমীর চলাফেরা করত ছদ্মবেশে। তুমি মনে করছ যে গুল শমীর একজন হিন্দু স্ত্রীলোককে অপহরণ করে তার বিয়ে একজন পাখতুন মালেকের সঙ্গে দিয়ে ভীষণ অন্যায় কাজ করেছিল। আমিও স্বীকার করি, কিছুটা অন্যায় হয়েছিল। কিন্তু ‘অল আর ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার’। তাছাড়া আমি জানি যে সেই স্ত্রীলোককে তার পূর্বের অবস্থার অপেক্ষা অনেক ভালো দৈহিক অবস্থায় এবং আরামে রাখা হয়েছিল ওয়াজিরি মালেকের বাড়িতে।

“ভাগ্যদোষে ওয়াজিরিদের সেই উত্থান বিফল হল। ইংরেজ তার সাম্রাজ্যের দৌলতে প্রবল শক্তিশালী। তাকে ওয়াজিরিস্তান থেকে তাড়ানো গেল না। তবে শত্রুর রক্তপাত হল প্রচুর। পাখতুনওয়ালি আইন, রক্তের বদলে রক্ত। তারপর এসে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জার্মান, ইতালি ও জাপানের আঁতাতের বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান শক্তি হল ইংরেজ। এখন সমগ্র পাখতুনিস্তানের উপজাতিদের সংগঠিত করে নামাতে হবে পাখতুনিস্তানকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য। দেখা যাক, কতদূর কী হয়। একটা ভবিষ্যদ্বাণী বোধহয় নির্ভুলভাবেই করা যেতে পারে যে বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল যে পক্ষের অনুকূলেই যাক না কেন, ব্রিটিশের সাম্রাজ্য লোপ অনিবার্য।

“কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য লোপ পেলে যে সাম্রাজ্যবাদও লোপ পাবে তা মনে হয় না। কোন পুঁজিবাদি পশ্চিম শক্তি ব্রিটিশের স্থান দখল করবে কিংবা করবে না, তা এখনই বলা কঠিন। যদি অন্য কোনও পুঁজিবাদি তথা সাম্রাজ্যবাদি পশ্চিমি শক্তির অভ্যুদয় হয়, তাহলে সেই শক্তি আর সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ নতুন করে আরম্ভ হবে আফগানিস্তানে এবং আমাদের রক্তের ফোয়ারা ছুটবে আবার। সুদূর ভবিষ্যতে পাখতুনিস্তান আবার আফগানিস্তানের সঙ্গে জোড়া লাগবে, না স্বাধীন সত্ত্বা ধারণ করবে কিংবা অন্য কোনও বৃহৎ শক্তির খপ্পরে গিয়ে রক্তাক্ত জোয়াল টেনে চলবে, তাও বলা যায় না এখনই। তবে আমার

জীবদ্দশায় আমি চেষ্টা করে যাব বিদেশির কবল থেকে পাখতুনিস্তানকে মুক্ত করাতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা একদিন সফল হবই। তবে সময় লাগবে এবং ধৈর্য ধরে সেদিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমি শায়েরের ভাষায় বলি,

অওর কুছ দের ভটক লে মেরে দরমাদা নদীম
অওর কুছ দিন অভি, জহরাব কা সাগর পী লে।
নূর অফশাঁ চলি আতি হ্যয় উরুসে ফর্দা,
হাল তারিকো সম
আফশাঁ সহি লেকিন জী লে।
(আর কিছুদিন বুকের বেদনা বয়ে
পান করে চলো গরলসাগরখানি
বেঁচে থাকো শত জীবনযাতনা সয়ে
আলোর সকাল দূর বেশি নয় জানি)

"সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কাজ করে যাচ্ছি। কোথাও রশিদ খাঁ, কোথাও গুল শমীর আর কোথাও আলেফসাহেব রূপে। এবার নতুন কী ভূমিকা তা এখনও স্থির করিনি। তোমাকে আমার অনেক ব্যক্তিগত কথা সংক্ষেপে বললাম। কারণ, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। সরকারি চাকুরিতে আমি ইস্তফা দিয়ে এসেছি। কারণ, তার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। আর তুমিও দু-তিনদিনের মধ্যে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবে। রাত প্রায় শেষ হতে চলেছে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। সকালবেলায় আমি চলে যাব। কোথায় যাব তা জিজ্ঞাসা কোরো না, করলে উত্তর পাবে না। যাবার সময় তোমাকে গুড বাই করে যাব। তুমি আমার দেশের লোক নও এবং তোমাকে আমি নিজেদের একজন বলে কখনই মেনে নিতে পারি না। তবুও তোমাকে আমার দোস্ত বলে স্বীকার করেছি এবং চিরকাল দোস্ত বলে তোমাকে মনে রাখব।"

ভোরের আবছা আলো তখন উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছে। রশিদের ডাক শুনে আমি কার্পেট-শয্যা ত্যাগ করে ঘরের বাইরে গেলাম। রশিদের দেখি নতুন মূর্তি। গায়ে শার্ট, নেকটাই, কোট নেই। বদলে সে পরে আছে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুলের কুর্তা তার ওপর পোস্তিন, ঢোল্লা সলওয়ার ও মাথার কুল্লার ওপর দড়ির মতো পাক দেওয়া পাগড়ি। বাঁ কাঁধে ঝুলছে কুদরতের তৈরি উইঞ্চেস্টার প্যাটার্নের থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল। কোমরে এক কার্তুজের ব্যান্ডোলিয়ার বেল্ট। তার একদিকে একটি ড্যাগার, অন্যদিকে একটি রিভলভার ও কার্তুজের স্ট্র্যাপ আর ডান কাঁধে কাপড়ের একটি পুঁটলি। রশিদ তার ব্রিফকেসটি খুলে স্কচের বোতল বের করল। তাতে তখনও প্রায় আধবোতল মতো হুইস্কি ছিল। একবার বোতলটির দিকে তাকিয়ে সেটাকে দূরে ছুড়ে দিয়ে বলল, "রিস্তা তোড়া ম্যয়খানে সে।"

তারপর ব্রিফকেসটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এটা তোমাকে দিলাম। এর ভিতর এক বান্ডিল কাগজ আছে। তাতে পাখতুনিস্তানের যেসব কাহিনি তোমাকে বলা হয়নি, সেগুলো সব লেখা আছে। তুমি পাখতুনদের ইতিবৃত্ত জানতে আগ্রহী, তাই তোমাকে এগুলো দিয়ে গেলাম।"

তারপর আমার সঙ্গে কোলাকুলি ও করমর্দন করে রশিদ বলল, "চললাম, দোস্ত।"

আমি শুভেচ্ছা জানিয়ে বললাম, "খুদা হ্াফিজ়।"

"খুদা হ্াফিজ়," রশিদ উত্তর দিল।

তারপর সোজা সামনের পাহাড়ের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল সে। আমার মন বিষাদে ভরে গেল। প্রায় তিনশো গজ গিয়ে রশিদ ফিরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে আবার বিদায় জানাল। তারপর তরতর করে পাহাড়ের মাথার দিকে উঠতে লাগল।

পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে রশিদ ক্ষণিক স্থির হয়ে দাঁড়াল। আমি আমার হাতের দুই তালু চোঙের মতো করে মুখের ওপর রেখে চেঁচিয়ে বললাম, "রশিদ, খুদা হ্াফিজ়।"

সে আর ফিরে তাকাল না। পাহাড়ের ও-পিঠে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার শুভেচ্ছা পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল, খুদা হ্াফিজ়, খুদা হ্াফিজ়, খুদা হ্াফিজ়।

শেষ

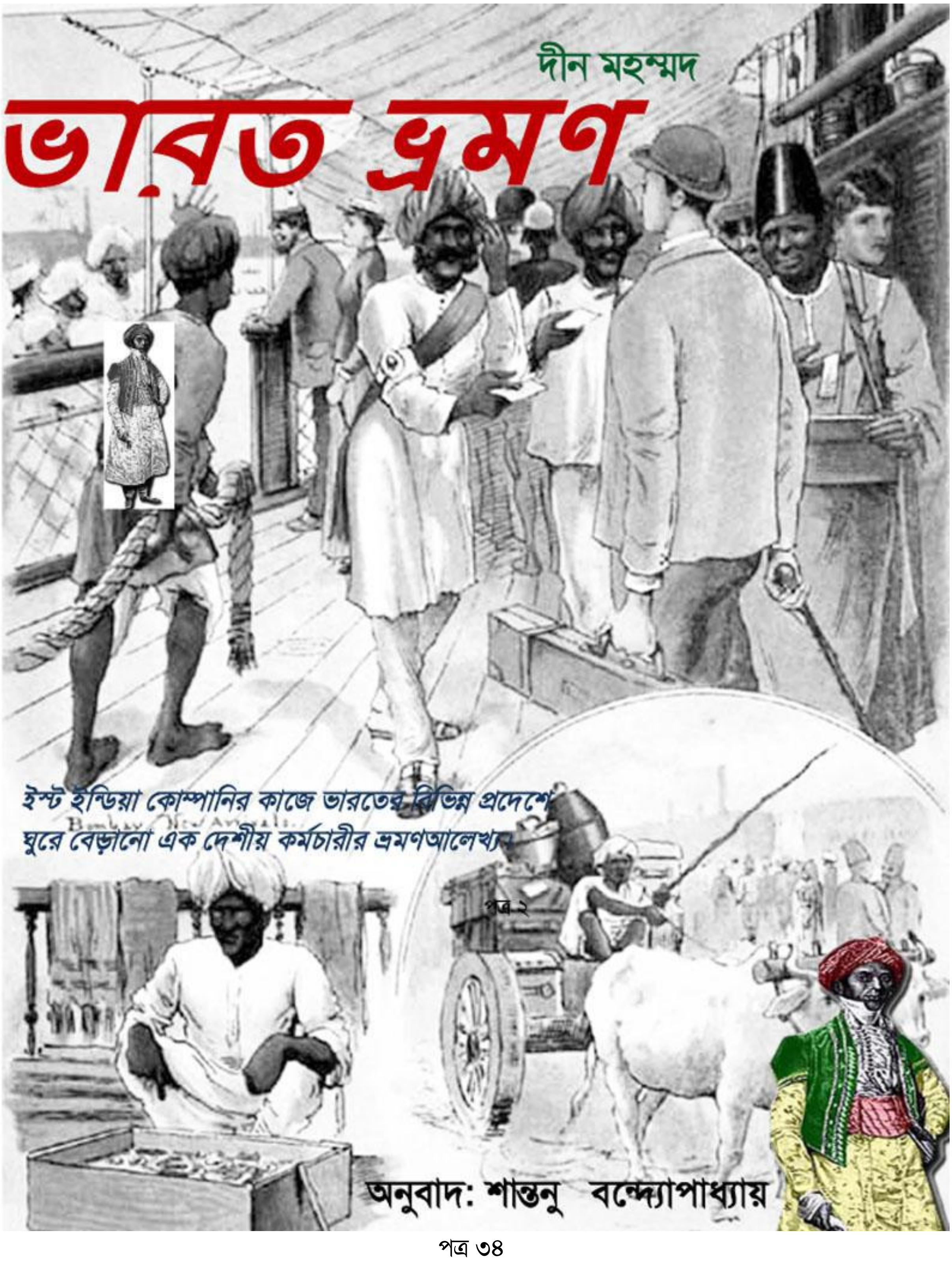

পত্র ৩৪

গোলমালটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, গাজীপুরে নতুন করে এক আরেকপ্রস্থ গোলমালের সূত্রপাত হল। গাজীপুর গোলাপ জলের জন্য বিখ্যাত ছিল। ওখানকার অধিবাসী আর ফৌজদারের মধ্যেই গোলমাল; এনার পদমর্যাদা, রাজা চৈত সিং এর কাছে যেমন ছিল, তেমনই রক্ষিত ছিল। বড়লাট মাপ করে দিয়েছিলেন একে, ফলে তিনি তার কাজকর্মেই বহাল রইল। জনগণের মধ্যে একটা অসন্তোষ ছিল, তাদের প্রাক্তন রাজার পরিণতিকে ঘিরে, ফলে তারা খুব সহজেই ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। আর এদিকে ফৌজদার তার কাজের

খাতিরেই যখন খাজনা আদায়ের চেষ্টা করলেন, সর্বত্র বাধা পেলেন, আর শেষে মানুষের রোষ থেকে অতিকষ্টে পালিয়ে বাঁচলেন।

বিদ্রোহের শুরুতেই তিনি বড়োলাটকে সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করার কথা লিখেছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। ফলে সহায়তার জন্য ক্যাপ্টেন বেকারকে তার সৈন্যদলসহ রামনগর থেকে পাঠানো হল। গাজীপুরে পৌঁছনোর পরদিন বেলুয়া নামে একটা ছোটো গ্রামের দিকে রওনা দিলাম আমরা, যেখানে বিদ্রোহীরা একটা মাটির দূর্গে একজোট হয়েছিল, বেশ ভালোরকম প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিয়ে।

এরকম একটা বিশৃঙ্খল দলের কাছ থেকে যেটা অপ্রত্যাশিত, সেটা হল প্রাথমিকভাবে আমাদের মাস্কেটিয়ারদের গুলিচালনা বেশ সাহসের সঙ্গেই প্রতিরোধ করা; কিন্তু যেই আমাদের কামানগুলো এগোতে শুরু করল, কিছু লোক পালাল, তাদের ধাওয়া করে বন্দী করা হল। আর বাকিরা, সেও সংখ্যায় প্রচুর, তাদের প্রতিনিধি পাঠাল ক্যাপ্টেনের কাছে। আক্রমণ থামানোর আর্জি নিয়ে। ক্যাপ্টেন রাজি হলেন এক শর্তে, যে যার ডেরায় ফিরে যাবে, আর জনজীবন একেবারেই বিপর্যস্ত করা যাবে না।

বন্দীদের মধ্যে একজন, ছাড়া পাওয়ার আগে, আমাদের খবর দিল যে কাছাকাছিই, সেনাপতি রামজীবনের অনেক হাতিঘোড়া মজুত রয়েছে, এবং সে আমাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারে; আমাকেই আদেশ করা হল; কয়েকজন সেপাই সঙ্গে নিয়ে তার বলে দেওয়া জায়গায় গিয়ে দেখি কয়েকজন চাষাভুষোর তত্ত্বাবধানে রয়েছে দুটো হাতি, দুটো উট আর বারোটা আরবি ঘোড়া । তারা তো বন্দুকধারী আমাদের দেখেই চম্পট দিল, আমিও শত্রুসম্পত্তি হিসেবে জানোয়ারগুলো বাজেয়াপ্ত করে সেগুলোকে গাজীপুরে নিয়ে চললাম। আমার দল ওখানেই অপেক্ষায় ছিল।

ক্যাপ্টেন বেকার একখানা মাত্র ঘোড়া নিজের ব্যবহারের জন্য রেখে বাকি সমস্ত বাজেয়াপ্ত করা জিনিস সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন, যুদ্ধের পারিতোষিক হিসেবে।

একমাস মতন থাকার পর, ক্যাপ্টেন লেন এসে গেলে আমাদের ওখানকার পাট চুকল আর আমরা জৌনপুরের দিকে চললাম। জৌনপুর সম্বন্ধে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু বলবার নেই, কিন্তু দুর্গটা চমৎকার আর বেশ কিছু ভালো অট্টালিকা আছে। তবে আমাদের শেষ সেনাছাউনি হিসেবে জায়গাটা অসাধারণ; আর হ্যাঁ, এখানকার গোলাপ জল আর গোলাপের তেল সারা এশিয়া মহাদেশে গন্ধদ্রব্যের জন্য নামকরা।

আবার একটা নতুন বখেরায় জড়াতে হল, এবারে উচ্ছৃঙ্খল জনগণকে বাগে আনতে এলাকার বেশ অনেকটা ভেতরে ঢুকতে হল আর যে দুর্গে বিদ্রোহীরা জড়ো হয়েছিল সেটাকে প্রায় দুর্ভেদ্য করে তুলেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল তীর ধনুক, ম্যাচলক নামের লম্বা নলের দিশি গাদা বন্দুক। প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে তারা দুর্গটিকে প্রায় নয় দশদিন দখলে রেখে দিয়েছিল, শেষে রাতের অন্ধকারে পালাতে বাধ্য হয়; পেছনে পড়ে থাকে কয়েকজন মৃত সঙ্গীর দেহ।

এই গন্ডগোলের পর, এলাকা মোটামুটি ঠান্ডা হল, পরের তিনমাস অন্তত আর কোনো ঝামেলা শুনতে পাইনি। বিদ্রোহীরা আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের ভয়ে আত্মসমর্পণ করত, তবু মনুষ্যত্বের খাতিরে বলতেই হয় সেসব হতভাগ্যের কথা, অযাচিত যুদ্ধ হঠাৎ যাদের চিরতরে মুছে দিল।

হায় রে বিনাশী যুদ্ধ, নির্মম তোর হাত
প্রিয়জন যতো, সকলেরে মুছি, খুলি বন্ধন হাত,
বন্ধুরে করে অশ্রুসজল, প্রিয় যাহা কিছু নিস
সারা পৃথিবীতে মৃত্যুমিছিল একা উপহার দিস।
দোষী নির্দোষ সাহসী ও ভীতু, অপচয়ী সংঘাতে
ডেকে আনে প্রেমী, বন্ধু , অনাথে ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।

মৃত্যুরে শুধু বয়ে আনে তার পাখনার গাঢ় রঙ
ভয়াল কুটিল, বন্য জটিল, কুৎসিত এক সঙ।
অসুখী, হতাশা, মৃত্যু মিছিলে, যুদ্ধের তরবারি
সন্ত্রাসী আর নিষ্ঠুর শুধু রক্তনদীতে পাড়ি
এক লহমায় মুছে দেবে হায় জনপদ হবে ফাঁকা
যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধমিছিলে যুদ্ধই থাকে একা।

জৌনপুরের কাছে একটি চ্যাপেলে মুসলমানধর্মী মানুষজনের আনাগোনা ছিল, যার নীচে বেশ বড়োসড়ো এবং বহুদূরবিস্তৃত একটা সুড়ঙ্গও ছিল। যুদ্ধের সময় কেবল দেশীয়দের আশ্রয় ও দূর্গ হিসেবে এটাকে ব্যবহার করা হত আর এর গুপ্তপ্রবেশপথ কেবল তাদেরই জানা ছিল। এখানকার বিস্তীর্ণ এলাকাতে আবার শান্তি ফিরে এলে আমরা চুনারগড়ে ফিরে গেলাম।

চিঠি ৩৫

চুনারগড়ে ফেরার কয়েকমাস বাদে ক্যাপ্টেন বেকার ইয়োরোপে যাবার মনোবাসনা ব্যক্ত করলেন। তার সঙ্গী হবার জন্য আমিও সুবেদারের চাকরিতে ইস্তফা দিলাম, কেননা ওই ভূখন্ড দেখবার প্রবল ইচ্ছে ছিল আমার, যদিও জানতাম বন্ধু পরিজন ছেড়ে ভয়ানক মনোকষ্টে দিন কাটবে আমার। একটা নৌকোয় চেপে চুনারগড় থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতার দিকে রওনা হলাম, গঙ্গানদী বরাবর তা প্রায় তিনশকিলোমিটার। আমাদের যাত্রা খুব আরামের হয়েছিল; একে তো আবহাওয়া চমৎকার, চাষিরাও ফসল কেটে সবে ঘরে তুলেছে। একপাল বলদ কোনো জমিদারের ফসল টেনে টেনে গোলায় নিয়ে যাচ্ছে, এরকম দৃশ্য দেখাও কিছু আশ্চর্যের নয়। নদীর দুপাশে চমৎকার সব জায়গা, নানাধরনের সুন্দর সুন্দর বাড়িঘরদোর, অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য আর নিস্তরঙ্গ গ্রামীন জীবনের ছবি, অবাক করবার পাশাপাশি, নয়নসুখের আনন্দে ভরিয়ে দেবেই।

এমনি যৎপরোনাস্তি সুখকর যাত্রা শেষ করে, ঢাকায় পৌঁছলাম। বাংলার সবচেয়ে বড়ো শহর। গঙ্গার পূর্বদিকের শাখানদীর পাড়ে, চব্বিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। পাঁচমাইল মতো লম্বা, কিন্তু চওড়ায় খুবই কম, আর নদীনালায় পরিপূর্ণ।
ভারতের মধ্যে প্রথম উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে ঢাকা সুপ্রসিদ্ধ, সোনা রূপা ও সিল্কের কাজে সবচেয়ে উৎকর্ষ। এখানকার সুতিরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে, যার মধ্যে মসলিন, ক্যালিকো (বিশেষ ধরণের ছাপা সুতির কাপড়), দিমিতি (উঁচু ডোরাযুক্ত শক্ত সুতিকাপড়) ইত্যাদি তৈরি হয়। অন্যান্য প্রদেশের থেকে যা বহুগুণে ভালো। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের কাপড় তৈরি হত প্রথমত মুঘল বাদশা, আর জেনানাদের ব্যবহারের জন্য, সর্বোচ্চ কারুকাজ ও উৎকর্ষ কাপড় এবং দামে অন্যান্য দেশীয় বা বিদেশীয় মানুষের কাছে যা বিক্রয় করা হত তার চেয়ে বেশি।

জরির কাজ, বিশেষত, প্রশংসার, কারিগরীদক্ষতা ধাতুর ওপর কাজ করার চাইতেও দামী। এটা এমন নয় যে ফুট করে করে বসানো, এখানকার মতো, বরং সরু সরু করে কেটে এমন সুচারুভাবে জোড়া যে খুব সুক্ষ্মভাবে দেখলেও জোড়ের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। এমব্রয়ডারি আর সূচীশিল্পের কমনীয় সৌন্দর্য বর্ণনার অতীত, এবং তুলনায় ওইধরণের ইউরোপীয় যেকোনো জিনিসের চেয়ে বহুগুণে ভালো। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এখানে কোনো মহিলা এমব্রয়ডারিকারি অথবা মহিলা সূচীশিল্পি নেই। এইসব ক্ষেত্রে পুরুষেরাই যাবতীয় কাজ করে থাকে, আর তাদের ধৈর্য দেখে চমৎকৃত হতে হয়, ধীরতায় একমেবদ্বিতীয়ম।

সবরকমের জিনিস ঢাকায় পাওয়াও যায় আর সস্তাও। উর্বর মাটি, অবস্থানের সুবিধে, বহুকাল থেকেই ঢাকাকে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র করে তুলেছে। শক্তিশালী একটি দূর্গের ভগ্নাবশেষ আজও আছে এখানে, আর তার মধ্যে এত ভারী একখানা কামান বসানো হয়েছিল, এই মাত্র কিছুকাল আগেই, সেটা নদীর একদিকের পাড়শুদ্ধ ভেঙে নদীগর্ভে গিয়ে পড়ল; সেপাড়েই কামানটিকে স্থাপন করা হয়েছিল; সেটা দৈর্ঘে চোদ্দ ফুট, সাড়েদশ ইঞ্চি, আর কামানের নলের ভেতরের দিকটা ১ ফুট ৩ ১/৮ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত। এতে রট আয়রনের

পরিমাপ ছিল দুশ চৌত্রিশ হাজার চারশ তেরো ঘনফুট। কামানটার ওজন চৌষট্টি হাজার চারশ আঠারো পাউন্ড এবং এর গোলার ওজন চারশ পঁয়ষট্টি পাউন্ড।

এক বড়োসড়ো নবাবের বাস এখানে, পুরোনো রীতি অনুযায়ী, সিংহাসনে বসার সময়, অনেকটা ভেনিসের "ডোজে"দের মতো, নদীর বুকে একদিন বজরায় ঘোরেন; বজরাখানাও দেখার মতো, নাম শ্যামসুন্দর, অদ্ভুতরকম, পৃথিবীতে এমনটা বুঝি আর নেই। বজরাটি রুপো দিয়ে মোড়ানো। ঠিক মাঝখানে একটা রাজকীয় বেদী, রাজ্যাভিষেকের সময় যার ওপর সিংহাসন রাখা হয়। সামনের দিকে চমৎকার একটা রুপোর রেলিংঘেরা বসবার জায়গা, মাথার ওপর ঝলমলে চাঁদোয়া, তাতেও নানারকম সোনারুপোর কাজ করা; আর তার নীচেই মহামান্য নবাববাহাদুর বসেন। এই বজরাখানা, আর সঙ্গে আরো একখানা, নবাবের কাছের লোকই জানাল, মোটামুটি লাখখানেক টাকা দাম। তিনি সবসময় পাত্রমিত্র, গন্যমান্য লোক পরিবৃত হয়েই থাকেন, আর এসব অনুষ্ঠানের সময় টাকা খরচের হিসেবের কোনো সীমাপরিসীমা নেই; পুরোনো রীতিপালনের এই অনুষ্ঠানে জাঁকজমক আর ক্ষমতা দেখানোর ব্যাপারেও কোনো কার্পণ্য নেই। এপথে যে ভ্রমণকারী বা পথিক আসুক না কেন, এই অসামান্য বজরাদুটির কথা শুনে, কৌতূহলেই, দেখতে আসবেনই।

সুকুমার সেন ও ভারতীয় নির্বাচন

অতনু প্রজ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবার ভোটের মরশুম এলেই ব্যালট পেপার, ভোট দেওয়া, কাউন্টিং, ইলেকশন কমিশন ইত্যাদি শব্দগুলো আমাদের চারপাশকে সরগরম করে তোলে। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে স্বাধীন ও স্বচ্ছ ভোটপর্বের মূল কান্ডারী হল ইলেকশন কমিশন দপ্তর।

১৯৯০-৯৬ সালের দিনগুলোতে ফিরে গেলে একটি নাম আমাদের জাতীয় স্তরে শোরোগোল ফেলে দিয়েছিল। টি এন সেশন। দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনের জন্য দায়বদ্ধ এই চীফ ইলেকশন কমিশনার তার সাহসী নানা পদক্ষেপে রাজনৈতিক মহলে সাড়া ফেলেছিলেন।

কিন্তু এসবের অনেক আগে, যে মানুষটির হাত ধরে ইলেকশন কমিশন দপ্তর বৃহত্তম এই গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভিত স্থাপন করেছিলেন তিনি হলেন উজ্জ্বল এক বঙ্গসন্তান শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।

সাতচল্লিশ সালে দেশ স্বাধীন হবার পরে এই ক্ষুরধার প্রশাসক মনোনীত হন বাংলার চীফ সেক্রেটারি হিসেবে। এই পদে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও রাজনৈতিক টালমাটালে আকীর্ণ বাংলায় তিন বছর কাটাতে কাটাতেই যেন উনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন উনি আরও অনেক কিছু দিতে এসেছেন এ দেশের প্রশাসনকে।

আর ঠিক তা প্রমাণ করতেই যেন এই সিভিল সার্ভেন্ট-এর কাছে চলে এল আরও এক বৃহৎ চ্যালেঞ্জ। উনি মনোনীত হলেন গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের প্রথম চীফ ইলেকশন কমিশনারের পদে। (২১ মার্চ১৯৫০ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৫৮)

কীভাবে নির্বাচন প্রতিনিধিরা দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন, নির্বাচনের প্রতীক চিহ্নই হয়ে উঠবে রাজনৈতিক প্রতিনিধির প্রতীক, কীভাবে গণনা হবে, কীভাবে পুরো ব্যাপারটা পরিচালনা হবে এসব পুরো খুঁটিনাটি ব্যাপারটাই ছিল এই দুঁদে প্রশাসনিক কর্তার ভাবনায়।

এভাবে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের হাত ধরেই এশিয়া মহাদেশ পেয়ে গেল নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মতো এক কর্মযজ্ঞ।

<u>কিছু তথ্যঃ</u>

জন্ম ১৮৯৯। তিন ভাই। মেজ পরবর্তীকালে ভারতের আইনমন্ত্রী অশোক সেন। ছোটো অমিয়কুমার সেন ডাক্তার ছিলেন-রবীন্দ্রনাথকে জীবিত অবস্থায় শেষদেখেছিলেন এই অমিয়কুমার। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুকুমার সেন-এর শিক্ষা। দ্বিতীয়টি থেকে গণিতবিদ্যায় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত। ১৯২১ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান। ১৯৪৭ এ বাংলার চিফ সেক্রেটারি। ১৯৫০ থেকে ভারতের প্রথম দুটি সাধারণ নির্বাচনের কর্ণধার।

কতটা কঠিন ছিল তাঁর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাজ? সাড়ে সতেরো কোটি ভোটার। তার মধ্যে পঁচাশি শতাংশ নিরক্ষর। আগে থেকে তৈরি কোন ভোটার তালিকা নেই। দেশের বেশিরভাগ অঞ্চল টেলিযোগাযোগের বাইরে। এই অবস্থায় প্রায় একা হাতে গণতান্ত্রিক ভারতের গণতন্ত্রের ভিৎ কেটেছিলেন এই প্রণম্য মানুষটি।

পরবরতী সময়ে সুদানের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হন।

নোবেল বিজয়ী, বিজ্ঞানী – অভিযাত্রী ডক্টর ফ্রিজফ নান্সেন

অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়

আঠারো বছরের বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেটি এক মাইল বরফের মধ্যে স্কি প্রতিযোগিতায় বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দিল। সেটা ছিল ১৮৭৯ সাল। স্থান নরওয়ের ফ্রয়েন নামের শহরতলী। এর আগে সে অন্তর্দেশীয় স্কি প্রতিযোগিতাতে প্রথম স্থান পেয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে। আবার সে ছেলে পড়াশুনোতেও সমান চৌখস। পদার্থবিদ্যা আর রসায়নশাস্ত্র তার পছন্দের বিষয়। কিন্তু জীববিদ্যায় অপরিসীম কৌতূহল। এদিকে আবার চোখে স্বপ্ন ভিড় করে আসছে, দুর্গম উত্তরমেরু অভিযানে বেরিয়ে পড়তে হবে। তখনো পর্যন্ত পৃথিবীর কেউ সেই অভিযানে সফল হয়ে উঠতে পারেনি।

দুর্ধর্ষ মেরু অভিযানের পাগলা ঘোড়াটা সারাজীবন ধরে যাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, তিনি হলেন ডক্টর ফ্রিজফ নান্সেন। মামাবাড়ির দিকে তাঁর আত্মীয় ছিলেন নরওয়ের সামরিক বাহিনীর প্রধান আর বাবার বংশে ছিলেন শ্বেত সমুদ্র পাড়ি দেওয়া দুঃসাহসী শহরের মেয়র। নান্সেনের বাবা ছিলেন পেশায় উকিল। মায়ের ছিল অগাধ পড়াশুনো। এমন পরিবারে বেড়ে ওঠা মৃদুভাষী বালকটির নানা বিষয়ে উৎসাহ আর পারদর্শিতা খুব ছোটবেলা থেকেই দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো শেষ করবার পর তিনি চাকরি পান বারজেন মিউজিয়ামে। তখন তার বয়স মাত্র তেইশ। কাজটা ছিল কিউরেটরের। এখানে তিনি এক অদ্ভুত বিষয়ের উপর গবেষণা লব্ধ পাণ্ডুলিপি জমা করেন, নিম্নবর্গীয় প্রাণীদেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর ঐতিহাসিক প্রাকৃতিক প্রভাব। যারা এই পাণ্ডুলিপির নিরীক্ষক ছিলেন তাঁরা বেজায় আপত্তি তুললেন। উঁহু, এই গবেষণা কোন কাজেরই নয়। আত্মবিশ্বাসী তরুণটি দমে না গিয়ে সেই পাণ্ডুলিপি জমা করে দিলেন। পেয়েও গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বচ্চ ডিগ্রী, ডক্টরেট অফ ফিলজফি। পরবর্তীকালে এই গবেষণার পাণ্ডুলিপি বিজ্ঞানী মহলে সাড়া ফেলে দেয়। অচিরেই জীববিজ্ঞানী মহলে ডক্টর ফ্রিজফ নান্সেন বেশ পরিচিত নাম হয়ে ওঠে।

মিউজিয়ামে কাজ করতে করতেই তিনি সমুদ্র বিজ্ঞানে উৎসাহী হয়ে পড়েন। এদিকে মাথায় তখন উত্তরমেরু জয়ের স্বপ্ন তাঁকে রাতে ঘুমোতে দিচ্ছে না। ইতিমধ্যে গ্রীনল্যান্ডের উপর তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য এক অভিযাত্রী দল তৈরি করা হয়েছে। সে দলে নাম লিখিয়ে বসলেন নান্সেন। সভ্য পৃথিবী তখনো পর্যন্ত গ্রীনল্যান্ডের এস্কিমোদের জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে না। বিভিন্ন অভিযানে অনেক মানুষ মারা গেছে, যাত্রীবাহী জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। গ্রীনল্যান্ড অভিযানে গিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করলেন নান্সেন। এস্কিমোদের জীবনযাত্রার উপর তথ্য সংগ্রহ করে লিখে ফেলেন 'দ্য এস্কিমো লাইফ'। গ্রীনল্যান্ড এলাকার জীবজন্তু ও পরিবেশ নিয়ে তাঁর লেখা পড়ে বিজ্ঞানী ও মেরু অভিযাত্রীরা প্রবল উৎসাহিত হয়ে পড়েন। নান্সেন ততদিনে নরওয়েতে বেশ পরিচিত একটি নাম।

গ্রীনল্যান্ড অভিযানে গিয়ে তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেন। সমুদ্রে নৌবিহার করাকালীন সাইবেরিয়া থেকে ভেসে আসা কাঠের টুকরো দেখতে পেয়ে তিনি অনুমান করেন বরফাবৃত আর্কটিক মহাসমুদ্র প্রকৃতপক্ষে গতিশীল, ভাসমান তুষারস্তূপ স্থিতিশীলতার ভ্রম সৃষ্টি করে মাত্র। তখনো পর্যন্ত ধারনা ছিল উত্তরমেরুর বরফ স্থির, গতিশীল নয়।

নরওয়ে উপকুল থেকে সোজাসুজি উত্তর মেরুতে যাওয়া কোনোরকম ভাবেই সম্ভব ছিল না। ঘনবদ্ধ তুষারস্তর ও হিমবাহ সেই যাত্রার প্রতিবন্ধক। তখনো কিন্তু উড়ো জাহাজ আবিষ্কার হয়নি। কাজেই জলজাহাজ ছিল একমাত্র বাহন।

মনে মনে যখন নান্সেন উত্তরমেরু অভিযানের পরিকল্পনা করছেন ঠিক সেই সময়ে (১৮৮৪ সাল) গ্রীনল্যান্ডে জেনেট জাহাজের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার হয়। নিউ সাইবেরিয়া থেকে সেই জাহাজ ১৮৮০ সালে উত্তরমেরু অভিযানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে আর্কটিক মহাসাগরের জমাট বাধা বরফের চাপে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন সহ অভিযাত্রীদের বেশির ভাগের মৃত্যু হয়।

জেনেট জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়ার ঘটনা জানতে পেরে নান্সেন তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরমেরু অভিযানে জেনেট জাহাজ যেখানে বরফবন্দী হয়ে ভেঙে যায়, সেখান থেকে যাত্রা শুরু করা স্থির করে ফেললেন। তাঁর হিসেব অনুযায়ী, তুষারবন্দী জাহাজেরও নিউ সাইবেরিয়া থেকে উত্তরমেরু প্রদক্ষিণ করে নরওয়ে ফিরে আসতে আনুমানিক তিন থেকে চার বছর লাগার কথা। আর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে নান্সেনের জুড়ি কেউ ছিল না। তাই আর্কটিক মহাসাগরে ভাসমান তুষার স্তরের গতিকে কাজে লাগিয়ে উত্তরমেরু অভিযানের পুরো ছক কষে ফেললেন তিনি।

কিন্তু বরফে ভাসব দরিয়ায়, বললেই তো হবে না! সেজন্য চাই বরফের চাপে ভেঙে না যাওয়ার মতো উপযুক্ত জাহাজ। জাহাজ গড়ার কারিগর কলিন আর্চারের তখন ইংল্যান্ড আর নরওয়েতে বেশ নামডাক। তাঁকেই নান্সেন নিযুক্ত করলেন জাহাজ বানাতে। নক্সা বানিয়ে ফেলা হল। এবার আসল কাজ, অভিযানের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ। নরওয়ে সরকারের কাছে আবেদন করতেই নান্সেনের প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়া হল অবাস্তব প্রস্তাব বলে। বিজ্ঞানীরাও সরকারের সাথে গলা মিলিয়ে নান্সেনকে সাবধান করে দিয়ে বলল, " একি অলুক্ষুনে কথা! মরতে চাও নাকি! আর্কটিক মহাসাগরে জাহাজ নিয়ে পাড়ি দেওয়া আর যমরাজকে নেমন্তন্ন করা, একই ব্যাপার"।

বারণ করলে আর শুনছে কে? নান্সেন পার্লামেন্টে গলা ফাটিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেই ছাড়লেন। চারটি কাঠের পুরু আস্তরণ দিয়ে তৈরি হল জাহাজ। জাহাজের খোলকে গোলাকার মসৃণ আকার দেওয়া হল, যাতে বরফের চাপে সে জেনেটের মতো ভেঙে না যায়। এদিকে অভিযানের জন্য নরওয়ে সরকারের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে যা অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল, তার সিংহভাগ খরচ হয়ে গেলো জাহাজ বানাতে। তখন তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করলেন তার অভিযানের পাথেয় জোগাড় করবার জন্য। সাধারণ মানুষ ততদিনে এই অসম সাহসী, জেদি বিজ্ঞানীটির উপর ভরসা করতে শুরু করেছে। তাই শেষ পর্যন্ত অভিযানের বাকি অর্থ জমা পড়ে গেলো।

উত্তরমেরু অভিযানের তাঁর সঙ্গী হবার জন্য আহ্বান করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। সাক্ষাতকার নিয়ে বারো জন বাছা বাছা যুবককে বেছে নেওয়া হল। তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন দক্ষ নাবিক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, আবার কেউ বৈজ্ঞানিক। প্রবল ঠাণ্ডায় এই মরণশীল যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ লিস্ট বানিয়ে, সেই সব জিনিষ জাহাজে তোলা হল। বরফের স্তরে চলাফেরা করবার উপযুক্ত স্লেজ ও অন্যান্য সরঞ্জাম তোলা হল। নান্সেন শুধু মাত্র অভিযাত্রী তো আর ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মেধাবি বিজ্ঞানী। তাই পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করবার উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও তোলা হল জাহাজে। তিনবছরের জন্য উপযুক্ত খাবার দাবার আর জ্বালানীর জন্য কয়লা নেওয়া হল। পড়াশুনো করে সময় কাটানোর জন্য গোটা একটা লাইব্রেরী তৈরি করা হল। তিনটি কায়াক (লম্বা সরু আকৃতির নৌকা) বানিয়ে জাহাজে তোলা হল। জাহাজের নামকরণ করা হল, 'ফ্র্যাম', অর্থাৎ অগ্রগতি।

দিনক্ষণ দেখে, ১৮৯৩ সালের জুন মাসে, স্পিট বারজেন উপকুল ছেড়ে অজানা উত্তরমেরুর সন্ধানে পাড়ি দিল ফ্র্যাম। পথে ভয়ঙ্কর কারা সমুদ্র পার হয়ে নিউ সাইবেরিয়ান দ্বীপে পৌঁছতে লেগে গেলো প্রায় চার মাস। তারপর সত্যি সত্যি তুষার সমুদ্রে বন্দী হল ফ্র্যাম। আর কি আশ্চর্য, সেই জাহাজ না ভেঙে গেলো, না কাত হয়ে গেলো। কম্পাস দেখে অঙ্ক কষে দেখা গেলো, ফ্র্যাম তুষারে বন্দী হয়ে সমুদ্রে ভেসে দিব্যিএগিয়ে চলেছে তার গন্তব্যে।

এই অভিযানে নান্সেন ও তার সঙ্গীরা প্রচুর বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করলেন, তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরে জলের তাপমাত্রা মাপা। এই কাজে নান্সেন একটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন, যাকে পরবর্তীকালে নাম দেওয়া হয় 'নান্সেন বটল'। প্রতি দিন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে সমুদ্রবিজ্ঞানে নান্সেনের আগ্রহ আরও বাড়তে থেকে। নিয়মিত গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধির সমীক্ষা চলতে থাকে। উত্তর গোলার্ধে পৃথিবীর পরিবেশ ও চুম্বক শক্তির উপর চালানো হয় পরীক্ষা নিরীক্ষা। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয়, বরফের স্তরে ড্রিলিং মেশিন দিয়ে ফুটো করে তুষার স্তরের গভীরতা মাপা। সময় কাটানোর জন্য ফ্র্যামে একটি খবরের কাগজ বার করা হয়। উদ্যোক্তা নান্সেন। আসলে তিনি পড়তে লিখতে নিজে যে ভালবাসতেন শুধু তাই নয়, অন্যদের উৎসাহও দিতেন। অভিযাত্রীরা এই কাগজে তাঁদের কবিতা, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কার্টুন, অভিজ্ঞতা সব লিখে রাখতেন।

অভিযাত্রীদের আর এক বিনোদন ছিল তুষার ভূমিতে বিচরণকারী শ্বেতভল্লুক, সিল মাছ আর সিন্ধুঘোটক শিকার। সে কাজে ঝুঁকিও কিছু কম ছিল না। অনেকবার এই বন্য প্রাণীদের আক্রমণ থেকে বিস্ময়কর ভাবে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন তাঁরা, শুধু সাহস ও শারীরিক বল সম্বল করে।

এক বছর ঘুরে গেলেও ফ্র্যামের অবস্থান প্রায় ৮০-৮২ ডিগ্রীতে আটকে। কিছুতেই ৯০ ডিগ্রী পৌঁছানো যাচ্ছে না। হিসেব কষে নান্সেন দেখলেন, এইভাবে চললে উত্তরমেরু পৌঁছানো অসম্ভব। তাই তিনি জহান্সেনকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়লেন স্লেজগাড়ি চেপে। আঠাশটি কুকুর হল সেই স্লেজের চালক। বাকি অভিযাত্রীরা নান্সেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ফ্র্যামেই থেকে গেলেন। যদি নান্সেনের অনুমান সত্যি হয়, তবে ফ্র্যাম একদিন না একদিন নরওয়ে উপকূলে ঠিকই পৌঁছে যাবে এই বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোন উপায় তাঁদের ছিল না। কারণ পিছু ফেরার পথ ছিল না।

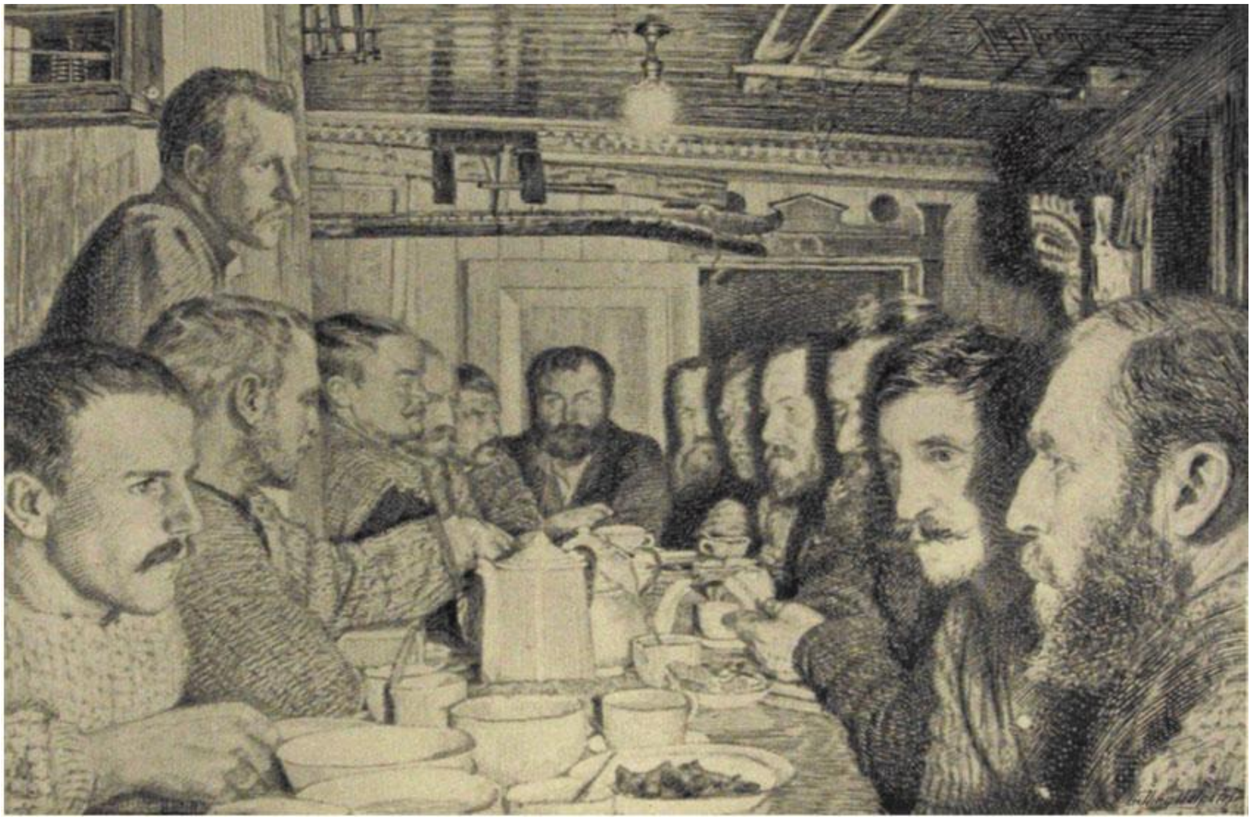

ফ্র্যাম জাহাজে অভিযাত্রীদের প্রাতরাশ

মাস ছয়েক কেটে যাবার পর বোঝা গেলো সেই ৮৫ ডিগ্রী উত্তর দ্রাঘিমাংশের কাছাকাছি নান্সেন ও জোহান্সেন ঘোরাফেরা করছেন। এদিকে সামনে আসছে উত্তরমেরুর ভয়ঙ্কর শীত। নান্সেন উত্তরমেরু পৌঁছানোর আশা ত্যাগ করলেন। কিন্তু পিছু ফেরার রাস্তা নেই। ফ্র্যাম ততদিনে বরফ সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কোথায় পৌঁছেছে তাও জানা নেই। ম্যাপ ও কম্পাসের সাহায্যে ফ্রাঞ্জ জোসেফ ল্যান্ডে পোঁছানোর উদ্দেশ্যে দুজনে রওনা দিলেন স্লেজ চেপে। এদিকে খাদ্যের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। অভিযানের ধকল ও শীতে অনেকগুলো কুকুর মারা গেছে। কুকুরদের খাবার শেষ। তাই উপায়ন্তর না দেখে, এক এক করে কুকুরদের মেরে, সেই মাংসই অন্য কুকুরদের খাইয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হল।

ভাগ্যক্রমে শীত শুরু হবার আগেই ফ্র্যাঞ্জ জোসেফ ল্যান্ডে পৌঁছাতে পারলেন নান্সেন ও জোহান্সেন। শীত শেষ হলে সেখান থেকে জলপথে স্পিট বারজেন রওনা দেবার আশায় উপকূলে ইগলুদের কায়দায় বহুকষ্টে ঘর বানিয়ে ফেলা হল। শ্বেত ভল্লুক আর সিন্ধুঘোটক মেরে তাদের মাংস আর চর্বি জমিয়ে রাখা হল খাবার হিসাবে। গোটা শীতকাল সেই কুঁড়ে ঘরে বন্দী থেকে কাটিয়ে দিতে হল দুজনকে। জামাকাপড়ের দৈন দশা দেখে তাঁবুর কাপড় আর ভল্লুকের চামড়া দিয়ে পোশাক বানানো হল।

শীতকাল শেষ হতে আবার জলপথে যাত্রা। মধ্যে তুষার ঝড়ে আবার উপকূলে আশ্রয় নিতে হল। এদিকে শ্বেতভল্লুক আর জলহস্তিদের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। হটাত একদিন হাঁটতে হাঁটতে নান্সেন কুকুরের ডাকের আওয়াজ শুনতে পেয়ে সেই ডাক লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে দেখেন তার পরিচিত এক অভিযাত্রী কুকুর নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছেন। প্রায় তিন বছর পর নান্সেন ও জোহান্সেন মানুষের দেখা পেলেন। সেই অভিযাত্রী দলটি ফ্র্যাঞ্জ জোসেফ ল্যান্ডে ঘাঁটি গেড়েছিলেন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহে।

নান্সেন উত্তর মহাসমুদ্রের স্রোতের একটি বিশেষত্ব আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর নিজের অক্ষে পাক খাবার জন্য মেরু অঞ্চলে কোরিয়োলিস বলের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের জলের পৃষ্ঠভাগে বাতাসের বল এবং কোরিয়োলিস বলের যৌথ প্রভাবে সমুদ্রের জল পেঁচালো পথে ঘুরতে থাকে। সমুদ্রের জলের এই ঘূর্ণ গতি একমাত্র মেরু অঞ্চলেই দেখা সম্ভব।

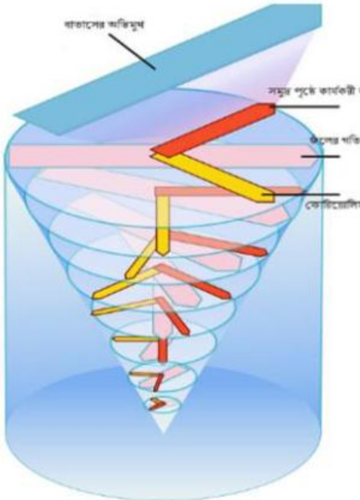

আর্কটিক মহাসাগরে ঘূর্ণিয়মান স্রোত

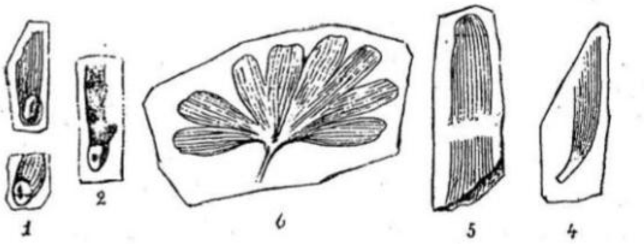

নান্সেনের সংগৃহীত উদ্ভিদ জীবাশ্ম

নিরাপদ শিবিরে ফিরে এসে নান্সেন জানতে পারলেন সারা পৃথিবীতে তার নাম তখন আর অপরিচিত নয়। ছিটগ্রস্ত বৈজ্ঞানিক মেরু অভিযাত্রী হিসাবে বেশ নাম ডাক হয়েছে তার। সবাই ধরে নিয়েছে জেনেট জাহাজের মতোই ফ্র্যাম ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে আর অভিযাত্রীদের হয়েছে সলিল সমাধি। উদ্ধারকারী জাহাজে চড়ে নান্সেন নরওয়ে ফিরে এসে বীরের অভ্যর্থনা পেলেন। পৃথিবীর মানুষের চোখে বিজয়ীর স্বীকৃতি পেলেন নান্সেন ও তার দল। যদিও সঠিক উত্তরমেরুতে না পৌঁছে ৮৬ডিগ্রী ১৪মিনিট উত্তর দ্রাঘিমাংশে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা।

উত্তরমেরুতে পা রাখতে না পারলেও নান্সেনের এই অভিযানের মাধ্যমে মানব জাতি সর্বপ্রথম জানতে পারল উত্তরমেরুতে কোনো মানব জীবনের চিহ্ন মাত্র নেই। তদানীন্তন ধারনা অনুযায়ী মনে করা হতো উত্তরমেরুর অগভীর সমুদ্রে আছে অনেক অচেনা অজানা দ্বীপ, অজানা মানুষ ও প্রাণী।

আছে শুধু বরফের স্তরে ঢাকা বহমান গভীর সমুদ্র। উত্তরমেরু অভিযানের অসংখ্য তথ্য নান্সেন ছয় খণ্ডে নথিবদ্ধ করেন, যা পরবর্তীকালে অভিযাত্রী ও বৈজ্ঞানিকদের অনেক কাজে আসে। ফ্র্যাঞ্জ জোসেফ ল্যান্ড থেকে ঘরে ফেরার পথে নান্সেন তুষার যুগের কিছু জীবাশ্ম খুঁজে পান। সেই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নথিবদ্ধ করেন।

যেদিন নান্সেন আর জোহান্সেন নরওয়ে পৌঁছান, তার দু একদিনের মধ্যে ফ্র্যাম জাহাজ স্পিট বারজেন পৌছায়। এগারো জন অভিযাত্রী নিরাপদে পৌঁছান। সাইবেরিয়ান উপকূলে বরফে বন্দী জাহাজ, আর্কটিক মহাসমুদ্রের টানে, নরওয়ে ফিরে আসার ব্যাপারে নান্সেনের সিদ্ধান্তের প্রমান পাওয়া গেলে সারা পৃথিবীতে নান্সেন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

১৮৯৭ সালে ক্রিস্টানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নান্সেনকে জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত করে। কিন্তু উত্তরমেরু অভিযানের অভিজ্ঞতা নান্সেনকে সমুদ্র বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং উৎসাহিত করে তুলেছিল। জীববিজ্ঞান ছেড়ে তিনি সমুদ্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়ানো শুরু করেন এবং প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সমুদ্র বিজ্ঞান পড়াবার জন্য অনুরোধ করে।

১৯০৫ সালে নরওয়েতে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। রাজনৈতিক কারনে সুইডেন ও নরওয়ে দুটি আলাদা দেশ হয়ে যায়। এর আগে পর্যন্ত দুটি দেশ এক ছিল। একই রাজা দুটি দেশের অধিকর্তা থাকলেও নরওয়ে পার্লামেন্টের হাতে ছিল প্রকৃত ক্ষমতা। বিদেশ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মতবিরোধ হলে দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। নান্সেন ছিলেন নরওয়ের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তার কর্মদক্ষতার জন্য বিশেষ ভাবে পরিচিতির কারণে নরওয়ের পার্লামেন্ট ও রাজা তাকে দুই দেশের বিরোধ মিটিয়ে ফেলার কাজে নামতে অনুরোধ করে। বিজ্ঞানী নান্সেন তার অধ্যাপনা ও গবেষণা ছেড়ে রাজনীতির পথে পা বাড়াতে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু খুব বেশীদিন তাঁর এই রাজনীতি বিমুখতা কাজে আসে নি। আসলে নান্সেন ছিলেন অত্যন্ত কর্মবীর এবং মানব দরদী। তাই দেশের জনসাধারণের স্বার্থে প্রথম চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়ে লন্ডনে গিয়ে রাজনৈতিক মধ্যস্থতা করেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ক্ষমতাশালী নেতারা নান্সেনকে সমীহ করে তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে সে যাত্রা নরওয়ে ও সুইডেনের যুদ্ধ বিরত থাকে।

মেরু অভিযাত্রী নান্সেন জীবনের কোন অবস্থাতেই হার মানতেন না। তার মধ্যে বাস করত এক যোদ্ধা। এক প্রকৃতি ও মানব প্রেমী সত্ত্বা। শোনা যায়, যেহেতু তিনি জনসাধারণের আস্থাভাজন মানুষ ছিলেন, তাঁকে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানোর চেষ্টা করা হয়। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নান্সেন তার বিজ্ঞানের দুনিয়ায় ফিরে যান। এই সময়ে আবার দক্ষিন মেরু অভিযানের পরিকল্পনা করতে থাকেন।

কিন্তু সমাজ হয়ত বিজ্ঞানী-অভিযাত্রী নান্সেনের কাছ থেকে আরও অনেক বেশি প্রত্যাশা করেছিল। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে না হতেই আবার রাজনীতি নান্সেনকে দাবী করে বসল। ১৯১৭ সালে আমেরিকান সরকার নরওয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি বন্ধ করে দিল। মধ্যস্থতা করবার জন্য নান্সেনের ডাক পড়ল। দেশের মানুষকে খাদ্যাভাব থেকে বাঁচানোর তাগিদে নান্সেন ছুটলেন আমেরিকা। তাঁর বাগ্মিতায় বশ করে ফেললেন আমেরিকার ধুরন্ধর রাজনীতিবিদদের।

বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিতে পৃথিবী জুড়ে অজস্র মানুষের হত্যা লীলা, খাদ্যাভাব, মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের উল্লাস নান্সেনকে এতটাই ব্যাথিত করে তুলল, তিনি পাকাপাকি ভাবে বিজ্ঞান এবং প্রকৃতির বৈচিত্র অনুসন্ধানের কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে, বৃহত্তর মানবকল্যাণে আত্মোৎসর্গ করলেন। লীগ অফ নেশনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দলে দলে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া শরণার্থীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন পরিত্রাতা হয়ে। সাইবেরিয়াতে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধ বন্দী তখন অনাহার আর মহামারীতে মরতে বসেছে। তাদের উদ্ধার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও যানবাহন দিতে সব উন্নত দেশই অস্বীকার করে বসে। লীগ অফ নেশন নান্সেনের মতো পারদর্শী মানুষ খুঁজছিল, যিনি এই মহাসংকট থেকে পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজে দিতে পারবেন। নান্সেন লীগ অফ নেশনের হাই কমিশনার হিসাবে সাইবেরিয়ার যুদ্ধবন্দীদের উদ্ধার কাজে যোগ দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের কাজে নেমে পড়লেন। বিভিন্ন দেশের কর্তাব্যক্তিদের সাথে কথাবার্তা চালিয়ে, অমানুষিক কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে, প্রায় ২৬ টি দেশের ৪,৫০,০০০ যুদ্ধবন্দীকে তাদের স্বদেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন।

যুদ্ধ বিরতির পর আর এক সমস্যা এলো গোটা ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশে। কোটি কোটি শরণার্থী বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাদের না আছে বাসস্থান, না আছে অন্ন সংস্থানের উপায়। এদিকে স্বদেশে ফিরতে বদ্ধপরিকর অজস্র নিপীড়িত মানুষ। লীগ অফ নেশনকে আবার নান্সেনের দ্বারস্থ হতে হল। শরণার্থীদের স্বদেশে নিরাপদে ফেরাবার জন্য এক বিশেষ পাসপোর্টের প্রচলন করলেন নান্সেন, যা নান্সেন পাসপোর্ট বলে পরিচিত। নান্সেনের প্রচেষ্টা ও মধ্যস্থতায় পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশটি প্রভাবশালী দেশ এই পাসপোর্ট মেনে নেয়। ১৯২০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এই পাসপোর্ট যুদ্ধকালীন শরণার্থীদের নিজের নিজের দেশে ফিরে গিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সাহায্য করে।

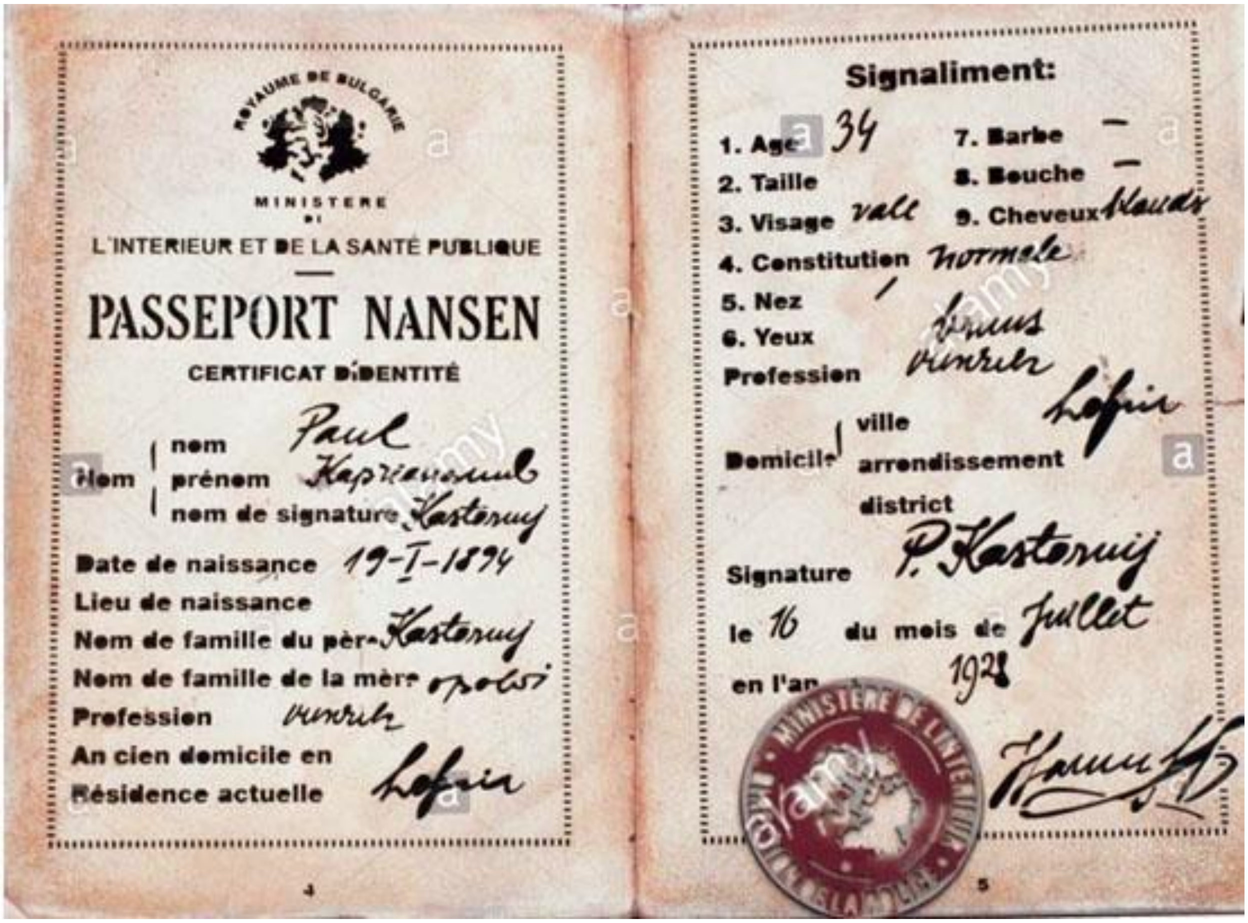

এদিকে রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ সম্পন্ন হবার পর সে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাশিয়ায় তখন সবেমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। দেশে উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায়, দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য ধনী দেশগুলো কম্যুনিস্ট রাশিয়াকে কোনোভাবেই সাহায্য করতে রাজি না হওয়ায়, রেড ক্রস সোসাইটি নান্সেনের কাছে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের ত্রাণের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করে। আরও একবার নান্সেন তার কর্মকূশলীতার পরিচয় দেন। বিভিন্ন দেশের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য হাত পাতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বক্তৃতার মাধ্যমে জনসমর্থন আদায় করে নেন। নান্সেনের চারিত্রিক দৃঢ়তার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় রাজনিতিকেরা। এই কাজে নান্সেন তার জমানো পুঁজি থেকেও অর্থসাহায্য করেন। ১৯২২ সালে জনদরদী নান্সেনকে শরণার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার দান করা হয়। সমস্ত অর্থই নান্সেন ত্রান তহবিলে দান করে দেন। সেই বছরেই গ্রীস এবং তুর্কির যুদ্ধে আবার শরণার্থী সমস্যা হয়। নান্সেন তখন শরণার্থীত্রাণে সিদ্ধহস্ত পুরুষ হিসাবে জগতজোড়া খ্যাতির অধিকারী। এবারেও তিনি সফল হন।

শরণার্থী সমস্যা মোকাবেলায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়ানোর ধকলে এই মানুষটির শরীর ভেঙে পড়ে। ১৯৩০ সালে তিনি ৬৯ বছর বয়সে মারা যান নান্সেন। মৃদুভাষী, কর্মবীর, বিজ্ঞানী ও অভিযাত্রী নান্সেনের সবচাইতে বড় গুণ ছিল যে কোন কাজের আগে নিখুঁত পরিকল্পনা করবার ক্ষমতা। আর ছিল সিদ্ধান্তে অটল থেকে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার সংগ্রামী মনোবল। মেরু অভিযানে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে শেখার মাধ্যমে গড়ে ওঠা শক্তি ও মনোবল তাঁকে মানুষের কল্যাণসাধনে সক্ষম করে তোলে।

পদে পদে মৃত্যুর অবধারিত ফাঁদ থেকে সুকৌশলে বেরিয়ে এসে সর্বপ্রথম উত্তরমেরুর অজানা তুষার মহাসাগরে অজানা তথ্য আবিষ্কারের জন্য নান্সেনকে ইতিহাস মনে রাখবে। নান্সেনের পরিকল্পিত ফ্র্যাম জাহাজ আরও তিনবার উত্তরমেরু সফর করে। সেই জাহাজকে স্মারক হিসাবে নরওয়ের রাজধানী ওসলোর ফ্র্যাম মিউজিয়ামে সসম্মানে স্থান দেওয়া হয়েছে। উত্তরমেরুর গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং স্মৃতি চিহ্ন সেখানে সংরক্ষিত। বিজ্ঞান সাধক, মানবপ্রেমী অসম সাহসী মনিষী ডক্টর ফ্রিজফ নান্সেন, সভ্য সমাজের কাছে এক জীবন্ত বিস্ময় হয়ে রয়ে গেছেন।

হেনরিয়েটা ল্যাকস

উমা ভট্টাচার্য

মাদার অফ 'ইমমর্টাল হেলা সেল লাইন'।

নামটা শুনে খুবই আশ্চর্য হবার কথা। এ আবার কী নাম, ইমমর্টাল হেলা সেল লাইন? জিনিসটা কী? কীই বা হয় তা দিয়ে? চিকিৎসকরা বিশেষ করে অঙ্কোলজিস্ট অর্থাৎ, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ তারা অবশ্যই জানেন 'হেলা সেল লাইন'-এর কথা। কিন্তু আমরা সকলেই তো আর জানি না। তাই এসো, জানি সেই 'অমর মানবকোষ' বিষয়ে, যে কোষের সাহায্যে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, পোলিও থেকে শুরু করে আরও অনেক ব্যাধির চিকিৎসার ওষুধ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে এই 'হেলা' কোষের সাহায্যে। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির আওতার বাইরে মহাকাশে এই কোষ কেমন আচরণ করে, সেখানেও এই কোষ রিপ্রোডাকশন (জীববিজ্ঞানের ভাষায়) করতে অর্থাৎ, বংশবৃদ্ধি করতে পারে কি না তা দেখার জন্য আমেরিকার বিজ্ঞানীমহল থেকে এই মানবকোষ বা সেলকে মহাকাশেও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই কোষ যাঁর দান তাঁর নামটি আমাদের অনেকেরই হয়তো জানা নেই। ১৯৭০ সালের আগে (পাঁচজন ছাড়া) চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কেউই জানতেন না তাঁর নামটি। তিনি ছিলেন এক দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা, হেনরিয়েটা ল্যাকস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা নানা অসুখের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য বিভিন্ন গবেষণাগারে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন। কালান্তক ব্যাধি ক্যান্সার মারাত্মক আকারে দেখা দিয়েছে। কিন্তু চিকিৎসার কোনও ওষুধ তখনও আবিষ্কার হয়নি। রোগ নির্ণয়ের বিশেষ কোনও অস্ত্রও চিকিৎসকদের হাতে নেই। সারভিক্যাল ক্যান্সার (তলপেটের ক্যান্সার) নিয়ে প্রচুর মেয়েরা আসছে; প্রচুর মেয়েদের মৃত্যু হচ্ছে বিনা চিকিৎসায়। সে সময় বছরে প্রায় ১৫০০০ মেয়েরা মারা যাচ্ছিলেন এই রোগে। ডাক্তাররা নিরুপায়। চিকিৎসা বলতে শুধু রেডিয়াম থেরাপি। কিছুকাল আগেই কুরি-দম্পতি রেডিয়াম আবিষ্কার করেছেন। সেটির প্রয়োগ শুরু হয়েছে নানা ক্ষেত্রে। ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষের ক্ষেত্রে রেডিয়ামের প্রয়োগে বাড়তি কোষগুলি পুড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে, কিন্তু রোগ নিরাময় করা যাচ্ছে না। কারণ, রেডিয়াম এক দু'মুখো তলোয়ারের মতো। ক্যান্সার কোষকে নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ কোষদেরও নষ্ট করে দেয়, বিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে রোগীর দেহের সর্বত্র।

ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের বিশেষত্ব সেগুলি অফুরান সংখ্যায় বেড়ে চলে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানী গবেষকরা এই কোষবৃদ্ধির কারণ জানার চেষ্টা করছিলেন। কোষবৃদ্ধির কারণ না জানতে পারলে কোষের বৃদ্ধি রোধ করার উপায়ও বের করতে পারছেন না তাঁরা। অবিরাম চেষ্টা চলছিল মানবদেহ থেকে সংগৃহীত কোষগুলিকে গবেষণাগারের কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে বিভাজিত করে কোষের বংশবৃদ্ধি করতে। কিন্তু বিভাজন তো দূরের কথা মানবদেহের বাইরে কোনও জীবকোষ বাঁচছিলই না। মানব-শরীর থেকে সংগ্রহ করার কিছু সময়ের মধ্যেই সেগুলির মৃত্যু হচ্ছিল। ইমমর্টাল বা অমর কোষের সন্ধানে বিজ্ঞানীরা হন্যে হয়ে পথ খুঁজছিলেন। এই সময়ে মেরিল্যান্ডের বাল্টিমোরের জন হপকিনস হাসপাতাল ছিল একাধারে শিক্ষাকেন্দ্র, নার্সিং ট্রেনিং কলেজ, চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্র। সেই হাসপাতালের একটি কোষ গবেষণা কেন্দ্রও ছিল। হাসপাতালে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল। রোগীদের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া হত না, কিন্তু গবেষণার কাজে রোগীদের অজান্তে তাদেরকে গিনিপিগের মতো ব্যবহার করতে দ্বিধা করতেন না চিকিৎসকরা।

একদিন সেখানে ডাক্তার দেখাতে এলেন পাঁচটি সন্তানের মা, একত্রিশ বছর বয়সী এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা - হেনরিয়েটা ল্যাকস। সময়টা ১৯৫১ সাল। হেনরিয়েটা নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন তার তলপেটে একটা বেশ বড়সড় টিউমার রয়েছে, যন্ত্রণা হয়। ভর্তি হওয়ার পর ডাক্তারের নির্দেশে নার্স তাঁকে নিয়ে গেল কৃষ্ণাঙ্গ রোগীদের জন্য নির্ধারিত কালার্ড ওয়ার্ডে। দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের থেকেও নিকৃষ্ট মনে করা হত কৃষ্ণাঙ্গ রোগীদের। জাতপাতের বৈষম্য দাতব্য চিকিৎসালয়েও ছিল। তাই কৃষ্ণাঙ্গ রোগীদের জন্য ছিল আলাদা বিভাগ। ভাগ্যের পরিহাসে সেই কৃষ্ণাঙ্গ রমণীই চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে চিরঋণী করে গেলেন নিজের 'সতত প্রজননশীল ব্যতিক্রমী দেহকোষ' দান করে। যার থেকেই তৈরি হল 'ইমমর্টাল সেল লাইন' বা 'অমর জীবকোষের এক ধারা'। সেই রমণীর জীবকোষ দেহের বাইরে গবেষণাগারে বেঁচে তো রইলই, আশ্চর্যজনকভাবে বংশবৃদ্ধি করতে লাগল;

চিকিৎসা বিজ্ঞানকে হাজার বছর এগিয়ে নিয়ে গেল। বিজ্ঞানীরা এই কোষের নাম দিলেন 'হেলা' (HeLa -কোড নেম)। হেনরিয়েটার নাম আর পদবির প্রথম দুটি করে অক্ষর নিয়ে তৈরি এই কোষনাম তাঁকে অমর করে রাখল কোষ গবেষণার ইতিহাসে আর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দুনিয়ায়।

দুঃখের বিষয় যখন তাঁর শরীর থেকে তাঁর অজান্তে আর বিনা অনুমতিতে এই কোষ সংগ্রহ করা হয়েছিল তখন তাঁর জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান থাকলেও স্বল্পশিক্ষিতা এই মেয়েটি ডাক্তারদের কেরামতি ধরতেও পারতেন না। অবশ্য সে সময় রোগীর দেহ থেকে গবেষণার জন্য নমুনা সংগ্রহ করতে হলে রোগী বা পরিবারের অনুমতি নেওয়ার কোনও রীতি বা আইন ছিল না। তাঁর দুস্থ, দরিদ্র পরিবারও জানতে পারেনি সেকথা বহুদিন। পায়নি কোনও ক্ষতিপূরণ। কিন্তু তাঁর সেই কোষের সাহায্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অল্পদিনেই এগিয়ে গেছে বহুদূর। ব্যাপক হারে এই কোষ তৈরি হয়েছে ফ্যাক্টরিতে, কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। কিন্তু সেসবের খোঁজ তিনি জানতে পারেননি। একরকম বিনা চিকিৎসায়, শুধুমাত্র রেডিয়াম থেরাপি আর এক্স-রে থেরাপি নিয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে পেতে চলে গেছেন জীবন থেকে বহুদূরে, পাঁচটি ছেলেমেয়েকে মাতৃহারা করে। চিকিৎসা শুরুর আট মাসের মাথায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দেহকোষ থেকে সৃষ্ট 'হেলা' অমর হয়ে রইল।

বাল্টিমোরের জন হপকিনস হাসপাতালের চিকিৎসক টেলমেড তাঁকে পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছিলেন হেনরিয়েটার ক্যান্সারটি দুরারোগ্য (ম্যালিগন্যান্ট)। নিয়ম অনুযায়ী বায়োপসি হল। তারপর তিনি এসে হাসপাতালে ভর্তি হলেন চিকিৎসার জন্য।

তিনি যখন হাসপাতালে এসেছিলেন সেসময় চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী টেলমেডও ভাবছিলেন কীভাবে কৃত্রিম উপায়ে মানবকোষকে বাঁচিয়ে রাখা যায় ও বিভাজিত করা যায়। এই গবেষণার জন্য মানব জীবকোষের প্রয়োজন। তিনি প্রায় প্রতি রোগীকে পরীক্ষা করার সময় তার শরীর থেকেই ক্যান্সার আক্রান্ত কিছু টিস্যু সংগ্রহ করে নিতেন। হেনরিয়েটার টিউমারটি দেখে তাঁর একটু আলাদা ধরনের মনে হল। এখান থেকে টিস্যু সংগ্রহের চিন্তা তার মাথায় রইল।

সেই সময় হপকিনস হাসপাতালের 'টিস্যু কালচার রিসার্চ' বিভাগের প্রধান ছিলেন চিকিৎসক জর্জ গে আর স্ত্রী মার্গারেট গে। ১৯৪৩ সালে একদল বিজ্ঞানী ইঁদুরের টিস্যু নিয়ে গবেষণা করে কোষ বিভাজন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই থেকে জর্জ গে লেগেছিলেন মানবকোষ বিভাজনের জন্য পরীক্ষায়। চিকিৎসক টেলমেড আর চিকিৎসক গে, দু'জনের মধ্যে এক চুক্তি হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী টেলমেড তাঁকে রোগাক্রান্ত মানবকোষের যোগান দিতেন গবেষণার জন্য। টেলমেড যেভাবে রোগিণীদের কোষের নমুনা সংগ্রহ করতেন তা আজ অন্যায় মনে হলেও এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না তখন। তিনি মেয়েদের ভালো করার ভাবনা থেকেই কোষ গবেষণার জন্য চিকিৎসক জর্জ গেকে মানব জীবকোষের নমুনা (স্যাম্পল) যোগান দিতেন।

১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বায়োপসি রিপোর্ট জানার পর হেনরিয়েটা প্রথামত একটি ফর্মে সই করে তাঁর শরীরের প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের অনুমতি দিলেন। বাড়িতে কিছুই জানালেন না। হাসপাতালে তাঁর প্যাথলজি টেস্ট হবার দু'দিন পর থেকে শুরু হল রেডিয়াম থেরাপি। এই থেরাপির সাহায্য নিয়েও আগে বহু মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসকদের হাতে তখনও আর কোনও ওষুধ নেই। তখন পর্যন্ত অস্ত্রোপচারের থেকে রেডিয়াম থেরাপিই নিরাপদ লাগত চিকিৎসকদের কাছে। রোগিণী অপারেশন টেবিলেই না মরে গিয়ে হয়তো আরও কিছুদিন বেঁচে থাকবে, এই আশায় রেডিয়াম থেরাপি করতেন চিকিৎসকেরা। হেনরিয়েটার চিকিৎসা শুরু হল। রেডিয়ামপূর্ণ টিউব তাঁর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সেলাই করে দেবার সময় চিকিৎসক টেলমেড তাঁর টিউমার থেকে দুটি পাতলা টুকরো কেটে নিলেন। অজ্ঞান রোগিণী কিছুই জানলেন না, বুঝতেও পারলেন না। চিকিৎসক দেখলেন, সেই ক্যান্সার আক্রান্ত টিস্যুগুলি একটু যেন আলাদা ধরনের। সকলের অজান্তেই এক নাটকীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত হল চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে।

যথাচুক্তি টেলমেড সেগুলি পাঠিয়ে দিলেন কোষবিজ্ঞানী গবেষক জর্জ গের গবেষণাগারে। তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন সে দুটিকে। তিনি, তাঁর স্ত্রী ও গবেষণাগারের সহকারী মারী কুবিয়েক সকলেরই ভয় ছিল যে এগুলিও হয়তো বাঁচবে না। তাঁরা গবেষণাগারের পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ নজর দিলেন। গে-দম্পতির সবসময় ভাবনাচিন্তা ছিল কোন মাধ্যমের মধ্যে রাখলে, কোন পুষ্টিকর পদার্থ দিলে মানবদেহকোষগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে। মানবদেহের বাইরে সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা ও সেগুলিকে বিভাজিত করে বংশবৃদ্ধি করানো ছিল তাঁদের কাছে এক চ্যালেঞ্জ। গবেষণাগারে কোষেদের বংশবৃদ্ধি করতে হলে তাদের পুষ্টির জন্য কী খাওয়ানো যায়, সেই মাধ্যমের অনুসন্ধান করছিলেন তাঁরা। তদুপরি ভয় ছিল ব্যকটিরিয়া সংক্রমণের। সংগৃহীত কোষগুলির সুরক্ষণের ভার ছিল মারী কুবিয়েকের ওপর। প্রথমে তিনিও এগুলির ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে হত এগুলিও হয়তো বাঁচবে না।

এদিকে রেডিয়াম থেরাপির প্রথম ডোজের পর চিকিৎসকরা তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করে বললেন যে তাঁর অবস্থা অনেকটা ভালো, দু'দিনের মধ্যেই তিনি বাড়ি যেতে পারবেন। তবে আড়াই সপ্তাহ বাদে আবার তাঁকে দ্বিতীয় ডোজটি নিতে আসতে হবে হাসপাতালে। দু'দিন পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল।

এদিকে মারী কুবিয়েক প্রতিদিন সকালে উঠে দেখতেন যে এককেটি কোষ দ্বিগুণ আকারের হয়ে গেছে। অর্থাৎ, সেগুলি বিভাজিত হবে। সকলের আশঙ্কাকে দূর করে সেই কোষ অমরত্ব লাভ করল। বেঁচে তো রইলই, আর অভাবনীয় দ্রুতগতিতে সেই

কোষ বংশবৃদ্ধি করতে লাগল। মারী কুবিয়েক অসাধারণ জীবনীশক্তির অধিকারী সেই কোষের নাম দিলেন ‘হেলা কোষ’, সেই সাধারণ মহিলা হেনরিয়েটার ল্যাকসের নাম আর পদবির প্রথম দুটি করে অক্ষর নিয়ে কোড নাম। চিকিৎসক গে আনন্দে বলে বেড়াতে লাগলেন ‘আমার গবেষণাগারে আমি অমর জীবকোষ সৃষ্টি করতে পেরেছি - নাম তার ‘হেলা’। কেউ তখনও প্রশ্ন করেনি এই কোড নামের অর্থ কী? সকলেই খুশি এই ভেবে যে গবেষণাগারে মানবকোষ তো তৈরি করা গেছে, এবার তাহলে এগিয়ে যাবে ক্যান্সারের চিকিৎসা। তখনও কেউ ভাবেননি যে আরও নানা রোগের অষুধ তৈরি করা যাবে এই কোষের সাহায্যে। তাঁর সহকর্মীরা তার কাছে ক্যান্সার কোষের নমুনা (স্যাম্পেল) চাইলেন। তিনি দিতে রাজি হলেন। বিভিন্ন গবেষণাগারে বিপুল সংখ্যায় বাড়তে লাগল সেই ‘হেলা’ কোষ।

তাঁর রেডিয়াম থেরাপি শুরু হবার ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত কেউ জানত না তাঁর রোগটির কথা। সে সময়ের বাল্টিমোরের সমাজে মেয়েদের এই রোগটি ঘৃণ্য বলে গণ্য ছিল। তিনি এই রোগের কথা তাই কাউকে জানাননি। দ্বিতীয় দফার রেডিয়াম থেরাপির পর তাঁর এক্স-রে থেরাপি শুরু হল। তখন একমাস ধরে প্রতিদিন তাঁকে হাসপাতালে আসতে বলা হল। দূর থেকে প্রতিদিন হাসপাতালে আসার ধকল নেবার শক্তি ছিল না তাঁর। সেটা সম্ভবও ছিল না। হাসপাতালের কাছাকাছি তাঁর এক জ্ঞাতিবোন মার্গারেটের বাড়িতে রইলেন তিনি। এই মার্গারেটও তাঁর সাথে দাদুর খামারবাড়িতেই থাকত। তখনও হাসিখুশি হেনরিয়েটা বাচ্চাদের নিয়ে আনন্দ করেছেন রোগযন্ত্রণা ভুলে। তাদের আনন্দে রাখার জন্য নিয়ে কাছের মেলায় গেছেন, নাগরদোলায় চড়েছেন। এই নাগরদোলাতে বসেই জ্ঞাতিবোন মার্গারেট আর সেডির কাছে প্রথম প্রকাশ করলেন নিজের অসুখের কথা। বোনেদের চিন্তা করতে দেখে বললেন, ভাবনার কিছু নেই, তাঁর শরীর এখন ভালোই আছে।

এক্স-রে থেরাপি শেষ হবার পর বাড়ি ফিরে গেলেন হেনরিয়েটা। স্বাস্থ্যের ক্রমাগত অবনতি হতে লাগল। দেহের রং, গায়ের চামড়া তেজস্ক্রিয় রেডিয়ামের প্রভাবে কালো হয়ে যেতে লাগল। হাত পায়ের নখগুলিও বিবর্ণ হয়ে গেল। অভাবের সংসারে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন হেনরিয়েটা। ১৯৫১ সালের ৪ঠা অক্টোবর তাঁর নশ্বর দেহের মৃত্যু হল। অন্যদিকে তাঁরই অমর দেহকোষ ‘হেলা’ বেঁচে রইল বিভিন্ন গবেষণাগারে। বিপুল সংখ্যায় চাষ হতে লাগল সেই কোষের। তাঁরই এক একটি দেহকোষ প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় দ্বিগুণ হারে বাড়তে লাগল, যা মানুষের কল্যাণের কাজে লাগাতে লাগলেন বিজ্ঞানী আর চিকিৎসকেরা। এ সময় হপকিনস হাসপাতালের কেউ তাঁর খোঁজও করেনি। অথচ তাঁরা তো জানতেন তাঁর অবদানের কথা। কোনও কৃতজ্ঞতাও জানায়নি কোনও চিকিৎসক বা সংস্থা। আট মাস রোগের যন্ত্রণা ভোগ করার পর আধুনিক যুগের এই দধিচী নিজের তনুত্যাগ করলেন। মানবকল্যাণের জন্য বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন ক্যান্সারসহ নানা মারণ রোগ নিরাময়ের ওষুধ আবিষ্কারের অস্ত্র ‘অমর হেলা কোষ’- এক অমর কোষ ধারা (সেল লাইন)। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর এল।

একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে আজ পর্যন্ত যত ‘হেলা’ কোষ তৈরি হয়েছে, ওজন করলে তার ওজন দাঁড়াবে পঞ্চাশ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি। সেগুলিকে জুড়লে এত দীর্ঘ হবে যে তা দিয়ে পৃথিবীকে তিনবার ঘিরে ফেলা যাবে। এই অমর কোষ বায়োকেমিস্ট্রি, সেল বায়োলজি, বায়োটেকনোলজি সবক্ষেত্রেই গবেষণার এক বিশেষ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এই কোষের বংশবৃদ্ধি অর্থাৎ ব্যাপক হারে চাষের জন্য ফ্যাক্টরি তৈরি হয়েছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত সেগুলিতে ব্যাপকহারে ‘হেলা’ কোষ তৈরি হয়েছে পোলিওর ওষুধ আবিষ্কারের গবেষণার জন্য। ১৯৫২ সালেই আবিষ্কৃত হয়েছে পোলিও ভ্যাকসিন। এছাড়া এই অমর ‘হেলা’ কোষ ব্যবহার করে হারপিস, লিউকেমিয়া, এইডস, হিমোফিলিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা এমনকি পারকিনসন্স ডিজিসেরও ওষুধ আবিষ্কার করেছেন গবেষকরা।

তাঁর মৃত্যুর পর ভার্জিনিয়ার ক্লোভে, যেখানে তাঁর স্বামীর পরিবারের শ্বেতাঙ্গ পূর্বপুরুষ জমিদার আর দাসমালিকদের বাস ছিল, সেখানে তাঁদের পারিবারিক সমাধিস্থল ছিল, তার কাছেই কোনওরকমে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল। তখন তাঁর সমাধিস্থলটি চিহ্নিত করার জন্য একটি সমাধিফলকও বসাতে পারেনি তাঁর পরিবার। পরবর্তীকালে তাঁর নাতিনাতনিরা সে স্থানটি চিহ্নিত করে সেখানে একটি সমাধিফলক লাগিয়েছে। সেটি দেখতে একটি বইয়ের আকারের। সেই সমাধিলিপিতে তারা লিখেছে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা।

তাঁর মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বছর পার হয়ে গেল, হপকিনস হাসপাতালের গবেষকরা ছাড়া কোনও দেশের কোনও বিজ্ঞানী জানতে পারেননি এই ‘হেলা’ জীবকোষের দাতার নাম। কোড নামেই পরিচয় ছিল তাঁর অমর দেহকোষের। কোনও সংবাদসংস্থা একবার জানতে চেয়েছিল। তখন তাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। কেউ বলেছিল কোষদাতার নামটি ছিল হেলেন লারা, কেউ কেউ বলেছিল তার নাম হেলেন লারসেন। আসলে কৃষ্ণাঙ্গ এই রমণীর নাম বলতে দ্বিধা ছিল শ্বেতাঙ্গ বিজ্ঞানীদের।

সময়ের কাজ সময়ই করে। প্রায় পঁচিশ বছর পর, ১৯৭৪ সালে একজন বিশেষজ্ঞ কোষ গবেষক ওয়াল্টার নেলসন আবিষ্কার করলেন যে প্রচণ্ড শক্তিধর অসাধারণ এই হেলা সেল অন্যধরনের জীবকোষকে সংক্রামিত করার ক্ষমতা রাখে। কারণ, এই কোষ বাতাসের ধুলিকণার সাথে ভেসে বেড়াতে পারে, হাতের পাতায় মিশে থাকতে পারে এবং সেটাই হয়েছে। অনেক কোষ ‘হেলা’ দ্বারা সংক্রামিত হয়েছে। বিতর্কের ঝড় উঠল। একদল গবেষক ‘হেলা’ কোষের আসল দাতার খোঁজ করতে লাগলেন, কেননা সংক্রামিত কোষগুলি থেকে ‘হেলা’ কোষকে আলাদা করে চেনা দরকার। তা করতে হলে আসল কোষদাতার বা তার পরিবারের কারও ডিএনএ নিয়ে জিন ম্যাপিং করতে হবে। না হলে সংক্রামিত কোষের জন্য বহুমূল্যের কোষ গবেষণার পরিশ্রম ব্যর্থ হবে।

খোঁজ করতে করতে হেনরিয়েটার স্বামী আর ছেলেমেয়েদের খোঁজ মিলল। হেনরিয়েটার স্বামী একদিন একটা ফোন পেলেন। কেউ একজন বললেন যে, 'আপনার স্ত্রী আমাদের ল্যাবরেটরিতে বেঁচে আছে তাঁর দেহকোষের মধ্যে। আমরা আজ পঁচিশ বছর তাঁর ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ নিয়ে গবেষণা করছি। এখন আপনার সন্তানদের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে দেখতে চাই যে তাদের মধ্যেও এই রোগ আছে কি না। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

এবারও প্রতারিত হতে যাচ্ছিলেন তারা। তৃতীয় শ্রেণীর সমতুল্য লেখাপড়া জানা এক তামাক শ্রমিক ডে ল্যাকস এসবের কিছুই বুঝতে পারলেন না। হেনরিয়েটার ছেলেমেয়েরা তখন বড়ো। ছেলে আর্থিক কোনও লেনদেন নেই বুঝে আগ্রহ দেখাল না। মেয়ে ডেবোরা ল্যাকস, যে ছিল মায়ের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী, মায়ের জন্য তার মনটা সবসময় হাহাকার করত। মা মারা যাওয়ার সময় যে ছিল দু'বছরের শিশুমাত্র। মার কথা জানার সে কত চেষ্টা করেছে। কেউ তাকে মায়ের ব্যাপারে কিছু বলেনি। সে এই খবর শুনে মাকে তাঁর জীবকোষের মধ্যে দিয়েই দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। এই সময়েই আরেক বিজ্ঞান-পত্রিকার সাংবাদিক রেবেকা স্কুট, তিনিও ডেবোরার খোঁজ করছিলেন। তিনি প্রায় দশ বছর ধরে 'হেলা কোষ'-এর দাতার ব্যাপারে অনুসন্ধান করছিলেন আর তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। অনেক চেষ্টার পর তিনি ডেবোরা ও তার পরিবারের খোঁজ পেলেন। তাঁরই চেষ্টা আর অনুসন্ধানের ফলে সামনে এল হেনরিয়েটা ল্যাকসের নাম, যিনি ছিলেন 'অমর হেলা কোষ'-এর জননী। পরিবারটি আবার প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেল। হেনরিয়েটা ল্যাকসকে নিয়ে রেবেকার বইটি প্রকাশিত হল ২০১০ সালে। সব তথ্য প্রকশিত হল। উঠে এল তখনকার চিকিৎসার অবস্থা, দরিদ্র তামাক শ্রমিকদের জীবনের নানা দিক, সর্বোপরি হেনরিয়েটার আবাল্যের ইতিহাস আর চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁর অমর অবদানের কথা।

তারপর থেকে হেনরিয়েটার সম্মানের ঘাটতি রইল না। বিজ্ঞানীদের কাছে তিনি হলেন মাদার অফ ইমমর্টাল হেলা সেল লাইন। ১৯৯৬ সালে 'মোরহাউস স্কুল অফ মেডিসিন'-এ অনুষ্ঠিত হল বিশ্বের প্রথম বাৎসরিক 'হেলা ওমেন'স হেলথ কনফারেন্স'। চিকিৎসা গবেষণায় তাঁর অবদানের স্বীকৃতির সঙ্গে আফ্রিকান আমেরিকানদের অবদানকেও সেই অনুষ্ঠানে সম্মান জানানো হয়। আটলান্টার মেয়র ১৯৯৬ সালের প্রথম কনফারেন্সের দিনটি, অর্থাৎ ১১ই অক্টোবরকে 'হেনরিয়েটা ল্যাকস ডে' বলে ঘোষণা করলেন। ২০১১ সালে বাল্টিমোরের 'মর্গান স্টেট ইউনিভারসিটি' তাঁর অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে 'মরণোত্তর সান্মানিক ডক্টরেট ইন পাবলিক সার্ভিস' ডিগ্রি প্রদান করলেন। ২০১১ সালেই ভ্যাঙ্কুবারের 'দি এভারগ্রীন স্কুল পরিচালন সমিতি' তাদের স্কুলের নাম পাল্টে নতুন নাম রাখলেন 'হেনরিয়েটা ল্যাকস হেলথ অ্যান্ড বায়োসায়েন্স হাই স্কুল'। নজর দিলেন জীববিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের দিকে। ভার্জিনিয়ার ক্লোভে, যে টার্নার স্টেশন এলাকায় তাঁরা একসময় বাস করতেন এখনও সেখানে

চিকিৎসা বিজ্ঞানে হেনরিয়েটা ল্যাকসের অবদান স্মরণ করে অনুষ্ঠান পালিত হয়। ২০১৪ সালে হেনরিয়েটা ল্যাকস পেয়েছেন (মরণোত্তর) 'মেরিল্যান্ড হল অফ ফেম'। সর্বোপরি ২০১৭ সালে মহাকাশের প্রধান অ্যাস্টরয়েড বেল্টে একটি ক্ষুদ্র গ্রহাণুর নাম রাখা হয়েছে তাঁর নামে - '৩৫৯৪২৬ ল্যাকস'। আগে সেটির নাম ছিল '২০১০এলএ৭১'।

আশৈশব কষ্টের মধ্যে দিয়ে কেটেছে তাঁর জীবন। ভার্জিনিয়ার এক গ্রাম রোয়াঙ্কোতে ১লা আগস্ট ১৯২০ সালে জন্মেছিলেন হেনরিয়েটা। তখন নাম রাখা হয়েছিল লরেটা প্লিজেন্ট। ডাকনাম ছিল হেনি। চার বছর বয়সে মা এলিজাকে হারালেন। দশটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে তামাকচাষি বাবা জনি প্লিজেন্ট খুবই বিপদে পড়লেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রাম থেকে চলে এলেন ভার্জিনিয়ার ক্লোভে। সেখানে অনেক আত্মীয়স্বজন ছিল তাঁর। সব পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দিলেন ছেলেমেয়েদের। চার বছরের হেনির ঠাঁই হল তাঁর মায়ের দিকের এক দাদু টমি ল্যাকসের খামার বাড়িতে। টমি ল্যাকস থাকতেন তাঁর এক জ্ঞাতি-দাদা ডে ল্যাকসের সাথে।

টমি ল্যাকসের বাবা ছিলেন এক শ্বেতাঙ্গ জমিদার আর বিরাট ফার্মের মালিক। তামাক চাষের ক্ষেতে কাজ করার জন্য তাঁর অনেক কৃষ্ণাঙ্গ দাস ছিল। তাদের জন্য ছিল একটি দোতলা কাঠের বাড়ি। এখন আর দাদুর বাবাও বেঁচে ছিল না আর দাসরাও ছিল না। দাসপ্রথা উঠে গিয়েছিল তখন। দাদুর কাছে এসে হেনি আর তার মতো আরও অনেক ছেলেমেয়েরা সেই বাড়িতে একসঙ্গে থাকত। যাদের সঙ্গে তাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল এমন অনেক দুস্থ পরিবার নিজেদের ছেলেমেয়েদের দুটো খেয়ে বাঁচার জন্য এই খামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে ডেভিড ডে ল্যাকস নামে একটি ছেলেও ছিল। পরে এর সাথেই হেনির বিয়ে হয়েছিল।

দাদু তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তামাকের কারবার ছিল তাঁর। সকাল হতেই সকালের খাবার খেয়ে সব ছেলেমেয়েরা বাড়ির কাজে লেগে যেত, আর অনেকে যেত দাদুর সাথে তামাক ক্ষেতে কাজ করতে। দুপুরে বাড়ি ফিরে গৃহপালিত গরু-ছাগলের দেখভালও ছেলেমেয়েরাই করত। পড়াশোনার বালাই ছিল না। তবুও নিজে নিজেই প্রায় ক্লাস সেভেন লেভেলের মতো পড়াশোনা করেছিল হেনি। মাঝে মাঝে তারা দাদুর সঙ্গে তামাক বিক্রি করতে বাজারেও যেত। সেদিন হত ছেলেমেয়েদের খুব আনন্দের দিন। বাবামায়ের স্নেহ-ভালবাসা আর সান্নিধ্য বঞ্চিত ছেলেমেয়েগুলোর নিস্তরঙ্গ জীবনে বাজারে যাওয়ার দিনটা ছিল বিশেষ দিন। কত কিছু দেখতে পেত তারা। মাঝে মাঝে দাদু কিছু বকশিশও দিত তাদের। সেদিন ফেরার সময় তারা কিনে আনত চীজ, লজেন্স জাতীয় কিছু। যারা সেদিন যেতে পেত না তাদের সেসব জিনিস এনে ভাগ করে দিত অন্যরা।

ডেভিড ডে ল্যাকসের সঙ্গে কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হল তাঁর। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধের প্রয়োজনে স্টীল-শিল্পের বাজার রমরমা। কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকরাই প্রধানত কাজ করত সেখানে। তাদের তখন দুটি সন্তান। খুবই ছোটো। তামাক ক্ষেতে কাজ করে ডে ল্যাকস। অভাব মেটে না। যুদ্ধের বাজারে হেনরিয়েটার দুই জ্ঞাতিভাই ক্লিফ আর ফ্রেড কাজ করত টার্নার স্টেশনের কাছে বেথেলহেম স্টীল প্ল্যান্টে। বাল্টিমোর থেকে বিশ মাইল দূরে ছিল টার্নার স্টেশন, যেখানে প্রধানত স্টীল কারখানার কর্মীদের বাস ছিল। ক্লিফ আর ফ্রেড হেনরিয়েটাদের তাদের কাছে এসে থাকতে বললেন যাতে ডে ল্যাকস কাজ করতে পারে স্টীল কারখানায়, তাদের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভালো হয়। সেই ডাকে তারা চলে এলেন টার্নার স্টেশন এলাকায়। ডে বেথেলহেম স্টীল-প্ল্যান্টে একটা কাজও পেয়ে গেলেন। সারাদিন প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হত হেনরিয়েটাকে। অদম্য শক্তির অধিকারী ছিলেন হেনরিয়েটা। অত্যন্ত বিনয়ী আর স্নেহময়ী ছিলেন। শত অভাবের মধ্যেও হাসি-মজা করতে খুবই ভালোবাসতেন।

ইতিমধ্যে হেনরিয়েটার এক জ্ঞাতিভাই গ্যারেটের সেনাদলে যোগ দেবার ডাক এল। সে চলে যাবার সময় তার জমানো কিছু টাকা দিয়ে গেল হেনরিয়েটার স্বামীকে। তাই দিয়ে ডে ল্যাকস টার্নার স্টেশনের কাছেই একটা ছোট্ট বাড়ি কিনলেন। জায়গাটা তখন ছিল বাল্টিমোরের এলাকার মধ্যে। সেখানে ছিল কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের মানুষদের বাস। এখানেই জন্মালো হেনরিয়েটার আরও তিনটি ছেলেমেয়ে। ছোটোটির জন্মের সময়ই ধরা পড়ল হেনরিয়েটার অসুখটা। তারপরের ইতিহাস শেষ হয়ে গেল ১৯৫১ সালের ৪ঠা অক্টোবর ৩১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে।

তাঁর সমাধিফলকের ওপর সমাধিলিপিতে যা লেখা আছে, তার শেষ চারটি লাইন হল–

'হেয়ার লাইস হেনরিয়েটা (হেলা), হার ইমমর্টাল সেল / উইল কন্টিনিউ টু হেল্প ম্যানকাইন্ড / ফরএভার'।

শম্পা গুহমজুমদার

নৌকার সাতকাহন

শীতের ছুটি এসে গেল। অনেকেই বেড়াতে যাবে নিশ্চয়ই। শীতের দিন মানেই বেড়ানোর ফোটো তোলার মজা। ক্যামেরার ব্যাগ গুছিয়ে নাও। অনেকেই হয়তো সমুদ্র দেখতে যাবে। কলকাতার কাছেই দীঘা, মন্দারমণি, তালসারি-- কত বেড়ানোর জায়গা।

নদী বা সমুদ্র দেখতে গেলে তোমরা সানরাইজ, সানসেট, সীস্কেপ, ল্যান্ডস্কেপ অনেক কিছুরই ছবি

তুলতে পারবে। এবার একটু নতুন বিষয় ভাবা যাক। যারাই সমুদ্র দেখতে যায় ল্যান্ডস্কেপে নৌকার ফোটো একটি একটি কমন সাবজেক্ট থাকে। কিন্তু নৌকাই যদি সাবজেক্ট হয়ে ওঠে,তা হলে আরো একটু নতুনত্ব তো হবেই। নদীর ধারে বা সমুদ্রের তীরে কিছু ভাঙা নৌকা পড়ে থাকে বা থাকে বা অব্যবহার্য নৌকাও তীরে রাখা থাকে।

নৌকা গঠনগত দিক থেকে বেশ একটা আর্টিস্টিক সাবজেক্ট। একটু অ্যাঙ্গেল পরিবর্তন করলে একটি সাধারণ নৌকাই কিন্তু অসাধারন হয়ে ওঠে। নৌকাতে যদি কোন বাচ্চা বা লোক বসে বা

দাঁড়িয়ে থাকে,তা হলে আরো ভাল হবে। আজ আমাদের সাবজেক্ট নৌকা,তাই নৌকার ফোটোই দিলাম। এর পর একদিন নৌকা ও একে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনী ফোটোর মাধ্যমে তুলে ধরব।

তোমাদের প্রত্যেকবার একটা কথা বলি,এবারেও বলছি... সানরাইজ ও সানসেটের সময়টাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা কোরো। আকাশের রঙ থাকলে যা ড্রামাটা তৈরি হবে তা বেলা বারোটার সময় তোলা একই সাবজেক্টের ছবিতে কখনোই থাকবে না। সানরাইজের পর ঘন্টা দুয়েক আকাশের রংটা খুব ঘন নীল পাওয়া যায়। বর্ষাকালের কথা বলছি না। তবে বর্ষার কালো মেঘের ব্যাকগ্রাউন্ডেও খুব সুন্দর

ফোটো হবে। শীতকালে আরো একটু বেলাতেও আকাশের নীল রঙ থাকবে। সানরাইজ বা সানসেটের সময়ে আকাশে কিছুটা মেঘ থাকলে তার ফাঁক দিয়ে সান-রে অসাধারণ লাগে। ছবি তুলতে গেলে লাকটা যদি কাজ তবে সুন্দর ছবি পাবেই। কবে কি রকম আকাশ থাকবে তা আগে থেকে বোঝা যায় না। তাই অনেকদিনের চেষ্টা আর ধৈর্যর ফলে একটি ভাল ছবি উঠলে এক অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায়।

শীতকালে খুব ফোটো তোলো। ভোরবেলার কুয়াশা বা ধোঁয়াশা,নীল আকাশ আর রংবেরঙের ফুলের ফোটো,গাছপালা,মানুষ যা ইচ্ছা তুলতে থাকো। অনেকসময়ে মনে হয় এখানে তো ছবি তোলার মতন কোনো দৃশ্য নেই। কিন্তু আশেপাশে একটু মন দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে অনেক সাব্জেক্ট রয়েছে। যেটা অনেকেরই চোখ এড়িয়ে যাবে। ভাল ফোটোগ্রাফ দেখো আর নিজের ভুলত্রুটিগুলো শুধরে নাও। আশা করি শীতকালে তোমরা অনেক ভাল ফোটো তুলতে পারবে।

রাজেশ বসুর বই

রাজেশ বসু এইসময়ের একজন জনপ্রিয় কিশোরসাহিত্যিক। শিশুসাহিত্যের জন্য উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পুরস্কারপ্রাপ্ত এই লেখকের নানা গল্প-উপন্যাস গত প্রায় পনেরো বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে প্রথম সারির নানা শিশু-কিশোর পত্রিকায়। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেক বই। এই সংখ্যায় থাকল শিশু সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত তাঁর কিছু বইয়ের খবর।

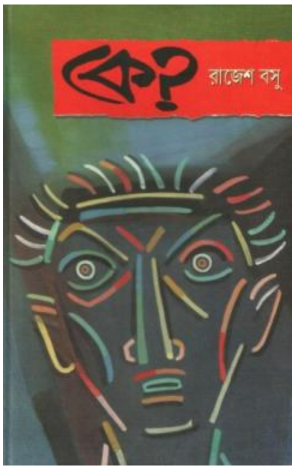

বইঃ কে?
লেখকঃ রাজেশ বসু
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করনঃ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত
বিষয়ঃ গল্প সংকলন
প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০০৯
প্রকাশকঃ শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৯; দামঃ ৩৫ টাকা
এই গল্পসংকলনে আছে ৮টি গল্পঃ
১। হান্স সাহেবের বেহালা, ২। বুইন্দির সাদা গোরিলা, ৩। চেন চি-র গল্প, ৪। বুজুম ও ফানুস, ৫। রিম্বোর আশ্চর্য পুতুল, ৬। নটা সাতান্নর লাস্ট ট্রেন, ৭। পুতুলের কষ্ট, ৮। কে?

বইঃ নেফ্রিখেফের কবলে
লেখকঃ রাজেশ বসু
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করনঃ অলয় ঘোষাল
বিষয়ঃ ফ্যান্টাসি ও অ্যাডভেঞ্চার থ্রিলার
প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১১
প্রকাশকঃ শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৯
দামঃ ৪০ টাকা

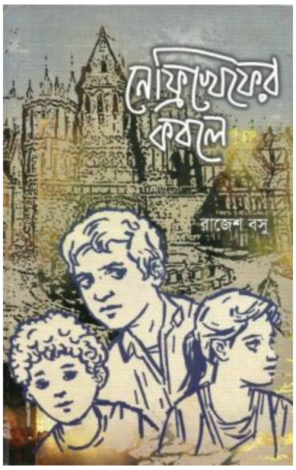

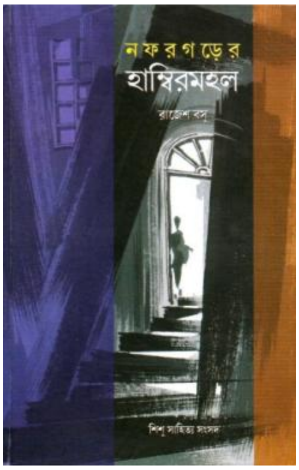

বইঃ নফরগড়ের হাম্বিরমহল
লেখকঃ রাজেশ বসু
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করনঃ চন্দন বসু
বিষয়ঃ গল্প সংকলন
প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৩
প্রকাশকঃ শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৯; দামঃ ৭০ টাকা
এই গল্পসংকলনে আছে ৯টি গল্পঃ
১। নফরগড়ের হাম্বিরমহল, ২। লাদাখের জাঙ্গবোচাচা, ৩। গ্যাবনের অভিশপ্ত গুহা, ৪। হ্যালোউইনট্রিকস ডট কম, ৫। ৩১ এলিয়ট রোড, ৬। ইশকুল পালিয়ে, ৭। অমাবস্যার সেই রাত্রি, ৮। অপচ্ছায়া, ৯। পাঁচমাড়ির অভিজ্ঞতা

বইঃ পালামপুরের ট্রেনে
লেখকঃ রাজেশ বসু
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করনঃ সিতাংশু ভট্টাচার্য
বিষয়ঃ গল্প সংকলন
প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৫
প্রকাশকঃ শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৯; দামঃ ৬৫ টাকা

এই গল্পসংকলনে আছে ১০টি গল্পঃ
১। হরিমতী আর জংলু, ২। সেই ছেলেটি, ৩। লগনরাম, ৪। পকাই ও কালু, ৫। নবীনের প্রতিশোধ, ৬। টাবুনের বিপত্তি, ৭। হাবুর পরীক্ষা, ৮। রুইদাস ঢাকি, ৯। সুহা, ১০। পালামপুরের ট্রেনে

বইঃ মৌমাছির বিষ
লেখকঃ রাজেশ বসু
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করনঃ চন্দন বসু
বিষয়ঃ রহস্য উপন্যাস
প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৬
প্রকাশকঃ শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৯
দামঃ ৬৫ টাকা

বইঃ মেরুদ্বীপে ভয়ংকর
লেখকঃ রাজেশ বসু
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করনঃ অলয় ঘোষাল
বিষয়ঃ কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস
প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৬
প্রকাশকঃ শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৯
দামঃ ৬৫ টাকা

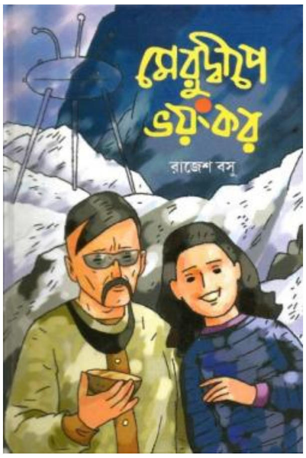

তথ্যঃ তাপস মৌলিক

দেবব্রত দাশ কল্পবিজ্ঞানের জগতে বসবাস করেন। আমরা বলতে চাইছি তিনি নিয়মিত কল্পবিজ্ঞন চর্চা ও লেখালিখি করেন।

দেবব্রতবাবুর মতে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পৃথিবীর দিকে ধাবিত উল্কা যখন বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে প্রায় তখনই অক্সিজেনের সংস্পর্শে জ্বলে ওঠে। এমন উল্কাখন্ড আছে যা কার্বন সমন্বিত। বায়ুমন্ডলের প্রচন্ড তাপে ও চাপে উল্কার ভিতরকার কার্বন হীরকে রূপান্তরিত হয় এবং বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঝরে পড়ে। ঘটে যায় আরো কত কিছু।

রহস্যের মোড়কে দেবব্রতবাবু রূপায়িত করেছেন **মহাকাশে হীরকবৃষ্টি,** একটি রোমাঞ্চকর কল্পবিজ্ঞান কাহিনি।

কল্পবিজ্ঞান

মডার্ন কলাম।

10/2A,Tamer Lane, Kolkata-700009 9836371932

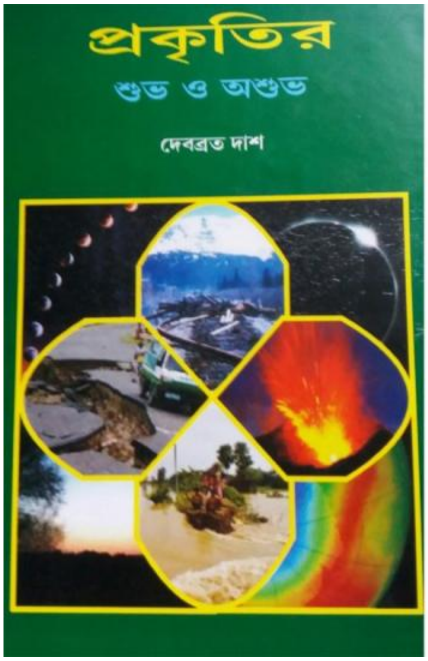

দেবব্রত দাশ বিজ্ঞান-কল্পবিজ্ঞান জগতে নিরন্তর বিচরণ করেন। তাঁর দুটি অনবদ্য গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে একটি কল্পবিজ্ঞান গ্রন্থ।

পৃথিবীর চারপাশে একের পর এক প্রাকৃতিক ও পরিবেশ দুর্যোগ মানুষকে দিশাহীন করেছে। আকস্মিক দুর্যোগের আশঙ্কায় মানুষ ভাবিত, ভীত।

রঙীন, সম্পূর্ণ রঙীন এই গ্রন্থের উপস্থাপনা সেই আশঙ্কা ও ভাবনারই অংশ। আপনাকে হয়তো এই গ্রন্থ কিছুটা আশ্বস্ত করবে।

কল্পবিজ্ঞান

মডার্ন কলাম।

10/2A,Tamer Lane, Kolkata-700009 9836371932

বাংলাদেশের বইঃ
রিভিউ করলেন, মীম নোশিন নাওয়াল খান

লাল্টু ভূতের তিন ছেলে- টিংকু, পিংকু আর বংকু। একদিন টিংকু আর বংকু বাবাকে জানাল, প্রতিদিন পিংকু ভূত কোথায় যেন যায়।
লাল্টু ভূত পিংকুকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, সে রোজ রোজ কাউকে কিছু না বলে কোথায় যায়।
পিংকু ভূত বলল, সে পাঠশালায় যায় পড়াশোনা শিখতে, কারণ সে শুনেছে, "লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে।"
লাল্টু ভূত কিন্তু মোটেও খুশি হল না, সে হতভম্ব হয়ে গেল। ভূতরা তো স্কুলে যায় না, তাদের স্কুলে যেতে নেই। পড়াশোনা শিখে ভূতদের কী হবে?
তারপর কি লাল্টু ভূত পিংকুকে স্কুলে যেতে দিয়েছিল? নাকি তাকে বকা দিয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল?
উঁহু, সেটা তো আমি বলব না। সেটা জানতে হলে তোমাকে পড়ে ফেলতে হবে "পিংকু ভূতের পড়ালেখা" গল্পটা। এই গল্পটা কোথায় পাবে?
এটা রয়েছে "ভূতের স্কুলে সেলফি" নামের একটা মজার গল্পের বইয়ে। শুধু এই গল্পটাই নয়, এই বইয়ে আছে আরো কিছু মজার মজার ভূতের গল্প। এসব গল্প শুনে তুমি ভয় পাবে না, বরং আনন্দ পাবে। ইচ্ছে করবে ভূতের সাথে বন্ধুত্ব করতে। এই ভূতের সাথে বন্ধুত্ব করানো গল্পগুলো লিখেছেন ইব্রাহিম নোমান। পুরো বইটা তিনি এত মজা করে লিখেছেন যে পড়তে পড়তে তুমিও চলে যাবে ভূতের রাজ্যে।
এই লেখক বেশ গুণী মানুষ। বাবা-মায়ের কাছ থেকে বর্ণমালা শিখতে শিখতেই ভর্তি হন ঢাকার গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাববিজ্ঞান নিয়ে অনার্স-মাস্টার্স করে আন্তর্জাতিক ডিগ্রির নেশায় ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে ACCA পার্ট টু শেষ করেন। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ব্রুকস ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে Bi MS ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে কর্মরত ছিলেন প্রায় এক বছর। তারপর লেখালেখির নেশা থেকে সাংবাদিকতা পেশায় চলে আসেন ইব্রাহিম নোমান। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার "ঝিলিমিলি" এবং "প্রকৃতি ও বিজ্ঞান" পাতা দুটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন তিনি।
"ভূতের স্কুলে সেলফি" ইব্রাহিম নোমানের প্রথম বই। বইটা প্রকাশ করেছে কালান্তর প্রকাশনী। ২০১৬ সালের একুশে বইমেলায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটার সুন্দর প্রচ্ছদ এবং পাতায় পাতায় রঙিন ছবি এঁকেছেন সোহেল আশরাফ।
ভূতের রাজ্যে ঘুরে ভূতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হলে বইটা অবশ্যই পড়বে কিন্তু!

কালান্তর প্রকাশনী, বন্দরবাজার , সিলেট
ইব্রাহিম নোমান
১২০ টাকা

রামময় রামনামী

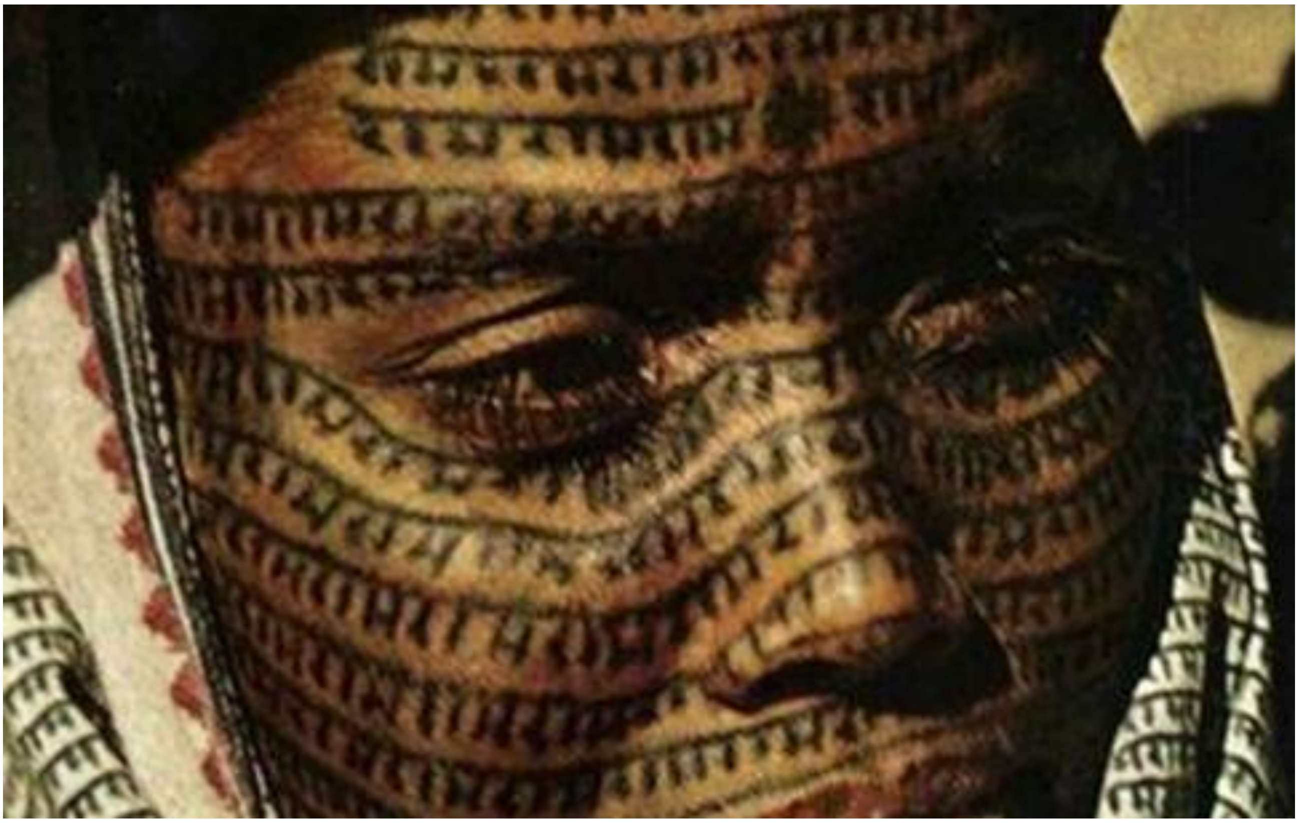

স্বপ্না লাহিড়ী

ছত্তিসগড়ের ধমতরি জেলার নগরি শহরের দক্ষিণে ছোট্ট গ্রাম ফারসিয়া। সেখান থেকে প্রায় ছয় কিমি দূরে সিহাবা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে মহানদীর মুখ্য ধারা। নদীটির উৎস ঠিক কোন জায়গাটিতে তা বলা যায় না। কারণ, অনেকগুলি পাহাড়ি নদীর প্রবল জলধারা যাদের উৎস পূর্বঘাট পর্বতমালার সিহাবা পাহাড়, একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করেছে মহানদী। প্রাচীনকালে নদীটির নাম ছিল চিত্রোৎপলা। মহানন্দা ও নীলোৎপলা নামেও নদীটিকে জানা যেত।

মহানদী তার উৎসস্থল থেকে বেরিয়ে ছত্তিসগড় হয়ে ৮৫৮ কিমি পথ পার করে উড়িষ্যার পারাদ্বীপের কাছে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এর প্রবাহপথ ধরে সৃষ্টি হয়েছে ছত্তিসগড় ও উড়িষ্যার পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক বিবিধতা। এই দুই রাজ্যের সংস্কৃতিগত পার্থক্য হয়তো আছে কিন্তু তাদের জীবনদর্শন ধনী হয়েছে এই নদীটির জলধারায় সিঞ্চিত হয়ে।

মহানদীর তটবর্তী ছত্তিসগড়ের কিছু গ্রামে বিশেষ করে বিলাসপুর, রায়গড় ও রায়পুরে বাস করে রামনামী সম্প্রদায়ের মানুষগুলি। এদের গুরু-গোঁসাই ও বিশিষ্ট লোকেরা মাথায় বাঁশের তৈরি মুকুট পরেন ও তাতে রঙবেরঙের ময়ূরপঞ্জ গুঁজে রাখেন। অনেকটা রেড ইন্ডিয়ানদের মতন। রামনামী সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষরা তাদের গোটা শরীরে কালো রঙ দিয়ে দুটি সূচের সাহায্যে রামনাম অঙ্কিত করে (স্থানীয় ভাষায় বলে গোদমা) এবং কালো রঙ আরও গাঢ় ও পাকা করার জন্য কেরোসিন তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে সেই কাজলেরও মিশেল দেয়। কালো রঙ এবং ধোঁয়া নিয়ে রামনামীদের একটি প্রচলিত ‘দোহা’ উদ্ধৃত করছি '- धूम कुसंगति कालिख होई / लिखिय पुराण मंजू मसि सोई -' অর্থাৎ, ধোঁয়া এবং কালি কুসঙ্গতির প্রতীক, মানুষের জীবন ও চরিত্রকে মলিন ও কালিমাময় করে তোল। কিন্তু সেই কালি দিয়ে পুরাণের মতো পবিত্র গ্রন্থ যখন লেখা হয় তখন সেই কালিই পবিত্র হয়ে ওঠে।

রামনামীদের সর্বাঙ্গে রাম নাম অঙ্কিত করার পিছনে একটি ইতিহাস আছে। কথিত আছে, কোনও এক সময় সবর্ণ শ্রেণীর উচ্চ জাতির লোকেরা রামনামীদের মন্দিরে প্রবেশ, ভগবান রামের পূজা, রামচরিত মানস পাঠ ও হোম-যজ্ঞাদি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাঞ্জগীর চাঁপা জেলার চারপারাতে এক দলিত যুবক পরসরাম ভারদ্বাজ ১৮১৯ সালের কাছাকাছি আশেপাশের দলিত জনসমূহকে সংগঠিত করে একটি আন্দোলন শুরু করেন যা কালক্রমে ভক্তি আন্দোলনের রূপ নেয়। দলগতভাবে এরা সমস্ত মন্দির ও ব্রাহ্মণ সমাজকে পরিত্যাগ করে। খুব সম্ভবত এই সময় রামনামী সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক কাজেই ব্রাহ্মণ বর্জনীয় এদের মধ্যে। এরা মৃতদেহ মাটিতে কবর দেয় কারণ, দাহসংস্কারে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। রামনামীদের এই ভক্তি আন্দোলন প্রায় একশো বছর ধরে চলে এবং ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে এরা রামনাম উচ্চারণ করার আইনি অধিকার পায়। এই আন্দোলন চলার সময় এদের জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষের মতো ছিল। এখন

তা প্রায় দশ লাখ। রামনামীরা বলে তারা যে রামকে স্মরণ করে, তিনি অযোধ্যাবাসী দশরথপুত্র রাম নন। তিনি 'নিরাকার ব্রহ্ম'-এর প্রতীক।

শরীরের কোন অংশে রামনাম উল্কি দিয়ে লেখা হয়েছে তাই দিয়ে গোটা রামনামী সমাজের লোকেরা আলাদা আলাদা নামে চিহ্নিত হয়। যারা শরীরের যেকোনও অংশে রামনাম চিত্রিত করে তাদেরকে বলা হয় রামনামী। যারা শুধু মাত্র মাথায় দুটি রামনাম লেখে, তাদেরকে বলা হয় শিরোমণি। যারা পুরো মাথায় রামনাম লেখায় তাদেরকে বলে সর্বাঙ্গ রামনামী ও যারা গোটা শরীরে রামনাম অঙ্কিত করে তাদেরকে বলা হয় নখশিখ রামনামী। এদের সন্তানদের দু'বছর বয়সের মধ্যেই শরীরে দুটি রামনাম উল্কি বা ট্যাটু করা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। বাড়ির দেয়ালগুলিতে কালো রঙ দিয়ে রামনাম লেখা থাকে এবং একে অপরকে অভিবাদন রাম রাম বলে করে। মন্দিরে প্রবেশ ও রামনাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ করাতে এরা এই অভূতপূর্ব উপায়টি অবলম্বন করে নিয়েছিল। আপাদমস্তক রামনামে চিত্রিত করে শরীরই মন্দির হয়ে উঠল। অনেকে জিভেও রামনাম লেখাল যাতে প্রতিটি কথার সাথে রামনাম উচ্চারিত হয়। নিজেদের আস্থা, বিশ্বাস ও অধিকার রক্ষার জন্য এই ছোট্ট সম্প্রদায়টি শক্তিশালী ব্রাহ্মণ সমাজের বিরুদ্ধে যে পথটি বেছে নিয়েছিল একদিন ও যে চারিত্রিক ও সাংগঠনিক দৃঢ়তা দেখিয়েছিল তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুব বিরল, খুব সম্ভবত নেই।

রামনামী সমাজের মানুষরা অনুসুচিত জাতির সতনামি, সূরজবংশী ও সদগুরু সমাজের লোকেদের থেকে নিজেদেরকে পৃথক ভাবে। কারণ, এদের জীবনের অনেকগুলি সংস্কার ব্রাহ্মণ-আশ্রিত। সতনামিরা উপবীত ধারণ করে, সূরজবংশীয়দের মধ্যে গঙ্গাস্নান, কথকথা পাঠ ও সদগুরুপন্থীদের মধ্য মুণ্ডন সংস্কার ও কণ্ঠি ধারণ তাদের ধার্মিক প্রথার অঙ্গ আর সেগুলির জন্য আজও এদেরকে ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হতে হয়। যদিও রামনামী ও এদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধের চলন আছে।

ছত্তিসগঢ়ের অনুসুচিত জাতির একটি বড়ো অংশ গুরু ঘাসীদাসের অনুগামী। কিন্তু রামনামীরা ভক্ত কবি সন্ত রায়দাসের অনুগামী। এদের সামাজিক সমস্ত ক্রিয়াকর্মতে শুধু রামচরিত মানস পাঠ করা হয়। রামচরিত মানস পাঠ করারও একটি নিয়ম আছে। প্রতিটি পদ বা চৌপাঈয়ের আগে এবং পরে দু'বার রামনাম জুড়ে পাঠ করতে হয়। এই আস্থাবাদী সম্প্রদায়টির জীবন দর্শনও বড়ো সুন্দর। তাদের বিশ্বাস ও প্রার্থনা '-- अर्थ न धर्म न काम-रुचि, जनि न चहौ निरबाना।। जन्म-जन्म मम राम-राम पद, यह वरदान न आना।'

এই সম্প্রদায়ের মানুষগুলির উল্কি দিয়ে চিত্রিত চেহারা, তাদের রহন-সহন, প্রায় একশো বছর ধরে চলে আসা পরম্পরাগত মেলা এবং সর্বোপরি তাদের জীবনদর্শন, দুনিয়াভরের সমাজ শাস্ত্রী ও মানব বিজ্ঞানীদের আকর্ষিত করেছে। আন্দামান দ্বীপসমূহ ও দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু জনজাতি মাটি ও ভেষজ রঙ দিয়ে শরীর চিত্রিত করে ও পাখির রঙিন পাখা মাথায় গোঁজে। কিন্তু সেটা সাজগোজের অঙ্গ, রামনামীদের মতো ধর্ম বা ভক্তির অঙ্গ নয়।

রামনামী সমাজের মানুষদের খুব কম জনের কাছেই কৃষিযোগ্য জমি আছে। জীবনধারণের জন্য এরা বেশিরভাগই দিনমজুরির কাজ করে অথবা কয়লা খাদান, ছুই খাদান বা অন্যান্য খাদানে কাজ করে। রাজনৈতিক সংরক্ষণ ও অন্যান্য যোজনার অন্তর্গত সুবিধা যতটা অনুসুচিত জাতির সতনামী, সূরজবংশীয় বা সদগুরুপন্থীরা পেয়েছে এই সমাজের মানুষগুলি এতদিন তা থেকে বঞ্চিত ছিল। তবে এখন তারা এই সুবিধাগুলি পেতে শুরু করেছে।

রামনামী সমাজের দুটি প্রমুখ ধার্মিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। একটি চৈত্রমাসের রামনবমীতে বিশাল সন্ত সমাগমের মেলা ও দ্বিতীয়টি পৌষমাসের একাদশী থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত তিন দিবসীয় বার্ষিক মেলা।

রায়গঢ় জেলার অন্তর্গত ঐতিহাসিক শহর সারংগড়-এর পথের পাশে একটি ছোট্ট গ্রাম গোড়ম। এর থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত গ্রাম ওড়কাকন। এই গ্রামটি রামনামী সম্প্রদায়ের একটি প্রমুখ ধর্মস্থান। চৈত্র রামনবমীর ধার্মিক মেলা ওড়কাকনে আয়োজিত হয়। মেলার প্রারম্ভে পূর্ব-নির্ধারিত জায়গায় ময়দানের মাঝখানে রামনাম লেখা একটি স্মারক-স্তম্ভ পোঁতা হয়। প্রথমে এই স্তম্ভটির পূজা হয় ও তার পর মেলা শুরু হয়। স্মারক-স্তম্ভটির চারদিকে গোল করে ঘিরে প্রথমে গোঁসাই সন্ত, বিশিষ্ট ভক্তগণ ও গ্রামপ্রধানদের তাঁবু বা 'চালনি' লাগানো হয়। তারপরে থাকে বাইরে থেকে আসা ব্যবসায়ীদের তাঁবু এবং সর্বশেষে বৃত্তাকারে থাকে গ্রাম থেকে আসা সমাজের সাধারণ মানুষদের চালনি। তাঁবুগুলির ওপর থেকে নিচে ও ভিতর থেকে বাইরে পর্যন্ত কালো রঙ দিয়ে রামনাম লেখা থাকে।

এই মেলাতে সামাজিক বিষয় ও বিবাদ প্রভৃতির ওপর সামুহিক নির্ণয় নেবার প্রথা আজও চলে আসছে। সামুহিক বিবাহও এখানে সম্পন্ন হয়। প্রতিটি বিবাহ পঞ্জের রেজিস্টারে পঞ্জিকৃত হয় ও নবদম্পতিদের সার্টিফিকেটও দেয়া হয়। পৌষমাসের তিন দিবসীয় বার্ষিক মেলাতে নির্ণয় নেয়া হয় যে আগামী মেলাটি কোন গ্রামে আয়োজিত হবে। গ্রামের প্রতিনিধিরা নিজের নিজের গ্রামের পক্ষ থেকে সমাজপ্রধানদের কাছে আবেদন জমা করেন সেখানে মেলা আয়োজিত করার জন্য। যে গ্রাম সবচাইতে বেশি নারিকেল ভেট দেয় সেই গ্রামকেই এই দায়িত্ব দেয়া হয়। বার্ষিক মেলা মহানদীর তটবর্তী গ্রামে আয়োজিত হয়। এদের গণতান্ত্রিক বিধিবিধানের পরম্পরা শত বৎসর ধরে আজও চলে আসছে।

ডুপুরের পর থেকে মেলা মুখর হয়ে ওঠে জনসমাগমে। গোঁসাই, সন্ত ও ভক্তগণ এক পায়ে ঘুঙুর বেঁধে রামনাম গাইতে থাকেন ও তার সাথে চলতে থাকে রামচরিত মানস পাঠ। মেলার ক'টা দিন ডুপুর থেকে ভোররাত পর্যন্ত দিক-দিগন্তে ধ্বনিত হতে থাকে সমবেত কণ্ঠের পবিত্র রামনাম। ছত্তিসগঢ়-এর আকাশ বাতাস, মাটি, নদী-নালা, অরণ্য-পর্বত রামময় হয়ে ওঠে।

মেলা শেষ হয়ে গেলে স্মারক-স্তম্ভটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে রামনামের স্মৃতিচিহ্ন রূপে।

---

(৬)

থর হেয়ারডাল

(অনুবাদঃ ইন্দ্রনাথ)

আগের কথা

অভিযাত্রী ক্লাব থেকে বেশ কিছু নতুন অথচ কাজের জিনিস পাওয়ার আশ্বাস পাওয়া গেল। পরদিন ঝাজিদের ঠেকে থর এর সাথে আলাপ হল হারম্যান এর। রেফ্রিজারেটর বিশেষজ্ঞ। খুব দ্রুত দলে ভিড়ে গেল হারম্যন। এবারে দুজনে একত্রে কাজ শুরু করল। বিখ্যাত অভিযাত্রী ফ্রাউসেন এর কল্যাণে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান প্রেসে ফলাও করে প্রচার হল ওদের সমুদ্র অভিযান। ফলে একটা স্পনসর জোটার সম্ভাবনা তৈরী হল। এবারে যন্ত্রপাতি আর লোকলস্কর নিয়ে ভাবলেই হবে। টাকা পয়সার ভাবনা অন্য লোকের। একে একে টরস্টাইন, এরিক আর ন্যুট জুটে গেল। প্রস্তুতি পূর্ণ উদ্যমে চলছে, এরই মধ্যে বিয়র্ন ওয়াশিংটন থেকে ফোন করল। পরদিনই দুজন ছুটল সামরিক দপ্তরে।

বিয়র্নকে সামরিক দূতের অফিসে ওর ঘরেই পেয়ে গেলাম।

“আমার মনে হয় সব ঠিকই আছে,” ও জানাল, “কর্নেলের কাছ থেকে যথাযথ সুপারিশ পাওয়া গেলে আমরা আগামীকালই বিদেশ-মৈত্রী বিভাগে যেতে পারি।”

কর্নেল হলেন অটো মুনতে কস, নরওয়ের সামরিক রাষ্ট্রদূত। ভদ্রলোক যথেষ্ট ভদ্র; উনি যখন আমাদের উদ্দেশ্যটা শুনলেন, বেশ আগ্রহের সাথেই রাজি হয়ে গেলেন সুপারিশ করে একটা চিঠি লিখে দিতে।

পরদিন সকালে চিঠিটা আনতে গেছি, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে ওঁর মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে উনিও গেলে বেশি ভালো হবে। সুতরাং কর্নেলের গাড়ি চেপেই পেন্টাগনে সামরিক দপ্তরে গেলাম। সামনের সিটে কর্নেল আর বিয়র্ন; তাদের সামরিক পোশাকে দুরস্ত লাগছিল; আর আমরা, হারম্যান আর আমি পেছনের সিটে বসে কাচের ভেতর দিয়ে পেন্টাগনের বিশাল বাড়িটা দেখছিলাম। তিরিশ হাজার কেরানি আর ষোল মাইল করিডোরের এই বিশাল বাড়িটা শেষমেষ আমাদের অভিযানের বিষয়ে সামরিক উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলার মঞ্চ হল! সত্যি বলছি, অভিযানের আগেও না, পরেও না, আমাদের ভেলাটাকে কখোনো এতটা অসহায় আর এট্টোটুকু লাগেনি কখনো।

এধার ওধার এই করিডোর ওই করিডোর ঘুরতে ঘুরতে শেষে বিদেশ মৈত্রী দপ্তরের দোরগোড়ায় পৌঁছোলাম। চারধারে ঝকঝকে উর্দিধারীরা। একটা বড়ো মেহগনি কাঠের টেবিলের চারধারে বসলাম। দপ্তরের প্রধান যিনি, তিনিই মিটিং এর সভাপতিত্ব করলেন।

সেনা অ্যাকাডেমির কর্তাটি চেহারায় বেশ লম্বা চওড়া। টেবিলের একপ্রান্ত প্রায় জুড়েই বসেছিলেন; উনি তো প্রথমে আমাদের ভেলা-অভিযানের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ বিভাগের কী সম্পর্ক তা বুঝেই উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু কর্নেলের সুচিন্তিত বক্তব্য আর অন্যান্য অফিসাররা যারা বসেছিলেন টেবিলের চারপাশে, তদের চটপট উত্তরে আর ওয়াকিবহাল মন্তব্যে আমাদের কাজটা সোজা হয়ে গেল, বা বলা যায়, উনি আমাদের খানিকটা পাত্তা দিতে শুরু করলেন, এবং যন্ত্রপাতি বিভাগ থেকে আসা বিমানসামগ্রী আধিকারিকের চিঠিটায় মনোযোগ দিলেন। পড়া শেষ করে ভদ্রলোক তার অফিসারদের খুব সংক্ষিপ্ত আদেশে জানালেন যাতে সাহায্য করা হয়। আমাদের শুভেচ্ছা জানালেন। এবং গটগট করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

দরজা বন্ধ হবার প্রায় সংগে সংগে এক যুবক, পদমর্যাদায় ওঁর ঠিক পরেই, ফিসফিস করে আমার কানের গোড়ায় বললেন, ‘‘বাজি ফেলছি, যা দরকার আপনি তাইই পাবেন। এক্কেবারে ছোটখাটো সৈন্য অভিযানের মতো লাগছে। আমাদের নিস্তরঙ্গ শান্ত অফিস আবহাওয়ায় খানিকটা পরিবর্তন তো বটেই! তাছাড়া এটা আমাদের নানান সামগ্রী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার একটা দারুণ সুযোগ।’’

যোগাযোগকারী অফিসারটি কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল এর গবেষণাগারে আমাদের সংগে মিস্টার লুইসের একটা সাক্ষাৎকারের দ্রুত বন্দোবস্ত করে ফেললেন। আর প্রায় সাথে সাথেই আমাকে আর হারম্যানকে সেখানে গাড়িতে করে নিয়ে চললেন।

মরিস দুর্দান্ত লোক, মস্তো সেনা অফিসার, বন্ধুর মতো, খেলোয়ারসুলভ। তিনি তক্ষুণি গবেষণগারের নানান বিভাগে দায়িত্বে থাকা লোকেদের ডেকে পাঠালেন। সক্কলে খুশিমনে তাঁদের নিজের নিজের সামগ্রীর পরিমাণ বাতলে দিলেন, যেগুলো তাঁরা আমাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করাতে চান। আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি অথচ যা যা চাইতে পারি এমন সমস্ত জিনিসই আমাদের চাহিদার কয়েক গুণ পরিমাণ গড়গড় করে আমাদের সামনে বলে যাওয়া হল। ফিল্ড রেশন থেকে শুরু করে, সানবার্ন লোশন থেকে জলনিরোধক স্লিপিং ব্যাগ অবধি।

এবারে সমস্ত জিনিসগুলো সরেজমিনে দেখানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হল। ফিল্ড রেশন চেখে দেখলাম দুজনে; দেশলাই জ্বেলে দেখলাম, ভিজে অবস্থাতেও দিব্যি সে কাঠি জ্বলল। নতুন প্রাইমাস স্টোভ, জল রাখার পিপে, রাবারের ব্যাগ, বিশেষ ধরণের জুতো, রান্নার বাসনপত্র ও ছুরি যেগুলো জলে ভাসতে পারে এবং একটা অভিযানে লাগার মতো আরো আরো নানান জিনিসপত্র।

হারম্যানের দিকে তাকালাম। ওর অবস্থাটা জুলজুলে চোখের সেই সরল বাচ্চাটার মতো যে কিনা, মনে করা যাক, খুব ধনী পিসিমার সাথে চকলেটের দোকানে এসেছে! কর্নেল আমাদের সমস্ত জিনিস দেখাতে দেখাতে চললেন, আর ঘুরে দেখার মধ্যেই সঙ্গী সহায়ক অফিসারটি একটা তালিকা করে ফেললেন, যাতে লেখা রইল আমাদের কী কী জিনিস কতটা করে লাগবে। মনে হচ্ছিল অর্ধেক যুদ্ধ জয় হয়ে গেছে, মনে হচ্ছিল আমার হোটেলের ঘরটায় ছুট্টে ফিরে গিয়ে নিরিবিলিতে টান টান হয়ে শুয়ে সত্যি সত্যি কী হচ্ছে, সেটা বোঝার চেষ্টা করি। অমনি, তখনই, দীর্ঘদেহী বন্ধু কর্নেল বলে উঠলেন, “তাহলে চলো এবার বস এর সঙ্গে কথা সেরে নিই, কেন না তিনিই একমাত্র এসব জিনিস তোমাদের দেবার অনুমতি দিতে পারেন।”

আমার প্রায় মাটিতে পড়ে যাবার জোগাড় হল। তার মানে আবার সেই বক্তিমে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে! আর ভগবানই জানেন এই বস লোকটি আদতে কেমন।

দেখলাম বস লোকটি ছোট্টোখাট্টো, রাশভারী আর গম্ভীর। লেখার টেবিলে বসেছিলেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই তার গভীর নীল চোখ দুটো দিয়ে আমাদের জরিপ করে নিয়ে বসতে বললেন।

‘‘বেশ, কী চান এই ভদ্রলোকেরা?’’ প্রশ্নটা করা হল সরাসরি কর্নেল লুইসকে অথচ চোখ আমার উপর থেকে সরল না।

‘‘ইয়ে, সামান্য কয়েকটা জিনিস,’’ কর্নেল লুইস তড়িঘড়ি মুখ খোলেন। তারপর আমাদের গল্পটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন, আর গোটা সময়টা বস লোকটা একচুল না নড়ে চুপ করে শুনলেন।

“আর বদলে কী দেবেন ওরা?” কথা শেষে, জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক; স্পষ্টত এসব অভিযানের কাহিনির ছিঁটেফোঁটাও প্রভাব পড়েনি ওঁর ওপর।

“হ্যাঁ, ঠিকই,” কর্নেল বললেন, বেশ সাফাইয়ের মতো করে, “মানে ওরা আমাদের একটা রিপোর্ট দিতে পারেন এইসব নতুন খাবারদাবার আর যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও গুণমান বিষয়ে। এ অভিযানে ওরা তো বেশ প্রতিকূল অবস্থাতেই ওগুলো ব্যবহার করবেন, তাই...”

রাশভারী, গম্ভীর ভদ্রলোকটি নিজের লেখার টেবিলের পেছনের চেয়ারটাতে খুব ধীরে ধীরে পেছনদিকে হেলে বসলেন। চোখ কিন্তু আমার ওপর থেকে একটুও সরেনি। লোকটি যখন শান্ত ভাবে মুখ খুললেন, আমি ক্রমশ চেয়ারের অতলে ডুবে যেতে থাকলাম, “আমি তো দেখতে পাচ্ছি না ওঁরা আমাদের এর বদলে সত্যিই কিছু দিতে পারবেন।” ঘরে শ্মশানের নীরবতা। কর্নেল লুইস তার কলারটা ঠিক করলেন; আমাদের কেউই মুখ থেকে টুঁ শব্দটি করল না।

“তবে,” বড়োসায়েব হঠাৎ করে বলে উঠলেন, এবারে তার চোখে হালকা হাসির ঝিলিক, “সাহস আর প্রত্যয় খুব বড়ো জিনিসও বটে। কর্নেল লুইস আপনি ওদের জিনিসগুলো দিয়ে দিন।”

হোটেলের ঘরে ফেরার গাড়িটায় আমি ভেবলে বসে ছিলাম, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে, আনন্দে। এদিকে হারম্যান আমার পাশে বসে আপনমনে হেসেই চলেছে।

“বেহেড হলে নাকি?” ওকে জিজ্ঞাসা করলাম।

“নাহ” বলে নির্লজ্জের মতো হাসতে থাকল, বলল, “খাবার দাবারের মধ্যে, দেখেছ, ৬৮৪ বাক্স আনারস। ওটা আবার আমার সবচে প্রিয়।”

হাজারটা কাজ বাকি রয়েছে। আর এদিকে সময় নেই। ছটা লোক, কাঠের ভেলা, তার যাবতীয় মালপত্র পেরুর সৈকতে এনে জড়ো করতে হবে। তিনমাস মাত্র সময়, হাতে কোনো আলাদিনের প্রদীপও নেই। নিউ ইয়র্ক গেলাম। লিয়াজঁ অফিস থেকে আগেই যোগাযোগ করে রাখা ছিল। আমরা কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেহরের সাথে দেখা করলাম। সামরিক দপ্তরের ভৌগোলিক গবেষণাদলে তিনিই ছিলেন প্রধান। ইনিই শেষ হাসিটা হাসলেন আরকি, আর আমাদের হারম্যান গিয়ে দামী দামী যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে এল, যাতে অভিযানের সময়ে বৈজ্ঞানিক পরিমাপগুলো সঠিক হয়।

এরপর গেলাম ওয়াশিংটন। অ্যাডমিরাল গ্লোভারের সাথে দেখা করতে। নৌবাহিনীর জলসম্পদ সংস্থায়। বুড়ো, মানুষ ভালো, দক্ষ নাবিক। তিনি তার সব অফিসারকে ডেকে পাঠালেন এবং আমার আর হারম্যানের পরিচয় দিয়ে, দেয়ালে ঝোলানো প্রশান্ত মহাসাগরের চার্টটা দেখিয়ে বললেন, “এই ভদ্রমহোদয়েরা আমাদের তৈরি সাম্প্রতিক মানচিত্র দেখেশুনে নিতে চান। ওদের সাহায্য কর।”

আমাদের অভিযানের গাড়ি গড়গড় করে দৌড়োচ্ছিল। ইংরেজ, কর্নেল লামসডেন, ওয়াশিংটনের ব্রিটিশ মিলিটারি মিশন-এ সভা ডেকে বসলেন। বিষয়, আগামী অভিযানের সমস্যা আর তার সম্ভাব্য সুষ্ঠু সমাধান। বহু ভালো ভালো পরামর্শ পেলাম আমরা, তার সাথে ইংল্যান্ড থেকে আনানো বেশ কিছু ব্রিটিশ যন্ত্রপাতি, যা আমরা অভিযানের কাজে লাগাব। ব্রিটিশ মেডিক্যাল অফিসারটি বিশেষ একটা গুঁড়োর কথা বারে বারে বলছিলেন। অদ্ভুত রকম; হাঙরদের জন্য তৈরি। কোনো হাঙর একটু বেশি নাছোড়বান্দা হলে, আমাদের স্রেফ একটু গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতে হবে জলে, ব্যস হাঙরবাবাজি গায়েব হয়ে যাবে।

“মশায়,” আমি বলি, “ইয়ে, আমরা কি এই গুঁড়োটার ওপর নির্ভর করতে পারি?”

“হুঁ,” ইংরেজ ভদ্রলোকটি মুচকি হাসলেন, “সেটাই তো আমরা দেখতে চাইছি!”

সময় যখন কম, আর ট্রেনের বদলে প্লেন, হাঁটার বদলে ট্যাক্সি এসব হলেই পকেটের হাল চুপসে ঝরাপাতার ঝোলা হয়ে ওঠে! শেষ অবধি আমার নরওয়ে ফেরার টিকিটের টাকাও যখন খরচা হয়ে গেল, আমরা নিউ ইয়র্কে আমাদের বন্ধু আর পৃষ্ঠপোষকদের কাছে গেলাম সাহায্যের জন্য। সেখানে গিয়ে তো অবাক, সে আবার এক উলটো সমস্যা! আমাদের অর্থসচিব জ্বরে পড়ে বিছানায় আর তার দুই সহকারী ঠুঁটো জগন্নাথ, ওঁকে ছাড়া কিছু করার ক্ষমতা তাদের নেই। অর্থসাহায্য নিয়ে যে চুক্তি হয়েছিল তা থেকে তারা সরে আসেননি বটে, কিন্তু তক্ষুনি তাদের কিচ্ছু করারও ছিল না। আমাদের বলা হল কাজকর্ম একটু পিছিয়ে দিতে;

একান্তই অবাস্তব একটা প্রস্তাব, বিশেষ করে, সেই মুহূর্তে। ততদিনে জল গড়াতে শুরু করেছে, চাকা ঘুরছে, আর তা থামিয়ে দেবার সাধ্য আমাদের আর নেই। আমরা খালি শক্ত করে হাল ধরে আছি এইই। বন্ধ করা বা থামিয়ে দেওয়া একান্তই অসম্ভব। বন্ধুরা তখন বলল, চুক্তিটা বাতিল করে, সংস্থাটাকে বন্ধ করলে আমরা নিজেদের মতো স্বাধীনভাবে চটপট কাজ করতে পারব।

সুতরাং, পকেটে হাত। আমরা রাস্তায়।

"ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি" হারম্যান বিড়বিড় করে বলল।

"আর মার্চের কটা দিন" আমি বলি, "কিন্তু, যাইই হোক আমাদের শুরু করে দিতেই হবে।"

বাকী সবকিছু ধোঁয়াশায় থাকলেও একটা বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল, আমাদের অভিযানের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে আর সেটাকে, ওই কাঠের পিপেয় নায়াগ্রায় ঝাঁপ দেয়া কিম্বা সতেরোদিন টানা মাস্তুলের ডগায় বসে থাকা অন্যান্য বাজীকরদের কাজকর্মের সাথে লোকে গুলিয়ে ফেলুক তা আমরা মোটেই চাইছিলাম না।

"সস্তা পিঠ চাপড়ানি মার্কা ব্যাপার চাই না।" হারম্যান বলল।

এবিষয়ে আমরা গভীরভাবে সহমত ছিলাম।

নরওয়ের মুদ্রা পেতে পারতাম, কিন্তু আটলান্টিকের এপারে তা দিয়ে আমাদের কাজ সমাধা হত না। কোন সংস্থা থেকে অনুদান চাইতেই পারতাম, কিন্তু আমাদের বিতর্কিত তত্ত্ব নিয়ে সেটা খুবই মুশকিলের ছিল, কারণ ওই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই ভেলা-অভিযান করছি কিনা! দ্রুত বুঝে গেলাম, না কোনো খবরের কম্পানি, অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগী কেউ, এমন কিছুতে টাকা ঢালতে রাজি নয় যে অভিযানটাকে তারা অথবা বীমা কম্পানিগুলো স্রেফ আত্মহত্যার নামান্তর মনে করে! কিন্তু যদি "সহি-সালামত" ফিরে আসি, তখন অন্য কথা।

ব্যাপারটা বেশ খানিকটা হতাশাব্যঞ্জকই লাগছিল, আর বহুদিন কোনো আশার আলোও দেখা যাচ্ছিল না। এমন সময় কর্নেল মুনতে কস এসে উদয় হলেন।

"ওহে ছেলেরা,আটকে গেছ দেখছি, বললেন ভদ্রলোক, "এই নাও চেকখানা ধরো, দক্ষিণ সাগরের দ্বীপ থেকে যখন ফিরে আসবে তখন ফেরত দিতে পারো।"

তার দেখাদেখি আরো কয়েকজন আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ফলে আমার ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণ যথেষ্ট ফুলেফেঁপে উঠল কোনো এজেন্ট বা অন্যান্য লোকেদের সাহায্য ছাড়াই। এবার আমরা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে ভেলা বানানো শুরু করতেই পারি।

পুরোনো পেরুর বাসিন্দাদের ভেলাগুলো বানানো হত বালসা কাঠের। শুকনো অবস্থায় সেগুলো শোলার চেয়ে হাল্কা। বালসা গাছগুলো জন্মায় পেরুতে, তাও আন্দিজ পর্বতমালা পেরিয়ে। ফলে ইনকাদের সময়কার সমুদ্রযাত্রাকারীরা, সমুদ্রতীর বরাবর ইকুয়েডর অবধি গিয়ে সেখানে বড়ো বড়ো বালসা কাঠের গুঁড়ি কেটে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরেই জড়ো করত। আমরাও ঠিক সেটাই করতে চাই।

এখনকার দিনের যাতায়াতের সমস্যা ইনকাদের সময়ের যাতায়াতের সমস্যার থেকে অনেকটাই আলাদা। আমাদের গাড়ি রয়েছে, উড়োজাহাজ রয়েছে, ভ্রমণ সংস্থা রয়েছে। আবার সব মিলিয়ে ব্যাপারখানা ততও সহজ নয়, সীমান্তের বাধা যেমন, বোতামআঁটা প্রহরী; তার কারো ওপর সন্দেহ হতে পারে, মালপত্র ফর্দাফাঁই করে দিতে পারে, এমনকি স্ট্যাম্প-পত্তর মারা কাগজে কাগজে বোঝাই হয়ে উঠবে, অবশ্য আদৌ যদি ঢুকতে পারো। এই বোতামআঁটা লোকগুলোর কারণেই আমরা জানতাম আমরা কখনোই প্যাকিং বাক্স, ট্রাঙ্ক ঠাসা অদ্ভুত জিনিসপত্র নিয়ে ওদেশে ঢুকতে পারব না; হয়তো ঢুকলাম আর ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে আলতো করে টুপি উঠিয়ে বললাম যে আমরা এসেছি, আমাদের ঢুকতে দিন, আমরা ভেলায় চড়ে এখান থেকে সাগরপাড়ি দেব! অমনি সোজা জেলে ভরে দেবে!

"নাহ," হারম্যান বলে "আমাদের একটা সরকারি পরিচিতি থাকা উচিত।"

জাতিপুঞ্জের বিদায়ী সভায় আমার এক বন্ধু, জাতিসঙ্ঘের মুখপাত্র ছিল। সে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। বলল, তার গাড়ি নিয়ে আসবে। ইউএনওতে অ্যাসেম্বলির বড়ো হলঘরে ঢুকে সত্যিই তাক লেগে গেল, সারা পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ বেঞ্চের ওপর পাশাপাশি বসে চুপ করে এক কালো চুলের রাশিয়ানের কথা

শুনছে, পেছনের কালো দেয়ালে গোটা পৃথিবীর এক প্রকান্ড মানচিত্র। আমাদের সাংবাদিক বন্ধুটি নিঃশব্দে ওরই মধ্যে প্রথমে পেরুর একজন তারপর ইকুয়েডরের একজন প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ সেরে ফেলল।

পাশের অ্যান্টিচেম্বারে চামড়াআঁটা নরম সোফায় বসে দুজনেই খুব আগ্রহের সাথে আমাদের পরিকল্পনাটা শুনল। আমরা সমুদ্র পার করতে চাইছি, শুধু এই প্রমাণ করার জন্য যে তাদেরই পূর্বপুরুষরাই সর্বপ্রথম সাগর পাড়ি দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে পৌঁছেছিল। দুজনেই নিশ্চিত করল যে অবশ্যই সরকারের কাছে এ প্রসঙ্গ তারা জানাবে এবং কথা দিল, আমরা গেলেই, দুজনেই তাদের নিজের নিজের দেশে যারপরনাই সাহায্য করবে। তুরগেভ লি, অ্যান্টিরুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমরা নরওয়ের লোক শুনে উনি এলেন, আর কেউ একটা পাশ থেকে প্রস্তাব দিল ভেলা-অভিযানে আমাদের সাথে যোগ দিতে। কিন্তু ডাঙাতে তার পাহাড় প্রমাণ কাজ ছিল যে! জাতিসঙ্ঘের সহকারী সম্পাদক চিলের ডক্টর বেঞ্জামিন কোহেন, নিজে একজন নামকরা শখের পুরাতাত্ত্বিক, আমাদের কাছে পেরুর রাষ্ট্রপতিকে লেখা একটা চিঠি দিলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সেখানেই আমরা নরওয়ের রাষ্ট্রদূত, মর্গেনস্টার্ন-এর উইলহেলম ফন মুনতে-এর সাথে দেখা করলাম, যিনি তারপর থেকে আমাদের গোটা অভিযানে অমূল্য সহায়তা দিয়েছেন।

সুতরাং দুটো টিকিট কাটলাম আর দক্ষিণ আমেরিকার উড়ানে চেপে বসলাম। চারটে ইঞ্জিন চালু হল একের পর এক আর আমরা সিটে প্রায় এলিয়ে বসে রইলাম, যেন আমাদের ইতিমধ্যে নিংড়ে নিয়েছে কেউ। ভাষাহীন এক অনুভূতি হচ্ছিল; যাক, অভিযানের প্রথম পর্ব চুকল! আর শেষ অবধি, এই, এখন, সোজা অভিযানেই নেমে পড়া গেল।

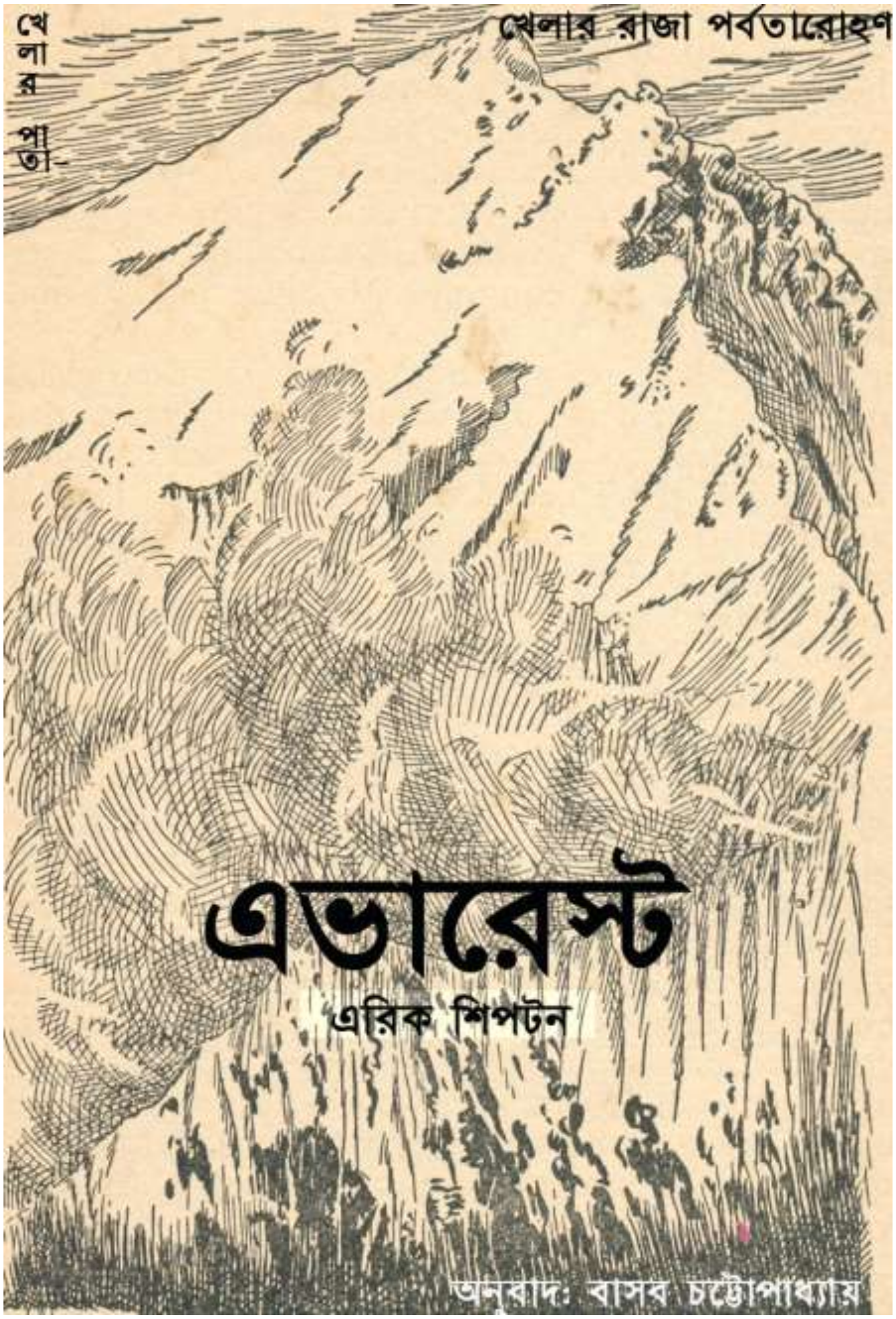

পৃথিবীর শীর্ষস্থানে

ওইদিনই বুর্ডিলন এবং ইভান্স সাউথ সামিটে ফিরে এলেন। হান্ট এবং শেরপা দা নামগিয়াল ২৭৩০০ ফুট উচ্চতায় বিপুল পরিমাণে আরোহণ সামগ্রী জড়ো করলেন। শুরু হল নতুন উদ্যমে দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলের আরোহণের প্রয়াস।

লো, গ্রেগরি এবং শেরপাদের সাথে হিলারি এবং তেনজিংও সাউথ কলে পৌঁছলেন। শুধু এভারেস্ট অভিযানের ইতিহাসই নয় যেকোনো দূর্গমতম শৃঙ্গ আরোহণের মুহূর্তে শেরপাদের অবদান আমাদের মত অভিযাত্রীদের কাছে যেহেতু অনস্বীকার্য, সেহেতু এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণের প্রচেষ্টার দ্বিতীয় উদ্যোগের অন্তিম লগ্নে শেরপা তেনজিংকে হিলারির সহযোগী হিসেবে নির্বাচন অন্যতম মুখ্য কারণ। শেরপা তেনজিং ব্যতীত কোনো অভিযাত্রী এই সম্মান পাওয়ার অধিকারী নন। সেই ১৯৩৫ এর প্রথম এভারেস্ট অভিযানে সে আমার সাথীই শুধু নয় এ পর্যন্ত চারবার এভারেস্ট অভিযানে আমার সঙ্গে তেনজিং অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও বছর জুড়ে হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গাভিযানে তেনজিং ছাড়া আমার অভিযাত্রী দল সম্পূর্ণ হত না। একজন হিমালয় অন্তপ্রাণ অভিযাত্রী হিসেবে সে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল। সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর তাবড় পর্বত অভিযাত্রী মহলে।

পূর্ববর্তী বছরে শৃঙ্গের ১০০০ ফুট নিচ থেকে খারাপ আবহাওয়ার জন্য ফিরে আসতে বাধ্য হয় তেনজিং। কোনো সহযোগী শেরপাই এই যোগ্যতার অধিকারী ছিল না। সবদিক থেকেই অভিযাত্রীরা দ্বিতীয় প্রয়াসের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু রাত থেকেই আবহাওয়ার অবনতি হতে থাকল। ২৭ তারিখ ভোর থেকে সাউথ কলে তীব্র হাওয়ার দাপট। তাপমাত্রা শূন্যের ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে। এই আবহাওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব ধার ধরে শৃঙ্গারোহণও অসম্ভব।

Hillary and Tensing

২৮ তারিখ সকালে আবহাওয়ার তুলনামূলক উন্নতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল লো এবং গ্রেগরি দক্ষিণ-পূর্ব ধার ধরে অগ্রসর হবেন। স্থাপন করবেন নবম শিবির। তিনজন মালবাহক তাঁদের সাহায্য করবে। কিন্তু মালবাহকদের মধ্যে দুজন অসুস্থ হওয়ায় আরোহণ সামগ্রী নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন অভিযাত্রীরা। এঁদের মধ্যে লো, গ্রেগরি এবং শেরপা আং নিমা ৪০ পাউন্ডের বেশি মাল বহন করলেন।

ঘন্টাখানেক পরে হিলারি এবং তেনজিং প্রত্যেকে ৫০ পাউন্ড মাল পিঠে শীর্ষ শিবিরের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললেন। তাঁদের সুবিধা হল পূর্ব অভিযাত্রীদের নির্মিত পথ ধরে এগিয়ে চলতে। দিনের মধ্যবর্তী সময় হিলারি এবং তেনজিং পূর্ববর্তী তিন অভিযাত্রীকে ধরে ফেললেন। দ্রুত পাঁচ অভিযাত্রী পৌঁছে গেলেন হান্টের রেখে যাওয়া বিপুল আরোহণ সামগ্রীর নিকট। সিদ্ধান্ত নিলেন অধিকতর উচ্চতায় তাঁরা অন্তিম শিবির স্থাপন করবেন। অতিরিক্ত আরোহণ সামগ্রীর ভারে প্রত্যেক অভিযাত্রীর পিঠে তখন ৬৩ পাউন্ডের ওজন।

খাড়াই হলেও পথ তুলনামূলক কম বিপজ্জনক। প্রত্যেকেই অক্সিজেন ব্যবহার করছিলেন। কিন্তু অধিকতর উচ্চতায় পৌঁছেও শিবির স্থাপন উপযোগী স্থান পাওয়া গেল না। ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর ২.৩০ মি.। হঠাৎ তেনজিং এর মাথায় এল আগের বছরের অভিযানেই কিছুটা বামদিকে শিবির স্থাপনোপযোগী একটি স্থানের কথা। তাঁরা আড়াআড়ি অগ্রসর হতে থাকলেন। পৌঁছে গেলেন সংকীর্ণ কিন্তু শিবির স্থাপনের উপযোগী স্থানে। উচ্চতা ২৭৯০০ ফুট। চূড়া থেকে মাত্র ১১০০ ফুট নীচে। লো, গ্রেগরি এবং আং নিমা শীর্ষ শিবিরে আরোহণ সামগ্রী জমা করে ফিরে গেলেন সাউথ কল অভিমুখে। অন্তিম শিবিরের সেই উচ্চতম জনমানবহীন স্থানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রেখে এলেন হিলারি এবং তেনজিংকে। দুজনে অতিরিক্ত ভারী অক্সিজেনের সিলিন্ডার অ্যাঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করে তাঁবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। স্থাপিত হল সামিট ক্যাম্প।এখানে অক্সিজেনের প্রভূত অভাব। সঙ্গে থাকা অক্সিজেন সিলিন্ডারও প্রয়োজনের তুলনায় কম। দুশ্চিন্তায় পড়লেন দুই অভিযাত্রী। হিলারি অক্সিজেনের ব্যবহারের যন্ত্রপাতি যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবহার করতে বাধ্য হলেন। কারণ ঐ হিসাব করা অক্সিজেন নিয়েই তাঁদের শীর্ষারোহণ করে একইদিনে সাউথ কলে ফিরে আসতে

Hillary and Tensing set off up the ridge

হবে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ত্রিসীমানায় তখন তীব্র ঠান্ডা হাওয়ার গর্জন। জ্যাম, জেলি, বিস্কুট, সার্ডিন এবং প্রস্তুত করা অ্যাপ্রিকট একত্র করে স্টোভের উত্তাপে গলানো এক অদ্ভুত উপাদান গলাধ্যকরণের পর স্লিপিং ব্যাগে প্রবেশ করলেন অভিযাত্রীরা। অধিক উচ্চতায় সামান্য নড়াচড়া করলেই অক্সিজেনের অভাব বোধ হয়। একমাত্র ঘুমন্ত অবস্থায়ই আরামদায়ক। কিন্তু ঘুম ভাঙলেই ক্লান্তি এবং শ্বাসক্রিয়ায় বিঘ্ন। অত্যধিক ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন অভিযাত্রীদের শরীর তীব্র ঠান্ডার দাপটে হয়ে পড়ে নিস্তেজ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁবুর দেওয়ালে শুরু হল বাতাসের বিরামহীন আঘাত। অ্যাংকার করা সত্ত্বেও সামান্য তাঁবুর স্থান পরিবর্তনে হিলারি তখন আতংকিত। তাপমাত্রা --২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মাঝরাতে হাওয়ার দাপট কিছুটা কমল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁবুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিদ্রাহীন রাত কেটে গেল অভিযাত্রীদের। ভোর তখন ৬.৩০ মি. আবহাওয়া পরিষ্কার এবং শান্ত।

পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে অভিযাত্রীদের তখন একটিই ভাবনা –সাউথ সামিটে পৌঁছনো। তিনদিন আগেই যেখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন বুর্ডিলন এবং ইভান্স। ধীরে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চললেন অভিযাত্রীরা।

সাউথ সামিট পৌঁছলেন সকাল ৯টায়। চোখের সামনে মাথা তুলে তখন এক আনক্লাইম্বড রিজ, যা অনুসরণ করেই এগিয়ে যেতে হবে এভারেস্ট শৃঙ্গে। দুজনের আসনোপযোগী জায়গা তৈরি করলেন শৃঙ্গ মুকুটের ঠিক নীচে। অক্সিজেনের মুখোশ খুলে ফেললেন দুজনেই সময়ের আন্দাজ করবার চেষ্টা করতে থাকলেন। কত অক্সিজেন ব্যয় হয়েছে? কতটাই বা সঞ্চয় প্রয়োজন? গণনার মাধ্যমে বুঝলেন সাড়ে ৪ ঘণ্টার বেশি সময় হাতে আর নেই।

সামনের রিজ ধরে কার্নিশে পৌঁছনো বিপজ্জনক। যেকোনো মুহুর্তে বিপুল নরম তুষারাচ্ছন্ন পথ আরোহীর সামান্য ওজনেই ভেঙে পড়তে পারে। চূড়ার বামদিকের অংশ অর্থাৎ West CWM উপরের অংশ যেহেতু কঠিন বরফাচ্ছাদিত, সে পথেই একমাত্র শৃঙ্গারোহণ সম্ভব। হিলারি সিদ্ধান্ত নিলেন এই কঠিন বরফ কেটে কেটে নিরাপদে চূড়ায় পৌঁছনো সেই মুহুর্তে একমাত্র পথ।

হিলারির দিনলিপি থেকে উদ্ধৃতি–‘রিজের শক্ত বরফে পথ তৈরির প্রথম সিঁড়ি কেটেছিল আমার আইস অ্যাক্স। স্ফটিকের ন্যায় সেই বরফে প্রথম আঘাতই আমাকে প্রত্যাশার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দিল।’

সামান্য তফাৎ রেখে হিলারি এবং তেনজিং এগিয়ে চললেন। সহঅভিযাত্রী তেনজিং এর দড়ির সাহায্যে তৈরি সুরক্ষা বলয়কে পাথেয় করে বরফের দেওয়ালের ধাপ কেটে প্রথম আরোহণ করতে থাকলেন হিলারি। রিজের বামদিকে সঠিক পাথুরে পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকলেন । ৮০০০ ফুট নীচে চোখে পড়ল বিন্দুর মত West CWM এর চতুর্থ শিবির। আবহাওয়া সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও তুষারাচ্ছাদিত রিজের উপরে অনবরত তীব্র হাওয়ার দাপট। ঘন্টাখানেক এগোনোর পর অকস্মাৎ এক কঠিনতম বাধার মুখোমুখি অভিযাত্রীরা। সম্মুখে ৪০ ফুটের পাথুরে দেওয়াল। সরাসরি আরোহণ অসম্ভব হওয়ায় হিলারি দুটি পাথুরে দেওয়ালের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থানের(চিমনি) তুষারাচ্ছাদিত পথ আবিষ্কার করে আরোহণ শুরু করলেন। বরফের ধাপ কেটে কেটে চলতে থাকল আরোহণ। তবুও শৃঙ্গের চূড়া নজরে এল না। ঘন্টাদুয়েক এক নাগাড়ে বরফ কেটে আরোহণ করলেন হিলারি। এবার তাঁরা ধীরে ধীরে এগোতে থাকলেন। চূড়া থেকে তাদের বর্তমান দূরত্ব তখন অনেক কম।

অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁরা একটা সমান্তরাল স্থানে পৌঁছালেন। যেখান থেকে সরাসরি নর্থ কল দেখা যায়, যে পথে আছে প্রথম এভারেস্ট অভিযাত্রীদের ৩০ বছর পূর্বের সংগ্রামের চিহ্ন। দূরে দেখা যাচ্ছে রংবুক হিমবাহ। তিব্বতের খয়েরি রেখা। পৃথিবীর প্রথম দুটি মানুষ অকস্মাৎ উপলব্ধি করলেন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সবচেয়ে উচ্চতম স্থান এভারেস্টের চূড়ায় তাঁরা। করমর্দনের পর হিলারি শার্টের মধ্যে থেকে সযত্নে রক্ষিত ক্যামেরা বার করলেন। তুষার কুঠার হাতে তেনজিং এর ছবি তুললেন। যার গায়ে বাঁধা ইউনাইটেড নেশন, ব্রিটিশ, নেপালি এবং ভারতের জাতীয় পতাকা।

বরফের মধ্যে তেনজিং একটা গর্ত খুঁড়ে উৎসর্গ করে রেখে এলেন অনেকগুলি স্মারক। হিলারি হান্টের দেওয়া একটি ক্রুসিফিক্স পুঁতে দিলেন গর্তে।

এই সামান্য আড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনুভব করা যাবে না সেই মুহুর্তের দুই অভিযাত্রীর এভারেস্টে প্রথম আরোহণের উত্তেজনাকর অনুভূতি।

৩০ বছর আগে এভারেস্ট অভিযানে যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল তার অন্তিম মুহূর্তের অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা হৃদয় দিয়ে ভাগ করে নিলেন পৃথিবীর সকল পর্বতারোহী এবং হিমালয়প্রেমী। ঈশ্বরের বর পেয়ে হিলারি এবং তেনজিং শীর্ষারোহণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ঝুলি বহন করে ফিরে এলেন সমতলে। প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করলেন পৃথিবীর প্রতিটি কোণে তাঁদের সুখ্যাতি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মানবজাতির ইতিহাসে অকল্পনীয় সম্মান তখন তাঁদের মুকুটে। নিন্দুকরা বলতে লাগলেন,--- “হায় পৃথিবীর শীর্ষবিন্দু আরোহণের সাথে সাথে কোন অভিযাত্রীদেরই উচ্চতম অগম্য স্থান বলে আর কিছু রইল না।”

এই উক্তির সাথে কোন সৎ অভিযাত্রী একমত ছিলেন না। কারণ তাঁরা জানতেন মধ্য এশিয়ায় ২৫০০০ ফিটের অধিক উচ্চতার অসংখ্য শৃঙ্গ বিদ্যমান। বহু দেশের অভিযাত্রীরাই শতবর্ষ জুড়ে আরোহণের চেষ্টা করেছেন। ডজনেরও অর্ধেক চূড়ায় পা রাখতে পেরেছেন । শুধু তাই নয় এভারেস্ট আরোহণের চেয়েও কঠিন ও দূর্গমতম সেসব শৃঙ্গে আরোহণ করতে অধিকতর দক্ষতা প্রয়োজন।

সেসব শৃঙ্গের উচ্চতা ১৮০০০ ফুট থেকে ২৫০০০ ফুটের মধ্যে। অধিকাংশ শৃঙ্গই নামহীন। সঠিক উচ্চতা নিরূপণও সম্ভব হয়নি। মানচিত্রেও অধিকাংশের কোন চিহ্ন নেই। অনেক কম উচ্চতার শৃঙ্গ আছে যা আধুনিকতম পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জাম ব্যতীত আরোহণ প্রায় অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণ পৃথিবীতে পর্বতারোহণকে জনপ্রিয় করে তুলল। যেমন প্রথম ম ব্লাঁ আরোহণ অ্যালপাইন ক্লাইম্বিং এর ‘সোনালী দিন’ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তেমনই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এভারেস্ট আরোহণকে হিমালয়ে পর্বত অভিযানের ‘সোনালী দিন’ হিসেবে চিহ্নিত

করবেন। পর্বত অভিযাত্রীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার আর কোন অভাব রইল না। আমাদের পর্বতপ্রেমী উত্তরাধিকাররা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিজেদের সমর্পণ করলেন হিমালয়ে পর্বতাভিযানের এই বিপুল প্রাচুর্যে।

লোয়ে, আলফ্রেড গ্রেগরি ও সামিট সাপোর্ট টিম

।।সমাপ্ত।।

আমাদের যখন ভারতীয়(উত্তর) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দশটি ঠাটের সিলসিলা চলছিল, তখন এক জয়ঢাকির ইচ্ছে হয়েছিল গাউতি রাগ নিয়ে আলোচনার। গতবার আমাদের ঠাট পর্ব শেষ হওয়ায় এবার একটু বেলাইনে গিয়ে হোক তাহলে গাউতি।

খমাজ ঠাটের (নি স্বরটি ছাড়া বাকী স্বরগুলি শুদ্ধ) এই রাগটি বেশ আকর্ষক হলেও তেমন প্রচলিত বা সেই অর্থে মূল ধারার রাগ নয়। হয়ত একটু সঙ্কীর্ণ রাগ বলেই কারণ গাউতির পরিবেশনায় আশেপাশের বেশ কিছু রাগ কে এড়িয়ে চলতে একটু মুন্সিয়ানা দরকার। কেউ কেউ রাগটিকে ভীম রাগ ও বলেন। তবে ভীম রাগে উত্তরাঙ্গে (অর্থাত চড়ার সা থেকে আরও চড়ার স্বরস্থানে) বিবাদী স্বর হিসেবে কোমল গা লাগানো হয়। এই ভীম রাগ বা গাউতি আবার কাফী ঠাটের ভীম রাগের সাথে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। কাফী ঠাটের ভীম রাগে গাউতির মত একই স্বর ব্যবহার হলেও মুখ্য অঙ্গ হল-

ণ্ স গ ম প $^{\text{র্স}}$ণ, প $^{\text{র্স}}$ণ র্স, র্স $^{\text{প}}$ধ প, ধ ম প, গ ম র ণ্ স।
ণ্ স গ ম প ণ প $^{\text{র্স}}$ণ র্স, র্স $^{\text{প}}$ধ প ধ ম প, গ ম র স, র ণ্ স, প্ ণ্ স গ ম র স।

আর খমাজ ঠাটের গাউতি বা ভীম রাগের মুখ্য অঙ্গ -
গ ম প $^{\text{র্স}}$ণ র্স $^{\text{প}}$ধ, প, ধ ম প গ ম র ণ্ স।

খমাজ ঠাটের রাগ হলেও গাউতিতে খমাজের রাগাঙ্গ, বিশেষ করে 'ধ-ম-গ' এই স্বরসঙ্গতি এড়িয়ে চলতে হবে। কলাবতী বা জনসম্মোহিনী রাগে গাউতির বিশেষত্ব বহনকারী গ ম প $^{\text{র্স}}$ণ র্স $^{\text{প}}$ধ প স্বরসঙ্গতি ব্যবহার করা হয় না।

বাদী স্বর - সা
সম্বাদী স্বর - প
রস - মধুর, শৃঙ্গার, ভক্তি
সময় - তৃতীয় প্রহর (দুপুর ১২ -৩)
জাতি -ঔড়ব-সম্পূর্ণ
চলন - বক্র

গাউতি রাগের ছায়া আছে এরকম কয়েকটি জনপ্রিয় গান -জীবন মে পিয়ে তের সাথ রহে (গুঞ্জ উঠি সেহনাই), বাত মেরি শুনিয়ে তো জরা (কুছ না কহো ছায়াছবির), এক সাথী ঔর ভি থা (এল ও সি কারগিল)।

ইউটিউব লিঙ্ক - https://youtu.be/WQ9eLnL85r A এর প্রথম অংশে ত্রিতাল গৎ, কয়েকটি এগারো মাত্রার তান আর রাগের চলন DAW সফ্টওয়্যার এ বাজিয়ে দেখানো আছে। ষোল মাত্রার চলনগুলি (ইউটিউব ভিডিওটির মোটামুটি দ্বিতীয় মিনিট থেকে) অভ্যাস করলে রাগের রূপটি পরিষ্কার হবে।

-গাওতি-

ত্রিতাল - গত্ (দ্রুতলয়) -পঃ দীপক চৌধুরী

স্থায়ী

x				**২**				**০**				**৩**			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
											গ	ম	প	র্ণ	র্স

ধ	-	প	ম	-	প	গ	ম	র	-	স					

											স	র	ণ্	-	স
গ	-	গ	ম	-	প	গ	ম	র	-	স					

অন্তরা

											গ	ম	প	-	ণ

র্স	-	র্স	ণ	-	র্স	র্গ	র্ম	র্র	-	স					

											র্স	র্র	ণ	-	র্স

ধ	-	প	ম	-	প	গ	ম	র	-	স					

তান

লক্ষ করে দেখ নীচের এই তানগুলি সবই ১১ মাত্রার। তাই তান শেষ করে ১২ মাত্রা থেকে ওঠা গৎ-এর মুখ, অর্থাৎ

গম	পণ	র্সগ	মপ	গর	র স	ণর্স	ধপ	মপ	গম	রস					

প্ ণ্	সণ্	সগ	মপ	গম	পণ	র্সণ	ধপ	মপ	গম	রস					

সগ	মপ	ণর্স	র্রর্স	র্রর্স	ণর্স	ধপ	মপ	গম	রস	-স					

সগ	মপ	ণর্স	র্রর্স	র্গর্ম	র্পর্ম	র্গর্ম	র্রর্স	মপ	গম	রস					

গম	পণ	র্সণ	ধপ	পণ	র্সণ	ধম	- প	মপ	গম	রস					

রাগের চলন (ষোল মাত্রা)

x				২				০				৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
সগ	মপ	ণর্স	ধপ	মপ	গম	রস	রণ্	সগ	মপ	ণর্স	ধপ	মপ	গম	রণ্	-স
গম	পণ	র্সণ	-র্স	ণর্স	র্গর্ম	র্রণ	-র্স	র্গর্ম	র্রর্স	ণর্স	ধপ	মপ	গম	রণ্	-স
সণ্	ধ্ম্	-প্	গ্ম্	প্ণ্	সগ	মর	-স	গম	পণ	র্সধ	-প				
সগ	মপ	ণর্স	ণর্স	র্গর্ম	র্পর্গ	র্মর্র	-র্স	র্সর্র	ণর্স	ধম	-প	গম	পগ	মর	-স
প্ণ্	সগ	মপ	ণর্স	র্গর্ম	র্পর্গ	র্মর্র	-র্স	ণর্স	ধপ	মপ	গম	রস	রণ্	সধ্	-প
প্ণ্	সগ	মপ	গম	পণ	র্সর্র	ণর্স	ধপ	র্গর্ম	র্রর্স	ণর্স	ধপ	মপ	গম	রণ্	-স

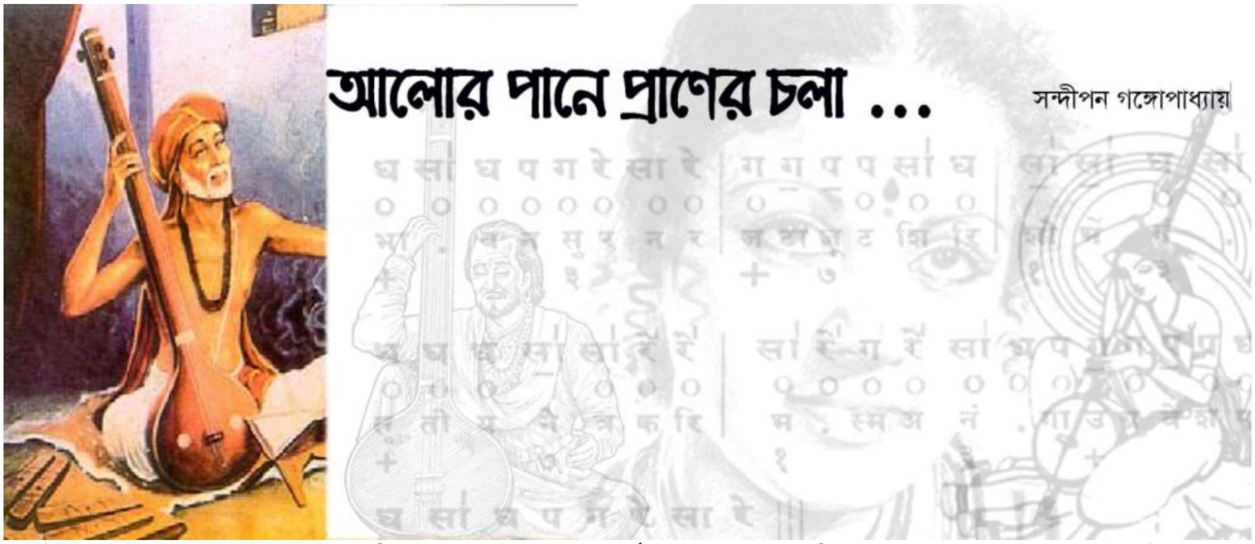

[এই দেশের বহুত্বের স্বর বহুধাবিস্তৃত। নানা ভাষা, ধর্ম, আচারের বে-নি-আ-স-হ-ক-লা'র মতো এই দেশের সঙ্গীতের বহতা ইতিহাসের ধারাও নানা বাঁকে বাঁকে নিজেকে পুনরাবিষ্কার করেছে। জয়ঢাকের এই প্রবন্ধমালায় আমরা সেই বিরাট শ্রুতির ধারার কয়েকজন পুরোধার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বয়ান করব]

প্রথম পর্ব

পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে

ঠাকুর পরিবারের বড়ো তরফ মানে পাথুরিয়াঘাটা অংশের এক কৃতী পুরুষ ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০-১৯১৪)। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের দুই ধারার সঙ্গীতেই তাঁর ছিল গভীর পান্ডিত্য আর অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি এই বিষয়ে। ১৯০৭ সালে মহারাষ্ট্র থেকে এক আইনজ্ঞ কলকাতায় আসেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। এই মানুষটা মাতৃভাষা মারাঠী ছাড়াও হিন্দি, গুজরাটি, তামিল আর সংস্কৃত ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত। এছাড়া কর্মসূত্রে ইংরেজি তো জানতেই হত সেই সময়। কলকাতায় আসার আগে তিনি বাংলা ভাষাটাকেও খুব ভালো করে রপ্ত করেছিলেন একটা বিশেষ কারণে। সেকালের প্রখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'গীতসূত্রসার' (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) ছিল ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের এক আকর গ্রন্থ। কেবলমাত্র এই বইটাকে পাঠ আর অধ্যয়ণের জন্যই তাঁর এই ভাষাশিক্ষা। এই ধরণের গভীর অনুসন্ধিৎসা সব দেশে সব কালেই বিরল। শুধুমাত্র বাংলা না, ওই মানুষটা ভারতের অন্যান্য বেশ কিছু প্রদেশের ভাষাও শিখেছিলেন এই একটামাত্র কারণে মানে ওইসব ভাষায় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করার জন্য। সঙ্গীতের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এই মহান মানুষটার নাম হল পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে (১৮৬০ – ১৯৩৬) আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার, প্রসার এবং অনেক অজানা রাগ আর শ্রুতির ধারাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রামান্য বয়ানে রেখে যাওয়ার পেছনে যার অবদান কোন বিশেষণেই বাঁধা যাবে না।

ছোটবেলা থেকেই চিরাচরিত পড়াশোনার পাশাপাশি সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর এই প্রবল অনুসন্ধিৎসা লক্ষ করা যায়। সঙ্গীত শিক্ষার জন্য তিনি অসংখ্য গুরুর কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের গান্ডা বাঁধা শিষ্যত্ব নিয়েছিলেন। ১৮৮৪ সালে এফ.এ. পাশ করার পর সে-সময়ের বোম্বে শহরের কাছে 'গায়ন উত্তেজন মণ্ডলী' নামে এক প্রসিদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্রের সদস্য হয়ে যান ভাতখণ্ডেজি। পাশাপাশি রাওজীজিবুয়া বেলবাগকার নামে এক বিখ্যাত ধ্রুপদীয়ার কাছে শুরু হয় ধ্রুপদ শিক্ষা। প্রায় একই সাথে মহম্মদ হোসেন এবং বিলায়ত হোসেনের কাছে চলছিল খেয়াল চর্চা।

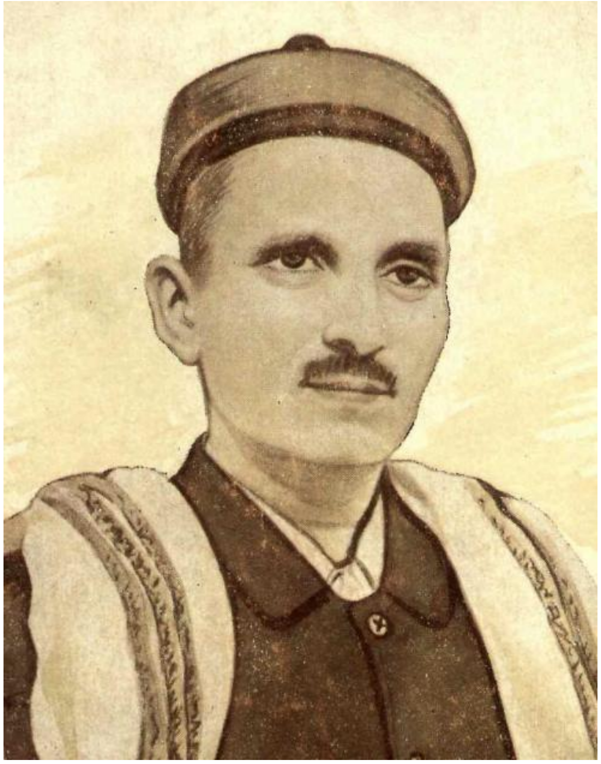

এছাড়া সেতার এবং বীণা বাজানোতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর দক্ষতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছোয় যে 'গায়ন উত্তেজন মণ্ডলী'র পরিচালনার ভার তাঁকেই দেয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৮৯০ সালে আইন পরীক্ষায় পাশ করে এক দক্ষ আইনজীবী হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন মহারাষ্ট্রে। কিন্তু সঙ্গীতই ছিল তাঁর প্রথম ভালোবাসা। সঙ্গীতের জন্য অনেক সময় তিনি নিজের আইনব্যাবসা ফেলে ছুটে যেতেন কোনো পণ্ডিত বা ওস্তাদের বাড়ি অজানা বন্দিশের খোঁজে।

ভারতীয় সঙ্গীতে ভাতখণ্ডেজির অবদান সম্বন্ধে বিচার করার আগে একটা প্রসঙ্গ বলে নেয়া উচিৎ। প্রাচীন এবং মধ্য যুগে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের যে ধারা ছিল তাঁর প্রকৃত রূপ নিয়ে নানা ধন্দ আছে পণ্ডিতদের মধ্যে। ভারতীয় সঙ্গীত শ্রুতি নির্ভর মানে স্বরের সূক্ষ্মতম ভগ্নাংশেও লুকিয়ে আছে তার পরিচয়। যেমন উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত অনুযায়ী ষড়জ বা সা চার শ্রুতির, ঋষভ বা রে তিন শ্রুতির ইত্যাদি। দক্ষিণ বা কর্নাটকী সঙ্গীতে আবার আছে মেল পদ্ধতি যার পঞ্জীকরণ আরো সূক্ষ্ম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে গত দু-তিনশ বছরে ভারতীয় সঙ্গীতের কিছু মূলগত পরিবর্তনের জন্য সেই প্রাচীন যুগের সঙ্গীত বিষয়ক প্রামাণ্য বইগুলোতে লেখা বিভিন্ন রাগের স্বর বা শ্রুতির অবস্থানকে ধরতে পারা খুব মুস্কিল বা প্রায় অসম্ভব ছিল। ভরত মুনির লেখা 'নাট্যশাস্ত্র' এর মতো সুপ্রাচীন বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙদেবের লেখা 'সঙ্গীত রত্নাকর' এমন কিছু আকর গ্রন্থ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বোঝা যাচ্ছিল যে এইসব বইতে লেখা স্বরের অবস্থানকে অনেক সময়ই ধরতে পারা যাচ্ছে না। বিদেশী মিশনারিদের প্রভাবে ভারতীয় মূল স্কেল (যা ছিল রাগ কাফি নির্ভর) পাশ্চাত্যের মতো টেম্পার্ড স্কেলে (রাগ বিলাবল অনুসারে – যার সব স্বর এখনকার পদ্ধতি অনুসারে শুদ্ধ) পরিবর্তন হয় গত দু-তিনশ বছরে। খেয়ালের জন্মও প্রায় একই সময়ে (অনেকের মতে মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ রঙ্গিলার শাসনকালে)। এই পরিবর্তনের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কোন কোন রাগের আগের চেহারাটাকে ধরতে পারা যাচ্ছিল না সেই সময়।

এছাড়া বিভিন্ন ঘরানায় রাগের শ্রুতির বেশ কিছু সূক্ষ্ম বা স্থূল পার্থক্য দেখা যায় যার ফলে সাধারন সঙ্গীত শিক্ষার্থীর কাছে কোন রাগ আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে একটা বড়ো বাধা দেখা দিচ্ছিল। আর একটা কথা বলে নেয়া ভালো যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই থেকেই চিরাচরিতভাবে গুরুর কাছে সঙ্গীত শিক্ষার পাশাপাশি সঙ্গীত শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছিল যেখানে অনেক বেশি সংখ্যায় শিক্ষার্থীরা শিখতে পারত। ভাতখণ্ডেজি সারা ভারতে অনেক গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের সাথে আলাপ আলোচনা করে অসংখ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ গভীরভাবে পড়ে কতগুলো মূল সিদ্ধান্তে আসেন একজন সাধারণ শিক্ষার্থীর কাছে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের মূল চেহারাটা যথাযোগ্য প্রামাণ্যভাবে তুলে ধরার জন্য।

১৯০৯ সালে সংস্কৃতে 'লক্ষণগীত' আর 'অভিনবরাগমঞ্জরী' নামে দুটো বই লিখে তাঁর সিদ্ধান্তগুলো প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করার কাজ শুরু করেন তিনি। এই বইগুলোতে প্রথম ঠাটভিত্তিক রাগের প্রকারভেদ আর আর তাদের সময় বিধি বর্ণনা করা শুরু হয়। পরের বছর মানে ১৯১০ সালে 'লক্ষণগীত' বইয়ের একটা বিস্তৃত টীকা হিসেবে

মারাঠীতে 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'র প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। এই বই ভাতখন্ডেজিকে সারা ভারতে বিরাট প্রসিদ্ধি দেয়।

১৯১৫ সাল থেকে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন শুরু হয় বরোদায়। ভাতখন্ডেজিই ছিলেন তার মূল উদ্যোক্তা। এর প্রভাবে সারা ভারতের বিভিন্ন শহরে নানা সঙ্গীত সম্মেলনের চল শুরু হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যার অন্যতম উদ্যোক্তা আর বিচারক ছিলেন তিনি। এর মধ্যে দিল্লি, বেনারস লখনউ এইসব জায়গায় হওয়া সঙ্গীত সম্মেলন ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উদ্যোগে বরোদা, গোয়ালিয়র ইত্যাদি রাজ্যে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয় স্থানীয় রাজা বা নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায়। এর সাথে সাথেই চলছিল 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'র বাকি খন্ডগুলো প্রকাশের কাজ। ১৯৩২ সালে এই বইয়ের শেষ (ষষ্ঠ) খন্ড প্রকাশিত হয়। প্রায় দু'হাজারের মতো খেয়াল আর ছশোর বেশি ধ্রুপদের সমন্বয়ে এই বই অনাগত সব সঙ্গীত শিক্ষার্থী আর সঙ্গীত পিপাসুর জন্য এক উজ্জ্বল দিকচিহ্ন হয়ে রয়ে গেছে তার পর থেকে।

[ভাতখন্ডে বর্ণিত পদ্ধতির এক সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্য নিচের ভিডিওটা দেখ]
https://www.youtube.com/watch?v=d9YCc8NyBt4

১৯২৬ সালে লখনউয়ের নবাব হামিদ আলি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় লখনউ মরিস কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় যা কিছুদিনের মধ্যেই সারা ভারতে অন্যতম সঙ্গীতশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ভাতখন্ডেজিই ছিলেন এর প্রথম অধ্যক্ষ।

সেই সময় এই কাজে তাঁর এক অন্যতম সুহৃদ ছিলেন কবি অতুলপ্রসাদ সেন যিনি নিজে লখনউ হাইকোর্টের এক প্রধান আইনজীবি হওয়ার পাশাপাশি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ছিলেন গভীরভাবে উৎসাহী। এই মরিস কলেজ পরে ভাতখন্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরবর্তীকালে বিখ্যাত অভিনেতা পাহাড়ি স্যান্যাল এই গুনীজনেরা ছিলেন এই কলেজের প্রথম দিককার ছাত্র। এই সময়ই রামপুর স্টেটের নবাবের সাথে ভাতখন্ডেজির বন্ধুত্বের ফলে নবাবের গুরু সেনিয়া ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ উজির খান এবং ছম্মন খানের কাছ থেকে অসংখ্য ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন তিনি আর তাঁর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে এইসব গানের প্রামাণ্য স্বরলিপি তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছিলেন।

রক্তচাপ আর অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সত্তরের পরেও তিনি বয়সকে তুড়ি মেরে সঙ্গীত বিষয়ে অনেক গবেষণা আর অধ্যয়নে কাজে মগ্ন হয়েছিলেন। তবে অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁর শরীর আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছিল। ১৯৩৩ সালে এক ভয়ঙ্কর পক্ষাঘাতের ফলে তাঁর জীবনীশক্তি অনেকটা ক্ষীণ হয়ে আসে। শেষে ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ সালে বোম্বে শহরে দিনের শেষে এক চির ঘুমের দেশে চলে যান ভাতখন্ডেজি।

ঘোমটা পরা ওই ছায়ার ওপারে দেবতারাও হয়তো ছিলেন এই সুরের সাধকের জন্য অধীর অপেক্ষায়। ভারতীয় সঙ্গীতের সারস্বত সাধনায় তাঁর অবদান বিশেষ করে ঠাটের ওপর ভিত্তি করে রাগের জাতিবিচার তাঁকে ভারতীয় সঙ্গীতের মহাসমুদ্রে এক পথ দেখানো বাতিঘর হিসেবে এক স্থায়ী অমরত্বের স্থান দিয়ে গেছে।

[ভাতখণ্ডেজির প্রিয় শিষ্য এবং তাঁর বর্ণিত পদ্ধতির অন্যতম প্রতিনিধি পন্ডিত শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনজনকরের কণ্ঠে কানাড়া অঙ্গের রাগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা শোনার জন্য নিচের ভিডিও ক্লিপটা দেখ]
https://www.youtube.com/watch?v=2ZVHrs_OtPg

চলবে

গ্রাফিক্স্- ইন্দ্রশেখর

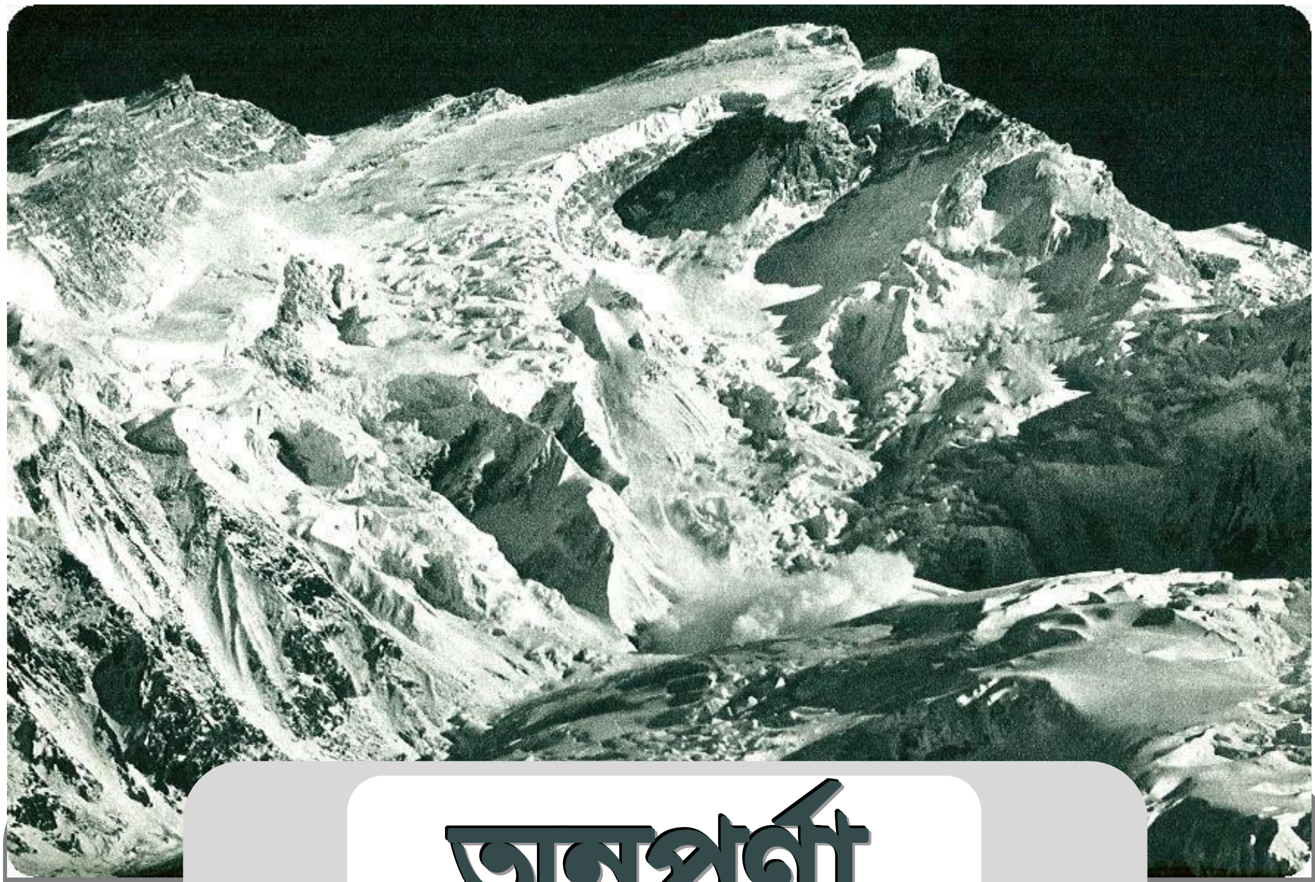

অন্নপূর্ণা

মরিস হারজগ

অনুবাদঃ তাপস মৌলিক

উচ্চতার হিসেবে অন্নপূর্ণা (৮০৯১ মিটার) বিশ্বের ১০ নম্বর পর্বতশৃঙ্গ। ১৯৫০ সালে ৮০০০ মিটারের চেয়ে উঁচু প্রথম শৃঙ্গ হিসেবে অন্নপূর্ণা জয় করেন মরিস হারজগের নেতৃত্বে এক ফরাসী অভিযাত্রী দল। আটহাজারি শৃঙ্গগুলিতে মোট ২২টি বিফল অভিযানের পর তাদের এই সাফল্য সারা বিশ্বে হৈচৈ ফেলে দেয়। জয়ঢাকে ধারাবাহিকভাবে চলছে সেই অভিযান নিয়ে হারজগের লেখা রুদ্ধশ্বাস কাহিনী। এবার চতুর্দশ পর্ব।

শীর্ষচিত্রঃ অন্নপূর্ণা উত্তরগাত্র, ফোটোঃ মার্সেল আইজ্যাক

কিছুক্ষণ যাবৎ তাঁবুর বাইরে শেরপাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনছিলাম। ব্যাপার কী বোঝার জন্য তাঁবু থেকে মাথা বার করে দেখি এক নম্বর ক্যাম্প থেকে আজীবা এসে উপস্থিত, ওর সঙ্গে বেশ কয়েকজন কুলি। একজন বিশেষ কুলিকে ও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। চিনেম্যানের মতো দেখতে বলে আইজ্যাক তার নাম দিয়েছিল ‘চিনি’। আমরাও সেটাই জানতাম, পরে জেনেছিলাম তার আসল নাম ছিল প্যাড্ডি। সে নাকি রাস্তার যাবতীয় বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও দু’নম্বর ক্যাম্প অবধি শেরপাদের মতোই একেবারে ফটাফট চলে এসেছে। তাই সবার প্রস্তাব, ওকে সাম্মানিক শেরপা হিসেবে দলে নেওয়া হোক। ওর এই পদোন্নতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমরা ওকে একটা সুন্দর নাইলনের ওয়েস্ট কোট উপহার দিলাম। চিনি খুব গর্বের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সেটা গায়ে চড়িয়ে নিল।

আজীবা আমায় দুটো হাতে লেখা চিঠি দিল। তাঁবুর ভেতর ঢুকে আমি সে দুটো জোরে জোরে রিডিং পড়লাম, যাতে অন্যরাও শুনতে পায় –

এক নম্বর ক্যাম্প, ২৯ মে ১৯৫০

আংথারকে বেলা বারোটা দশে পৌঁছল। বেস ক্যাম্পে আরও ২২টা বোঝা পড়ে আছে। বেস ক্যাম্প আর এক নম্বর ক্যাম্পের মধ্যে মাল ফেরি করার জন্য আংথারকে চিনি নামে একজন কুলি আর একটা কমবয়সী ছোকরাকে নিয়ে এসেছে। বেস ক্যাম্পে নোয়েল ১৫ জন কুলি সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছেছে। আংথারকে ফের নিচে নেমে যাচ্ছে, চেষ্টা করে দেখবে ওই কুলিদের মধ্যে কয়েকজনকে রেখে লোড ফেরির কাজে

লাগানো যায় কিনা। আজীবাকে যত শীঘ্র সম্ভব ফেরত পাঠিয়ে দাও, ওর সঙ্গে জরুরি আর কী কী প্রয়োজন তার লিস্ট পাঠিয়ে দিও। হাই অলটিচিউড টেন্ট কি লাগবে আরও?

দু'নম্বর আর তিন নম্বর ক্যাম্পের মধ্যে শেরপা দিয়ে মাল ফেরি পরিচালনা করার জন্য আমাদের কাউকে কি দু'নম্বর ক্যাম্পে দরকার হবে? যদি দরকার হয় তাহলে কখন? ইতি -

মারসেল আইজ্যাক

দারুণ খবর! নোয়েল চলে এসেছে বেস ক্যাম্পে, আমাদের যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জামের সরবরাহ নিয়ে কোনও চিন্তা নেই আর। ক্যাম্পে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল।

দ্বিতীয় চিঠিটা নোয়েলের লেখা পুরোনো এক চিঠি যাতে ও জানিয়েছিল সরকির হাতে পাঠানো আমার আদেশ সে পেয়েছে। চিঠিটা সে তুকুচা থেকে ২৫ মে পাঠিয়েছিল, সরকি সেখানে পৌঁছোবার পরদিন। এক নম্বর ক্যাম্প থেকে সরকির হাত দিয়ে আমার চিঠিটা আমি পাঠাই ২৩ মে। বেচারা সরকি! এক নম্বর ক্যাম্প থেকে তুকুচা – সাধারণভাবে যা চার-পাঁচ দিনের রাস্তা – দিনরাত পথ চলে সরকি তা মাত্র ছত্রিশ ঘন্টায় পেরিয়েছিল। পুরো অভিযান এ জন্য সরকির কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আর ঠিক সময়মতো অভিযানের নেতা যে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলবেন না সে ব্যাপারে সরকি নিশ্চিত থাকতে পারে। একটা মোটা বকশিশ ওর প্রাপ্য।

খুশির খবরটা উদযাপন করতে ক্যাম্পে একবোতল রাম খোলা হল। কিন্তু নষ্ট করার মতো সময় নেই হাতে। আজীবাকে এক্ষুনি নেমে যেতে হবে যাতে আগামীকাল মাল ফেরি চালু থাকে। তাড়াতাড়ি একটা কাগজ টেনে নিয়ে নিচের ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য চিঠি লিখতে বসলাম আমি।

দু'নম্বর ক্যাম্প, ২৯ মে ১৯৫০

নোয়েল, আইজ্যাক এবং অন্যরা -

এত তাড়াতাড়ি সবকিছুর ব্যবস্থা করার জন্য নোয়েলকে অনেক শুভেচ্ছা। আমরা সবাই ওর প্রতি কৃতজ্ঞ। গতকাল কাস্তে হিমবাহের উপরাংশে ২৩,৫০০ ফিট উচ্চতায় চার নম্বর শিবির স্থাপন করা হয়েছে। এই মুহূর্তে টেরে, রেবুফত এবং দু'জন শেরপা ২১,৬৫০ ফিট উচ্চতায় তিন নম্বর ক্যাম্পে আছে। এখন আমাদের লক্ষ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা পাঁচ নম্বর শিবির স্থাপন করা এবং তারপর দু'জন দু'জন করে দল বানিয়ে একের পর এক শৃঙ্গের দিকে অভিযান চালানো।

আইজ্যাকের জন্য জরুরি বার্তাঃ আগামীকাল সকালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফের আজীবা, সরকি, ফুথারকে এবং চিনিকে ওপরে পাঠাবে। ওদের সঙ্গে একটা বড়ো মেস টেন্ট, দু'জোড়া স্লিপিং ব্যাগ আর ম্যাট্রেস, একটা হাই অলটিচিউড ইউনিট, একটা পেট্রোল স্টোভ আর এক টিন পেট্রোল পাঠিও। সিনে ক্যামেরার জন্য আরও ফিল্ম দরকার। আমি কিছু ভিডিও তুলেছি, সেই ফিল্মগুলো আজীবার হাত দিয়ে ফেরত পাঠাচ্ছি। ওষুধপত্রও কিছু লাগবে, তার লিস্ট আলাদা করে জুড়ে দিলাম। সব প্যাকিং হয়ে গেলে চারজনের বোঝায় যা জায়গা বাঁচবে তা খাবারদাবার দিয়ে ভরে দিও – কিছু সসেজের টিন আর এক বোতল কনিয়াক পাঠিও।

নিচে ল্যাচেনালের রুকস্যাক থেকে ওর জন্য বাড়তি মোজা, ক্যাম্প শু, শার্ট প্যান্ট সব পাঠাও, বেচারার জামাকাপড় সব ভিজে একশা।

আজ সন্ধে আটটায় ওয়াকি টকি-তে কথা বলার চেষ্টা করব। আগামীকাল কোজি আর শ্যাজ সম্ভবত নিচে নেমে যাবে, ওদের কাছে বিশদ খবর পাবে।

পুনঃ – ওপরে যা যা পাঠাতে বললাম কাল খুব ভোর ভোর পাঠিও। ওগুলো এলে তবেই আমি, ল্যাচেনাল, সরকি আর ফুথারকে কাল তিন নম্বর ক্যাম্পের দিকে রওনা দিতে পারব। আবহাওয়া ভালো থাকলে শৃঙ্গজয়ের ব্যাপারে খুবই আশাবাদী আমরা।

মরিস হারজগ

আজীবা আর চিনি একটা হাই অলটিচিউড ইউনিট, কিছু খাবারদাবার আর একটা ওয়াকি টকি নিয়ে এসেছে। অবশেষে আজ সন্ধে আটটা থেকে বেস ক্যাম্পের সঙ্গে ওয়াকি টকিতে সংযোগ স্থাপন করা যাবে। এতে অভিযান পরিচালনার কাজে যে প্রচুর সুবিধে হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

নোয়েলের কাজে আমি খুবই সন্তুষ্ট। ও যে কোন ধাতুতে তৈরি ধীরে ধীরে তা সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। নোয়েল না থাকলে বর্ষার আগে শৃঙ্গজয়ের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

অসুস্থ দাওয়াথোন্ডুপকে যত শীঘ্র সম্ভব নিচে নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভাবলাম, আজীবার সঙ্গে যদি তাকে পাঠিয়ে দিতে পারি, তাই দেখতে গেলাম সে কেমন আছে। দেখি তার অবস্থা খুবই শোচনীয়! সাদা চোখে দেখে মনে হচ্ছে যেন মৃত্যুর প্রায় দোরগোড়ায় উপস্থিত সে। তাই এই খারাপ আবহাওয়ায় তাকে নিচে নামানোর ঝুঁকি নিতে ভরসা হল না। আগামীকাল দেখা যাবে।

আজীবা একমুহূর্ত সময় নষ্ট করল না। নামার সময় ওর পিঠে আর বোঝার ভার নেই। তাই লম্বা লম্বা পা ফেলে আগে আগে আজীবা, আর পেছনে ছোটো ছোটো পায়ে গুরগুর করে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে চিনি, কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিচের কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ওয়াকি টকি-টা নিয়ে গুছিয়ে বসলাম। নব-টব ঘুরিয়ে নানান কসরত করতে করতে উচ্চৈঃস্বরে বলে চললাম, "হ্যালো, হ্যালো, মরিস বলছি। আইজ্যাক, শুনতে পাচ্ছ?" কিন্তু টানা ক্যারক্যার ক্যারক্যার আওয়াজ ছাড়া যন্ত্রটা থেকে কিছুই বেরোল না! কিছুক্ষণ চেষ্টাচরিত্র করার পর হঠাৎ সেটটা থেকে একটা হিন্দি গান বেজে উঠল – অসাধারণ ছন্দময় প্রাণচঞ্চল সে সঙ্গীত –হিমালয়ের বুকে ওই ২০,০০০ ফিট উচ্চতায় আমার প্রায় নাচতে ইচ্ছে করছিল।

'হ্যালো' 'হ্যালো' করে আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর নিরাশ হয়ে আটটা পনেরো নাগাদ রণে ভঙ্গ দিলাম আমি। অভিযানে এই বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরও অনেক উন্নতির সুযোগ আছে। পরিকল্পনার সময় ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাইনি আমরা, তাই পস্তেছি। খুবই অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে আমাদের। বিরসবদনে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে দেখি অন্যরা ততক্ষণে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরিষ্কার ঝকঝকে একটা সকাল পরদিন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ঘুম যখন ভাঙল তাঁবুর ওপর সূর্যের আলো পড়ে ভেতরটা ততক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাত্রে দারুণ ঘুমের পর শরীরটা খুব ঝরঝরে লাগছিল। তাড়াতাড়ি উঠে তাঁবুর বাইরে এলাম। মাটিতে ছড়িয়ে থাকা মিছরির দানার মতো বরফের গুঁড়োগুলোয় সূর্যের আলো পড়ে শয়ে শয়ে হিরের মতো ঝকমক করছিল। রাত্রে নিশ্চয়ই ভালো ঠান্ডা পড়েছিল। আমাদের আজকের পরিকল্পনা খুব সরল – এক নম্বর ক্যাম্প থেকে মালপত্র নিয়ে শেরপারা মনে হয় একটু পরেই চলে আসবে, ওরা চলে এলেই গোছগাছ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিন নম্বর শিবিরের দিকে রওনা দেওয়া। কোজি আর শ্যাজ এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি। কোজি ঠিক করল এখানে থেকেই বিশ্রাম নেবে। শ্যাজ অবশ্য শরীর ঠিক করার জন্য আরও নিচে নেমে যাওয়ার পক্ষপাতী, সে ঠিক করল এক নম্বর শিবিরে নেমে যাবে। ভালোই হল, দাওয়াথোন্ডুপকে শ্যাজের সঙ্গে নিচে পাঠিয়ে দেব। তিনদিন হয়ে গেল, বেচারার অবস্থা সেই একইরকম আছে। ওদিকে ল্যাচেনাল আজ যেন একেবারে অন্য মানুষ! যেভাবে সে স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়েই বাইরে এসে শেরপারা কে কী করছে তার তদারকি আরম্ভ করল আর তারপর চোখে দূরবিন লাগিয়ে ওপরে টেরেদের কোনও চিহ্ন দেখা যায় কিনা খুঁজতে শুরু করল তাতে বুঝলাম ও মানসিকভাবে ফের চাঙ্গা হয়ে গেছে। আশা করি শারীরিক সক্ষমতার দিক থেকেও খুব শিগগিরই সে তার ফর্মে ফিরে আসবে। তাই যদি হয় তাহলে চিন্তা নেই, আমরা দু'জন মিলেই তিন নম্বর শিবিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারি – টেরেদের পরে দ্বিতীয় শৃঙ্গাভিযাত্রী দল হিসেবে।

দু'নম্বর শিবির

“এতক্ষণ ধরে আজীবারা করছেটা কী?” অধৈর্য হয়ে গজগজ করছিলাম আমি, “পরিষ্কার করে চিঠিতে লিখে দিলাম যে ওদের তাড়াতাড়ি পাঠিও যাতে আমরা আজ সময় থাকতে দু’নম্বর শিবির থেকে রওনা দিতে পারি!” পালা করে আমি আর ল্যাচেনাল দূরবিন চোখে হন্যে হয়ে আজীবাদের উঠে আসার চিহ্ন খুঁজতে লাগলাম।

“ল্যাচেনাল, ওই দেখ, টেরে আর রেবুফত শেরপাদের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে,” হঠাৎ ওপরে দূরবিন তাক করে দেখতে পেলাম আমি।

“হুমম, খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে!”

“ওই জায়গাটা নরম তুষারের গভীর স্তরে ঢাকা, ঠেলে ঠেলে পথ চলতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে ওদের।”

মিরিস্তি খোলার গভীর উপত্যকা থেকে হালকা নীলচে কুয়াশা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে সূর্যের আলোয় মিলিয়ে যাচ্ছিল। এই নীল কুয়াশা খুব ভালো লক্ষণ, আবহাওয়া ভালো থাকবে আজ।

কী আর করি! ক্যামেরা বার করে চারপাশের পাহাড়পর্বতের কিছু ছবি তোলার পর আমি আর ল্যাচেনাল নিজেদেরই খানকতক ছবি তুললাম। দুপুর হতে চলল, আজীবাদের কোনও চিহ্নই নেই! রোদে পিঠ দিয়ে আরাম করে বসে আমাদের দু’জনের ম্যারাথন আড্ডা চলতে থাকল। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল। শ্যাজ দাওয়াথোন্ডুপকে নিয়ে নিচে নেমে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। ততক্ষণে পরিষ্কার বুঝে গেছি যে আজ আর আমাদের তিন নম্বর ক্যাম্পে যাওয়া হচ্ছে না, বড্ড দেরি হয়ে গেছে তার পক্ষে।

“সালাম, বড়া সাহিব!”

“সালাম!” বলে ঘুরে তাকিয়ে দেখি আংথারকে, ফুথারকে আর সরকি এসে উপস্থিত। তখন বিকেল ছ’টা বাজে। ওদের দেখে খুব আনন্দ হল। তিনজনেই প্রচুর মালপত্র, সাজসরঞ্জাম আর খাবারদাবার বয়ে নিয়ে এসেছে – আর সবচেয়ে খুশির ব্যাপার হল দু’নম্বর শিবিরের জন্য আরেকটা বড়ো মেস টেন্ট নিয়ে এসেছে।

আলো থাকতে থাকতে দূরবিন চোখে ওপরে চার নম্বর শিবিরের জায়গাটা ভালো করে খুঁজে দেখলাম, কিন্তু কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ল না। টেরেরা নিশ্চয়ই তাঁবুর ভেতরে ঢুকে বিশ্রাম নিচ্ছে এতক্ষণে – এরকম ভেবে নিলে নড়াচড়ার চিহ্ন না থাকাটা ভালো লক্ষণ! আগামীকাল তাহলে ওরা পাঁচ নম্বর শিবির স্থাপন করতে যাচ্ছে!

আমাদের দেখা পেয়ে আংথারকেও খুব খুশি, মুখে হাসি আর ধরে না তার। দু’দিনের মুক্তিনাথ যাত্রাটা সে খুব উপভোগ করেছে বলল, মনে হল এখনও তার ঘোরে আছে সে। ও এসে পড়ায় আমার অনেক ঝামেলা কমে গেল। শেরপাদের সর্দার আংথারকে, অন্য শেরপা এবং কুলিদের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত। হিমালয়ে তার বিপুল অভিজ্ঞতার সম্ভার নিয়ে সে জানে কখন কী করতে হবে না হবে, আর সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের উদ্যোগে এগিয়ে যেতেও কখনওই দ্বিধা করে না। আমার ঘাড় থেকে একটা বিশাল বোঝা যেন নেমে গেল।

পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে আংথারকে আমার হাতে একটা চিঠি দিল। চিঠিটা লিখেছে আইজ্যাক, নোয়েল আর অডট –

৩০.০৫.১৯৫০

১। আজ সকালেই সমস্ত মালপত্র সমেত শেরপাদের পাঠানোটা অবাস্তব ব্যাপার ছিল। গতকাল সন্ধেবেলা অনেক দেরিতে এক নম্বর শিবিরে তোমার চিঠি পেয়েছি আমরা, আর সাজসরঞ্জাম ও শেরপারা ছিল নিচের বেস ক্যাম্পে।

২। আংথারকে, সরকি আর ফুথারকে-কে পাঠালাম, তোমার তালিকা অনুযায়ী যাবতীয় মালপত্র ওরা নিয়ে যাচ্ছে।

৩। আগামীকাল দু’নম্বর শিবিরে শুধু রেশন, অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রী বয়ে নিয়ে একদল শেরপা যাবে, আমাদের মধ্যে কেউ সম্ভবত সঙ্গে যাব।

৪। আমাদের জন্য কোনও নির্দেশ থাকলে দু’নম্বর শিবিরে রেখে গেলেই চলবে।

৫। তিন নম্বর শিবিরে রেশন ফেরি করার জন্য শেরপাদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের কারও যাওয়ার দরকার হলে জানিও।

৬। গতকাল ওয়াকি টকিতে কিছুই তো শুনতে পেলাম না! আজ সন্ধে ৫টা, ৭টা আর ৮টায় একবার করে চেষ্টা করে দেখো। আমাদের রিসিভার সেটটা তো বেশ বড়োসড়ো!

৭। আবহাওয়ার সংবাদ অনুযায়ী আমরা এখন প্রাক-বর্ষার ক্ষণস্থায়ী খামখেয়ালি পর্যায়ের মধ্যে আছি, কোনদিন কীরকম থাকবে আন্দাজ করা মুশকিল। আসল বর্ষা কলকাতা ছেড়ে এগিয়ে আসছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই এ বছর আসছে বর্ষা।

৮। জি বি রাণা বেস ক্যাম্পে নেমে গেছে। দেশে খবর পাঠাতে হলে পাঠাও, কাল সবার চিঠিপত্র নিয়ে বেস ক্যাম্প থেকে একজন রানার রওনা হবে। জি বি-ও তুকুচা ফিরে যাবে।

৯। ফেরার ব্যবস্থা ভেবেছ কিছু? কুলি জোগাড় করা এখানে সময়সাপেক্ষ, আজ বললে আটদিন পরে মাত্র কুড়িজনের একটা দল পাবে। ফেরার সময় মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুলি লাগবে তো!

নোয়েল, আইজ্যাক, অডট

পুনঃ সিনে ক্যামেরায় রঙিন ভিডিও ছবি তোলার সময় স্বাভাবিক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে অ্যাপারচার F.11. অবধি রাখতে পারো। - আইজ্যাক

ওয়াকি টকির সঙ্গে পাঁচটার সময় তো পেরিয়ে গেছে, সাতটায় একবার চেষ্টা করে দেখব যদি যোগাযোগ করা যায়। বর্ষার খবরটা বেশ উদ্বেগজনক। তীরে এসে শেষে তরি ডুববে নাকি? তাহলে আপশোশের আর সীমা থাকবে না। কলকাতা অঞ্চলে বর্ষা শুরু হয়ে গেছে মানে এখানে পৌঁছনো আর মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার।

কথামতো সাতটার সময় ওয়াকি টকিতে এক নম্বর শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে কোনও লাভ হল না, কিছুই শুনতে পেলাম না। সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানানোর জন্য ঠিক করলাম আগামীকাল ঠিক বেরোনোর আগে ওদের চিঠির উত্তর লিখব।

আজ সূর্যাস্তটা অসাধারণ ছিল। নীলগিরি আর অন্নপূর্ণার শৃঙ্গ সোনালি থেকে প্রথমে কমলা, তারপর ধীরে ধীরে হালকা বেগুনি হয়ে এল। নিখাদ পরিষ্কার আকাশ। কনকনে ঠান্ডা। সবই ভালো লক্ষণ। বর্ষা পৌঁছনোর আগে শেষ কয়েকদিনের এই ভালো আবহাওয়াই মনে হয় আমাদের শেষ সুযোগ! নীলগিরিতে ধীরে ধীরে ছায়া নেমে এল। অন্নপূর্ণার উপরাংশের বরফাবৃত অঞ্চলগুলি কেমন একটা হালকা গোলাপি রঙ ধরল। তারপর, প্রায় সম্পূর্ণ পর্বতগাত্র যখন ক্রমশ ছায়ার অন্ধকারে তলিয়ে গেছে, তখনও শৃঙ্গের সর্বোচ্চ বিন্দুটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য রোদটা ধরে রেখে সোনার মুকুটের মতো ঝলমল করতে থাকল।

লায়োনেল টেরে

লুই ল্যাচেনাল

রাত্রে বলার মতো তেমন কিছু ঘটেনি। তুষারধ্বস নামার শব্দ তুলনামূলকভাবে অনেক কম কানে এল। স্বাভাবিক, কেননা কাল সারাদিন কোনও তুষারপাত হয়নি। ভোর ছ'টার সময় স্লিপিং ব্যাগের আরাম ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। আবহাওয়া একদম ঠিকঠাক। দেখে মনে হল ল্যাচেনাল দুর্দান্ত ফর্মে আছে। খারাপ সময়টা কাটিয়ে উঠে ও আবার নিজের মেজাজে ফিরে এসেছে।

"কী ল্যাচেনাল, নিচ থেকে তোমার বাড়তি শার্ট-প্যান্ট সব পাঠিয়েছে তো? পেয়েছ?"

রুকস্যাক গোছাতে গোছাতে একগাল হেসে মাথা নাড়ল ল্যাচেনাল, খুব খুশি। ছোট্ট ছোট্ট জিনিস যে এরকম সময় কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে!

আমরা দু'জনেই নিঃসন্দেহ ছিলাম, আজ এই যে ওপরে উঠতে যাচ্ছি, এই যাত্রাতেই চূড়ান্ত সাফল্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

শেরপারা যতক্ষণ বাঁধাছাঁদা করছিল সেই ফাঁকে চটপট এক নম্বর শিবিরের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখে ফেললাম আমি।

৩১.০৫.১৯৫০

এক নম্বর শিবিরের সব সাহেবদের প্রতি –

ল্যাচেনালের সঙ্গে জুড়ি বেঁধে তিন নম্বর ক্যাম্পের দিকে রওনা দেবার ঠিক আগে তোমাদের লিখছি। আবহাওয়া সহায় থাকলে এবারে একেবারে শৃঙ্গ অবধি না পৌঁছে ফিরছি না আমরা। আমাদের পরে শ্যাজ আর কোজি তৃতীয় শৃঙ্গাভিযাত্রী দল হিসেবে ওপরে উঠবে।

আইজ্যাক, নিচের টেলিগ্রামটা অনুগ্রহ করে লুসিয়ান ডেভিসকে তার করে দিও –

'অন্নপূর্ণা শৃঙ্গজয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করছি আমরা। রাস্তা কঠিন বরফ আর তুষারে ঢাকা, যথেষ্ট শক্ত রুট, তবে আশা করি বেশ তাড়াতাড়িই এগোনো যাবে। কিছু কিছু জায়গায় তুষারধ্বসের ভয় আছে। বেস ক্যাম্পের ওপরে এখন অবধি চারটে শিবির স্থাপন করা হয়েছে, এক নম্বর (১৬,৭৫০ ফিট), দু'নম্বর (১৯,৩৫০ ফিট), তিন নম্বর (২১,৬৫০ ফিট) আর চার নম্বর (২৩,৫০০ ফিট)। শৃঙ্গজয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী। শারীরিক এবং মানসিকভাবে সবাই একেবারে ঠিকঠাক আছে।

\- মরিস হারজগ'

রেশনঃ কিছু খরচা হয়েছে। কোজি দু'নম্বর শিবিরে রইল। তিন নম্বর ক্যাম্পে কী কী পাঠাতে হবে সে ব্যাপারে ও নির্দেশ দেবে।
ওয়াকি টকিঃ কিছুই তো শুনতে পেলাম না। শ্যাজ নিচে গেছে, ওকে সেটটা দেখতে বলো।
বর্ষাঃ সর্বশেষ খবর জানাতে থেকো।
ফেরাঃ কাউকে আগেভাগেই তুকুচা চলে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে কুলি জোগাড় করে তাদের নিয়ে ফিরবে সে।
ভিডিওঃ শৃঙ্গ অবধি সিনে ক্যামেরাটা নিয়ে যাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি।

মরিস হারজগ

এবারে যে আমরা সবাই খুব আশাবাদী তা সবার গোছগাছ আর তৈরি হওয়া দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। লক্ষ করলাম যার যার ব্যক্তিগত ওষুধবিশুধের বাক্স গোছানোর ব্যাপারে সবাই এবার খুব সাবধানী, যার যার ক্যামেরার জন্য বাড়তি ফিল্ম নিতেও ভুল হল না কারও। শ্যাজ খুব সুন্দর ছোট্ট একটা ফ্রান্সের পতাকা তৈরি করেছিল, আমি সেটা আমার রুকস্যাকে ভরে নিলাম। শৃঙ্গে যদি উঠতে পারি সেই কথা ভেবে আমি নিজেও কিছু বিশেষ স্মারকচিহ্ন এনেছিলাম, সেগুলোও নিতে ভুললাম না। ঝটপট নিজের নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরোনোর জন্য তৈরি হয়ে গেলাম সবাই।

শিবির ছেড়ে, বড়ো ফাটলটার পাশ দিয়ে ঘুরে, সোজা সেই নালা বেয়ে তুষারধ্বস নেমে এসে তৈরি হওয়া বিশাল বরফের স্তূপটার দিকে এগিয়ে চললাম আমরা। এখনও তুষার বেশ শক্ত, পা ডুবে যাওয়ার হ্যাপা নেই। আবহাওয়া খুব ঠান্ডাও না, খুব গরমও না, একেবারে ঠিকঠাক। ফলে সবার মনেই বেজায় স্ফূর্তি।

"মরিস, এ কী ব্যাপার? ওপরে তাকিয়ে দেখ!" হঠাৎ ল্যাচেনালের কথায় চমক ভাঙল।

"সে কী!! ওরা নেমে আসছে কেন? কী হয়েছে?"

মাথা তুলে তাকিয়ে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, দেখি চারটে ছোটো ছোটো কালো বিন্দুর মতো টেরে, রেবুফত আর তাদের দু'জন শেরপা ওপর থেকে আমাদের দিকে নেমে আসছে!

ব্যবহৃত ছবিঃ অন্নপূর্ণা অভিযান **(এরপর আগামী সংখ্যায়)**